রূপ-মঞ্চ

1943

মৃগাক্ষী
জয়শ্রী
৩০

রূপ-মঞ্চের
ক্যামেরা ও শিল্পীর
চোখে
চন্দ্রাবতী

দায়ী কে বা কারা ?

—কালীশ মুখোপাধ্যায়—

কয়েকদিন হলো একটী পুরোন কথা—নতুন ভাবে শুনলুম। যে মহল থেকে শুনবার কথা নয় সেই মহল থেকে তাই শারদীয়ায় আমার আলোচনা হয়ত বা কারো কারো কাছে অপ্রীতিকর বলেই মনে হবে। কথাটা পুরোন। শুনে শুনে কাণের পরদা এমনি ভোতা হ'য়ে গেছে যেন শুনেও শুনতে পাই না। এবার শুনেছিলাম অন্য সুরে। কথাটা আর কিছু নয়। বাংলা ছবির বিরুদ্ধে অভিযোগ। উপযুক্ততার বিচারে বাংলা ছবির জন্য কোন স্থান নির্বাচন করা যায় না—তাই। বলছিলেন যিনি তিনি অন্য কোন মহলে বিচরণ করেন না বাংলা ছায়া জগতের একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেত্রী। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এত গেল বাংলার একজন অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর কথা—যে বাংলা ছবি তিনি খুব কমই দেখেন—দেখবার উপযুক্ত নয় বলে। কিন্তু বাংলার একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালকের কথা শুনবেন? কয়েক মাস পূর্বে—সাংবাদিক ও দর্শক সমাজ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত কোন চিত্র সম্পর্কে উক্ত পরিচালককে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ছবিটা মুক্তিলাভ করবার প্রায় দু'মাস 'পরে তার সংগে আমার সাক্ষাৎ হয়—তখন অবধি তিনি দয়া করে বাংলা ছবিটী দেখে উঠতে পারেননি—অথচ আলোচনা প্রসংগে জানলুম কয়েকটা নিকৃষ্ট শ্রেণীর ইংরেজী ছবি দেখে নিতে তিনি কসুর করেননি। যারা বাংলা ছবি তৈরী করেন, যারা বাংলা ছবিতে অভিনয় করেন—যাদের জন্য বাংলা ছবি তৈরী করা হয়—তাদের কাছ থেকেই যদি বাংলা ছবি পায় এমনি অনাদর এমনি তাচ্ছিল্য তবে তার উন্নতির সম্ভাবনা কোথায়?

মেনে নিলাম বাংলা ছবি নিকৃষ্টতর বা তম বা তার নিচেও যদি কিছু থাকে—কিন্তু এজন্য দায়ী কে বা কারা?

অভিনেত্রীদের কথাই প্রথম ধরুণ। অভিনেত্রীদের যে যে গুণ বা সম্পদ থাকলে তারকা শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে—আমাদের তারকাকুলে—সেরূপ শ্রেণীর গুণসম্পন্না ক'জন অভিনেত্রীর সন্ধান পাওয়া যাবে? সৌন্দর্যে, অভিনয় প্রতিভায়—কণ্ঠ মাধুর্যে—ক'জন অভিনেত্রী 'অভিনেত্রী' নামের মর্যাদা রাখতে সমর্থা হয়েছেন? বাচন ভংগীতে—উচ্ছল যৌবনের চপল চাপল্যে—এর মাঝে কেউ হয়ত বা কয়েক শ্রেণীর দর্শকদের মনে একটু একটু করে রেখাপাত করতে লাগলেন—কিন্তু ঐ দু' একখানা ছবির পরই তাদের আর সে অবস্থায় দেখতে পাবেন না। অনেকখানি তখন পদস্খলন ঘটেছে। স্টুডিও মহলের মক্ষিকাদের গুঞ্জনে তখন তিনি গুঞ্জরিত। এই মক্ষিকা দলের ভিতর মাইক্রোসকপিক দৃষ্টির সাহায্যে সহজেই দেখতে পাওয়া যায় প্রযোজকদের নিকটতম না হলেও দূর সম্পর্কীয় ভাই বা আত্মীয়—স্বয়ং পরিচালক—নায়ক—এছাড়া বিভিন্ন বিভাগের খুচ্‌রো খুচ্‌রো কর্মচারীরাও কেউ কেউ। অবশ্য আমার এই অভিযোগ সমষ্টিকে নিয়ে নয়। ব্যতিক্রমও আছে। যাই হউক এই মক্ষিকা গুঞ্জরণে নবাগতা অভিনেত্রীর পক্ষে—দু'দিক সামলানো দায় হ'য়ে পড়ে। হয় তাকে মক্ষিকানুরাগিণী হ'তে হয়—না হয় শিল্পানুরাগিণী। অশিক্ষায় যাদের ভিতর অন্ধকারাচ্ছন্ন, প্রথমটার প্রলোভনের হাতছানি তারা কোন মতেই এড়াতে পারেন না—তাই তাদের ঘটে পদস্খলন। ষ্টুডিও মহলে কয়েকদিন যাতায়াত করুন, একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখুন, সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন—সেখানকার

আবহাওয়ার পংকিলতায় পা পিছলে যাবার কত সম্ভাব
বাংলা ছবির অবনতির মূলে এই 'আবহাওয়া' কম
নয়। তাই এর চাকা ঘুরিয়ে দিতে হবে। এমন অ
বাদী শক্তিমান বা শক্তিমতী শিল্পীদের এ পথে যাতা
করতে হবে—যাদের পদধ্বনির পবিত্রতায় মক্ষিকা-৩
ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসবে। এমনই শক্তিধর পথ
দ্রষ্টাদের আসতে হবে এই পথে যারা সবার আগে এগি.
যেতে পারেন, যারা পিছনের পরে—থাকাদের প'
আদেশ জারি করবেন—"ওগো পায়ের ধূলি ঝেড়ে ন
নইলে পথও পাবে না—চলতি-পথও করে রাখবে ধূলিময় –।

* * * *

স্কুল-কলেজের বড় বড় পণ্ডিত দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি
বর্গ—সাহিত্য-মহলের ধুরন্ধরেরা তারাও বাংলা ছবিকে
'দূর দূর' করে কম দূরে রাখেন না। কিন্তু এজন্য তারাও
কোনাংশে কম দায়ী নন। তাঁদের অদূরদর্শিতা কে
মতেই অবহেলার নয়। তারা শুধু 'ঘোমটার মাঝে
খেমটা নাচের সন্ধানই পেয়েছেন—তাঁরা এটা তলিয়ে
দেখেননি, ঐ অবগুণ্ঠনের তলে বসে আছে—শিল্পকলা—
সাহিত্য, বিজ্ঞান—জাতির সর্বপ্রকার উন্নতির অধিষ্ঠাত্রী
দেবী—যার প্রাণপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব রয়েছে সমবেত ভাবে
আমাদের সবাকার হাতে।

পতিত সাহিত্যিকের জবানী

প্রেমেন্দ্র মিত্র

অনেক দিন বাদে দেখা। তবু দেখা হতেই বন্ধু একটা কথার পর জিজ্ঞাসা করলেন,—কি হে, তোমাদের সিনেমার খবর কি?

এ প্রশ্নটা যে ভূমিকা মাত্র, তা অনেক অভিজ্ঞতা থেকে জানি, তাই চুপ করে রইলাম। এবং আমার অনুমান যে ভুল নয় তার প্রমাণ স্বরূপ তিনি পরমুহূর্তে মন্তব্য করলেন—বাংলা ছবি সত্যি দেখা যায় না।

বাংলা ছবির অন্ধ স্তাবক আমি নই, তার সম্বন্ধে সত্যি কথা বলতে গেলে আমার যা ধারণা, তা, ছায়াছবির জগতে নিজেদের ফাঁপান ছায়া দেখেই যারা নিজেদের গৌরবে মশগুল, তাঁদের কাছে খুব প্রীতিকর শোনাবে না। তবু বাংলা ছবিকে সরাসরি যারা ফাঁসিতে লটকে দিতে চান তাঁদের সঙ্গেও একমত হতে আমি অক্ষম।

বাংলা ছবি এখনও জাতে ওঠেনি এ-কথা সত্য। দেশের সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির যে চিরন্তন বেদী তার ধারে-কাছেও বাংলা ছবির কোথাও স্থান নেই। যে সব ভুঁইফোড় নামের ঢক্কানিনাদে সিনেমা জগৎ মুখরিত, একটা বিশেষ গড্ডালিকা-প্রবাহের বাইরে সত্যকার বিদগ্ধ সমাজে তার ক্ষীণতম প্রতিধ্বনিও পৌঁছোয় না। তবু বাংলা ছবিকে এক কথায় বিদায় দেবার আগে তার পক্ষের একটা কথা শোনবার আছে বলে আমার মনে হয়।

বাংলা ছবি এদেশে আরম্ভ হয়েছে অনেকটা হুজুগ হিসাবে—সখের হুজুগই তাকে বলা যায়। তার ব্যবসায়-দিকটার প্রতিও যথেষ্ট মনোযোগ প্রথম দিকে দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না। সখের হুজুগ থেকে বাংলা ছবি এখন লাভের ব্যবসায়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু ব্যবসায় থেকে শিল্পের পর্য্যায়ে ওঠবার বিশেষ কোন লক্ষণই তার দেখা যাচ্ছে না একথা সত্য।

ব্যবসায় ও শিল্পের মধ্যে যে চিরন্তন পরস্পর-বিরোধী সম্পর্ক বর্ত্তমান, বাংলা ছবির শিল্প-মর্য্যাদা লাভের পথে তাই প্রধান অন্তরায় বল্লে খুব ভুল বলা হয় না। শুধু ছায়া-ছবি কেন, হাটে যাকে বিকোতে হয় এমন কোন শিল্পই নিজের সম্পূর্ণ মর্য্যাদা খুব কম সময়ই রাখতে পারে। হাটের ফরমাজের দিকে নজর রাখতে, সার্থক রস-সৃষ্টির আদর্শ তার পদে পদে ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য।

সিনেমার হাটে নিজেদের বিকিয়েছি বলেই, তার পক্ষে এই ওকালতি, পতিত সাহিত্যিকের কাঁদুনি বলে যদি কেউ মনে করেন, তা হলে আমরা নাচার। ছায়া-ছবিকে,—এ দেশের শুধু নয়, সকল দেশের ছায়া-ছবিকেই প্রধানতঃ হাটের মুখ চেয়ে থাকতেই হয়। তবে হাটের তফাৎ আছে, আর তফাৎ আছে মহাজনের, হাটের চাহিদা অনুমান করা যাদের কাজ।

সে তফাৎ প্রচুর থাকা সত্ত্বেও, যে বিদেশী ছবির নামে অনেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন, সেই ছবি শতকরা ক'টা সার্থক সৃষ্টির স্তরে পৌঁছোয় একবার এ হিসাব করলেই বোধহয় বাংলা ছবির প্রতি অহেতুক বিরাগ পোষণ করা আর সম্ভব হবে না।

চোর দায়ে একা বাংলা ছবিকেই ধরবার আগে আর একটা কথাও ভাবা দরকার। বাংলা দেশে সিনেমাকে নেহাৎ নাবালক আর বলা চলে না, কিন্তু রঙ্গমঞ্চ সিনেমার চেয়েও অনেক বেশী প্রাচীন। সিনেমার আবির্ভাবের আগে পর্য্যন্ত রঙ্গমঞ্চের কোন প্রতিদ্বন্দ্বীও ছিল না। তবু এ পর্য্যন্ত পেশাদার রঙ্গমঞ্চে কটা সার্থক সৃষ্টি আমরা

রঙ্গ-মঞ্চ

দেখতে পেয়েছি! একাধারে জনপ্রিয় অথচ রসোত্তীর্ণ কটি নাটক নিয়ে বাংলা রঙ্গমঞ্চ গর্ব্ব করতে পারে।

রঙ্গমঞ্চই বা কেন, স্রষ্টার হাত যেখানে ব্যবসার চাকায় বাঁধা নয়, মহাজনের অনুগ্রহ বা হাটের ফরমাজ, কিছুরই তোয়াক্কা না রেখে যেখানে সৃষ্টির প্রেরণা নিজের পথ বেছে নিতে পারে, সেই সাহিত্য-ক্ষেত্রেও অহরহ কিছু অসামান্য রচনার সাক্ষাৎ আমরা পাই না।

বাংলা ছবি দেখা যায় না বলে যাঁরা নাসিকা কুঞ্চিত করেন, তাঁদের কাছে তাই আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, বাংলা বই খুললেই কি পড়া যায়, না, বাংলা রঙ্গমঞ্চে ঢুকলেই পরিতৃপ্ত মন নিয়ে উঠে আসা যায়! যা সত্যি ভালো তা সব ক্ষেত্রেই বিরল, সিনেমাক্ষেত্রে সেই ভালো কিছু সৃষ্টির প্রেরণা আবার আষ্টে পৃষ্ঠে নানা শৃঙ্খলে বাঁধা।

বাংলা ছবির তরফে এই কৈফিয়ৎটুকুতেই আমার বক্তব্য অবশ্য শেষ নয়। বাংলা ছবি ভালো না হওয়ার কারণ যত বেশীই থাক, তার ভালো হওয়ার প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশী। যত বেড়ী-ই আজ তার পায়ে থাক, সে বেড়ী ভেঙে বার হবার সম্ভাবনা ও প্রেরণা যদি তার মধ্যে না থাকে, তাহ'লে তার হয়ে ওকালতির কোন মানেই হয় না।

অবশ্য ব্যবসায়গত ভিত্তি সম্পূর্ণভাবে পরিহার করবার আশা বাংলা ছবির পক্ষে অত্যন্ত সুদূর, তবু ব্যবসায় ও সার্থক সৃষ্টির আদর্শের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য-বিধান একেবারে অসম্ভব নয়। এ সামঞ্জস্য বিধানের কাজে অগ্রণী হবার জন্যে শুধু পরিচালক বা লেখক নয় সব চেয়ে বড় প্রয়োজন সত্যকার প্রযোজকের। বাংলা দেশে এ পর্য্যন্ত প্রযোজক বলে যাঁরা পরিচিত হয়েছেন তাঁদের অধিকাংশই প্রযোজকের দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন এমন কি অজ্ঞ বলতেও পারা যায়। ইঞ্জিনিয়ার কি উকিল কি পাটের বাজারের ব্যবসায়ী না হয়ে তাঁরা যে সিনেমা জগৎ অলঙ্কৃত করছেন সে নেহাৎ ঘটনা চক্রে এবং কতকটা নতুন যুগের হাওয়ায়। ছায়াছবি হাটের জিনিষ হলেও পুরোণো হাটের বদলে নতুন হাট যে তার জন্যে বসান যায়, দর্শক সমাজের একটা কাল্পনিক চাহিদার জোগান না দিয়ে নতুন চাহিদা সৃষ্টি করে ছায়া ছবিকে উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের দিকে যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এমন দূরদৃষ্টি উদ্দীপনা ও আদর্শ নিষ্ঠা যাঁর আছে, সেই প্রযোজকেরই আজ সব চেয়ে বড় অভাব।

বাংলা দেশে প্রতিভার দৈন্য সত্যিই আছে বলে বিশ্বাস হয় না। যাঁরা ছায়াছবির জগতে আছেন, তাঁরা যদি শক্তির দিক দিয়ে দেউলে হয়ে গেছেন বলেও প্রমাণিত হয় তবু সত্যকার প্রযোজক এসে হাল ধরলে আপনা থেকে নতুন প্রতিভা তাঁর চারিধারে আকৃষ্ট হয়ে আসবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

রেনুকা

(শারদীয়া রূপ

দেশ ও রঙ্গালয়

মহেন্দ্র গুপ্ত

বিলাতি থিয়েটারের অনুকরণে বাংলাদেশে রঙ্গালয় স্থাপিত হয়েছে। তাই অনেককাল পর্য্যন্ত বিদেশ থেকে আমদানী জামা, কাপড়, সৌখীন আসবাবপত্র প্রভৃতির সামিল ধরা হ'ত—রঙ্গালয়কে। ও যেন কেবল সৌখীন সম্প্রদায়ের নিছক বিলাসের ক্ষেত্র। তাই স্বদেশী ভাবের প্রেরণা যখন এদেশে জাগল—রঙ্গালয়কেও বিদেশী মালের মত বর্জ্জন করবার একটা ধুয়া উঠল। বড় বড় কংগ্রেস-নেতা জেলে যেতে শুরু করলেন—বিলাতী কাপড়ের সঙ্গে থিয়েটারের সামনেও অমনি "পিকেটিং" আরম্ভ হল। অনেক ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে; কলকাতা থেকে আমাদের দেশে মেলায় থিয়েটার গেছে; কত নামজাদা অভিনেতা, অভিনেত্রী গেছেন; তাদের অভিনয় দেখব বলে আনন্দে, উত্তেজনায় চার পাঁচ দিন ভাল ক'রে ঘুমুতে পারিনি! যেদিন অভিনয় সুরু হ'বে সেদিন সকালবেলা আমাদের শহরের একজন কংগ্রেস-নেতা ধরা পড়লেন! আর যাবে কোথায়? সমস্ত স্কুলের ছেলেরা এবং তা'দের পাড়ার উদ্যোগী দাদার দল ছুটলেন মেলায় থিয়েটার বন্ধ করে দিতে। "বন্দেমাতরম্", "গান্ধিজী কি" জয় ধ্বনি তুলে আমিও এসে যোগ দিলুম তাদের দলে। তারপর সে কি পিকেটিংএর ধুম:! ফলে থিয়েটার-ওয়ালাদের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে কলকাতায় ফিরে আসতে হ'ল। যে দু'চারজন চেনা ছেলে পিকেটিং অগ্রাহ্য করে থিয়েটার দেখেছিল—তাদের আমরা মনে করলুম দেশের পরম শত্রু বলে। থিয়েটার দেখার মহা অপরাধে তাদের আমরা যে দণ্ডের ব্যবস্থা করেছিলুম—স্বদেশী করে জেলে গেলেও জেলকর্ত্তৃপক্ষ তার চেয়ে অধিক শাস্তি তাদের দিতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

থিয়েটার উগ্র-গন্ধী বিদেশী বস্তু, এই যে অদ্ভুত মনোভাব এ অবশ্যি কালের গতির সঙ্গে অনেকটা পাল্টে গেছে। কিন্তু তাহলেও এখন পর্য্যন্ত থিয়েটার দেশের মাটীতে তার ভিত্তি স্থাপন করতে পারেনি। জাতির মনোবৃত্তির জাতির উন্নতি ও অবনতির মান-যন্ত্র হ'ল জাতির রঙ্গালয়; জাতির চিন্তাধারা কোন্ পথে চলেছে তা রঙ্গালয় এমন প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে দিতে পারে যা নাকি অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে প্রথম থিয়েটার স্থাপিত হয়েছিল বিলাতী থিয়েটারের অনুকরণে একথা আগেই বলেছি। কয়েকজন মিশনারী ও ইঙ্গ-বঙ্গ সম্প্রদায়ের শিক্ষিত লোক বিলেতে রঙ্গালয় আছে, তাই দেখে এদেশেও রঙ্গালয় স্থাপনার পরিকল্পনা করেছিলেন। সেই হ'ল থিয়েটারের আদিপর্ব্ব। কিন্তু তাই বলে থিয়েটার দেশের নিজস্ব বস্তু হতে পারে না, এ ধারণা বড্ড অদ্ভুত। তাকে গঠন করে নিতে হবে স্বদেশীয় ভাব দিয়ে···সভ্যতা দিয়ে···সংস্কৃতি দিয়ে। তারপর দেখতে পাবেন—থিয়েটারের ভেতর দিয়ে দেশ-সেবার, জাতি গঠনের সে কি বিরাট সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে।

আমাদের গোড়ার গলদ কোথায় জানেন? আমাদের দেশের দর্শক সমাজ এককালে যেমন থিয়েটারকে বিদেশী জিনিষ মনে করতেন—যাঁরা থিয়েটার পরিচালনা করতেন বা থিয়েটারের সঙ্গে অন্য দিক্ দিয়ে সংশ্লিষ্ট থাকতেন তাঁরাও অনেকটা ওই ভাব পোষণ করতেন! স্বদেশীযুগে বিলাতি মালের দোকানদারের মত তাঁরাও সর্ব্বদা তটস্থ থাকতেন,—পেটের দায়ে যেন দেশের কাছে অপরাধ-মূলক কাজ কর্চ্ছেন অনেকটা এই রকম ভাব। নাট্যশালার

বিরাট দায়ীত্ব, জাতিগঠনের অপরিসীম সম্ভাবনার পরিকল্পনা করা দূরে থাক—তাঁরা রঙ্গালয়কে সত্যি সত্যিই করে তুললেন ধনিকের বিলাস কেন্দ্র। আত্ম-বিস্মৃত রঙ্গালয়ের এমন অবনতি ঘটল যে নৈশপানাগারে যে বীভৎস উল্লাসে মদমত্ত নর-পশু মেতে ওঠে···রঙ্গালয় যোগাতে লাগল অনেকটা সেই স্তরেরই প্রমোদ-বিলাস! অবশ্যি মহাকবি গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ প্রমুখ দু'চার জন তাঁদের নাট্য-সাহিত্য ও সাধনা দিয়ে রঙ্গালয়কে এই দূষিত আব-হাওয়া থেকে অনেকটা উন্নতি করতে প্রয়াস পেয়েছেন। আর ওঁদের প্রচেষ্টা না থাকলে অনেক আগেই বাংলার রঙ্গালয়ের অপমৃত্যু ঘটত। কিন্তু তবু একথা সত্যি, যে আজ পর্য্যন্ত বাংলার রঙ্গালয়গুলি সর্ব্বতোভাবে বাঙালীর রঙ্গালয় হতে পাবে নি। তার কারণ রঙ্গালয়কে জাতির প্রাত্যহিক জীবনক্ষেত্র থেকে বরাবর আলাদা করে দেখা হচ্ছে; রঙ্গালয় শুধু প্রমোদ-গৃহ হয়ে থাকছে! শুধু রঙ্গ, তামাসা! দু' ঘণ্টা নাচে, গানে, বর্ণবৈচিত্রে মাঝখানে খানিকটা আপনা ভুলে থাকবার যায়গা—ব্যস্, এই পর্য্যন্ত!

দেখুন, বাঁচতে হ'লে মানুষের খানিকটা আমোদ প্রমোদের দরকার বৈকি। প্রাণখুলে হাসতে পেলে জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি পায় এমন কথাও শোনা যায়। তাই রঙ্গালয়ের খানিকটা প্রমোদ বিতরণের জন্য বেঁচে থাকা দরকার। তবে কি জানেন, আসল কথা হল, রঙ্গালয় হতে যে বর্ণ-বৈচিত্র, আমাদের মনের ওপর প্রলেপ দেবে—সে যেন আমাদের মনকে বিস্তৃত না করে ··বরং খানিকটা ঔজ্জ্বল্য দান করে।

নিছক আনন্দ পরিবেশনের জন্য রঙ্গালয়ের এই যে প্রয়োজনীয়তা সে-ও কেবল দেশের স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আর রঙ্গালয়ও প্রমোদ বিতরণের দায়িত্ব নিতে পারে তখনই যখন সে তার নিজের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে পেরেছে। কারণ প্রমোদ পরিবেশন বড় কঠিন ব্যাপার; অত্যন্ত হুঁসিয়ার হয়ে না চললে প্রমোদ থেকে প্রমাদ ঘটতে বিলম্ব হয় না। জাতি যখন সুস্থ···রঙ্গালয় যখন সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিকার মুক্ত শুধু সেই অবস্থাতেই নিছক পারস্পরিক আদান প্রদান হতে পারে। অন্য অবস্থায় নয়।

বিশেষতঃ দেশের বর্ত্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতি! এ সময়ে শুধু বিমল আনন্দ-পরিবেশনের উদ্দেশ্য নিয়ে রঙ্গালয় পরিচালনা করা যুক্তিযুক্ত নয়। দুর্ভিক্ষপীড়িত দুর্গত নরনারী অন্নাভাবে যেদেশে হাহাকার করছে, সে জাতির জীবনে বিমল আনন্দ-সম্ভোগেরই বা অবকাশ কোথায়? আগে দেশকে বাঁচাতে হবে, জাতিকে বাঁচতে হবে—জাতি সুস্থ সবল হলে—তখন তো আনন্দ-সম্ভোগ! তাই আজ রঙ্গালয়কে যদি বাঁচতে হয়—তাকে জাতির দুঃখ-দুর্দ্দশার অংশ নিয়ে বাঁচতে হবে—জাতিকে আশ্বাস দিতে হবে, সাহায্য করতে হবে. মৃত্যুর মুখ হতে জাতিকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে দেশব্যাপী প্রেরণা জাগাতে হবে। রঙ্গালয় প্রত্যক্ষভাবে যে আবেদন উপস্থিত করতে পারে—হাজার সভাসমিতি তা পারে না। এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, দেশের সমস্ত দুঃখ-দৈন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত হয়ে—রঙ্গালয় যদি দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারে—তাহ'লেই আজ রঙ্গালয়ের বাঁচবার সার্থকতা আছে। নতুবা—আজ একথা বলা অন্যায় হবে না যে প্রমোদ-সর্ব্বস্ব রঙ্গালয়—আজ দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর আহার্য্য অপহরণ করে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সেই শোষণকারী রঙ্গালয়কে আপনারা ধ্বংস করুন—জাতির দেহে বিষদুষ্ট ক্ষতির ন্যায় তাকে বর্জ্জন করুন।

সমরোত্তর চলচ্চিত্র-শিল্প

গোপাল ভৌমিক

এক ধরণের চলচ্চিত্রদর্শক এবং চলচ্চিত্র সমালোচক আছেন যাঁবা বঙ্গীয় তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অতিমাত্রায় নৈরাশ্যবাদী : দেশীয় চলচ্চিত্রের নাম শুন্‌লেই এই জাতীয় ভদ্রলোকেরা নাক সিঁটকিয়ে ওঠেন। তাঁদের কাছে দেশীয় চিত্রশিল্পের বর্তমানও যেমন নেই, ভবিষ্যতও তেমনি নেই। চলচ্চিত্র বলতেই এঁরা বোঝেন বিদেশী চলচ্চিত্র—তাও আবার হলিউডের চিত্র। বিদেশী চিত্র যত নিকৃষ্ট ধরণেরই হোক না কেন, এঁরা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বিদেশী চলচ্চিত্রের প্রতি এঁদের অনুরাগ যেমন অহেতুক, দেশীয় চলচ্চিত্রের প্রতি অন্ধ বিরাগও তেমনি কারণহীন। চেষ্টা করলে চাঁদের মধ্যেও কলঙ্ক আবিষ্কার করা কঠিন নয়—কিন্তু তাই বলে চাঁদের সৌন্দর্য তাতে কিছুমাত্র মলিন হয় না। এতে কেউ যেন না মনে করেন যে আমি দেশীয় চলচ্চিত্রকে চাঁদের সঙ্গে তুলনা করছি। তুলনা করতে পারলে খুসীই হ'তাম কিন্তু দুঃখের বিষয় চাঁদের মত সৌন্দর্যের অধিকারী আমাদের চলচ্চিত্র শিল্প এখনও হয়নি। তবে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি পূর্বোক্ত ভদ্রলোকদের মত নৈরাশ্যবাদী নই : আমি বিশ্বাস করিনে চেষ্টা করলে আমাদের দেশীয় চলচ্চিত্রশিল্প অদূর ভবিষ্যতে চাঁদের মত স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের অধিকারী হতে পারে। আমার এটা শুধু যুক্তিহীন বিশ্বাস মাত্র নয়—এর পিছনে আছে যুক্তির দৃঢ় ভিত্তি। ইতিমধ্যেই বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রে অগ্রগতির এমন লক্ষণ দেখেছি যাতে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই আশা করা যায় যে আজ ভ্রূণরূপে যার অস্তিত্ব দেখতে পাচ্ছি, অদূর ভবিষ্যতে তার পূর্ণাবয়ব আমরা দেখতে পাবো। একে কি নিছক কল্পনা-বিলাস বলে উড়িয়ে দিতে পারা যায়? তাই ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের শত দোষ ত্রুটি সত্বেও আমি এই শিল্পটিকে অন্তর দিয়ে ভালবাসি এবং তার গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করি।

চলচ্চিত্রের দুটো দিক আছে : একটা ব্যবসায়ের দিক এবং অপরটি শিল্পরূপের দিক। ব্যবসায়ের দিকটা এতই প্রত্যক্ষ যে তা নিয়ে আলোচনা করা বৃথা। প্রযোজক কিংবা পরিচালক যখনই কোন চলচ্চিত্রনির্মাণে হাত দেন তখনই সর্বপ্রথম এর ব্যবসায়ের দিকটার নজর দেন। যে ছবি তাঁরা তুলতে যাচ্ছেন, সে ছবিটি দর্শক সাধারণের মনোমত হবে ত—তাঁরা টাকা দিয়ে এই ছবিটি দেখ্‌বে ত, চিত্র-নির্মাণকার্যে কোম্পানীর যে পরিমাণ টাকা লেগেছে, সে টাকাটা উঠে এসে লাভ হবে ত—এই জাতীয় অনেক চিন্তাই তাঁদের মাথায় এসে ভিড় জমায়। অতএব চলচ্চিত্র যে ব্যবসায়ের বস্তু সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এতে একধরণের আদর্শবাদী এই বলে আপত্তি করতে পারেন যে চলচ্চিত্র যদি ব্যবসায়ের বস্তু হয়, তবে তাকে নিশ্চয়ই শিল্প নাম দেওয়া যেতে পারে না। এই ধরণের আদর্শ-বাদীদের মতে শিল্প কখনও ব্যবসায়ের বস্তু হতে পারে না। এই ধরণের আদর্শবাদীদের বলা চলে পলায়নবাদী—এস্কেপিস্ট্, তাঁরা মানব জীবনকে চলচ্চিত্র থেকে বাদ দিতে চান। তাঁরা কি জানেন না যে বর্তমানের যান্ত্রিক ধনতান্ত্রিক জগতে শিল্পমাত্রই ব্যবসায়—তা' সে সাহিত্য-শিল্পই হোক্ আর চারুকলাই হোক্? অতএব চলচ্চিত্রকে শিল্প বলতে আমাদের বাধা নেই। তবে সাহিত্য, চারু-কলা প্রভৃতি শিল্পের সঙ্গে চলচ্চিত্রশিল্পের বিভিন্নতা দ্রষ্টব্য। একখানা বই লিখতে কিংবা একখানা ছবি আঁকতে সৃষ্টিমূলক কাজটি করেন বিশেষ একজন লোক। কিন্তু

চলচ্চিত্র-নির্মাণে একাধিক লোকের প্রয়োজন। কাহিনী-কার আছেন, প্রযোজক আছেন, পরিচালক আছেন, আলোকচিত্রশিল্পী আছেন, শব্দযন্ত্রী আছেন, অভিনেতা অভিনেত্রী আছেন—আরও কত কে? তা ছাড়া আছে মোটা অঙ্কের টাকার প্রয়োজন। এই সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সমাবেশে যখন কোন একটি স্টুডিও থেকে একখানা চলচ্চিত্র নির্মিত হয়ে সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করে, তখন কি তাকে শিল্প বলব না? অতএব দেখা যাচ্ছে যে চলচ্চিত্রের মধ্যে ব্যবসায় এবং শিল্প—এ-দুটি জিনিসেরই সমন্বয় ঘটেছে।

এখন দেখা যাক, আমাদের ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের ব্যবসায় এবং শিল্প—এর কোন দিকটা কত পরিমাণ অগ্রসর হয়েছে। নির্বাক যুগের কথা বাদ দিলে ভারতে সবাক্ চলচ্চিত্রের আগমন হয়েছে মাত্র ১০।১২ বৎসর। সবাক্ যুগের প্রথম থেকেই আমাদের চিত্রশিল্পের কর্ণ-ধারদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল ব্যবসায়ের দিকে। প্রথম প্রথম দর্শক সমাজ সবাক্ চিত্রের অবাক-করা ব্যাপার দেখার জন্যে গাঁটের পয়সা খরচ করতে কসুর করেনি ফলে আমাদের চলচ্চিত্র-শিল্প ব্যবসায়ের দিক থেকে আশাতীত রকম ফেঁপে উঠেছে বলা চলে। আজ আমাদের জাতীয় ব্যবসায়ের তালিকায় চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের স্থান বেশ উঁচুর দিকে। এটা যে সুলক্ষণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে ব্যবসায়ের দিকটাই চলচ্চিত্রের একটি মাত্র দিক নয়—এর একটা শিল্পগত দিকও আছে। আমাদের চিত্রশিল্পের বেশীর ভাগ অকৃতিত্ব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এই শিল্পগত দিকে। গণ-দেবতারা যা চান তাই দিয়ে তাঁদের সন্তুষ্ট করার অত্যুগ্র আগ্রহে, আমাদের চলচ্চিত্র কর্তৃপক্ষ শিল্পের দিকে নজর দেবার অবসর পান নি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে নতুনত্বের মোহ বেশী দিন থাকে না। তাই আমাদের দর্শক সমাজও শীঘ্রই নতুনত্বের মোহ কাটিয়ে উঠে দাবী জানাতে লাগল—ভাল ছবি চাই। অবশ্য সুবৃহৎ দর্শক সমাজের একটা সচেতন অংশ মাত্র দাবী জানাচ্ছে—বাকী দর্শকেরা এখনও নিছক দেখার আনন্দেই চলচ্চিত্র দেখে। যাই হোক, এ দাবীতে ফল কিছুটা হয়েছে বৈকি! আমাদের চলচ্চিত্র কর্তৃপক্ষ কুম্ভকর্ণের ঘুম থেকে জেগে দেখছেন যে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে তাঁরা যুগের অনেক পিছনে পড়ে গেছেন। এ যুগে কেউ আর চলচ্চিত্রে ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীর গল্প শুনতে চায় না। তাই স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের চলচ্চিত্রে পরিবর্তনের সূচনা দেখতে পাচ্ছি। নতুন নতুন রুচিবান্ আদর্শবান্ প্রযোজক পরি-চালকের সন্ধান আমরা পাচ্ছি। চলচ্চিত্রের আলোকচিত্র, শব্দ গ্রহণ প্রভৃতি যান্ত্রিক দিকগুলোর উৎকর্ষ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। বিগত যুগের যে-সব মঞ্চাভিনেতা এতদিন পর্যন্ত চিত্রাভিনয়ের আসরও অধিকার করে ছিলেন, তাঁরা ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছেন: তাঁদের শূন্যস্থান দখল করেছেন এমন একদল তরুণ-তরুণী যাঁরা কোনদিন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেননি। সবাই বুঝতে শিখেছে যে মঞ্চাভিনয় এবং চিত্রাভিনয় এক জিনিস নয়। আমাদের চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দিকগুলোর এমনই উৎকর্ষ দেখা যাচ্ছে বলেই আমরা এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এতটা আশান্বিত।

কিন্তু সুদিনের লক্ষণ আমরা যখন সবে দেখতে পেয়েছি এমনই সময় এল মহাযুদ্ধ। ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের উপর এই মহাযুদ্ধের দুই প্রকারের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল: এর একটি আমাদের চিত্র-শিল্পের পক্ষে হ'ল মঙ্গলজনক এবং অপরটি হ'ল মারাত্মক। যুদ্ধজনিত অস্বাভাবিক অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে আমাদের শিক্ষিত সমাজের ব্যাপক বেকারত্বের কিছুটা সমাধান হ'ল। ভারতীয় চলচ্চিত্রের দর্শক-সংখ্যা গেল অনেক বেড়ে: চলচ্চিত্র-কর্তৃপক্ষের আয়ও তদনুরূপ বেড়ে গেল। এদিকে যুদ্ধের বাজারে ব্যবসায় করে অনেকেই প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করলেন এবং চলচ্চিত্র শিল্প লাভজনক

কানন দেবী

দর্শক এবং সাংবাদিকদের বিচারে ১৯৪৮ সনের শ্রেষ্ঠা চিত্রাভিনেত্রী

দেখে—অনেকেই এই শিল্পে অর্থনিয়োগ করাব জন্যে এগিয়ে গেলেন। দেশীয় চিত্র-নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল : অবশ্য স্টুডিওর সংখ্যা সেরূপ বাড়ল না। তার কারণ যুদ্ধের দরুণ বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানী করা একরূপ অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের চিত্রের সংখ্যাধিক্য হ'ল বটে, কিন্তু তদনুরূপ গুণের উৎকর্ষ দেখা গেল না। অযথা কাঁচা ফিল্‌ম ব্যয়িত হ'তে লাগল। কাঁচা ফিল্‌ম বিদেশ থেকেই ভারতে আমদানী করা হয়ে থাকে। যুদ্ধের সময় কাঁচা ফিল্মের জন্যে জাহাজে স্থান সংরক্ষণ করতে হলে, যুদ্ধ প্রচেষ্টা তার দ্বারা কিছুটা ক্ষতি-গ্রস্ত হয় বৈকি! তাই কাঁচা ফিল্‌মের অপব্যয় যাতে কমে সেই উদ্দেশ্যে ভারত গভর্ণমেণ্ট নিয়ম করে দিলেন যে কোন চিত্রেব দৈর্ঘই এগাবো হাজাব ফুটের বেশী হ'তে পারবে না। এই দৈর্ঘ্য-নিয়ন্ত্রণের ফল আমাদের চিত্র-শিল্পের দিক থেকে শাপে বর হ'ল বলা চলে। বিরক্তিকর দৈর্ঘ সৃষ্টি ছেড়ে আমাদের চিত্র-নির্মাতারা চিত্রের গুণগত উৎকর্ষের দিকে নজর দিতে বাধ্য হলেন। যাই হোক সরকারী নিয়ন্ত্রণ কিন্তু এখানে এসেই শেষ হ'ল না। এবারে সরকারী নিয়ন্ত্রণের পরিধি আরও বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। গভর্ণমেণ্ট সমস্ত কাঁচা ফিল্মের দখল নিয়ে নিলেন এবং ভারত রক্ষা আইনের আওতায় আদেশ জারী কর্‌লেন যে সরকারী ছাড়পত্র না পেলে কেউ ফিল্‌ম কিনতে পাবেন না। আর যাঁদের নিজস্ব স্টুডিও আছে, সেই রকম চিত্র-নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরকার সরাসরি একটা সন্ধি করলেন। এই সন্ধির সর্ত অনুসারে গভর্ণমেণ্ট নিয়মিত এই সব কোম্পানীকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফিল্‌ম সরবরাহের ভার গ্রহণ কর্‌লেন; পরিবর্তে এই সব কোম্পানীকে সরকারের হ'য়ে যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সহায়ক প্রচার-মূলক চিত্র-নির্মাণ করে দিতে হবে। বর্তমানে এই ব্যবস্থাই চালু আছে।

গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে এই সন্ধির কথা বিচার কর্‌তে গেলে মনে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ : আমরা বিদেশী গভর্ণমেণ্টের দ্বারা শাসিত হই। রাশিয়া, জার্মানী, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি যুদ্ধরত স্বাধীন দেশগুলোতে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে চলচ্চিত্র-প্রতিষ্ঠানগুলোর চুক্তির কথাই উঠ্‌তে পারে না। চিত্র-নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো আপনা থেকেই নিজেদের দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টার সহায়ক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন এবং জনগণ কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করে এই সব চিত্র দেখেও। কিন্তু আমাদের দেশের কথা স্বতন্ত্র : আমরা বর্তমান যুদ্ধের নীরব দর্শক মাত্র। বিদেশী গভর্ণমেণ্ট আমাদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় উজ্জীবিত করার জন্যে নানাপ্রকার প্রচার-কার্যের সহায়তা এ পর্যন্ত গ্রহণ করেছেন। চলচ্চিত্র-নির্মাণ তার মধ্যে অন্যতম। এ প্রসঙ্গে আমরা গভর্ণমেণ্ট-সংগঠিত এফ্, এ, বি-র (F.A.B) সাহায্যে ব্যর্থ চিত্র-নির্মাণ প্রচেষ্টার উল্লেখ করতে পারি। ভারতীয় জনগণের মনে এই সব চিত্র কোন রেখাপাতই করতে পারে নি। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে প্রচার-মূলক চিত্র-নির্মাণের জন্যে গভর্ণমেণ্ট আমাদের ব্যবসায়ী চিত্র-নির্মাণ-প্রতিষ্ঠানগুলোরই শরণাপন্ন হলেন। আমাদের চিত্র-নির্মাণ-প্রতিষ্ঠানেরা প্রথমে এ সর্ত গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু আমরা পরাধীন জাতি বলেই শেষ পর্যন্ত এ সব সর্ত গ্রহণ করতেই হ'ল। সর্ত গ্রহণের ফলে তবু যুদ্ধকালে আমাদের চিত্রশিল্পের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। সর্ত গ্রহণ না করলে আমাদের চিত্র-শিল্পের অকালমৃত্যু হ'ত। আমাদের সভ্যতা বা সংস্কৃতির জন্যে বিদেশী গভর্ণমেণ্টের এতটুকু দরদ নেই; তাঁদের এই মুহূর্তের চরম প্রয়োজন হচ্ছে যুদ্ধ জয়। এই যুদ্ধ জয়ে ভারতীয় চিত্রশিল্প যদি গভর্ণমেণ্টকে কিছুমাত্র সাহায্য না করে, তবে তাঁরা একে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে চেষ্টা কর্‌বেন কেন?

এই নতুন আইনের একটা কুফল এই যে এর ফলে ষ্টুডিও-হীন অনেক স্বাধীন প্রযোজককেই চিত্র-নির্মাণ বন্ধ করে দিতে হবে। একটা ক্রমবর্ধিষ্ণু শিল্পের পক্ষে এই বাধা ক্ষতিকর বই কি? তবে মনে হয় যে জগতে সম্পূর্ণ ক্ষতিকর বোধ হয় কোন কিছুই নেই। সর্বাপেক্ষা বেশী খারাপ জিনিষেরও একটা ভাল দিক থাকে। সরকারী নতুন ব্যবস্থার ফলে যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রচার-চিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে আমাদের চিত্র-নির্মাতারা উদ্দেশ্যমূলক চিত্র নির্মাণ শিখ্‌বেন। তাঁরা বুঝ্‌তে পারবেন যে নিছক ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর গল্পের চিত্ররূপ দিয়ে দর্শক ভোলানোর দিন অনেক দিন গত হয়েছে। বলিষ্ঠ আদর্শবাদ ও সূক্ষ্ম প্রচার-কার্যের ভিত্তিতে গঠিত না হ'লে আজকের দিনের চিত্র নেহাৎ অর্থহীন। আমরা প্রেক্ষাগৃহে মুখ্যত হয়ত আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যেই যাই; তবে সেই সঙ্গে কিছুটা শিক্ষাও আমরা পেতে চাই। কিন্তু আমাদের দেশ এবং জাতির প্রতি যে তাঁদের কিছুটা দায়িত্ব এবং কর্তব্য-বোধ আছে, এ কথাটা যেন আমাদের চিত্র নির্মাতারা ভাব্‌তেই পারেন না। কি করে This Above All, Mrs. Miniver কিংবা In Which We Serve-এর মত সূক্ষ্ম রস-সংবেদনশীল চিত্তাকর্ষক প্রচার-চিত্র নির্মাণ করতে হয়, এই সুযোগে চেষ্টা করলে আমাদের চিত্র-নির্মাতারা সে কলাকৌশলটা কিঞ্চিৎ আয়ত্বের মধ্যে আনতে পারবেন বলেই মনে হয়। ভবিষ্যতে তাঁদের এ কষ্ট-লব্ধ অভিজ্ঞতা আমাদের জাতীয় চিত্রশিল্পের উন্নতিরই সহায়ক হবে।

এই গেল আমাদের চিত্রশিল্পের বর্তমান আনুপূর্বিক ইতিহাস। এখন প্রশ্ন এই যে এর সমরোত্তর ভবিষ্যৎ কি? বর্তমানে যে পৃথিবীব্যাপী মহাসমর চলছে, তার অস্তিত্ব চিরকাল থাক্‌বে না! আজ হোক্‌, কাল হোক্‌, এ মহাযুদ্ধ একদিন শেষ হবে এবং দেশের স্বাভাবিক অবস্থাও আবার ফিরে আসবে। বর্তমানের বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করে আমাদের চিত্র-নির্মাতাদের দৃষ্টি সেই সূর্যকরোজ্বল অদূর ভবিষ্যতের দিকে ফিরেছে কি? সেই ভবিষ্যতে তাঁদের অবলম্বিতব্য কর্মপদ্ধতির জন্যে তাঁরা কি তৈরী হচ্ছেন—না তাঁরা কি শুধু বর্তমানের চিত্র-শিল্পের বিপদেই অভিভূত হয়ে আছেন? তাঁদের মনে রাখ্‌তে হবে যে যুদ্ধোত্তর জগতে এই মৃতপ্রায় চিত্র শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করে তাকে সার্থকতার পথে টেনে নিয়ে যাবার ভার তাঁদের উপরেই। এই গুরু কর্তব্য সম্পাদন করতে হলে চিত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি নিয়ে তাঁদের এখন থেকেই ভাবতে সুরু করতে হবে। এ যুদ্ধ শেষ হ'তে এখনও হয়ত দেরী আছে, তবু ইতিমধ্যেই যুদ্ধোত্তর জগৎ পুনর্গঠনের সমস্যা এসে দেখা দিয়েছে। হিটলার ইউরোপে নববিধান গঠনের পরিকল্পনা করেছেন; চার্চিল দেখছেন অতলান্তিক সনন্দের স্বপ্ন, রুজভেল্ট দেখছেন তাঁর চতুর্বিধ স্বাধীনতার স্বপ্ন—আর এদিকে জেনারেল তোজো দেখছেন, তার পূর্ব-এশিয়া সহ-সমৃদ্ধি অঞ্চলের স্বপ্ন। অর্থনীতিবিদরা পরিকল্পনা করছেন কি করে যুদ্ধ-দীর্ণ জগতের অর্থনৈতিক কাঠামোটাকে পুনর্গঠিত করা যায়? আমাদের ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের কর্মসচিবরা কি সমরোত্তর যুগে এই শিল্পটির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন পরিকল্পনা করেছেন? যদি না-ও করে থাকেন তবে এখনই তাঁদের এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা করা উচিত।

এই পরিকল্পনা করতে গেলে এবারকার যুদ্ধজনিত নতুন অভিজ্ঞতাগুলো তাঁরা যেন কাজে লাগান। যেমন ধরুন কাঁচা ফিল্মের কথা। কোন আন্তর্জাতিক যুদ্ধ লাগলেই ভারতীয় চিত্র-শিল্পের পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন—কেননা চলচ্চিত্রের প্রাণবস্তু কাঁচা ফিল্মের জন্যে ভারতীয় চিত্রশিল্প বিদেশের উপর নির্ভরশীল। ভবিষ্যতে যাতে এই পরমুখাপেক্ষিতার দরুণ ভারতীয় চিত্রশিল্পকে তাঁর স্বাভাবিক স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে না হয়, তার উপায়

উদ্ভাবন করতে হবে। তার পরে এই মহাযুদ্ধের ভাঙ্গনের দরুণ সারা পৃথিবীতে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা করা যাচ্ছে, সেই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সঙ্গে সমরোত্তর ভারতীয় চিত্রশিল্প কি করে লড়াই করবে, সেকথাও আমাদের চলচ্চিত্র-কর্তৃপক্ষের ভাববার বিষয়বস্তু হওয়া হওয়া উচিত। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দিনেও আমাদের চিত্রশিল্প যাতে তার অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর মনে রাখতে হবে আমাদের পরাধীনতার কথা। যুদ্ধোত্তর জগতে ভারতের ভাগ্যে যদি পূর্ণ স্বাধীনতা না জোটেও, তবু কিছুটা পরিমাণ স্বাধীনতা যে জুটবেই সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বর্তমানে আমাদের চিত্রশিল্পকে যতটা অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে, ভবিষ্যতে ততটা অসুবিধার মধ্যে তাকে কাজ করতে হবে না। দেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি আশা করা যায়, দেশব্যাপী অশিক্ষা এবং কুশিক্ষার প্রাবল্য এতটা থাকবে বলে মনে হয় না। সেদিন আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতি বিধানে দেশীয় চিত্রশিল্পকে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করতে হবে। আমাদের চিত্রনির্মাতারা তাঁদের সেদিনের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ আছেন ত? আজকের দিনের নিছক ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি নিয়ে সেই আগামী দিনে তাঁরা যদি চিত্রের মারফৎ ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প শোনাতে চান, তবে আসর জমাতে তাঁরা পারবেন না এবং আমাদের চিত্র-শিল্পের অগ্রগতির পথেও অহেতুক বাধা সৃষ্টি হবে। যুগধর্মকে অস্বীকার করে চলার বিপদ আছে অনেক। বর্তমানে আমাদের সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে যে পরিবর্তনের আভাস দেখা যাচ্ছে, তার সম্বন্ধে আমাদের অধিকাংশ চিত্র-নির্মাতাই সজাগ নন। তবু এরি মধ্যে দু'একজন তরুণ প্রযোজক এবং পরিচালকের প্রগতিশীল সচেতন মনোবৃত্তির পরিচয় পেয়ে আমরা খুশী হয়ে উঠি। তাঁদের চিত্রের পিছনে যেমন সুস্পষ্ট শিল্প-প্রেরণা থাকে, তেমনি থাকে একটা বৃহত্তর সামাজিক কর্তব্যবোধ। আমাদের সমরোত্তর চলচ্চিত্র-শিল্পে এই দুটি জিনিষেরই প্রয়োজন হবে সব চেয়ে বেশী।

এক কথায় আমাদের অগ্রগামী যুগের চলচ্চিত্রকে অধিকতর সমাজবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে হবে। যে সমাজ-চেতনার অভাবে আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্য অনেকাংশে পঙ্গু, আমাদের চলচ্চিত্রেও সেই সমস্যা দেখা দিয়েছে। মনে রাখতে হবে চলচ্চিত্র নিছক ধান-চালের ব্যবসায় নয়; এর একটা সুনির্দিষ্ট শিল্পরূপ আছে এবং জাতির সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে এর প্রভাব অপরিসীম। প্রবন্ধ দীর্ঘ হ'য়ে গেল; জানিনা আমার বক্তব্যকে আমি সুস্পষ্ট করে বলতে পেরেছি কিনা। এই প্রবন্ধে আমি শুধু একটা কথা বলতে চেয়েছি; আমাদের চিত্র-শিল্পের উন্নতির জন্যে একটা সমরোত্তর ব্যাপক পরিকল্পনার প্রয়োজন। আমি এই পরিকল্পনার আভাসমাত্র দিয়েছি, বিস্তৃতভাবে এই পরিকল্পনা তৈরীর ভার আমাদের চিত্রনির্মাতাদের হাতে। যুদ্ধোত্তর জগতে তাঁরা যদি এই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে ভারতীয় চিত্রশিল্পের উন্নতি বিধানে মনোনিবেশ করেন, তবে আমরা ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের দিকে নিখুঁৎ ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের অভ্যুদয় প্রত্যাশা করতে পারি। সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায়ই আমরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করব।

শ্যামাকান্তর ভূমিকায়
নটগুরু শিশির কুমার.

সন্ধ্যারাণী

শারদীয়া রূপ-মঞ্চ
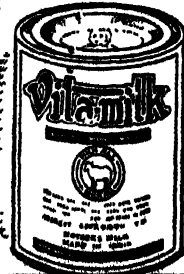
চলচ্চিত্রে প্রেম

শ্রীনরেন্দ্র দেব

আমরা অনেকেই নিয়মিত সিনেমায় যাই। ছবি দেখে এসে সমালোচনা করি। কিন্তু আমাদের মোদ্দা কথা ৩টি। ছবিটি চমৎকার, ছবিখানা যাচ্ছেতাই, ছবিখানি মন্দ নয়। অর্থাৎ Good-Bad-Tolerable এই তিনটি শব্দের মধ্যে আমাদের মতামত সীমাবদ্ধ। কিন্তু যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে—ছবিটি চমৎকার বলছেন কেন? বা, ছবিখানা ভাল নয় বলছেন কেন? এ কেন'র সদুত্তর আমরা দিতে পারিনি। কেননা, আমরা জানি না ছবিটি কেন আমাদের ভাল লেগেছে—বা কেন ভাল লাগেনি! জেরা করলে বড় জোর বলি—ভারি সুন্দর গল্পটি, তেমনিই অপূর্ব্ব অভিনয় আর ফটোগ্রাফী! একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ হয়েছে। অথবা বলি—গল্পের মাথা নেই মুণ্ড নেই—ওকি আবার ছবি? তার উপর অভিনয় আর ফটোগ্রাফী দুইই wretched! আসলে, ছবি যে কেন ভাল লেগেছে সে খবর আমাদের অজ্ঞাত!

কী ছবি দেখে এলে? ছবিখানি কোন্ শ্রেণীর ছবি? এর উত্তরে আমরা প্রায়ই ভুল জবাব দিই। হয় বলি—যে ছবিখানি 'গ্রীম্-ট্র্যাজেডি' নয়ত বলি—'প্লেজাণ্ট কমেডি'। কারণ, আমরা অনেকেই সম্ভবতঃ জানিনি যে, এ পর্যন্ত যতরকম চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে বিশেষজ্ঞেরা সেগুলিকে নিম্নলিখিত ১২টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন :—

১ম। Absolute Film, অর্থাৎ অবিমিশ্র চিত্র। এ চিত্রে কোনও গল্প বা ঘটনার সাহায্য না নিয়ে কেবলমাত্র গতিছন্দ, বর্ণ বৈচিত্র, রূপরাগ, নিসর্গ সৌন্দর্য্য প্রভৃতির সাহায্যে দর্শকের চিত্ত-বিনোদন করা হয়।

২। কাব্যচিত্র (Cine-pem Ballad Film) অর্থাৎ কোনও প্রসিদ্ধ গান, কবিতা বা গাথায় চলচ্চিত্র।

শারদীয়া রূপ-মঞ্চ

৩য়। নাট্যচিত্র (Cine-Drama or Play Film)

৪র্থ। কথাচিত্র (Cine-Fiction or Story Film)

৫ম। রসচিত্র (Cine-Farce or Comic Film)

৬ষ্ঠ। উপচিত্র (Fantasy Film) অর্থাৎ, আজগুবি আচারে কাহিনীর ছবি।

৭ম। কৌতুকচিত্র (Cartoon Film) 'মিকিমাউস্' প্রভৃতি।

৮ম। ঐতিহাসিক চিত্র (Cine Classic or Epic Film) বড় বড় পৌরাণিক ছবিগুলিও এই বিভাগের অন্তর্গত।

৯ম। শিক্ষা-চিত্র (Educational Film) Art, Industry, Science, Culture প্রভৃতি এর অন্তর্গত।

১০ম। কারুচিত্র (Decorative Film) অর্থাৎ ছবিখানি আদ্যোপান্ত উচ্চাঙ্গের কারুকলার আবেষ্টনের মধ্যে তোলা।

১১শ। ধর্মমূলক চিত্র (Church Film)

১২শ। প্রদর্শনী চিত্র (Spectacular Super-Film) অর্থাৎ, জমকাল, ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত, বিরাট দৃশ্য সম্বলিত দীর্ঘচিত্র।

'ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ' এই প্রবাদবাক্য স্বীকার করলেও দেখা গেছে যে এই দ্বাদশ প্রকার ছবির মধ্যে দর্শক আকর্ষণ করে সবচেয়ে বেশী 'নাট্যচিত্র' ও 'কথাচিত্র'! সুদূর আমেরিকার সেই নব নব রহস্য-লোক 'হলিউডে' গড়ে তোলা অসংখ্য ছবি আজ পৃথিবীর সকল দেশেই যে এতটা সমাদর পাচ্ছে এর কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয় প্রত্যেক ছবিখানিতেই ওরা এমন একটি বিশ্ব-মানবের চিত্তাকর্ষক সার্ব্বজনীন গল্প বেছে নিয়ে রূপায়িত করছে যা সহজেই নিখিল নরনারীর অন্তর স্পর্শ করে। অর্থাৎ, ওদেশের তোলা ছবির মধ্যে একটা Universal Appeal বা বিশ্বজনীন আবেদন থাকে।

রূপ-সজ্জার বাইরে চন্দ্রাবতী: ফটো ১৯৩৯

ছবিতে এই Universal Appeal সম্ভব হয় কি করে? একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে এমন কতকগুলি

চিত্তবৃত্তি আছে যা সকল দেশের সকল জাতির মানব প্রকৃতির মধ্যে স্বভাবতঃই স্ফূর্তি লাভ করে। ধনী-নির্ধন সভ্য-অসভ্য ও জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে জগতের সকল মানুষের উপর সমান প্রভাব বিস্তার করতে পারে প্রথমতঃ—যৌন আকর্ষণ বা sex appeal, দ্বিতীয়—বাৎসল্য রস, তৃতীয়—মহত্ব বা আদর্শ ত্যাগ, তা' যে ধর্ম্মের জন্যই হোক্, দেশের জন্যই হোক, ভাইয়ের জন্যই হোক, আর প্রণয়িণীর জন্যই হোক। এ ছাড়া কতকগুলো নিকৃষ্ট বৃত্তিও আছে যেমন হিংসা, দ্বেষ, লুব্ধতা, অহঙ্কার, বিশ্বাসঘাতকতা, ব্যাভিচার প্রভৃতি মানব চরিত্রের সনাতন পাপ ও দৌর্বল্য।

এর মধ্যে কিশোর থেকে পরিণত বয়স্ক পর্য্যন্ত সিনেমা দর্শকদের মনের উপর প্রেমের প্রভাবই সবচেয়ে বেশী প্রতিফলিত হ'তে দেখা যায়, অর্থাৎ যৌন আকর্ষণেরই জয় জয়কার। এই যৌন ধর্ম্মের প্রভাবে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে একটা সহজাত আকর্ষণ অনুভূত হয়, তাই থেকেই তাদের মধ্যে জাগে—হয় দৈহিক জঘন্য লালসা, অথবা অন্তরের প্রগাঢ় প্রেম। এই প্রেমের প্রবল তাড়নে তাদের মধ্যে যে মিলনাকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে ওঠে তারই ফলে ঘটে ইলোপমেণ্ট্, সমাজ-দ্রোহ বা সামাজিকে বিবাহ বন্ধন। তারা সংসার পাতে, সন্তান সন্ততি লাভ করে, জীবনে সুখী হয়; সেই খানেই কিন্তু গল্প শেষ হয় না। তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে, প্রেমের নিষ্ঠা নষ্ট হয়। পূর্ব জীবনের বন্ধনকে বাধা বলে মনে হয়। এইখানে দেখি বেদনার সৃষ্টি হতে। জীবন হয়ে ওঠে দুর্বহ ও দুঃখময়। বাধা দূর করবার জন্য মানুষ অসাধ্য সাধনে অগ্রসর হয়। জীবন তুচ্ছ করে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রেমের জন্য করতে পারে না মানুষ জগতে এমন কাজ নেই। আবার এই প্রেম যখন অন্তর্হিত হয় বা পূর্ব পাত্র শূন্য করে নিঃশেষে অন্য পাত্রে গিয়ে সঞ্চারিত হয়ে পড়ে, তখন সুখের সংসারে আগুণ ধরে, সাজানো ঘর শ্মশান হয়ে যায়। জীবনে ব্যাভিচার দেখা দেয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মানুষের জীবনকে তোলপাড়ও ওলট পালট করে দিতে পারে এই প্রেম। দস্যুকে করে দেবতা, কাপুরুষ ভীরুকে ক'রে দুঃসাহসী বীর অলসকে করে উদ্যমশীল, মূককে করে বাচাল, নিষ্ঠুরকে করে তোলে দয়ালু আবার শান্তকে করে অশান্ত—সংযত চরিত্রকে করে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল, সাধুকে করে শয়তান। অতএব মানব জীবনে প্রেমের প্রবল প্রাধান্যকে অমান্য করা যায় না। সুতরাং, যে চলচ্চিত্রের গল্পের বা নাট্যের ভিত্তি মানবের এই চিরন্তন যৌন আকর্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারই ছন্দানুসরণে পুষ্ট ও পরিণত হয়ে ওঠে তার মধ্যে একটা বিশ্বজনীন আবেদন নিহিত থাকেই। চতুর চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা মানব চিত্তের এই চিরন্তন প্রকৃতিকে exploit করেই সবচেয়ে বেশী লাভবান হন; তাই আমরা দেখি প্রায় সমস্ত চলচ্চিত্রের গল্পকেই তাঁরা প্রেমরসে সঞ্জিবীত করে তুলছেন।

সঙ্গীত-সাধক রবীন্দ্রনাথ

শান্তিদেব ঘোষ

সঙ্গীতকে আমাদের দেশের একদল সাধক ভগবৎ সাধনার একটি পথ হিসেবে অতি প্রাচীনকাল থেকেই দেখে এসেছিলেন। প্রাচীন সাহিত্যে এবিষয়ে অনেক খবর পাই। মধ্যযুগের ইতিহাসে এই পথের একদল সাধকের সন্ধান মেলে যাদের ভিতর তানসেনের গুরু হরিদাসস্বামীর কথা গায়কমহলে অনেকেই জানেন। তাছাড়া কবির, নানক, দাদু, মীরাবাই, সুরদাস ইত্যাদি বাংলার বৈষ্ণব পদাবলীকার ও বাউলের মত ঈশ্বর প্রেমিকদের কথা সকলেই শুনেছেন। এরা সব যেমন উত্তর ভারতের সঙ্গীতসাধক, তেমনই দক্ষিণ ভারতেও একদল ছিলেন তার শেষ পরিচয় হোলো রামভক্ত গায়ক "ত্যাগরাজ"। তিনি গত শতাব্দির প্রথম ভাগে দক্ষিণ ভারতে এই সাধনায় জীবন কাটিয়ে গেছেন। তাঁর গান আজ সে দেশের সব চেয়ে প্রিয় গান। এ যুগের ভারতে এর পরেই এই পথের একমাত্র সঙ্গীতসাধক ছিলেন ভারতের মধ্যে আমাদের গুরুদেব। একটু তলিয়ে খোঁজ করলে দেখা যায় যে, সাধকদের সাধনার এই পথ অবিচ্ছিন্ন ধারায় কালে কালে প্রবাহিত হয়ে এসেছে সেই অতি প্রাচীনকাল থেকে। শোনা যায়, এই সব সাধকদের স্বত উৎসারিত গানের নানা সুর আহরণ করেই কালে কালে সঙ্গীতজ্ঞ গায়করা তাদের রাগরাগিণীর সম্পদ বাড়িয়েছেন। গুরুদেবের অন্তরের সুরের প্রেরণায় যা সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে কি বাংলাদেশ সেই সাহায্য পায়নি? নতুন রকম গানের ঢং পেয়েছে, সুরের নতুনত্ব পেয়েছে, আর পেয়েছে রাগিনী ও কথা কি ভাবে সহজে মিশে মানুষের কাছে সহজে ধরা দেয় তার পরিচয়।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী

গুরুদেবকে সঙ্গীতে বিচার করতে হলে সঙ্গীতে তাঁর সাধনার পরিচয়টিকে আগে মনে রেখে তার পরে তাকে যে ভাবে খুশী দেখবেন বা বিচার করবেন তাতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু তা না করতে গেলেই সব মাটি হয়ে যাবে। কালোয়াতের পর্য্যায়ে তাঁকে কোন মতেই ফেলা যায় না।
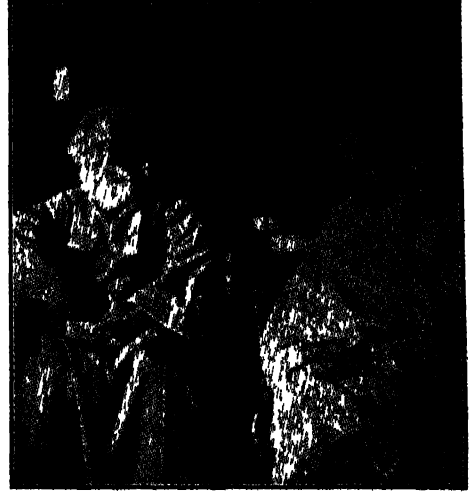
সাধকরা সঙ্গীতের সাহায্যে খুঁজেছিলেন মুক্তির আনন্দ। তাঁরা বলে গেছেন যে, আমাদের সামনে বা চারিদিকে যে বিশাল বিশ্বপ্রকৃতি বর্ত্তমান তার প্রত্যেকটি অণু পরমাণু থেকে সুরু করে সকলেই এক এক বিরাট অব্যক্ত বিশ্বসঙ্গীতের অংশ মাত্র। বিশ্বসঙ্গীতের এই রহস্যটি বুঝতে পেরে সে এক বিপুল আনন্দের পরিচয় পায় এবং সেই পাওয়াই মুক্তি। গুরুদেবের সঙ্গীতসাধনা সেই

সঙ্গীত-সাধক রবীন্দ্রনাথ

শান্তা আপ্তে

অশোক কুমার
শারদীয়া রূপমঞ্চ

আনন্দের সাধনা। তিনি সুরের ভিতর দিয়ে মুক্তির আনন্দ যে খুঁজেছিলেন তাঁর বহু লেখায় সেই কথা প্রমাণ করছে। এবং সে আনন্দ যে তাঁর অন্তরে কতবার স্থান গ্রহণ করেছিল সেকথাও বহু গানে তিনি স্বীকার করে গেছেন। এ যুগের বস্তুতান্ত্রিক মন এ বিষয় নিয়ে হয়তো ঠাট্টা করবে—বলবে এ মধ্যযুগীয় ভাবধারা এ যুগে সম্ভব নয় কিন্তু গুরুদেবের জীবনের সঙ্গে যারা পরিচিত তাঁরা জানেন একথা কতখানি সত্য তাঁর পক্ষে। কারণ তাঁরা দেখেছেন গুরুদেবকে সুরের নেশায় মাতাল হতে, সুরের মায়ায় রাতের পর রাত জেগে কাটাতে। গানের পর গান কে যেন একটানা রচনা করেছে তাঁকে উপলক্ষ করে। যতক্ষণ না তা শেষ হয়েছে, সে খবরও তিনি নিজেও পাননি, প্রবাহ থেমেছে তখন অবাক হয়েছেন তাই দেখে। কে যে তাকে বাজায় এবং কেন বাজায় কিছুই তিনি জানতেন না কেবল এটুকু বুঝতেন তাঁকে বাজতে হবে যে অদৃশ্য বানকার তাঁকে সুরে বেঁধে রেখেছেন তাঁরই ইচ্ছামত। সব সাধকেরা এই পথের পথিক হলেও প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের প্রভেদ ছিল অনুভূতির ক্ষেত্রে। গুরুদেবের মধ্যেও যে তা না হয়েছিল তা নয়। পূর্ব্ববর্ত্তী সাধকদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্যের একটি মূল কারণ হোলো গুরুদেব যত বড় কবিচিত্ত নিয়ে জন্মেছিলেন পূর্ব্ববর্ত্তীরা ততবড় কবি ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন কেবলমাত্র ভক্ত। ভক্তির আবেগে মন তাঁদের যা বলতে চেয়েছে কেবল সেই টুকুই গান হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু গুরুদেবের কবি মন

জহর লালজীর ভংগিমায় দম্পতিতে ছবি বিশ্বাস

তাতে আরো কতখানি মাধুর্য্য ও বৈচিত্র বিস্তার করতে পেরেছিল তা তার গানগুলিতেই প্রমান। এবিষয়ে নতুন করে বলার দরকার করে না। ২টি গান দিয়ে আমার উপরের কথাকে আর একটু পরিষ্কার করতে চেষ্টা করবো।

ভারতবর্ষে ছয়টি ঋতু যত সুন্দর করে নিজেদের ফুটিয়ে

তোলে বৎসরে বৎসরে, ঠিক এমনটি আর কোথাও হয় বলে জানি না। কিন্তু এই ঋতু কটির মধ্যে বর্ষা ও বসন্তই ভারতীয় সাধক ও কবিদের চিত্ত চিরকালই বিশেষ করে আকর্ষণ করেছে। তাই এ দুটিকে নিয়ে কত গান, কত বর্ণনা আমরা দেখেছি। সবচেয়ে অবহেলা পেয়ে এসেছে, বিশেষ করে গানের ক্ষেত্রে, গ্রীষ্ম ও শীত। এই দুই ঋতুতে আমাদের মন কি কোনরকম রসের সন্ধান পায় না? বা এমন কিছুই এর ভিতরে নেই যার দ্বারা আমাদের মন আকৃষ্ট হতে পারে? এই প্রশ্নেরই উত্তর গুরুদেব দিয়েছেন তাঁর গ্রীষ্মের ও শীতের গানে। বর্ষা ও বসন্ত কালে মনে যে রসের উদয় হয় ঠিক সেই রসের সন্ধান হয়তো গ্রীষ্ম ও শীত দেবেনা কিন্তু তারা নিজেরা যে রস আমাদের মনে বিতরণ করে গুরুদেব তাকে অবহেলার বস্তু বলে মনে করেন নি—তাই গ্রীষ্মের দারুণ দাহন জ্বালায় যখন সকলে অস্থির তখন তিনি অম্লানবদনে গেয়ে গেলেন "নাই রস নাই দারুণ দাহন বেলা"। শীতের তীব্রতার ভিতরে আমাদের যে প্রকাশ আজ আমরা অনুভব করি তার জন্যও কি গুরুদেব দায়ী নন? এই শীত ও যে সংবেদনশীল মনে বিশেষ রসের আমেজ জাগিয়ে দেয় সেকথা কি তাঁর কাছ থেকেই আমরা বিশেষ করে গানে জানতে পারিনি? "শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন আমলকীর ঐ ডালে ডালে" গানটা গাইলেই মনে সমস্ত শীতঋতুর একটা অনুভূতি জেগে ওঠে। তার তীব্রতার ভিতরে উন্মাদনা আছে তাও যেমন অনুভব করি আবার তেমনি সেখানে যে বেদনা লুকিয়ে আছে তাতেও মনটা অকারণ ব্যথায় একটু ভারাক্রান্ত হয়। এবং দুটি সুরেরই গঠন প্রণালী লক্ষ্য করার পরে কি কারও একথা মনে হয়েছে যে ঐ রাগিনী দুটি ভাবকে প্রকাশ করতে পারেনি? গ্রীষ্মের তাপে মানুষের চিত্তে ও দেহে অবসাদ জাগে। সেই আলস্যের আভাষ কি রাগিনীটি গানেতে দেখায়নি?

গীতের মধ্যে তীব্রতা যে আছে এ কথা বলেছি—সে তীব্রতা কিভাবে মানুষের মনকে নাড়া দিয়ে যায় সে গানটিতে কি তা ফোটেনি ?

এই খানেই গুরুদেবের সঙ্গে অন্য সাধকদের বিশেষ প্রভেদ—তাঁর মন এত সতর্ক যে যা কখনো কারুর কাছেই কোন ভাবেই গানে বেঁধে রাখার যোগ্য বলে গণ্য হয়নি তাঁর দৃষ্টি, তাঁর মন সেখানেও এমন কিছু খুঁজে পেয়েছে যাকে গানে না বেঁধে তিনি স্বোয়াস্তি পাননি। তখন আমাদের মনে হয়েছে যে তিনি যা বলছেন তা ঠিক্। এই কবি বা শিল্পী মনের সাহায্যেই গুরুদেব আর সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন। এখন কথা উঠবে যে গানের সাধনার পথটি তিনি পেলেন কি করে ? যাঁরা তাঁর পিতার জীবনীর সঙ্গে পরিচিত এবং তাঁর বাল্যজীবনের পরিবেষ্টনটিকে ভাল করে পর্য্যবেক্ষণ করেছেন তাঁরা দেখ্‌বেন তাঁকে স্বষ্টিকর্ত্তা ঐ পথে চালনা করবার ইচ্ছায় আগে থেকেই তাঁর চারিদিকে কেমন একটি অনুকূল আবহাওয়ার স্বষ্টি করে রেখেছিলেন। পিতা উচ্চ শ্রেণীর অর্থাৎ মার্গ সঙ্গীতের সাহায্যে ধর্ম্মের ক্ষুধা মেটাবার চেষ্টা করছেন, নিজে গান বাঁধছেন, তাঁর সুযোগ্য পুত্ররা নানা উৎসবের উপাসনার প্রয়োজন মেটাচ্ছেন গান বেঁধে, বড় বড় ধ্রুপদ খেয়াল গাইয়েদের সাহায্যে।

অজয় ভট্টাচার্য পরিচালিত "ছদ্মবেশী'তে মীরা, পদ্মা ও শান্তি গুপ্তা

তাই দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পরিবারে যে গানের আবহাওয়া তৈরী করেছিলেন তাতে মার্গ সঙ্গীতের মধ্যে যে ধ্যানের রূপটি ছিল সেইটিই প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতীয় সঙ্গীতের ভিতরে ধ্যানের গভীরতা ধ্রুপদ সঙ্গীতে ও বড় তালের খেয়ালে যে রকম ফুটে উঠতো এমন আর কোন সঙ্গীতে পাওয়া যায় না। সেইটিই দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে ছিল বিশেষ প্রয়োজনীয়। গুরুদেব এই আবহাওয়ায় ও এই রকম সঙ্গীতের আদর্শের মধ্যে ছোট থেকে সুরু করে প্রায় জীবনের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত সময় অতিবাহিত করেন বলেই বৃদ্ধ বয়সে বলে গিয়েছিলেন "আমার মুক্তি আলোয়

আলোর এই আকাশে।"

আমি পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম যে সাধকদের কাছ থেকেই আহরণ করে সমসাময়িক সঙ্গীতজ্ঞরা নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করেন। গুরুদেবের কাছ থেকে সেই ভাবে আমরা কি পেলাম এই বারে তারই আলোচনায় আসা যাক। পেয়েছি অনেক কিছু কিন্তু সব দিক থেকে আলোচনা না করে আমি কেবল তার বীর্য্য সূচক গানগুলি নিয়েই আজ আলোচনা করবো। এ বিষয়টির উপর কেন জোর দিচ্ছি আগে তা বলেনি। ভারতীয় সঙ্গীতের কতগুলি বিষয়ে আমাদের দেশে কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকলের মধ্যেই অজ্ঞতা অতি প্রবল। যে কারণেই হোক দিনে দিনেই সে অজ্ঞতা বাড়ছে বলে আমার বিশ্বাস। এ অজ্ঞতাটা কি? সেটি হোলো ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসের সাধারণ জ্ঞান ও তার বিভিন্ন ঢং এর সাধারণ পরিচয়ের অভাব। এই ইতিহাস ও ঢংএর জ্ঞান যদি আমাদের থাকতো তাহলে আমরা দেখ্‌তে পেতাম যে, শারীরিক শক্তিতে জ্ঞানে, চিন্তার ক্ষেত্রে আমরা যেমন দুর্বল হয়ে পড়ছি গানের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সেই কারণেই কি আজ দেশ জুড়ে এত কান্না ও ব্যাথাভরা দুর্বল ভাবাবেগের গানের ছড়াছড়ি। কেবল ঠুংরী জাতীয় মিষ্টি গান ও ভাটিয়াল ইত্যাদি পল্লীগানের আজ এত নকল হচ্ছে কেন? ধ্রুপদ বা বড় তালের খেয়ালের আদর্শ আজকাল কাউকে অনুপ্রাণিত করে না কেন?

শকুন্তলায় দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলারূপে চন্দ্রমোহন ও জয়শ্রী।

যদি বা একটু চঞ্চলতা কোথাও আমরা দেখি তাতেও দেখি ঝুমুর জাতীয় গানের আদর্শে অনুপ্রাণিত চপল চঞ্চলতা। এই সব কারণেই আজকাল সকলের মধ্যেই ধারণা বদ্ধমূল যে করুণ গানের জন্য ভারতীয় রাগরাগিনী উপযুক্ত। তাই বিদেশী জোরালো গান শুনে মন যখন উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তখন মনে মনে আমরা অনেকে লজ্জিত হই, মনে করি ভারতীয় সঙ্গীতের পরিধি কত ছোট, তাতে জোরালো গান রচনার সুযোগ নেই। তাই দেশী ভাষায় জোরালো গান শুনেই অতি সহজে সকলে ধরে নেন এতে বিদেশী প্রভাব নিশ্চয়ই আছে। রচয়িতারাও অনেকেই বিদেশী অনুকরণে জোরালো জাতীয় সঙ্গীত রচনা করে সে ধারণাকে আরো পাকা করে দিয়েছেন—তা না হলে এখনো পর্যন্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানের যখন আলোচনা হয় তখন অনেকেই বলেন ভারতীয় সঙ্গীতে বীর্য্যের যে ভাব আছে দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতী গানের সাহায্যে বাংলা গানে তা পুরণ করেছেন। নিজের দেশের একটা শিল্পকে ভাল করে না জানা থাকলে তার যে কি দশা হয় এগুলি হোলো তার সুন্দর পরিচয়। অন্ধকারে ডুবে একদিন ভারতবাসী তার চিত্রকলাও মূর্ত্তি-শিল্পকে নিয়ে অহংকার করবার সাহস দেখায়নি; মনে করেছিল বিদেশীরাই যা করেছে তাই শ্রেষ্ঠ, তাই আদর্শ, কিন্তু আজ সে ভুল অনেক পরিমানে ভেঙ্গেছে।

ধ্রুপদে আমরা অনেকেই চারিটি গায়কী ঢংএর কথা শুনেছি, যদিও তার পরিচয় অজানা আছে অনেকেরই কাছে। এই চারিটি ঢংএর নাম হোলো গওহরবাণী, খাণ্ডারবাণী, ডগরবাণী ও নওহরবাণী। এর মধ্যে গওহর-বাণী ঢং এখনো শুনতে পাওয়া যায়, খাণ্ডারবাণী মৃতপ্রায়; অন্য দুটি নেই বল্লেই হয়। এই খাণ্ডারবাণীর ধ্রুপদে গানের কথাই হোলো আমার আলোচ্য বিষয়—এ চালের গানে মুসলমান যুগের গায়করা বুঝিয়ে দিতেন যে তাঁরা মৃত বা অর্দ্ধমৃত জাত নন। এই গানের ঢং ছিল দ্রুত। সুরের গতি ছিল লাফিয়ে লাফিয়ে চলা যে কোন রাগিণী যখন এই চালে পড়তো তখন সে অন্য রকমের একটা নতুন আকার নিয়ে প্রকাশ পেত। তখন সে রাগিণী পৌরুষের পূর্ণ তেজে দীপ্যমান হয়ে উঠতো, গুরুদেবের হিন্দি ভাঙ্গা খাণ্ডারবাণী চালের বাংলা ধ্রুপদ গান

"আনন্দ তুমি স্বামী" ও "জয় তব বিচিত্র আনন্দ হে কবি" গান দুটি তার নমুনা। এ দুটি গানের ভিতরে একটুও বিলেতি প্রভাব নেই একথা আমি নিঃসংকোচে বলতে পারি এবং রাগিণী গুলি দেশী সঙ্গীত শাস্ত্র সম্মত। এবং তালেও তাই। এই গান দুটি যে তালে রচিত বিদেশী গানে সে তালও দুর্লভ। এ গান শোনার পর কেউ যদি বলেন যে,—ভারতীয় রাগরাগিণীর সাহায্যে জোরালো গান রচনা হতে পারে না, বা কোন দিন তা হয়নি, তবেই সে কথা মেনে নিতে পারি। গুরুদেবের সৌভাগ্য যে তিনি প্রথম থেকে বড় বড় ধ্রুপদীদের সাহায্যে ভারতীয় সঙ্গীতকে সর্বদিক দিয়েই পরিষ্কার ভাবে জেনে নিয়েছিলেন। তাই তাঁর

মনে কিন্তু এ রকমের ভুল ধারণা কোন দিনই ছিল না। তিনি জানতেন যে বিদেশী সঙ্গীতের মধ্যে জোরালো গান যেমন আছে ভারতীয় সঙ্গীতেও তার অভাব ঘটেনি। সেখানেও যথেষ্ট মূল্যবান রত্ন সঞ্চিত আছে। তাকে ঠিক ভাবে ব্যবহার করতে জেনে ও সমাদর করতে পারলেই তার প্রকাশের বিঘ্ন ঘটে না। বিদেশী সঙ্গীতের জোরকে গুরুদেব কখনো অবজ্ঞা করেন নি। তাকেও অনেক গানেই ব্যবহার করেছেন।

ডি, লিউক্স ফিল্মের ছদ্মবেশীতে পূর্ণিমা ও ছবি।

খাণ্ডারবাণী সঙ্গীতের আদর্শ সামনে রেখে তিনি তাঁর গানের অন্যান্য ক্ষেত্রে আরো কিছু করেছেন যা আলোচনার বস্তু। বাংলা দেশে গীত রচয়িতাদের মধ্যে ধারণা যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে পারে এমন ভাবের গান ছাড়া জোরালো গান রচনা করা যায় না। এখনো এই আদর্শটিই জোরালো গান রচনার দিক থেকে সর্বত্রই গৃহীত হচ্ছে। কিন্তু গুরুদেব এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর রচনার সাহায্যে আমরা দেখেছি কেবল জাতীয়তা-বোধ উত্তেজক গান ছাড়া আরো নানা রসের উদ্দীপক গান ও রচিত হতে পারে। নানা প্রকার গানের মধ্যে প্রেমের গান দিয়ে এর উদাহরণ দিই। প্রেমের গান সাধারণত দুরকমের হয়; এক রকমের গানে কেবল দুঃখ বেদনা ব্যর্থতার কান্না ও অন্য রকমের গানে থাকে চঞ্চল আমোদের ভাব। কিন্তু প্রেমের ভিতরে যে বীর্য্যের প্রকাশ আছে আজকালকার প্রেমের গানে সেদিকটা কোথাও ফোটে না। হয়তো তার একমাত্র কারণ আমাদের এ যুগের প্রেমের ভিতরেও তেজের অভাব ঘটেছে। তাই প্রেমেতে কেবল কান্নাই খুঁজি। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানে সে ব্যতিক্রম যথেষ্ট আছে। তার প্রেমের গানে যেমন ধ্যানের গাম্ভীর্য্য আছে আবার তেমনি পাগল করে দেবার প্রেরণাও তাতে পাওয়া যায়। "তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম" এই বেহাগ রাগিনীর গানটিতে পাই প্রেমের ধ্যানমগ্ন একটি গম্ভীর পুরুষোচিত মূর্তি, আবার যে প্রেম মনে জাগলে কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছা করে 'ক্ষুধার্ত প্রেম তার নাই দয়া তার নাই ভয় নাই লজ্জা' তখন গাইতে হয় "প্রেমের জোয়ারে ভাসাব দোঁহারে," বাহার রাগিনীর মত গান। কিন্তু গুরুদেব ছাড়া আর কে প্রেমের এ রূপকে এ ভাবে ফুটিয়েছেন গানে? গুরুদেবের মনে প্রেমের আদর্শ কি রকম বীর্য্যশালী ও প্রাণের পূর্ণতায় প্রাণবান,—

"আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা গড়িব না ধরণীতে"

গানটিতে সুরে কথায় ও ছন্দে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে।
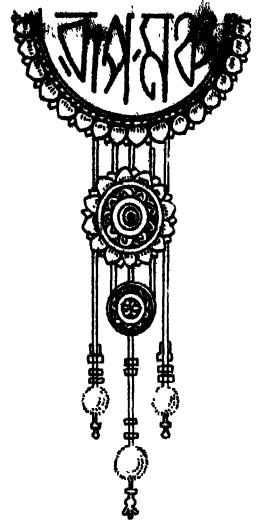
ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক ভী, শান্তারাম।

এঁর আগত প্রায় চিত্র 'শকুন্তলা"।

শকুন্তলায়—নাম ভূমিকায় অভিনয় কচ্ছেন—এরই সুযোগ্যা স্ত্রী জয়শ্রী দেবী।

আলো ছায়ার খেলা

নেগেটিভ থেকে খানিকটা বাদ দিয়ে এই ছবিটী ডেভলব করা হয়েছে।

বিভিন্ন কোণ থেকে গৃহীত একই পর্বত চূড়ার ছবিতে কেমন আলোছায়ার বিভিন্নতা ফুটে উঠেছে

দিনের আলো পরিবর্তনের সংগে সংগে ছবির রূপ পরিবর্তন।
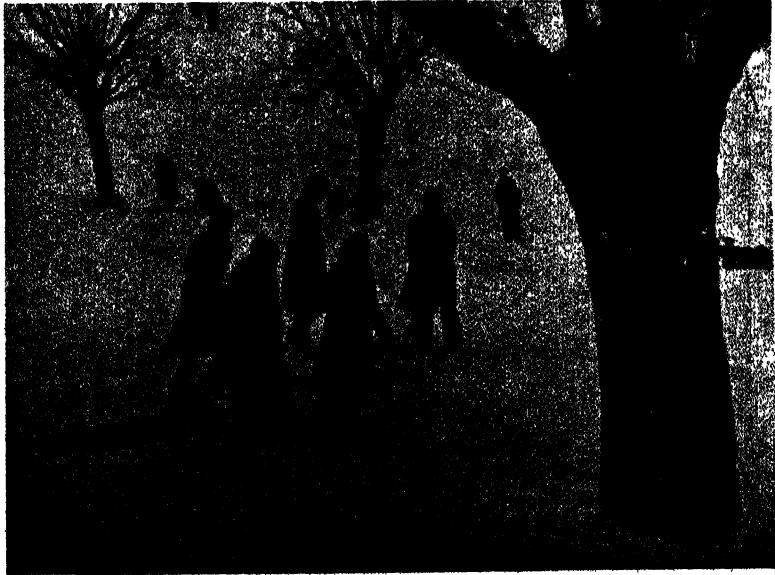
ভিন্ন ঋতু—ভিন্ন আলো। জুনের পরিপূর্ণ সূর্যের আলোকে গৃহীত পর্বত চূড়ার ছবির সংগে ডিসেম্বরের ধূসর আলোকে গৃহীত ছবির তারতম্য। আশা করি সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন। ফটো: এডউইন স্মিথ (Edwin Smith)

আলোই ছবি—একথা ছবির জন্ম সম্পর্কে যারা ওয়াকিবহাল আছেন তারাই স্বীকার করবেন। কোন দেয়াল গেঁথে তুলতে যেমনি ইটের প্রয়োজনীয়তা তেমনি কোন ছবির জন্ম রহস্যের মূলে রয়েছে আলো। ক্যামেরা এবং ফিল্ম হচ্ছে যন্ত্রপাতি, যার সাহায্যে ছবি তৈরী করা হয়। দেয়াল গেঁথে তুলতে যেমনি ইট ছাড়া যন্ত্রপাতির আবশ্যক তেমনি ছবি তুলতে ক্যামেরা ফিল্ম এবং আনুষঙ্গিক। তবে ইট না হলে যেমনি ইটের দেয়াল তৈরী করা যায় না তেমনি আলো না হলে—ছবি গ্রহণ করা যায় না। ছবি তুলতে আলোর প্রয়োজনীয়তা কতদূর এইটুকু বলাতেই আমার মনে হয় যথেষ্ট।

এই কথায় অনেকে হয়ত বলতে পারেন তাহ'লে
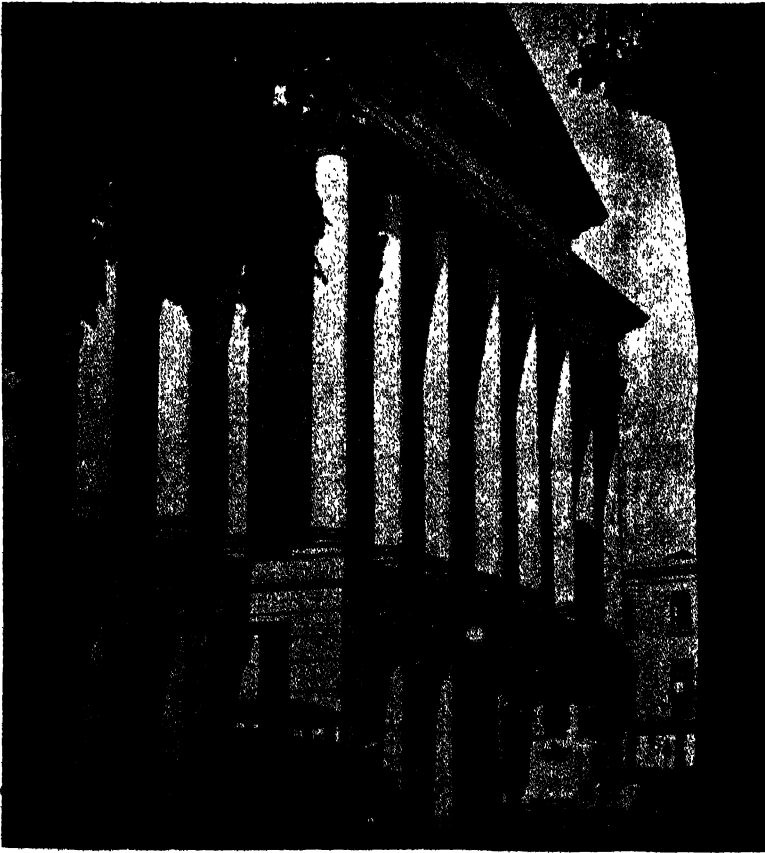
আবহাওয়ার তারতম্যে ছবির রূপ-পরিবর্তন; গ্রীষ্মের খর-রৌদ্রে গৃহীত ছবি

কুয়াসার মাঝে গৃহীত একটি ছবি। গাছগুলোকে দেখে অঙ্কিত দৃশ্যাবলীর মত কেমন চ্যাপটা (Flat) মনে হচ্ছে। এইচ, ভ্যান ওয়াডেনোইয়েন এবং এডউইন (H. Van. Wadenoyen & Edwin).

আমাদের বন্ধুবান্ধব কী কোন দৃশ্যাবলীরচিত্র গ্রহণ করতে প্রচুর আলোই ত আমাদের ক্যামেরার পক্ষে যথেষ্ট। আর কী দরকার? কিন্তু সত্যই কী আর কিছুর কী দরকার নেই? এর উত্তরে আমি বলবো—আরও অনেক কিছুর দরকার। কোন বিষয়বস্তুর রূপ দিতে আলো একটী অংশ বিশেষ মাত্র—প্রধান অংশ। কেন তার উদাহরণ স্বরূপ বলতে হয়—কেমন করে আপনি আপনার বন্ধুর অবয়ব এবং ঠিক অনুরূপ কোন বিষয়ের পার্থক্য বুঝবেন

যদি না অঙ্কন বা স্পর্শের সাহায্যে পরস্পরের যথাযথ রূপ ফুটিয়ে তোলা যায়? আলো ছাড়া কালো বিড়াল কয়লার স্তূপের পর এবং ছায়া ছাড়া সাদা বিড়াল বরফের পর ক্যামেরার ভিতর কোন রূপ নিতে পারে না। আলো এবং ছায়ার মেশামিশিতেই কোন বিষয় ক্যামেরার সাহায্যে রূপায়িত হতে পারে। আলো এবং ছায়ার মেশামিশিতেই আমরা বুঝতে পারি দূরের একটী বাড়ীর আকৃতি গোল বা কোন্ ধরণের। আলো বিষয় বস্তুর আকৃতির আবিষ্কারক—ছায়া আবিষ্কারের চাবিকাঠি।

স্পষ্ট ছায়ায় 'কোণ'ধরা পড়ে অস্পষ্ট বা আবছায়ায়

ভিন্ন দেশের ভিন্ন আলোকে : হাঙ্গেরীতে তোলা একটি ছবি। এখানে আলো প্রখর, আবার কুয়াশায় মিশ্রিত। ফটো : এল, সমবোরী (L. Sombori).

সম্মুখ এবং সামান্য পিছন থেকে আলোক সম্পাতে গৃহীত। বিষয়টি সমস্তই সাদা, অথচ দেখুন ছায়া-সম্পাতে কেমন সব কিছু উপলব্ধি করা যাচ্ছে। (এডউইন স্মিথ)

আমরা বৃত্তরেখা আবিষ্কার করি"। 'কোন' অথবা যে 'কোন্' থেকে আলোক নিয়ন্ত্রণ করা হয় তারই সাহায্যে ছায়ার দীর্ঘতা এবং স্বাভাবিক স্থিতি নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রতিদিনকার ঠিকঐ ধরণের 'কোণে'র আলোর দ্বারা আমরা পরিচিত কোন বন্ধুকে, চিনতে পারি কিন্তু ঐ ছায়াকে যদি কোন অপ্রত্যাশিত আলোক সম্পাতে নিয়ন্ত্রিত করা যায়—তাহ'লে ঐ পুরোন বন্ধুকেই নতুন ভাবে আমরা দেখতে পাই। আবার আলোর প্রাচুর্যের
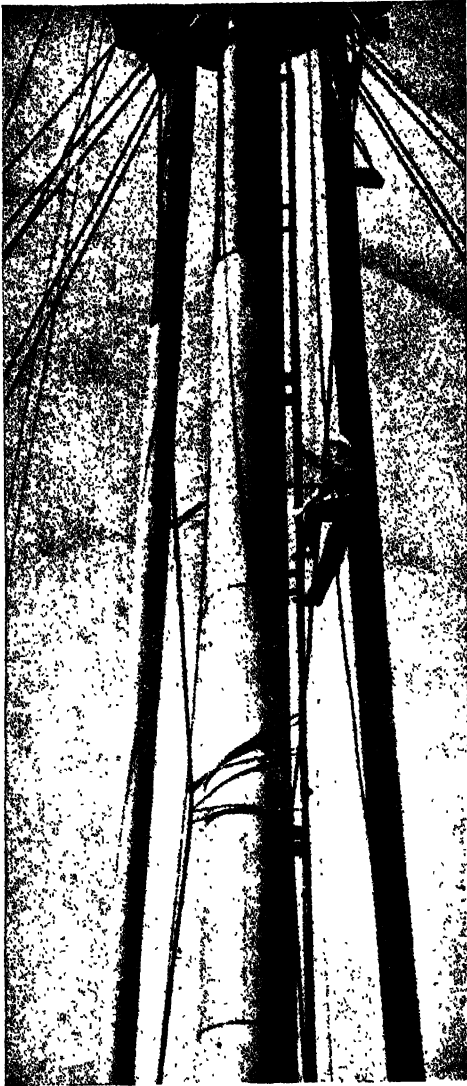
সমুদ্রের এই মাস্তুলটির চিত্রে চিত্রকর কেমন আলো ছায়ার খেলা ফুটিয়ে তুলেছেন। সম্মুখ থেকে পার্শ্ব আলোক-সম্পাতে গৃহীত হয়েছে। (C. Croeber) সি ক্রোবার।

সংগে ছায়া মিশিয়ে অনেক সময় নিচু থেকে মুখাবয়ব আলোকিত করা হয়—যেমন ধরুন সিগারেট ধরাবার সময়, তাই বলছি আলোর অদ্ভুত ক্ষমতা কোন পরিচিত বিষয়কে সাজিয়ে গুজিয়ে নতুন ভাবে রূপ দেবার অদ্ভুত উপায় এর সাহায্যেই সাধিত হতে পারে।

আলোর প্রাচুর্যের তারতম্য ছাড়াও—গতির বিশেষত্ব আছে—যা চিত্র গ্রহণে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার। আকাশ থেকে সূর্য যে আলো দেয়—সকালে এবং বিকেলে তার স্নিগ্ধ তেজ—দুপুরে এই তেজের মাত্রা স্বভাবতঃই খরতর। একই দিনে বিভিন্ন সময়ের সূর্যালোকের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট—চিত্র গ্রহণ করবার সময় এই কথা মনে রেখে সময়োপযোগী আলোক সম্পাতের দিকেই চিত্রকরের রাখতে হবে প্রখর দৃষ্টি। শুধু এদিকে দৃষ্টি রাখলেই চলবে না, যে আলোআমরা দেখছি—তা ত সব সময় স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না। আবহাওয়ার বিভিন্নতার জন্য কখনও বা স্বাভাবিক ভাবে দেখতে পাই কখনও বা অস্বাভাবিক অবস্থায়। আলোর সৃষ্ট যে ছায়া সে সম্পর্কে ঐ একই কথা প্রযোজ্য, কখনও বা তা স্পষ্ট—কখনও অস্পষ্ট। আলোর রংই বা কোন ধরণের—দিনের বেলার ঠাণ্ডা নীলাভ, না—বৈদ্যুতিক আলোর মত উষ্ণ? অথবা এই আলো কী কোন ঘরের রং নিয়েছে যে ঘরে আমরা বসে আছি? ছবি তুলবার সময় আপনার ক্যামেরার কাছে এই সব জবাবদিহি করতে হবে—তারপর ছবি তুলতে অগ্রসর হবেন, যিনি সত্যিকারের গুণী চিত্রশিল্পী এই সব প্রশ্নের জবাব তার অজানা নয়।

তা'হলে চিত্র গ্রহণের মূলে রয়েছে আলো এবং আলোর পরিমাণ—গতি ও শ্রেণী—(Quantity, Direction and Quality) হচ্ছে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার।

আলোর এই বৈশিষ্ট্যগুলি সব সময়ই বর্তমান এবং পরিবর্তনশীল।

গ্রীষ্মের খর-রৌদ্রে যদি এরূপ ছবি তুলতে চান—তবে উপর থেকে আলোক সম্পাত আপনার প্রচেষ্টাকে জয়যুক্ত করে তুলুন।— K. Schenker) কে, সেনকার।
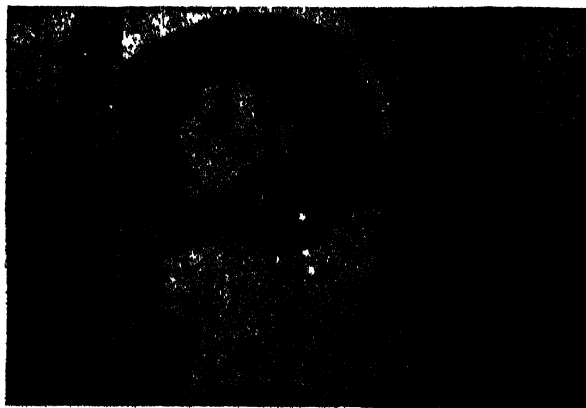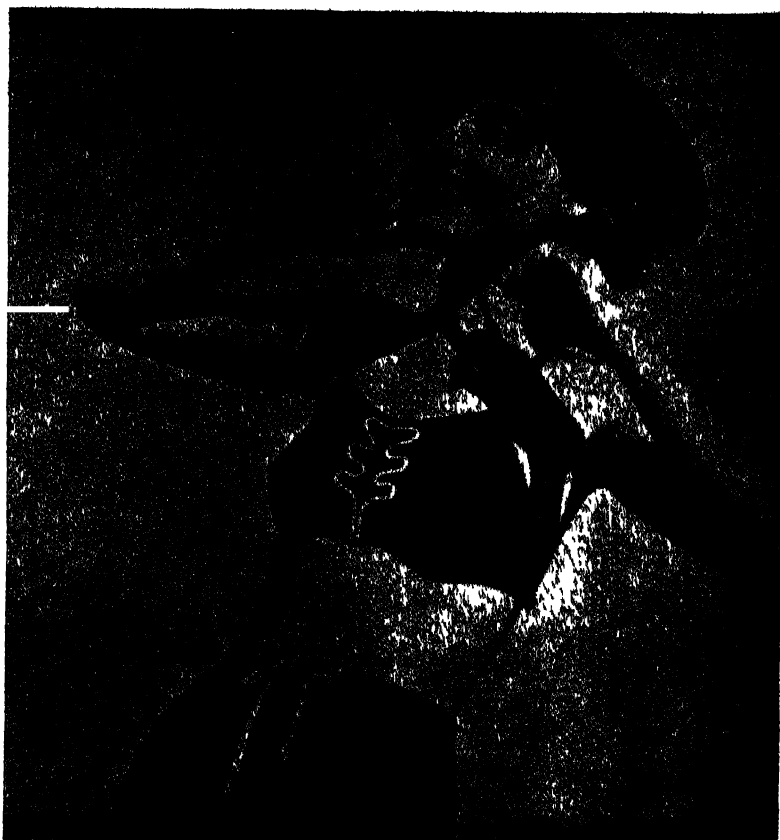
'সাইরেন যখন বাজে'—জ্যোতি সেন।

আলোর গতি ঃ ছায়া দেখেই আলোর গতি নির্ধারিত হয়ে থাকে। কোন্ কোণ থেকে কোন্ আলো এসেছে—ছায়ার পার্থক্য দেখেই তার গতি আবিষ্কার করা যায়—আবার আলোর গতি দেখে ছায়াকে নিরূপণ করা হ'য়ে থাকে। আলোর গতির আপনি মোড় ফিরিয়ে দেন—দেখবেন আপনার ছায়ারও মোড় ঘুরে গেল। আরও পরিষ্কারকরে বুঝতে পারবেন—সূর্যোদয়ের সময় রাস্তার যে ধারে আলো থাকে—সূর্যাস্তের সময় দেখবেন যেদিকে ছায়া পড়েছে। যদি আপনার বিষয় বস্তুটীর সংগে মাটির কোন যোগাযোগ না থাকে তবে

অন্ধকার 'ব্যাক্ গ্রাউণ্ড'-এ এই ছবিটী তোলা হ'য়েছে
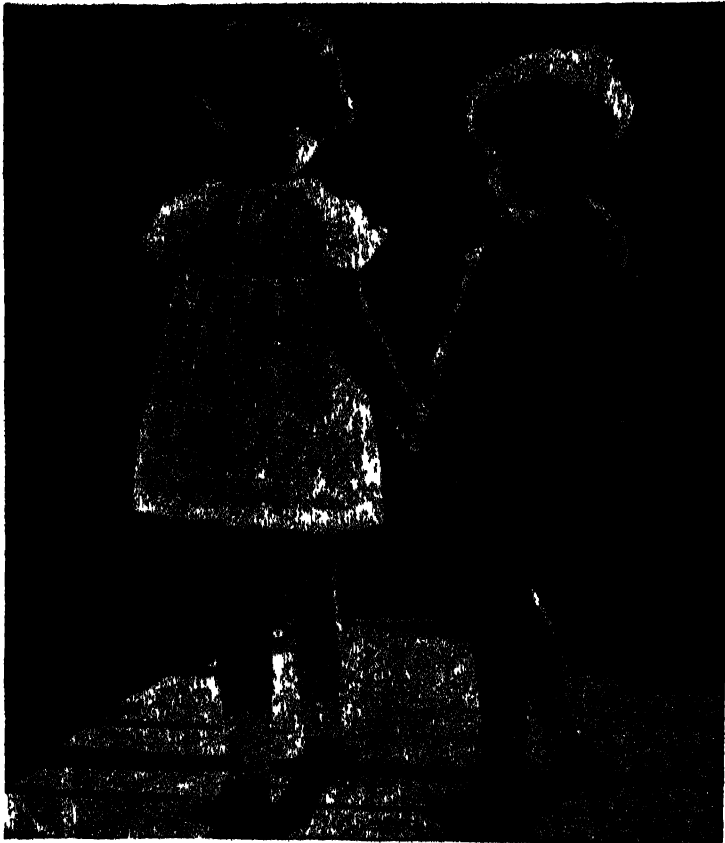
এখানেও 'ব্যাক গ্রাউণ্ড' অন্ধকার—তবে বিষয় বস্তুটির মুক্ত পথ বেয়ে আলো এসে পড়েছে।
পি, পপার (P Popper)

সূর্যের পরিবর্তনের জন্য আপনার অপেক্ষা করতে হবে না—আপনার খুশীমত আলো-নিক্ষেপে চিত্র গ্রহণ করতে পারেন। এবার আসুন আলোর গতি নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

সম্মুখ থেকে আলোক-সম্পাত: ক্যামেরার পিছন থেকে যখন বিষয় বস্তুর উপর আলো ফেলা হ'য়ে থাকে। এই ধরণের আলোক সম্পাতে কোন ছায়ারই সৃষ্টি হয় না। ছায়া ব্যতীত বিষয় বস্তুর আকৃতি এবং অবস্থান সম্পর্কে কোন ধারণা করা সম্ভবপর নয়। সমস্ত বিষয়টাই (Flat) চ্যাপটা মনে হয়।
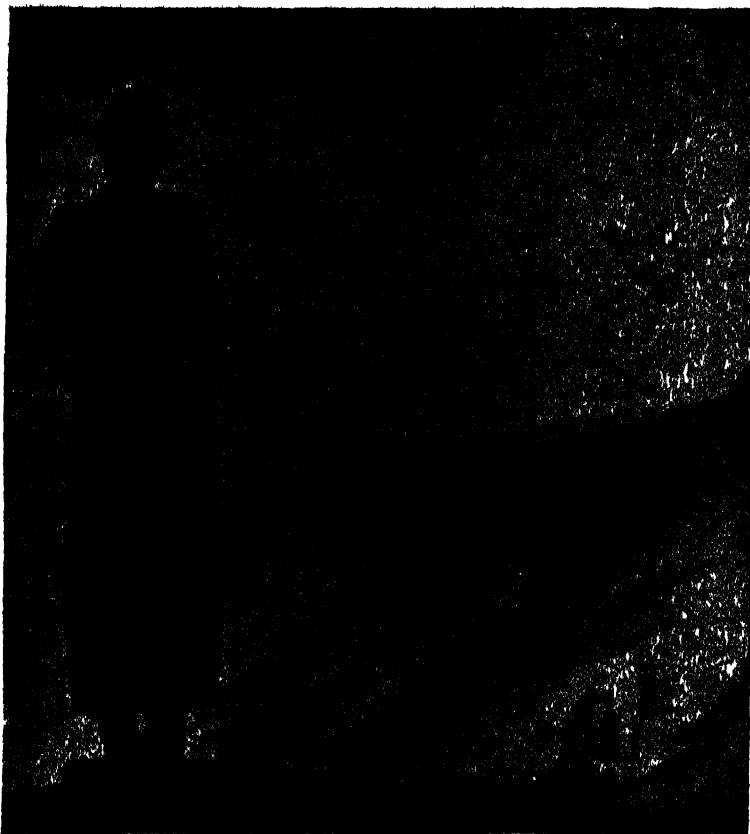
এখানে সামনে এবং পিছন দুইদিক থেকে আলোর গতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।—এল রোজেন বার্গ (D. Rosen Berg)

বাদিকে : নিকটের একটা জানালা থেকে আলো আসছে।—সুব্রত সেন। ডানদিকে : পাশ থেকে আলো এসেছে।

আলো ছায়ার মারপ্যাচে শিল্পীর দক্ষতা কেমন ফুটে উঠেছে—দেখুন।

নির্গত ধুয়ার মাঝেও কেমন আলো ছায়ার খেলা।

পিছন থেকে আলোক-সম্পাত ঃ মুখ ঘুরিয়ে এবং চাহনী সূর্যের দিকে, যাতে ক্যামেরার এদিক দৃষ্টি পরে। এখন আমরা সম্পূর্ণ আলো এবং ক্ষুদ্রতম ছায়া থেকে সমস্ত ছায়া এবং অল্প আলোর দিকে এসেছি। এখন এবারও অনেকে মনে করতে পারেন বিষয় বস্তুটী ফ্ল্যাট বা চ্যাপটাই হলো কেবল প্রথম বারের উল্টো। কিন্তু বাস্তবিকই তা নয়। বেশীর ভাগ এবার ছায়া হওয়াতে বিষয় বস্তুর গভীরতা সহজেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

সূর্য ক্যামেরার সামনে, কিন্তু সড়াসড়ি ভাবে নয়। সূর্যকে বিষয় বস্তুর ভিতর তখনই গ্রহণ করা যেতে পারে

আলো ছায়ার ম্যারপ্যাচে একটী গৃহের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য যেমন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উপরের জানালার আলোকে অন্ধকার দেয়াল ক্যামেরার চোখে ধরা পড়ে গেছে।
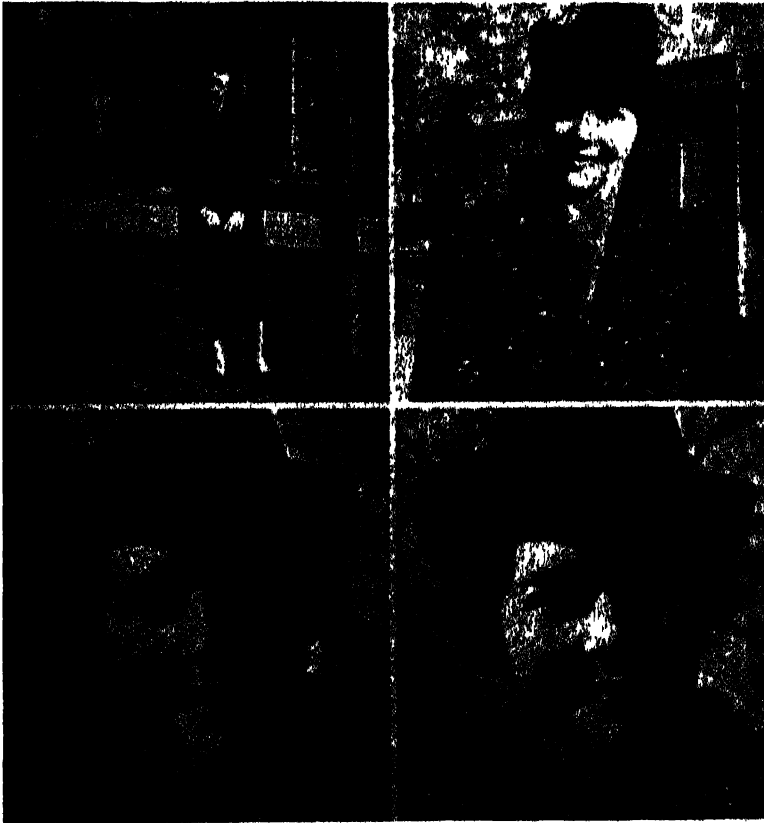
বাদিকে উপরে : একটা বক্স ক্যামেরার সাহায্যে আপনি আপনার বিষয় বস্তুর খুব কাছে আসতে পারেন না তাই যা আপনি চাননি—তাও গ্রহণ করতে হবে বাধ্য হয়ে। ডানদিকে : আপনি যদি দশ ফিট এগিয়ে যান ফোকাসের অভাবে এমনি তর আসবে।
নিচে বাদিকে : একটু এগিয়ে গেলে এর কমও আসতে পারে। ডানদিকে : মাঝামাঝি দূর থেকে যদি গ্রহণ করেন তবে এমনি আসবে।

শীতের দিনে কুয়াসার ভিতর থেকে যখন সে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। অন্যান্য সময় সূর্য এমন উচুতে থাকে যে কেবল বিষয় বস্তুর মাথার পর আলো পড়ে—এই সময় একটী জিনিবের প্রতি আমাদের সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে—যেন ক্যামেরার চোখে কোন সড়াসড়ি আলো না পরে—এই জন্ত লেন্সে পর্দা ব্যবহার করতে হয় এবং এরূপ আলোর সময়ও সব সময়ই পর্দা ব্যবহার করতে হবে, অন্ত সময়ও করা ভাল।

খরতর রৌদ্রের আলোকে মুখের হাবভাব কেমন ফুটে উঠেছে—জন, কোল (কোডাক লিঃ) এবং পি, উলফ্ :

গৃহ প্রাঙ্গনের 'আলপনা' কেমন ক্যামেরায় ধরা পড়েছে।—জ্যোতি
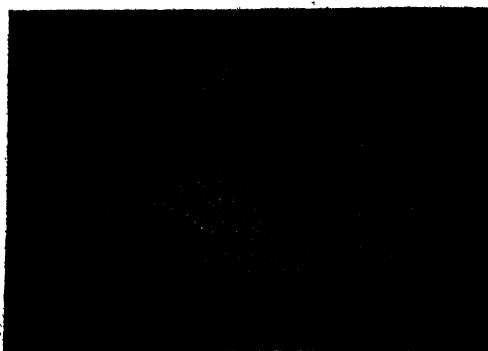
বিভিন্ন কোণ থেকে একই সময়ের গৃহীত ছবি। উপরে বাঁদিকে: খানে সামনে থেকে আলো নিক্ষেপ করা হয়েছে। নিচে ডান দিকে: সামনে এবং পাশ থেকে আলো ফেলে মুখাবয়বের এক পার্শ্বের চিত্র গ্রহণ করা হয়েছে। নিচে বাঁদিকে: সূর্য্যের দিক থেকে ঐ অবস্থায় গ্রহণ করা হ'য়েছে। উপরে ডানদিকে: নিচু এবং পার্শ্ব থেকে আলোক নিক্ষেপ।

পার্শ্ব থেকে আলোক সম্পাত: এক ধার থেকে যখন আলো ফেলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ মনে করুন সূর্য, পূর্ব পশ্চিম দিকে, ক্যামেরা যখন উত্তর বা দক্ষিণ দিকে।

কোণাকোণি ভাবে আলোক সম্পাত: পার্শ্ব আলো যখন সামনে বা পিছন থেকে নিক্ষেপ করা হয়। এ ছাড়া উপর থেকে আলো নিক্ষেপ করা হ'য়ে থাকে।

এই ছবিটীতে পিছনের দৃশ্যাবলী কেমন ফুটিয়ে তোলা হ'য়েছে। জলের উপরিভাগ, নৌকা গাছ। এবং আলোক সম্পাতেরও খুব বাহাদুরী বলতে বৈ কী ?

কলা-মঞ্জুষা

এখানেও ব্যাক গ্রাউণ্ডের প্রশংসা করতে হবে বৈ কী? গাছ গাছরা এবং তার সংগে কেমন আকাশ এসে মিশেছে।

নভেম্বরের বিদায় কালীন সূর্য্যালোকে গৃহীত।—বীণা দেবী।
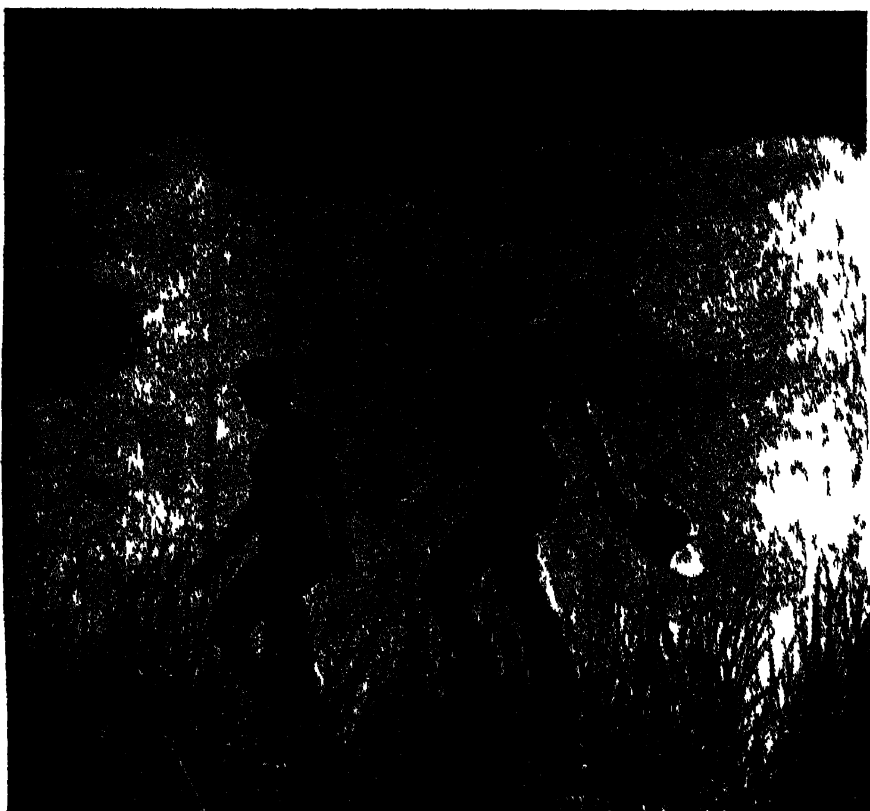
দিনের ভিন্ন সময়ে ভিন্ন আলোক সম্পাতে এই ছবিখানি গ্রহণ করা হয়েছে। আলোর বিরুদ্ধ দুপুরের খর-রোদ্রের দৃশ্য কেমন সুন্দর ফুটে উঠেছে।

তেত্রিশ পৃষ্ঠার ছবিটি এই চিত্র থেকে আবশ্যকানুযায়ী কেটে 'ডেভলপ' করা হয়েছে।

বিদায় কালীন মধ্যাহ্নের অপেক্ষাকৃত স্নিগ্ধ আলোকে গৃহীত। ফটো : এহচ গবনি এবং এডউইন স্মিথ।
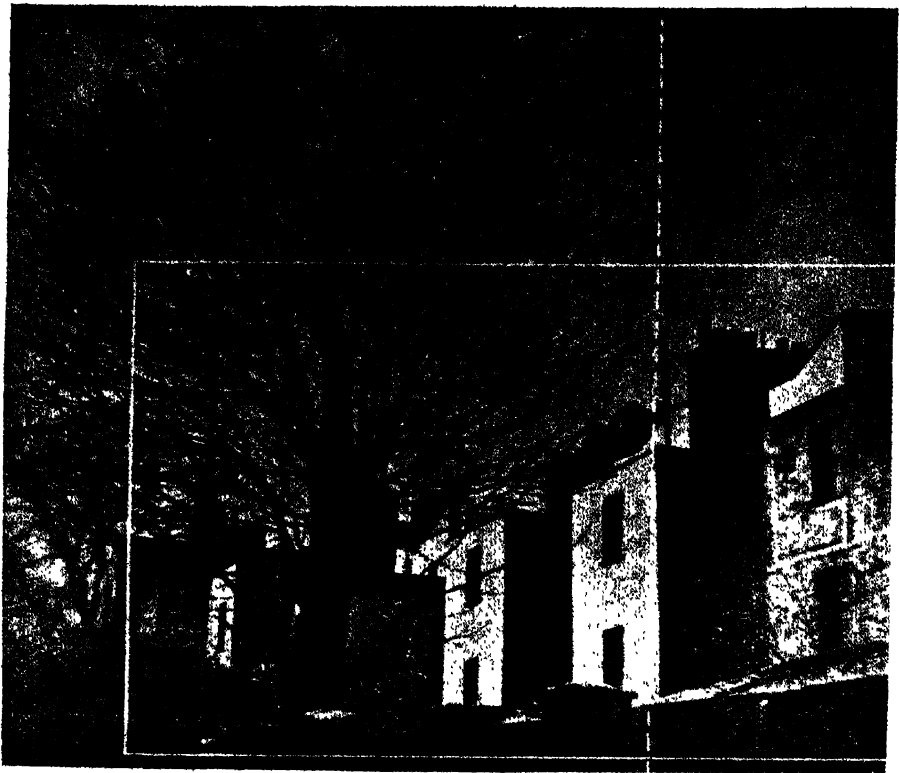
সম্পূর্ণ একটি নেগেটিভ থেকে ইচ্ছানুযায়ী কি ভাবে ছবিটি মুদ্রণ করা চলে।
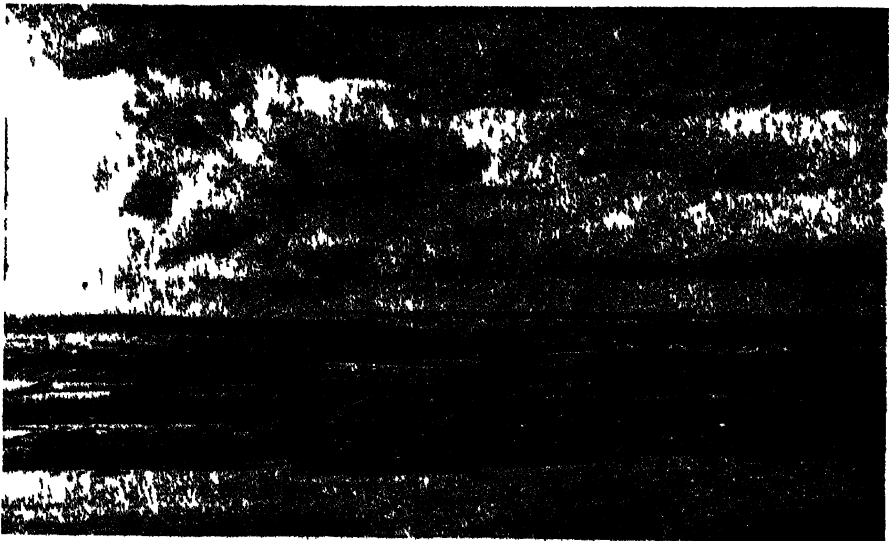
চিত্রটিতে কেমন মেঘ ছায়াবলী ফুটে উঠেছে।

মুদ্রণ করবার তারতম্যে বিষয় বস্তুটি কোমল ও কর্কশ হয়।

ক্যামেরার দিকে না চাইতে দিয়ে কেমন স্বাভাবিক ভাবে চিত্রটি গ্রহণ করা হয়েছে। —(কোডাক)।
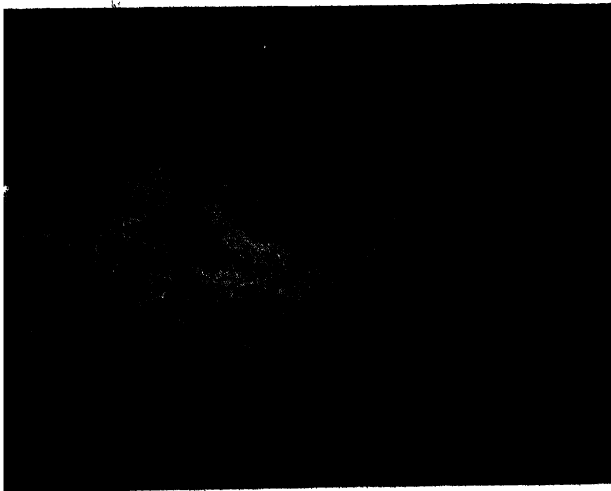
শরৎকালে (ছুটী) :—জ্যোতি সেন।

ছবি মুদ্রণ করবার কাগজ নির্বাচনের তারতম্যে

পিসিমা, জেঠিমা, সিনেমা

সুধীরেন্দ্র সান্যাল

কথা-সাহিত্যের প্রেম এবং সিনেমার প্রেম, এ দুটোর মধ্যে অর্থগত পার্থক্য না থাকলেও প্রকৃতিগত পার্থক্য বর্তমান। কারণ বিভিন্ন চরিত্রে আরোপিত, কথা-শিল্পীর কল্পিত প্রেম অনেকটা জীবনের অনুগামী। কিন্তু সিনেমার প্রেমে ভেজাল, গলদ ও গোজামিল প্রচুর। যেমন রোমাঞ্চ সিরিজেরে নভেল, তেমনই সিনেমা সিরিজের রোমান্স। সবগুলি প্রায় বাঁধা ফরমূলায় ঢেলে সাজানো। একই জাতের সিন্থেটিক টিংচার, বিভিন্ন বোতলে, বিভিন্ন লেবেলে দিব্বি চলে, যেমন চলে বাংলা দেশে রোমাঞ্চ সিরিজের সিরিয়ালগুলি।

ছায়াচিত্রের যাঁরা ভাগ্যবিধাতা, তাঁদের প্রায় সবাই অনেকটা গানি-হেশিয়ানের ব্যবসাদারীতে পাকাপোক্ত স্পেকুলেটারের মত নগদ বিদায়ের কারবারী। খরিদ্দারের অধিকাংশই রেল কোম্পানীর থার্ডকেলাশের যাত্রী অর্থাৎ কি না, দাঁতের মাজন, দাদের মলম থেকে, হাঁতে গরম বত্রিশ ভাজা পর্যন্ত যা ফিল্পি কোরবেন, তাতেই খুশী। তাই সিনেমাওয়ালাদের হাতে পড়ে মানুষের সবচেয়ে সর্বনেশে হৃদয়বৃত্তি, এত মোলায়েম, এত সহজ-বোধ্য হয়ে পড়েছে।

নিউ থিয়েটাসের নতুন আবিষ্কার শ্রীমতী লতিকা। 'দুই পুরুষে' আত্মপ্রকাশ করবেন।

রূপ-মঞ্চ

শ্রীচৈতন্য বাংলাদেশে প্রেম বিলিয়েছিলেন—নাম গানের ভেতর দিয়ে। সিনেমায় গৌরাঙ্গ ও জগাই-মাধাই-এর দল তাকেই আজ বিলি কচ্ছেন, ফুট মেপে, গজ মেপে কথায় ও গানে, আলাপে-প্রলাপে ও রং-বেরং-এর সংলাপে। সংলাপের নমুনা এত মৌলিকরূপে অরিজিন্যাল যে, যে তার অর্থবোধ করতে মল্লিনাথের কারণ নিতে হয়, প্রয়োগ করতে আশু হার্টফেল করবার সম্ভাবনা থাকে।

বাপকে লুকিয়ে শিক্ষিত, প্রাপ্তবয়স্ক বংশধর চুটিয়ে প্রেম করে; অথচ ভয়ে বাপের কাছে গিয়ে বিবাহের প্রস্তাব করে না। সিনেমার প্রণয়িনী বেপরোয়া। ভাবী শশুরকে কাৎ করবার মত সংলাপ তার দুরন্ত। প্রেমের হাইকোর্টে তার অল্পেতেই জিৎ হয়।

একরাত্রের বৌ সাজতে গিয়ে হাসপাতালের তরুণী নার্স নকল শশুরকে থ্যাম্‌টার কারসাজীতে বশ করে। সাজানো স্বামীর সাজানো মালঞ্চের খোলা পথে, প্রেমের মালিনী ধরা দেয় গাঁটছড়ায়। সিনেমার দেহ বিলাসিনী তর্কে বৈদান্তিক সংগীতে নৃত্যে অপ্সরী, কূটনীতিতে কার্ল-মার্কস্‌, যৌনতত্বে হ্যাভলক এলিস্‌। চৌষট্টি কলায় সাধনায় সে পি, আর, এস ; পি. এইচ, ডি !

সিনেমার তরুণী ফার্ষ্টক্লাস রাঁচি এক্সপ্রেস এর প্যাসেঞ্জার। ডান্স এনগেজমেন্টে যোগ দেবার তার অবাধ স্বাধীনতা। এদের বাপগুলো হয় গবেট, নয় ক্লাউন। মা ও মাসী এদের বাড়ীর হাউস-মেইড্‌। মেয়ের টুট্যার বা রাইভ্যাল, অর্থাৎ জগৎসিংহ ও ওস্‌মান—দু'দলকেই জোগায় চা, কেক, পেস্‌ট্রি। এদের আস্তানার খবর এদেশের বেকার গ্রাজুয়েটদেরও জানা নেই। থাকলে তারা খানসামা গিরিতেও বহাল হোত।

সিনেমার প্রেমিকের দল বড় একটা ধুতি-পাঞ্জাবীর পক্ষপাতি নয়। তাদের অংগে সর্বদাই বিলিতি স্যুট। ড্রেসিং গাউনেও এরা বাড়ীর বার হয় ; বিনা ভেষ্টেও এরা ডিনার জ্যাকেট পরে। ককটেলের গ্লাসে হেলথ ড্রিংক করে, সামাজিক আমন্ত্রণে বল-ডান্স এর মহলা বসায় আর প্রেমের কথা মনে হ'লেই রবীঠাকুরের গান গায়। এদের আকাশে সর্বদাই পূর্ণিমা। এদের জীবনে নিত্য বসন্ত। এদের প্রেমিকের পাশে জেলাস্‌ ভিলেন সদাই ওৎপেতে আছে সুযোগের অপেক্ষায়।

হয় নায়ক, নয় নায়িকা—দুজনের একজন হওয়া চাই ডেয়ার-ডেভিল। বাড়ী থেকে না পালালে এদের এড-ভেঞ্চার এগোয় না। বিনা এডভেঞ্চারে সিনেমার গল্পও জমে না। নায়ক বা নায়িকার মধ্যে প্রথম মিটিঙ এত চমৎকার রূপে ড্রামাটিক্‌ যে শেষ পর্যন্ত ভাবনারই দরকার হয় না যে এদের জীবনের পরিণাম কী হবে। রাম না হতেই রামায়ণের মত এদের জীবন-পঞ্জীর গ্রহ-নক্ষত্র, জন্মের আগেই যথা নিয়মে বাঁধা ঠিকুজীর বিধান মেনে চলে। এদের হাসি-কান্না ঝগড়া সবটাতেই ডুয়েট্‌ গান।

রূপ-মঞ্চ

এদের বিচ্ছেদ, এদের কলহ, এদের মিলন—সবতাতেই সেই বাঁধা ফরমুলা !

ফাঁক বা ফাঁকীর কোন সুযোগ নেই সিনেমায়।

দেড়শো ফুট হাসি, পাঁচশো ফুট কান্না, দুহাজার ফুট গান, বাকী ক'হাজার সংলাপ। এদের লঘু কৌতুক ও পরিহাসের মধ্যে এমন একটি সবচিন্ বন্ধু থাকা চাই, যে বরের ঘরের মাসী, কনের ঘরের পিসি।

সাহিত্যে যারা প্রেমের রকেট ছুঁড়ে দিগ্বিজয়ী হয়েছেন এমন কী শেষের কবিতার স্রষ্টা পর্যন্ত সিনেমা-প্রেমের প্যাটার্ন দেখে এঁদের মৌলিকত্বের তারিফ করতে দ্বিধা বোধ করেন না। এদেশের এড্গার

'কিসমৎ'-এর একটী দৃশ্যে মমতাজ শান্তি ও অশোক কুমার।

ওয়ালেশের দল এদেরই সমগোত্রীয়। সাহিত্যে রোমাঞ্চ, সিনেমায় রোমাঞ্চ—ছ'পেনীতে সহজ লভ্য এমন আমোদ থেকে এদের বঞ্চিত করে কে ?

চল্লিশ কোটি কালা আদমীর প্রায় বাইশ কোটি এই থার্ডক্লাশ রেলগাড়ীর প্যাসেঞ্জার।

ছবির কারখানার প্রায় শখানেক ডিরেক্টার। মালিকের মধ্যে শতকরা নব্বই জন মা সরস্বতীর স্কুল পালানো গুণধর। পাবলিসিটির ঢাকে কাঠি দিয়ে যারা এঁদের exploit করেন তাঁরা চতুর লোক। ঢাকের বাজনা যত বেতালে, যত জোরে বাজে, এরা তত বেশী খুশী। এঁদের হাতে আছে বাছাই করা, চোখা চোখা ইয়াঙ্কী বুলি ও বেপরোয়া বিশেষণের এনসাইক্লোপিডিয়া। এঁরা সদাই সন্ত্রস্ত। কখন কোনটি বা বাদ পড়ে যায় !

এঁদের film-hit, song-hit, box-office hit.—রোমাঞ্চ পিয়াসী নিরন্ন জাতকে টিট্ করবার fit অস্ত্র এর থেকে আর কোনটি বড় !

প্রেমের জন্য লেকের সলিলে জীবন-সমাধি—দিন কতক বন্ধ আছে। সম্প্রতি সুরু হয়েছে ছবি দেখবার ছাড় পত্র না পেয়ে dramatic side-show—সুইসাইডে !

এই সিনেমার যুগে, নবজাত শিশুর মুখের প্রথম চারিটি বুলি : মা, পিসিমা, জেঠিমা, সিনেমা.........

তাই একদিন বড় আনন্দে, ভাবী বংশধরের আগমন সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হয়ে এই দু'ছত্র কবিতা লিখে গৃহিনীকে উপহার দিয়েছিলাম :

> শিশুরা ভুলেচে পিসিমা, জেঠিমা,
> প্রথম মুখের বুলি যে সিনেমা,
> ঝিনুকে-বাটিতে চলিছে ঠুংরী—
> সা-রি-গা-মা ; সা-রি-গা-মা !

বাঙলায় চিত্র-পরিবেশনা

ভুবনমোহন লাহিড়ী

বর্তমান পৃথিবীব্যাপী এই মহাসমরের আবর্তন প্রত্যেক ব্যবসায়কেই আঘাত করিয়াছে কিন্তু বাঙালা চিত্রপরিবেশক ব্যবসায়ীদিগকে যে এক অভাবনীয় অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহা আমাদের সমব্যবসায়ীগণ চিন্তা করিয়াছেন এবং করিতেছেন কি না জানি না।

চিত্র পরিবেশন প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হিসাবে লেখকের অভিজ্ঞতা খুব কম বটে কিন্তু চিত্রব্যবসায়ে প্রদর্শক এবং পরিবেশক ব্যবসায়ীর দায়িত্বপূর্ণ পদে তাহার দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা আছে।

বর্তমান চিত্রব্যবসায়ে চিত্রপরিবেশকেরা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং বাস্তবপক্ষে তাঁহারাই এই ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই গুরুভার দায়িত্ব সুচারুরূপে নির্বাহিত হইতেছে কি না ইহার আলোচনার চেষ্টা করিব।

যে কোনও একখানি একভাষী চিত্র নির্মাণের ব্যয় বর্তমান সময়ে ৬০।৭০ হাজার টাকা এবং নির্মাণ সাফল্য নির্ভর করে বহু মানবের সমবেত কর্মশক্তি এবং যান্ত্রিক সূক্ষ্মতার উপর। সেই বিপুল ব্যয়ভারের অর্দ্ধাংশ বা অনেক সময় অধিকাংশ বহন করেন চিত্রপরিবেশক। সেই চিত্র প্রদর্শন করিয়া এই বিপুল অর্থের পুনরায়ন এবং চিত্রপ্রযোজকের লাভ প্রদর্শনও চিত্রপরিবেশকের কর্তব্য কাজেই একথা প্রণিধানযোগ্য যে চিত্রপরিবেশকের কার্য এবং যাত্রাপথ মোটেই সুগম নহে পরন্ত- ইহা অতীব দুর্গম।

পরিবেশনা প্রতিষ্ঠানের যে কর্মীর উপর চিত্র-পরিবেশনা ভার ন্যস্ত থাকে তাহার অভিজ্ঞতা এবং ব্যবসায় বুদ্ধি ব্যতীত নিতান্ত প্রয়োজন তাহার অধিকারভুক্ত চিত্র-প্রদর্শনী গৃহ এবং তাঁহাদের মালিকদের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।

এই চিত্রগৃহের মালিকগণ এই ব্যবসায়ের প্রাণস্বরূপ কারণ চিত্র যতই ভাল হউক না কেন তাহার অর্থাগম নির্ভর করে এই প্রদর্শকগণের উপর। বর্তমান বাঙলা দেশে নিতান্ত অভাব উপযুক্ত প্রদর্শকের। যদি ব্যবসায় করিয়া চিত্রপ্রদর্শক না বাঁচে চিত্রপরিবেশক থাকিবে না চিত্রব্যবসায় বন্ধ হইয়া যাইবে।

দুঃখদৈন্যদশাগ্রস্থ এই বাঙলা দেশে নির্দোশ আমোদে দুই ঘণ্টা সময় যাপন করিবার একমাত্র উপায় চিত্রপ্রদর্শনী যদি কেহ প্রদর্শনী অন্তে মফঃস্বলের চিত্রগৃহের দর্শকদিগকে লক্ষ্য করেন দেখিবেন বেশীর ভাগ দর্শকই কৃষক মজুর শ্রেণীর, তথাকথিত ভদ্রলোক নহেন তাঁহাদের সংখ্যা কম।

চিত্র প্রদর্শকগণ তাঁহাদের যান্ত্রিক প্রয়োজনীয়তার বর্তমানে বিদেশ মুখাপেক্ষী কাযেই যে হংসী স্বর্ণডিম্ব প্রসবিনী তাহাকে রক্ষা করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। গত পাঁচ বৎসরের মধ্যেই বাঙলার সমস্ত চিত্র প্রদর্শক অবাঙলা চিত্র প্রদশনে মনোযোগী হইয়াছেন তাহার কারণ কি আমার সমব্যবসায়ীগণ বিবেচনা করিয়াছেন কি? ১৯৩৬।৩৭ সালেও এই প্রদর্শনী গৃহগুলি বাঙলা চিত্রই প্রদর্শন করিত এবং তাহা পরিচালনা করিতেন বাংলা চিত্র পরিবেশক কিন্তু ক্রমশঃ এই অধিকার চ্যুত হইয়াছেন বাংলা চিত্র পরিবেশকগণ এতদূর যে আজ সমস্ত বিহারে আসামে এবং উড়িষ্যার বাংলা চিত্রে কোনও কদর নাই। ফলে চিত্রপ্রযোজকগণ যদি উত্তম চিত্র নির্ম্মাণে অসমর্থ হন তাঁহাদের চিত্র এই সকল প্রদেশে প্রদর্শিত হয় না।

কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই

যে অবাঙালী চিত্র পরিবেশকগণ চিত্রগৃহের মালিকদিগকে প্রথম প্রথম এরূপ সুবিধা দেন যে তাঁহাদের আপাত লাভের অংশ ভালই দেখা যায় এবং তাঁহারাও আকৃষ্ট হইয়া পড়েন পরে ক্রমশঃ দর্শকগণও আকৃষ্ট হন ফলে হয় যে চিত্রপরিদর্শকগণ বাঙলা অপেক্ষা অন্য চিত্রের পক্ষপাতী হইয়া পড়েন।

চিত্র প্রদর্শনের এমন একটি নিত্য-খরচ আছে যাহা কম করা সম্ভব নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখা যায় কলিকাতার কোনও গৃহেই কোনও বাংলা চিত্র ঐ গৃহের সর্বনিম্ন ব্যয়ের দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া প্রদর্শন করান অসম্ভব কিন্তু সেই মালিক-পরিবেশক মফঃস্বলের চিত্রগৃহের মালিকের নিকট দৈনিক বিক্রয়ের শতকরা ৫০।৫৫ টাকা চিত্রের আয় স্বরূপ দাবী করেন। যে কোনও চিত্রগৃহের বর্তমান দৈনিক ব্যয় ২৫।৩০৲ টাকার কম হওয়া সম্ভব নহে, কাযেই চিত্র পরিবেশকের দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে ২৫।৩০৲ টাকা যেন প্রদর্শক পায় অন্যথা একটি চিত্র গৃহের লোকসান বা বন্ধ হইয়া যাওয়া সমস্ত ব্যবসায়কে আজ না হউক কাল ধাক্কা দিবেই।

উত্তমরূপে সন্ধান করিলে দেখা যায় যে চিত্রগৃহের মালিক পরিবর্তন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়—প্রথমত চিত্রগৃহের মালিকের অনভিজ্ঞতা দ্বিতীয়ত চিত্রপরিবেশকের বিবেচনা হীনতা। সামান্য সুবিবেচনার সহিত যদি চিত্রপরিবেশকগণ প্রথম প্রথম এই নবাগত প্রদর্শকদিগের সহায়তা এবং সহযোগীতা করেন তাহা হইলে সম্ভব হয়। লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে সাহসের সহিত এ কথা বলা সম্ভব যে কয়েকটি অবাঙালী চিত্রপ্রদর্শক আছেন তাঁহারা তাঁহাদের দেশীয় পরিবেশকদিগের কি পরিমাণ সহযোগীতা লাভ করিয়া ক্রমশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছেন তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু পরিবেশকদিগের এই সহযোগীতার অভাব বাঙলা চিত্রব্যবসায়ের ক্ষতিকর হইয়া উঠিতেছে এবং ভয় হয় যে এমন দিন আসিতে পারে যে বাঙলা চিত্র নির্মাণ অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

বাঙলা পরিবেশন প্রতিষ্ঠানের কর্মসচিবকে মনে রাখিতে হইবে যে প্রত্যেকটি চিত্রগৃহের মালিকের ব্যবসার প্রত্যেকটি কেন্দ্রের বিক্রয় সম্ভাবনা প্রত্যেকটি কেন্দ্রের স্থানীয় বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা, প্রদর্শনী গৃহের কর্মচারীদের সাধুতা এবং কর্মক্ষমতা। এই অভিজ্ঞতা এবং যে চিত্রখানি পরিবেশিত হইবে তাহার যোগ্যতা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইয়া মূল্য এবং প্রদর্শনীর সময় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এক সময় যদি পরিবেশক অন্যায় লাভ করেন প্রদর্শক তাহা ভুলিবে না কারণ প্রদর্শকের উপরই নির্ভর করে চিত্র প্রদর্শনের আয়।

বর্তমানে বাংলা দেশের আর্থিক দুরবস্থা ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা হইবে কিন্তু ইহাতে চিত্রপ্রদর্শকের আপাত ব্যবসায় উন্নতি হইয়াছে তাহার কারণ প্রণিধান করিলে দেখা যায় টাকার মূল্যহ্রাস। বাস্তবপক্ষে এক সিনেমা ছাড়া অর্থের ক্রয়মূল্য সর্বত্রই কমিয়া গিয়াছে এবং বর্তমান অবস্থায় শ্রমজীবিগণ প্রায়ই কেহ বেকার নাই। এই অর্থের চালু অবস্থাই বর্তমান চিত্রব্যবসায়ের উন্নতির কারণ কিন্তু তাহা একমাত্র কলিকাতা সহর বা মফঃস্বলের যে সমস্ত স্থান যুদ্ধপ্রয়োজনীয়তার কেন্দ্রস্থল সেইখানেই দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই লাভের মোটা অংশ সরকারী আমোদ করে যাইতেছে এবং নূতন আইন সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক চিত্রপদর্শকের ক্ষমতা থাকুক আর না থাকুক সপ্তাহে ১০৲ হইতে ৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত সংবাদ চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে। বাঙলা দেশে শত করা ৫০টি চিত্রগৃহের মাসিক মুনাফার সংখ্যা ১০০৲।২০০৲ টাকার মধ্যে কাহারও তাহাও হয় না। এই অঙ্ক হইতে যদি ৪০৲।৫০৲।৬০৲ টাকা অনর্থক সরকারকে সংবাদ চিত্র প্রদর্শনীর জন্য দিতে হয় অন

দিনের মধ্যেই এই ছোট ছোট চিত্রগৃহের মালিকদের ব্যবসা গুটাইতে হইবে। আশ্চর্যের বিষয় যে ইহাতে ক্ষতি হইবে চিত্রপ্রযোজক এবং চিত্র পরিবেশকদের কিন্তু কোনও আন্দোলন সে পক্ষ হইতে বাঙলা দেশে হয় নাই শুনিতে পাই বোম্বাইতে হইয়াছে এবং তাহার ফলও হইয়াছে।

যুদ্ধচিত্রের পরিবেশনী বিদেশীয় দুইটি চিত্রপরিবেশকের একচেটিয়া অধিকার এবং আইনের ফাঁকিতে তাঁহারা নিজেদের আয়ের সুব্যবস্থা করিয়া লইয়াছেন। সমস্ত ভারতবর্ষে প্রায় ১৫০০ চিত্রগৃহ আছে এবং তাহারা যদি ভাগাভাগি করিয়া লন মোটামোটি তাহাদের আয় সপ্তাহে ৭৫০০০ হাজার টাকা বাড়িবে এবং তাহার একটি মোটা অংশ অনর্থক বিদেশে চলিয়া যাইবে।

প্রদর্শকগণ চেষ্টা করিবে যে চিত্রের সহিত এই সকল সংবাদ চিত্র চলিবে তাহার মোট বিক্রয় হইতে যুদ্ধচিত্রের ভাড়া বাদ দেওয়া। এই সংবাদচিত্র প্রদর্শনের জন্য বিক্রয়ের কোন উন্নতি হওয়া সম্ভব নয় কারণ বর্ত্তমান সময়ে এমন কোনও চিত্রই প্রদর্শিত হইবে না যাহা জনপ্রিয় বা চিত্তাকর্ষক কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে এই বিপুল ব্যয়ভারের অনেক অংশই বহন করিতে হইবে বাঙলা চিত্রপরিবেশককে।

ঐ উপরোক্ত সমস্ত বিষয় উপযুক্ত বিবেচনা করিলে আমরা দেখিতে কি পাই বা বুঝিতে পারি। প্রথমতঃ বাঙলা চিত্রের প্রদর্শনীর গণ্ডি কমিয়া গিয়াছে দ্বিতীয়তঃ চিত্র প্রযোজনার ব্যয় বাড়িয়া গিয়া লাভের অঙ্ক সঙ্কুচিত হইয়াছে তৃতীয়তঃ বাংলা চিত্র প্রদর্শন করিয়া চিত্রপ্রদর্শকগণের লাভের অংশ কম থাকায় তাঁহাদের আগ্রহ কমিয়া গিয়াছে।

কাজেই বাঙলা চিত্র পরিদর্শকগণ যাঁহাদের কর্ম্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে এই একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় তাঁহাদের পরস্পর একান্ত সহযোগীতার প্রয়োজন আছে যাহাতে বাঙলাদেশে চিত্রপ্রদর্শকগণ বাঙলা চিত্রকে সর্বাগ্রে স্থান দেন এবং প্রত্যেকটি বাংলা ছবি যে উৎকৃষ্টরূপে প্রদর্শিত হয় সেই প্রদর্শনীর ত্রুটী না থাকে। এইরূপে প্রতিটি বাংলা চিত্র প্রদর্শন করাইতে হইলে চিত্রপ্রদর্শকদিগকে আগ্রহান্বিত করিয়া তুলিতে হইবে এবং তাহাদিগকে যথেষ্ট সুবিধা দিতে হইবে। এই সঙ্গে মনে পড়ে একটি কথা যাহা বহু বৎসর যাবৎ আমার মনে আছে। বাঙলা-চিত্রপদর্শকের একটি অবাঞ্ছিত ব্যয় চিত্রের সঙ্গে যে পরিবেশকের পরিদর্শক আসেন তাহার ব্যয় বহন। বহু প্রদর্শকের পক্ষে এই ব্যয় বহন লোকসানের সামিল। এই ব্যয় হইতে অতি সহজেই চিত্রপ্রদর্শককে মুক্ত করা সম্ভব। এবং তাহাতে চিত্রপরিবেশকদের পরস্পর সহযোগীতার প্রয়োজন।

আমেরিকা হইতে যে চিত্রপরিবেশক পৃথিবীব্যাপী ব্যবসায় চালাইতেছেন তাহারা প্রতি পদে পদে এই ব্যবসায় যাহাতে সুন্দররূপে চলে তাহার ব্যবস্থা রাখিয়াছেন এবং সমস্ত সময়ে তাঁহাদের পরিদর্শনের ব্যবস্থা আছে কিন্তু তাহার ব্যয়ভার প্রদর্শককে বহন করিতে হয় না।

তদুপরি বর্ত্তমানে আমাদের ব্যবসায়ে এই পরিদর্শনের যে ব্যবস্থা চলিতেছে তাহা শোভন নহে এবং কার্য্যকরী কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে একথা আমি নির্ভয়ে বলিতে পারি যে মফঃস্বলে গিয়া আমার কর্ম্মচারী কতদূর নির্লোভ হইয়া আমার স্বার্থসংরক্ষণ করিবে তাহা আমার এবং আমার কর্ম্মচারীর সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে। অতি নিকট আত্মীয় ব্যক্তির উপর ভারার্পণ করিয়া দেখিয়াছি এই স্বার্থসংরক্ষিত হয় না স্থানে স্থানে এরূপ ঘটে যে পরিদর্শক পাঠাইয়া ক্ষতি হয়।

অভিজ্ঞতা লব্ধ ফল আমার এই যে বর্ত্তমানে পরিবেশক এবং পরিদর্শকের মধ্যে যে সম্বন্ধ থাকিলে ব্যবসায় সুষ্ঠুভাবে

চলিতে পারে তাহা নাই ফলে পরস্পর পরস্পরকে অবি-অবিশ্বাসের চোখে দেখেন এবং ফলে মন্দই হয়। বর্তমানে পরিবেশকগণ প্রায়ই নির্মাতার স্থান অধিকার করিতেছেন এবং তাঁহারা প্রায়ই প্রদর্শকদের দোহাই দেন কি করিব প্রযোজক মানে না তাহার কোনও ক্ষতির প্রতি কোনও দৃষ্টিই নাই।

চিত্রপ্রদর্শকের ক্ষতি পরিবেশকের ক্ষতি এবং তাহাতে আজ হউক আর কাল হউক এই ব্যবসায়ের মূলে আঘাত করিবে।

বর্তমানে চিত্রপরিবেশকগণ সমিতিবদ্ধ হইয়াছেন কিন্তু এই সমিতি বাস্তবপক্ষে কি কাজ করিতে পারে, কি উপায়ে দুষ্ট প্রদর্শককে সৎপথে আনিতে পারেন, যে চিত্রপ্রদর্শক নূতন এই পথে আসিয়াছেন তাহাকে ব্যবসায়ের আরম্ভের ভুলত্রুটিগুলি দেখাইয়া দিয়া ক্রমশঃ যাহাতে এই ব্যবসায় প্রসার লাভ করে তাহার উপায় চিন্তা করা উচিত। এই সমিতিভুক্ত কোনও পরিবেশক যদি অন্যায় করেন তাঁহার সংশোধনও এই সমিতির কর্তব্য বটে। কিছু কিছু কাজ হইতেছে বটে তবে আরও সময় লাগিবে।

পরিবেশকদের বর্তমানে আরও একটি চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত প্রদর্শকদিগের যন্ত্রসম্বন্ধীয় যথাযোগ্য উপদেশ দান। আমার স্বকীয় অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে বর্তমানে বাংলাদেশে প্রদর্শনী যন্ত্রসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোনও যন্ত্রী নাই। কোনও যন্ত্রের কোনও অংশ নষ্ট হইলে তাহা বদলান অসম্ভব কিন্তু জোড়াতালি দিয়া কায চালাইতে হইলে সাধারণ অভিজ্ঞতায় হয় না আরও বেশী জ্ঞানের প্রয়োজন। যন্ত্র উপযুক্ত না হইলে বর্তমানে চিত্র-ব্যবসায়ের অবস্থা অতীব সংগীন হইয়া দাঁড়াইবে। এবং পরিবেশক সমিতি চেষ্টা করিলে দুই একজন উপযুক্ত লোক রাখিতে পারেন যাঁহারা হঠাৎ প্রদর্শকদের এইরূপে সাহায্য করিতে পারেন।

লেখকের অভিজ্ঞতা পরিবেশকরূপে চূড়ান্ত নহে তবে এই ব্যবসায়ে প্রদর্শক পরিবেশকের পরিদর্শক, পরিবেশনার ভারপ্রাপ্ত এবং পরিবেশকরূপে ক্রমশঃ প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা হইতে এই কয়েকটি কথা লিখিতে সাহস করিলাম বন্ধুবর রূপমঞ্চ সম্পাদক মহাশয়ের প্রদত্ত ভরসায়।

যদি এই প্রবন্ধে কোনও কটুভাষণ হইয়া থাকে প্রযোজক, পরিবেশক এবং প্রদর্শকগণ নিজগুণে ক্ষমা করিবেন কারণ লেখক সমব্যবসায়ী এবং বাংলা চিত্র ব্যবসায়ের উন্নতিকামী সে কারণে এই ব্যবসায়ের প্রত্যেকটি কর্মীকেই উপরোক্ত বিষয়গুলি ভাবিয়া দেখিতে বলি।

বাংলা চিত্র প্রযোজনা এবং পরিবেশনার দুর্দিন সমাগত এবং বাংলা চিত্র প্রদর্শকদিগের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন মনোভাব লইয়া পরিবেশককে অগ্রসর হইতে হইবে। একাধিকবার শুনিতে হইয়াছে অমুক চিত্রগৃহকে ছবি দিব না, না দিলেও আমাদের ক্ষতি নাই। চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় এই বাক্য সুবুদ্ধি-সম্পন্ন নহে এবং বাংলা চিত্র পরিবেশকের উপযুক্ত নহে। কি কারণে কোন চিত্রগৃহ চিত্র পরিদর্শন করিতে চান না সমিতিতে তাহা জানান উচিত। এবং তাহার অভিযোগ শুনিয়া যাহাতে চিত্র প্রদর্শিত হয় তাহাই করা উচিত কারণ বাংলা চিত্র প্রদর্শনের সীমা গণ্ডীবদ্ধ এবং কোনও একটি গৃহে প্রদর্শনী না হওয়া বাংলা পরিবেশক এবং প্রযোজকের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিজনক। কারণ প্রদর্শক ঐ দিন অবাংলা চিত্র প্রদর্শন করিবে এবং তাহার ক্ষতি হইবে না কিন্তু পরিবেশক এবং প্রদর্শকের সমূহ ক্ষতি।

বাংলা চিত্র পরিবেশকের দায়িত্ব অতীব গুরুত্বপূর্ণ তাহার প্রধান কারণ এই সীমাবদ্ধতা এবং বিশেষ বিবেচনা ও বিচারশক্তির প্রয়োজন তাহার পূর্বাভাষ এই প্রবন্ধে দিয়াছি। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরও আলোচনা করার বাসনা রহিল।

দলসুখ পাঞ্চোলী প্রযোজিত 'পুঁজি' চিত্রের তারকাত্রয়ী—বেবী আখতার রাগিণী ও মনোরমা..............

অসাময়িক

(গল্প)

নরেন্দ্র নাথ মিত্র

নায়কের জেল হয়ে গেল সতের বছর। হাতে শিকল বাঁধা, পুলিস পাহারায় নায়কের ভূমিকায় বীরেশ্বর করুণ দৃষ্টিতে কেতকীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেঁদনা কেতকী, কয়েকটা তো বছর মাত্র, দেখতে দেখতে কেটে যাবে। কেঁদনা।'

কিন্তু কেঁদনা বল্‌লেই তো আর না কাঁদলে চলে না। এই মুহূর্তে কেতকীর দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়বে, ফোঁটায় ফোঁটায় তার উচ্চ স্তন চূড়া সিক্ত হয়ে উঠবে। এই ছিল পরিচালকের নির্দেশ। নাট্যকার কেতকীর মুখে এই মুহূর্তে কোন ভাষা দেননি। চোখের জলেই সমস্ত অন্তর এখন প্রতিবিম্বিত হবে, ভাষা এখানে অবান্তর। কিন্তু আশ্চর্য, চোখের জল তো বেরুলই না, এক ঝিলিক কৌতুকের হাসি ঝরে পড়ল কেতকীর ঠোঁট থেকে।

সকলে অবাক, নায়ক বীরেশ্বর বিস্মিত। পরিচালক নিরঞ্জনের চোখ দিয়ে আগুন জলছে।

অনেক দিন ধ'রে অভিনয় করছে কেতকী। দুটো বইতে নায়িকার ভূমিকাতেও নেমেছে। করুণ রসের অংশেই সে সবচেয়ে ভালো করে। কোন রকম কৃত্রিম রাসায়নিকের প্রয়োজন হয় না, এসব সময় চোখের জল তার অনায়াসে স্বাভাবিক ভাবেই বেরিয়ে আসে কিন্তু আজ কিসে কি হয়ে গেল তা কেউ বুঝে উঠতে পারলনা।

খানিকটা ফিল্ম নষ্ট হয়ে গেল। আবার নতুন ক'রে তুলতে হবে অংশটা।' কোম্পানীর ইচ্ছা যত কম খরচে পারা যায়। নিরঞ্জন সে বিষয়ে তাঁদের জোড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ফিল্ম খানিকটা না হয় গেল। কিন্তু একি ব্যবহার কেতকীর! হাসি পেল তার কোন কথায়। সর্ব সমক্ষে নিরঞ্জন কেতকীকে ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'হাসলে যে? এখানে কি খেলা পেয়েছ নাকি?'

কেতকী নিজেই অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিল, ধমক খেয়ে মুখ তার অপমানে কালো হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে অভিনেত্রী মহলে বেশ নাম হয়ে উঠেছে কেতকীর। দু'তিনটে কোম্পানী তাদেব ক্যালেণ্ডারে ছাপবার জন্য তার ফটো নিয়ে গেছে। কাগজে কাগজে তার অভিনয়ের, গানের উচ্চ প্রশংসার সঙ্গে বিভিন্ন ভঙ্গির ছবি ছাপা হয়েছে তার। হোটেলে রেঁস্তরায়, ট্রামে বাসে, সর্বত্র আজকাল কেতকীর নামের গুঞ্জরণ শোনা যায়। তার গান শুধু রেকর্ডে নয়, সহরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে। কিন্তু আজ দেখা গেল নিরঞ্জনের কাছে এই প্রতিষ্ঠার ভিত্তি কিছুই নয়, ধূলার স্তূপের মত মুহূর্তে এক ফুঁয়ে সব সে উড়িয়ে দিল।

কেতকী বলল, 'খেলা? আপনারাই বা খেলাটা কম করছেন কই? কি co-actorই দিয়েছেন আমাকে! অমন কাঁদ কাঁদ ভাবে কেঁদনা বললে কার সাধ্য না হেসে থাকতে পারে?'

নিরঞ্জন বলল, 'selection কি তোমার পছন্দ মত হবে? তা হোলে তুমি ডিরেক্‌সন দিতে এলেই তো পারো। আমাদের আর দরকার কি? এরই মধ্যে খুব দম্ভ এসেছে দেখছি যে?

'দম্ভ কারই বা কম? বেশ তো, আমাকেই যদি সবচেয়ে এখন অদরকারী মনে করেন আমি সরে যাচ্ছি।' কেতকী বেড়িয়ে এল ষ্টুডিয়ো থেকে। নিরঞ্জন পিছন থেকে

'শকুন্তলা'র রূপ দিতে যেয়ে শান্তারাম যে দৃশ্যপট ফুটিয়ে তুলেছেন—বর্ত্তমান দৃশ্যটি তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

শাসনের ভঙ্গিতে বলল, 'তেজটা একটু কম দেখালেই ভালো করতে কেতকী, এখনো শোনো।'

কিন্তু কেতকী দাঁড়ালো না। নিরঞ্জন তা'কে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'অচ্ছো বেশ। এ ষ্টুডিয়ো তো ভালো, কোলকাতার কোন ষ্টুডিয়োতে যাতে তুমি না ঢুকতে পারো আমি তার ব্যবস্থা ক'রে ছাড়ব। কালিদাসীকে কেতকী ক'রেছি, আবার কেতকীকে কালিদাসী করতে আমার এক মুহূর্ত্তও সময় লাগবে না।'

ট্যাকসী থেকে দুপুরের সময় কেতকী বাড়ীর দরজায় এসে নামল। আশে পাশের সমস্ত লোক তার দিকে তাকিয়ে আছে। অক্ষি কোটর ছেড়ে চোখগুলি যদি তার বুকে পিঠে এসে লেগে থাকতে পারত, তা হ'লেও যেন কামনা পূর্ণ হোত তাদের। গেটে দারোয়ানটা সেলাম জানালো। কিন্তু কেতকী বেশ জানে লুব্ধ দৃষ্টিতে ওরাও তাকে চেয়ে চেয়ে দেখছে এবং পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছে। নিরঞ্জন বলে, 'এতে ক্ষুব্ধ হবার কি আছে। তোমাকে তো নয়, সৌন্দর্যকে ওরা উপভোগ করে। উপভোগের পদ্ধতি হয়তো একটু ভিন্ন তা আর কি করা যাবে। বক্স্ কি ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকিট কাটবার

সাধ্য তো সকলের নেই। তা ব'লে ফোর্থ ক্লাসের দর্শককে বাদ দিতে পারো না।

কেতকী বলেছিল, 'পরের বেলায় অমন উপদেশ দিতে সবাই পারে। ধর, কোন মেছুনি যদি এসে তোমাকে জড়িয়ে ধরে সহ্য করতে পারো তুমি ?

নিরঞ্জন বলেছিল, 'খুব। কারণ কয়েক মিনিট পূর্বেই মাছ বিক্রি ক'রে দশ টাকার একখানা নোট পায়ের ওপর সে প্রণামী দিয়ে রেখেছে। তার গায়ে এখন পদ্মগন্ধ।

কেতকী গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে এই মুহূর্তে তার মনে হ'তে লাগল—এর চেয়ে সেই জীবনও যেন কেতকীর ভালো ছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পথে দাঁড়িয়ে থাকতে হোত তারপর হয়তো কোন অতিথি ধরা দিত এসে। কিন্তু পথে যাই হোক, ঘরের মধ্যে তার নিজের রাজত্ব। খাজনা অগ্রিম আদায় ক'রে নিয়ে তারপর চলত প্রজা নিপীড়নের পালা। শ্লেষে, ব্যঙ্গে, নির্মম পরিহাসে অতিথিকে অস্থির ক'রে তোলাই ছিল তার আনন্দ। পাশের ঘরের হরিদাসী বলত, 'এমন করলে লোকে আর আসবে না তোর ওখানে।' কেতকী জবাব দিত, 'নিত্য নতুন আসবে। তাছাড়া তুই ওদের কিচ্ছু বুঝতে পারিসনি। ওরা এখানে এসে ওই রকমই চায়। ঘাঁড় কাত করা লক্ষ্মী বউ তো ওরা ঘরেই পায়। দাসী তো ওদের ঘরেই আছে। এখানে আসে ওরা রাণীর খোঁজে। আমরা কেরাণীদের রাণী।'

নিরঞ্জনও যে তার এই চটুল উজ্জ্বল প্রগলভতায় মুগ্ধ হয়েছিল তা কেতকী জানে। তারপর সেখান থেকে তাকে তুলে নিয়ে এলো নিরঞ্জন। পর্দায় ছবি উঠল তার। কত বড়লোকের সঙ্গে তার আলাপ হোল। তার স্তুতি আর প্রশংসায় সহর মুখরিত হয়ে উঠল। সে নিজেই বিস্মিত হোল ভেবে যে এত ঐশ্বর্য ছিল তার মধ্যে। ভিতরের ঐশ্বর্য বাইরে রূপ গ্রহণ ক'রতে লাগল আসবাবে, অলঙ্কারে।

ফ্লাট বাড়ীটার দোতলার তিনটে ঘর কেতকীর নিজের। ভাড়া নিরঞ্জন স্বেচ্ছায় বহন করে। দক্ষিণ কলকাতায় তার বাড়ীর জন্য কামড়া তৈরী হয়ে গেছে। বাড়ী তৈরী হ'তে যতদিন বাকি, ততদিন এখানে তাকে থাকতে হবে। অবশ্য এখানেই যে থাকতে হবে তার কোন মানে নেই। কালই হয়তো নিরঞ্জন এসে বলবে 'চলো, আর এক জায়গায়।' এমনি আরো কয়েকবার বাড়ী বদলানো হয়েছে।

কেতকী একদিন বলেছিল, 'তুমি কি আমাকে কেবল লুকিয়ে লুকিয়ে রাখতে চাও নাকি ? ঘরের বউরাও তো আজকাল এমন পর্দার আড়ালে থাকে না। আর আমার জানলায় পর্দা, দরজায় পর্দা, জীবনের সমস্তটাই দেখছি পর্দাময় হয়ে উঠল।'

'তবু একটু পার্থক্য আছে।' গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে নিরঞ্জন বলেছিল, 'তারা পর্দার আড়ালে, আর তুমি ওপরে। কিন্তু তাদের মত লোক লোচনের আড়ালে তোমাকেও থাকতে হবে, পাছে কেউ দেখে ফেলবে সে ভয়ে নয়, পাছে কেউ না দেখতে চায় সেই আশঙ্কায়। তোমার কায়ার সন্ধান যত কম তারা পাবে, তোমার ছায়ার দিকে ছুটবে তত বেশী। এই যে লুকিয়ে লুকিয়ে আঁধারে আঁধারে তোমাকে ঢুকতে হয়, বেরুতে হয় এ সেইজন্যই। এই যে কড়া পাহারা, বারান্দায় দাঁড়ানো সম্বন্ধে এত বিধি নিষেধ, জানলা দরজায় গাঢ় রঙের পুরু পর্দা, এসব সেই জন্যই। সত্যি সত্যি পর্দা তো ওগুলি নয়, রহস্যের রঙীন আবরণ তোমার চারদিকে ঘিরে রয়েছে।'

কথার মধ্যে রঙ আছে নিরঞ্জনের। সব সময় সব কথা তার বোঝা না গেলেও শুনতে কেতকীর বেশ লাগে

প্রেমসংগীতের একটি দৃশ্যে বামদিক থেকে—জয়রাজ, নীনা প্রভৃতি।
চিত্রখানির পরিবেশনার ভার পেয়েছেন মেসার্স কাপুরচাঁদ লিমিটেড।

কিন্তু নিরঞ্জন কেন বোঝে না এসব কথা কেবল বলবার জন্য, শোনবার জন্য, দৈনন্দিন জীবনে মানতে গেলে তার রঙ ঝরে যায়।

কিন্তু এই শেষ। নিরঞ্জন ভেবেছে তাকে ছাড়া কেতকীর চলবে না। কন্তু কেতকীও এবার দেখে নেবে নিরঞ্জনকে। ও বইতে সে আর নামবে না। যাঁকে দিয়ে ও বই করাতে পারে সে করাক। নিরঞ্জনের সঙ্গে সম্পর্ক এতে নির্মূল হবে, বাড়ীটা কনট্রাকটারের খসড়াতেই অবশ্য থেকে যাবে; তা যাক, আরো অনেক নিরঞ্জন তার জন্য, অপেক্ষা করছে, আরো অনেক বাড়ী, এবার কেতকী দেখবে, তার নিজের কোন মূল্য অছে কি না, লোকে কাকে চায় তাকে না নিরঞ্জনকে।

ঝি কুমুদিনীকে কেতকী বলে দিল, 'খবরদার, আজ কড়া নাড়লে মোটেই নড়বি না, দোর খুলে দিবি না কাউকে, আমার শরীর আজ ভালো নেই।'

খেয়ে দেয়ে ঘুমাবার পর শরীরটা অপেক্ষাকৃত ভালো হোল কেতকীর, মেজাজটা শান্ত হয়ে এল। মনে হোল অমন চট্ করে না চ'লে আসাই উচিত ছিল। ঝানু পরিচালক নিরঞ্জন ইচ্ছামত বই এর প্লট সে বদলে নেবে। হয়তো বিরহ আর কলেরা এক সঙ্গে মিশিয়ে নায়িকাকে

ফেলবে মেরে। তার পর নিয়ে আসবে অন্য নায়িকা অন্য অভিনেত্রী মাঝখান থেকে কেতকীর টাকাটা মারা যাবে! অন্য কোম্পানী, অন্য পরিচালকও সহজে তাকে বিশ্বাস করবে না। বিকালের দিকে কেতকী অভ্যাস মত তার সান্ধ্য প্রসাধন সারল, অন্য দিনের চেয়ে প্রসাধনটা আরো বরং কিছু তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল কড়া ন'ড়ে উঠল না কেতকীর দরজায়। বীরেশ্বরেরই বা কি হোল আজ সেও তো আসতে পারত, কাল রাত্রে অত কীর্তি অত কাণ্ড করে গেল সে, আর আজ তার টিকি দেখবার জো নেই। একটু কড়া বলেছে তো কি হয়েছে। অতখানি অভিমান করবার কি আছে সে জন্য, ছেলেটির সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। অল্প মদে মাতলামী করবে বেশী, অভিনয়ে হাত পা নাড়বে বেশী. মুখ ভার করবে, গলা ভারি করবে বেশী; আর তা দেখে কেতকীর যদি সামান্য একটু হাসি পায় তা হ'লেই সমস্ত মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল।

মরুকগে বীরেশ্বর, নিরঞ্জনের কি হোল। দোষ কি নিরঞ্জনই বেশী করেনি—অপমানের চূড়ান্ত করে ছাড়ে নি কেতকীকে? তবু নিরঞ্জনের রাগটাই সব চেয়ে বড় হয়ে উঠল? সারাটা দিনের মধ্যে এতখানি রাতের মধ্যে এক বার সে এমুখো হতে পারলো না? আচ্ছা বেশ না যদি পারে তো বয়ে যাবে কেতকীর। ভালোই হোল নিজের মূল্য কেতকী এবার যাচাই করে নেবে।

কিন্তু খানিক বাদেই বাড়ীর দোরে মোটরের শব্দ হোল। সিঁড়িতে জুতার শব্দ। তার পরেই দরজার কড়া নড়ে উঠল। কুমদিনী এসে দোর খুলে দিল। নিরঞ্জন ঢুকল ঘরে।

নিরঞ্জন এসেছে। কেতকী জানে না এসে সে পারবে না। যত বড় পরিচালকই নিরঞ্জন হোক কেতকীকে বাদ দিয়ে এ বই তার করাবার উপায় নেই। মাঝখানে

প্রতিমা দাশগুপ্তা 'নমস্তে' চিত্রে।

কলেরায় কেতকীকে মেরে ফেললে বই ও তার মার খাবে কিন্তু সহজে নিরঞ্জনের কাছে আজ ধরা দিলে চলবে না। অপমানের প্রতিশোধ পূর্ণমাত্রায় আজ কেতকীকে তুলে নিতে হবে।

কিন্তু আশ্চর্য নিরঞ্জনের দক্ষতা। কিছুই যেন হয়নি। অতি স্বাভাবিক ভাবে এসে খাটের উপর গিয়ে বসল কেতকীর। কেতকী অবশ্য উঠে গেল তৎক্ষণাৎ। নিরঞ্জন একবার সেদিকে চেয়ে মৃদু হেসে চা আর খাবার করতে পাঠিয়ে দিলে কুমুদিনীকে।

'শরীর কি খুব খারাপ বোধ করছ কেতকী?

কেতকী অবশ্য কোন জবাব দিল না, জানালার পর্দা সে তুলে দিয়েছে। বাইরে তমসাবৃত রহস্যময়ী কলকাতা।

নিরঞ্জন ধীরে ধীরে বালিসের তলা থেকে চাবি বের করে নিজেই গিয়ে আলমারী খুলল। রঙীন কাঁচের পাল্লা সরিয়ে চ্যাপ্টা বোতলটা নীরবে কেতকী টেবিলের

উপর বার করে রাখল। নিরঞ্জন গ্লাস দু'টো রাখল তার পাশে।

কিন্তু জানালার কাছে ইজি চেয়ারটা টেনে নিয়ে সমস্ত শরীরটা তার মধ্যে শিথিল ভঙ্গিতে এলিয়ে দিয়েছে কেতকী। সে আর কোন দিন উঠবে না।

কেতকীর খাটে বসে নিরঞ্জন নিজের মনে হাসছে। অবশ্য বসে থাকলে আর হাসলে বেশীক্ষণ চলবে না। এখনি উঠে যেতে হবে কেতকীর পাশে। আরম্ভ করতে হবে মানভঞ্জনের পালা। এখানকার বিরোধ মিটিয়ে যেতে হবে মালিকের বাড়ী, কি সব কথা আছে তাঁর। সেখান থেকে আরো দু'তিন জন অভিনেতার বাড়ী ঘুরতে হবে। সব আর্টিষ্ট মানুষ। খেয়ালী তাঁদের চালচলন। বলে পাঠালেই হোল, কালকের স্যুটিংএ থাকতে পারব না। তা হ'লেই হয়েছে আর কি। সব আয়োজন পণ্ড। অল্প টাকা নিয়ে এসব কাজে নামবার বিপদই এই। অতএব নিরঞ্জন উঠে এল। নিজেই আর একটা সোফ্যা টেনে নিয়ে এসে বসল কেতকীর পাশে। তারপর কেতকীর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, 'সত্যি, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে আমার। বুঝতেইতো পারো, নানা ঝামেলায় মেজাজ সব সময় ঠিক থাকে না।' কেতকী হাতখানা সরিয়ে নিয়ে বলল, 'থাক আমাকে দিয়ে আপনার কাজ যখন চলবে না ছেড়ে দিন আমাকে।'

নিরঞ্জন কেতকীর পিঠে হাত বুলাবার ভঙ্গিতে বলল, পাগোল।'

ইদানীং কাজকর্ম নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়েছে নিরঞ্জনকে। মান অভিমানের সময় ছিল না। অবসর ছিলনা কেতকীর দিকে তাকাবার। তা ছাড়া আরো চার পাঁচটী নতুন অভিনেত্রীকে সম্প্রতি গড়ে তোলবার ভার এসে পড়েছিল তার উপর। অবসর বিনোদনটা তাদের ওখানেই চলে। নিজের ছবি যতক্ষণ নিরঞ্জন গড়ে তোলে ততক্ষণই তার ওপর তার আকর্ষণ, তার আনন্দ। কিন্তু released হয়ে যাওয়ার পর নিরঞ্জনের নিজের আর কোন মোহ থাকে না তার উপর। এই সব অভিনেত্রীর সম্বন্ধেও তাই। নতুনত্বের স্বাদ দু'চার দিন মাত্র তীক্ষ্ণ থাকে তার পরই সব ভেঁাতা হয়ে যায়।

কিন্তু ঘরের এই নরম নীলাভ আলোয় ওই শিথিল এলায়িত দেহ ভঙ্গিতে কেতকীকে যেন সম্পূর্ণ অন্য রকম মনে হচ্ছে আজ। একটা অস্পষ্ট রহস্যের আভাস যেন চারদিকে সত্যিই ওর ঘিরে রয়েছে।

নিরঞ্জন আরো কাছে ঘেঁষে এলো। হাত দুখানা আর একবার তুলে নিল কেতকীর, 'পাগোল' তুমি ছাড়া ও পার্ট করবে কে?' কিন্তু ওসব থাক, আমার ডিরেকসন আর নয়, এবার তুমি আরম্ভ কর।'

বিস্মিত হয়ে কেতকী বলল, 'আমি আবার কি আরম্ভ করব?'

নিরঞ্জন মৃদু হেসে বলল, 'ডিরেক্সন। আমার ডিরেকসনে তুমি আর এখন চলবে না, এবার তোমার ডিরেক্সনের পালা। সম্বন্ধটা একদম উল্টে গেছে।'

কথাটা যে নিরঞ্জনের মিথ্যা বিনয় মাত্র নয়, তা কেতকী জানে। আর জানে বলেই এমন দূরে এসে বসতে পেরেছে। এই একমাত্র সময়, যখন এই সব প্রবীণ পরিচালকদেরও কেতকী অঙ্গুলি নির্দেশে যে কোন দিকে চালিয়ে নিতে পারে যে কোন কিছু আদায় ক'রে নিতে পারে খুসি মত। এই একমাত্র সময় যখন আর কারো লেখা পার্ট তাকে মুখস্ত বলতে হয় না, নিজের কথা সে নিজেই বানিয়ে নিতে পারে। কিন্তু এই মাহেন্দ্র মুহূর্তটির প্রতীক্ষা ক'রতে হবে ধৈর্য ধরে। চঞ্চল হ'লে চলবে না। পাশুপত অস্ত্র হানতে হবে যথাসময়ে। 'শুভস্য শীঘ্রম' এ ক্ষেত্রে অচল! গোপনে একবার নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে নিল কেতকী। তার রক্তাভ চোখে যে মাদকতার

বিভিন্ন রূপসজ্জায় নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী

—শারদীয়া রূপ-মঞ্চ —

কিশোরী চিত্রাভিনেত্রী

শার্লি টেম্পল

শ্রীমতী মেহতাব কারদার প্রডাকসন্সের 'কানুন'-এ একটি বিশিষ্ট ভংগিমায়। চিত্রখানি কলিকাতা ফিল্ম এক্সচেঞ্জের পরিবেশনায় মুক্তিলাভ করবে।

আভাস দেখা যাচ্ছে, তা যে শুধু মদের নয় কেতকী তা বুঝতে পারছে। কিন্তু অত সহজে ছেড়ে দিলে চলবে না, নিজের কামনার উত্তাপে নিজেই নিরঞ্জন ছটফট ক'রতে থাকুক, আহুতি পড়তে থাকুক একের পর একে। সকাল বেলায় সর্বসমক্ষে যে অপমান নিরঞ্জন তাকে ক'রেছে তার ক্ষতিপূরণের এই একমাত্র সময়।

কেতকী কথা বলল না, চোখ ফিরিয়ে আবার বাইরের দিকে তাকাল।

সহজে যে হবে না, তা নিরঞ্জন আগেই জানে, প্রায়শ্চিত্ত বাবদ কিছু খসবেই, তারজন্য সে প্রস্তুত হয়েই এসেছে।

ব্যাগ থেকে একশ টাকার একখানা নোট নিরঞ্জন বার করল। কেতকী একবার বাঁকা চোখে সেদিকে তাকিয়ে অলক্ষিতে হাসল, কেবল সুরু।

উঠে গিয়ে নোটখানা টেবিলের উপর রেখে রঙীন কাগজ চাপাটা তার ওপর তুলে দিল নিরঞ্জন। তারপর ছোট্ট গেলাসটায় মদ ঢেলে সোডা মিশিয়ে সেটা হাতে ক'রে নিয়ে এসে কেতকীর সামনে হাঁটুগেড়ে বসল, বলল, অধরের রস এতে না মেশালে, শুধু মদে আমার

নেশা হয় না, তুমি তো জানো।' হাসি চেপে কেতকী বলল, 'রঙ তামাসা রাখো, আমার শরীর ভালো না।'

'রঙ লাগাও তা হোলেই ভালো লাগবে।'

চটুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে কেতকী বলল, 'বারে, মানুষের শরীর কি কোনদিন খারাপ হয় না?

নিরঞ্জন বলল, 'তা অবশ্য হয়।' একটু ইতস্ততঃ করল নিরঞ্জন। মানুষের লোভ দেখতে দেখতে কি ভাবেই না বেড়ে উঠে। এমন দিন গেছে যখন বাদাম তলার ঘরে দশ টাকার একটা নোট ফেলে দিলে কেতকী না করতে পারত এমন জিনিস নেই। আর আজকাল একশ টাকার নোটেও তার শরীর খারাপই থাকে। একটু বাজে খরচ অবশ্য হবে কিন্তু উপায় কি। কি একটু ভেবে আঙুল থেকে আংটিটা খুলে নিরঞ্জন কেতকীর আঙুলে পরিয়ে দিল।

কেতকী বলল, 'এসব তোমার কাছে কে চাইছে?'

নিরঞ্জন বলল, 'আমার কাছে কে আবার কি চাইবে, আমি চাইছি তোমার কাছে।'

তারপর গেলাসটায় নিজে এক চুমুক দিয়ে সেটা তুলে কেতকীর মুখের কাছে তুলে ধরল নিরঞ্জন তার পরবর্তী চুমুকে গেলাসটা নিঃশেষ ক'রে পানপাত্রের মত এবার নিজের মুখখানাকে তুলে ধরল কেতকী নিরঞ্জনের সামনে।

গেলাসটা নামিয়ে রেখে নিরঞ্জন এক মুহূর্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তারপর বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে, ভঙ্গিটুকুর কথা মনে থাকে যেন কেতকী, পরশু দিনের স্যুটিংএ ঠিক এমন একটি ভঙ্গিরই দরকার হবে।'

'ওকি, চমকালে কেন?' পরমুহূর্তে নিরঞ্জন কেতকীকে বুকে টেনে নিল।

আবার সেই স্যুটিং, সেই ডিরেক্সন। আবার সেই পুনরাবৃত্তি। লুকিয়ে লুকিয়ে এখানে এসে কেতকীর পায়ের তলায় হাঁটুগেড়ে বসায় একটুও অসম্মান নেই নিরঞ্জনের, কারণ কাল ভোরেই সর্বসমক্ষে কেতকীকে পায়ের তলায় নিপীড়িত করবার সর্ত আজ রাত্রে সে পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত ক'রে নিল। আর এই হোল কেতকীর প্রতিশোধের নমুনা, এইটুকু মাত্র ক্ষমতা কেতকীর একখানা নোট, একটা আংটি।

কেতকী কোন জবাব দিল না। দু'চোখ বেয়ে তার জল গড়িয়ে পড়ছে।

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে কেতকীর সিক্ত চোখের কোলে কয়েকবার চুম্বন করল নিরঞ্জন। মেয়েদের চোখের জলের স্বাদও মন্দ নয়, বেশ একটু নোন্‌তা নোন্‌তা।
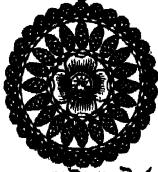
চিত্রাঙ্গদা

(গল্প)

সন্তোষ কুমার ঘোষ

বাইরে যাবার সময় চম্পা শিকল তুলে দিয়ে যায়। ফরাসটার ওপর হারমোনিয়মটা রেখে বলে,—পালিয়োনা কিন্তু লক্ষীটি,—আমি এই এখুনি এলাম বলে। তুমি ততোক্ষণ একটু সারেগামা করো বসে বসে।

কার্তবীর্যের লালচে দাড়িতে হাসির একটু মিষ্টি আমেজ লাগে। লুঙ্গিটার প্রান্ত দিয়ে গোফের চা টুকু মুছে নেয়। মৃদু মৃদু মাথা নাড়ে।

সেই মাথা নাড়াটা স্বীকৃতি কি অস্বীকৃতির, চম্পা ভালো বোঝে না। ভয়ে ভয়ে শিকল তুলে দিয়ে যায়।

রান্না ঘরে বসে বসে চম্পা ডালে কাঁটা দেয় বটে, বাটনাও বাটে, কিন্তু বুকের ভেতরটা ওর যেন সর্বদাই ধড়াস ধড়াস করছে। শিকল দিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু কী জানি, যা পালোয়ান লোকটা, যদি দরজাটা ভেঙেই বেরিয়ে পড়ে? ভাবে চম্পা আর ঘামে। ঘামে ঘামে আর আঁচের ধোঁয়ায় চোখের জলে যখন একাকার হয়, চম্পা তখন হলুদ-লাগা আঁচলটা দিয়ে মুখটা মুছে নেয়; কড়ে আঙুলের চোখা নখে ভ্রুবিন্যাস করে। তারপর উঠে গিয়ে উঁকি দিয়ে আসে একবার।

ভেতর থেকে কার্তবীর্যের গানের আওয়াজ আসে এতক্ষণে। এতক্ষণ বসে বসে লোকটা করছিল কী। কী উপায়ে শিকল খুলে বেরোনো যায় তার ফন্দী আঁটছিল নাকি। কার্তবীর্য গান ধরেছে, পরিচিত হিন্দী গান। গলা-ভাঙা হারমোনিয়মটার ভেতর থেকে ফ্যাসফেসে একটা আওয়াজ বেরুচ্ছে, জলে-ভেজা একটা বেড়াল গোঙাচ্ছে যেন।

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ে চম্পার; বাঁচা গেল। একবার যখন গান ধরেছে কার্তবীর্য তখন কম-সে-কম দেড় ঘণ্টা কি দু' ঘণ্টার ধাক্কা। কার্তবীর্য আধুনিক সিনেমার নিউরটিক গান তো গায় না যে গোনা গুণতি পাঁচ মিনিটে শেষ হবে? কার্তবীর্যের গান একটু উচ্চাঙ্গের। লোকটা খালি পালোয়ান নয় কালোয়াতও। লক্ষ্ণৌ-না-বেনারসে কোন এক বাঈজির রক্ষিত হয়েছিল কিছুকাল; বাঈজি ওকে হাতে ধরে শিখিয়েছে। গানের কথা কিছু চম্পা বুঝতে পারে না, সুরটাও তেমন কাণের খোসামুদে নয়, কিন্তু কার্তবীর্যের গলাটা ভারি মিঠে লাগে মুখে হাসি ফোটাতে গিয়ে চোখে জল এসে পড়ে চম্পার। এমনি মিঠে গলা তাদের গাঁয়ে ছিল একজন বড় কীর্তনিয়ার। তার মুখে মাথুরের গান শুনতে গিয়ে ছোট বেলায় কতোদিন কান্নায় ওর বুক ভেসে গিয়েছে।

চোখ মুছে চম্পা ফের রান্নাঘরে গিয়ে বসলো।

মায়া ব্যানার্জি

এ যুগের সর্বজন সম্বর্ধিত প্রযোজকদের
সৌজন্যে বর্ষের শ্রেষ্ঠতম অবদান

মাংসের পুর দিয়ে তৈরি করলে গরম গরম সিঙারা; রুটি তৈরি করার কথা ছিল; মনের খুশিতে চম্পা লুচি বেলে ফেললে।

ঝনাৎ করে শিকল খোলার শব্দ হ'ল। এক প্লেট লুচি সিঙারা আর চা নিয়ে ঘরে ঢুকলে চম্পা। চা ভিজিয়ে রাখার অবসরে চম্পা এরই মধ্যে কখন যেন হলুদ-লাগা শাড়িটা পালটে এসেছে, শুধু সেমিজের বদলে প্রজাপতি-কারু করা একটা ব্লাউজও উঠেছে গায়ে। ঘামে চপচপে মুখখানা বদলে একটা প্রসাধন-চকচকে মুখ দেখা দিয়েছে।

ওকে ঢুকতে দেখেই কার্তবীর্য গান থামিয়ে দিলে। হারমোনিয়মটা ঠেলে দিয়ে ইশারায় ওকে বসতে বললে।—চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়ে বললে, বাঃ খাসা হয়েছে, সিঙারায় একটা কামড় বসিয়ে বললে,—সাবাস, তোমার হাতের তারিফ করি চম্পা বিবি। তামাম হিন্দুস্থান ঢুঁড়েও এমন তোফা চা পাইনি।

বুকের ভেতর টিপ টিপ করে চম্পার; আনন্দের আতিশয্যে তলপেটে একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রনা হয়। কাছে ঘেঁষে এসে কার্তবীর্যের কাঁধের ওপর নরম গাল রেখে টেরচা চোখে চায়। বলে,—মাইরি।

ওর গালে টোকা দিয়ে কার্তবীর্য বলে,—মাইরি নয় তো কি আমি ঝুট্ বলছি?

চা খাওয়া শেষ হতে হতে আকাশ ভেঙে ঝমাঝম বৃষ্টি নামে, ছাদ-চোয়ানো জলে ফরাসটার একধার ভিজে ওঠে। কার্তবীর্যের আদর খেতে খেতে চম্পা বলে,—আজ আর কোথাও বেরিয়ো না লক্ষ্মিটি, এই বাদলা আবহাওয়ায়। আজ চুপটি করে ঘরে বসে থাকো, গান শোনাও। আমি তোমাকে খিচুড়ী রেঁধে খাওয়াবো—খুব ভালো করে গরম গরম।

হঠাৎ কেমন ভালো মানুষের মতো কার্তবীর্য রাজি হয়ে যায়; চম্পাকে ঠেলে দিয়ে হারমোনিয়মটা কাছে টেনে নেয়। বলে,—তোমাকে তা হলে নাচতে হবে কিন্তু।

মাথা দুলিয়ে চম্পা সলজ্জ অস্বীকার করে।—আমি কি নাচতে জানি। ওসব ছেড়ে দিয়েছি অনেক কাল।

হারমোনিয়মের চাবি টিপতে টিপতে কী যে দুষ্টুর মতো কার্তবীর্য হাসে! বলে,—আমি শিখিয়ে নেবো।

শিখিয়ে নেবে? অবাক লেগে চম্পা চোখ দুটোকে বড়ো করে ফেলে। কার্তবীর্য কি নাচতেও জানে নাকি! লোকটার অজানা কিছু নেই। তামাম হিন্দুস্থান ঢুঁড়ে সকল বিদ্যা আহরণ ক'রে এনেছে: একবার নাকি

যমুনা দেবী অভিনয়-প্রতিভায় যার স্থান কারো চেয়ে কম নয়।

জীবনের প্রথম প্রেম বড় মধুর।

কিন্তু সে স্বপ্নের সৌধ যখন ভেঙ্গে যায়, তখনই আসে চরম পরীক্ষার মুহূর্ত!...... ....
এমনি একটি ভাগ্যাহত গৃহবধূর বেদনা বিক্ষুব্ধ জীবন-রহস্যের বিচিত্র ব্যঞ্জনায় মূর্ত সর্বরস পুষ্ট অভিনব সমাজ চিত্র!..........................

দেবর দেবর দেবর দেবর

মানুষের মাঝে বাস করে যে দেবতা ও দানব, নানা সংঘাতের মাঝে তাদেরই জীবনের বিচিত্র ব্যঞ্জনা, কত সুন্দর ও কত বীভৎস হয়ে প্রকাশ করে তাদের গোপন সত্তাকে, ইন্দ্রপুরীর বর্তমান চিত্রে সেই রহস্যের পরিচয় পাবেন।..........................

সুর দিয়েছেন : সুবল দাশগুপ্ত

গান লিখেছেন : প্রণব রায়

ভূমিকায় : ইন্দিরা, রমা, ইন্দু, আশু বসু, সুনীল, বেচু, শ্যাম লাহা এবং আরো অনেকে।

চিত্রায় শুভ মুক্তি আসন্ন

পরিবেশক : রায়সাহেব চন্দনমল ইন্দ্রকুমার : ৩নং সিনাগগ ষ্ট্রীট

সমাজের বিচারে না হ'তে পারে—নীরেন লাহিড়ীর বিচারে এরা দম্পতি বলেই রায় পেয়েছেন।

তিব্বতের ওপারেও পাড়ি দিয়েছিল। ভাষা জানে ছত্রিশ রকম; জানে মণিপুরি মেয়েদের বিনুনি বাঁধবার ভঙ্গি, কাশ্মীরী খাবার মশলার উপাদান, ত্রিবেন্দ্রামের বাদশার হারেমের খবর,—লোকটা না জানে কী। এত জানে যে, এত অপরূপ অদ্ভুত সব জ্ঞানে যার মাথা ঠাসা, তাকে চম্পা ভোলাবে কী দিয়ে! এই কালো চেহারায় পুঁজি নিয়ে আর টেরচা চোখের চাউনি নিয়ে চম্পা অনেক কেরাণি আর দোকানদার বাঙালী বাবুদের ঢিট করেছিল বটে, কিন্তু কার্তবীর্যের কাছে সে 'সব প্রয়োগ করতে যাওয়া ছেলেমানুষি, সব অস্ত্রই মনে হয় ভোঁতা।

কার্তবীর্যের গোঁফে ঢাকা—বাঁকা ঠোঁটে রয়েছে রাজপুতনার মরু-হাসির ঝিলিক, ওর লালচে দাড়িতে আছে মেওয়া ওয়ালার রুক্ষ পার্বত্যতা; কটা চোখের ঘোলাটে চাউনিতে ভারতের সীমান্ত পেরিয়ে কোন্ মেসোপটেমিয়ার আকাশের প্রতিচ্ছবি উঁকি দিচ্ছে। তাকে চম্পা বাঁধবে কোন বাঁধনে।

তাই নিশুতি রাতেও কার্তবীর্যের পেশল রোমশ দেহটাকে বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনে বেঁধেও চম্পার স্বস্তি নেই; আনন্দের সুরাপাত্রে যখন ফেণা উপছে উঠে, তখনও তার তলানির কটু তিক্ত ঝাঁঝের কথাটা উঠে আসে মনের তল থেকে। পেঁজাতুলোর নরম বিছানা কাঁটাছাওয়া মনে হয়। উঠে এসে ঢক ঢক করে এক কুজো জল খেয়ে তবে একটু ঠাণ্ডা হয় চম্পা। যেদিন একটু বাড়াবাড়ি হয় সেদিন চম্পা দুপুর রাতেই গা ধুয়ে আসে।

অকস্মাৎ একদিন দেখা গেল, কার্তবীর্য জেণ্টলম্যান হয়েছে। খোল নলচে দুই-ই বদলে গেছে। লম্বা লম্বা চুলগুলো এতকালে কপালের দুপাশে কাণ বেয়ে গড়িয়ে

পড়তো,—সেগুলো সহসা বীপরীতগামী হয়েছে; লাইম-জুসে চিক্ চিক্ করছে। এতকাল ছিলো সালোয়ার আর সোয়ায়ানি, সেখানে এসেছে ফুরফুরে আদ্দির পাঞ্জাবি (গিলে করা আস্তিন) কাঁচানো ধুতি, (বহর পঞ্চাশ ইঞ্চি)। পকেটের রুমালটায় সর্বদাই আতরের সদাব্রত। কামানো গাল দু'টি স্নোর প্রভায় তৈলাক্ত।

কার্তবীর্যের চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে চম্পা ওর মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চুলগুলো আঁচড়ে দেয়; পাউডার মাখিয়ে গাল দুটো টিপে দিয়ে বলে,—

হাতে দিলেম ম্যাকু
একবার ভ্যা করোতো বাপু।

ঠিক জামাই বাবুটির মতো দেখাচ্ছে।

কার্তবীর্য শূন্য চোখে হাসে। যেন সে বিশ্বাস করছে না। চম্পা চটে গিয়ে বলে,—আমার সাজানো, পছন্দো হচ্ছে না? আর্শিটায় একবার মুখখানা দেখনা বাপুঃ! একেবারে আলাদা মানুষ।

আলাদা মানুষই বটে। নিতান্ত সুবোধ বালকের মত কোঁচানো ধুতি পাঞ্জাবিতে ছ'ফুট লম্বা শরীরটা নিয়ে কার্তবীর্য যখন উঠে দাঁড়ায়, তখন মনে হয় ঠিক যেন আদর্শ তৈলরসে স্নিগ্ধতনু বাঙালী সন্তান। কে বলবে, এই লোকটাই একদিন ইস্কুলের পড়া পড়তে পড়তে পণ্ডিতের টিকি কেটে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছিল; পায়ে হেঁটে গিয়েছিল কন্যাকুমারীতে। হরিদ্বারের মেলায় পকেট কাটার সাজা স্বরূপ ছ'মাস ঘুরিয়ে ছিল ঘানি? আবার সি-পিয়ান কোন প্রিন্সের দরবারে মোসায়েবি করে ইনাম পেয়েছিল দেড় শ আশ্রফি? এমন কি ছোট নাগপুরের জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে ওর কনুইয়ে লেগেছিল বাঘের থাবা, তার দাগ আজও গভীর হয়ে আছে; সেই দাগটাও গিলেকরা আস্তিনের নিচে কেমন বেমালুম চাপা পড়ে যায়। এ যেন এক আলাদা কার্তবীর্য, চিড়িয়াখানার পোষমানা জানোয়ারের মত আপন খাচায় ঘেরা টোপে আটক; মেহনৎ নেই, কসরৎ নেই, হাতের কাছে তুলে ধরা খাবার খাচ্ছে, টপাটপ মুখের কাছে তুলে ধরা ঠোঁটে অনায়াস অভ্যাসে খাচ্ছে চুমো।

এটা একটা মস্ত গর্ব চম্পার; কার্তবীর্যকে সে পোষ মানিয়েছে। আফ্রিকার সিংহকে পুরেছে প্রণয়ের পিঞ্জরে। পাশের বাড়ির মালিনী বলে,—কাজকম্মো কি একেবারে ছেড়ে দিলি চম্পা,—একেবারে? হীরের বাবু সেদিন তোর কতো সুখ্যাতি করছিল; হীরের বাবুকে জানিস তো। চার আনা রেট থেকে চোদ্দটাকা অবধি কলকাতা শহরে কোন বাড়িই ওর বাদ নেই। সে দিন বলেছে,—চম্পার মর্ত্ত ফূর্তি কারুর কাছে পায় নি।

এসব কথা শুনে এককালে চম্পার মুখে হাসি দেখা দিতো, আত্মপ্রসাদের রেখা ফুটতো চিবুকে আর টোল খাওয়া গালে; কিন্তু এখন তার ওসব অসহ্য লাগে। ওর অপ্সরী জীবনের ইতি হয়ে গেছে। রূপের জাল ফেলে

শ্রীমতী যমুনা

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর দেবারে দেখা যাবে।
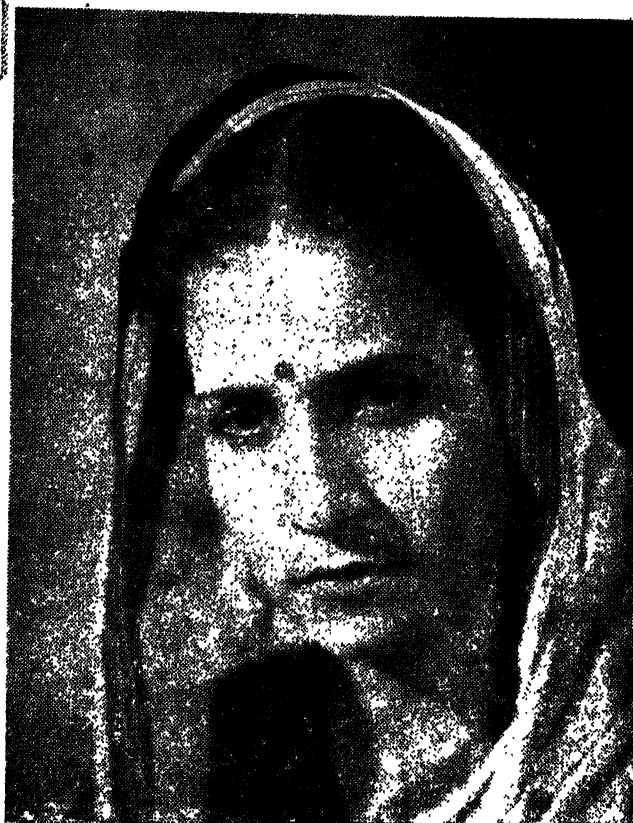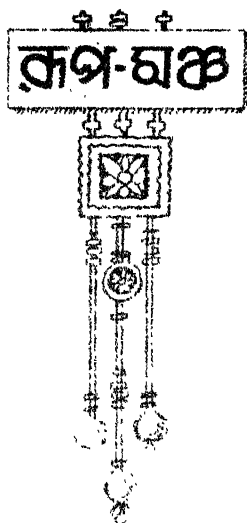
ROSCO'S
PERFUMED
OR OIL
রস্কো
সুরভিত
ক্যাষ্টর অয়েল
ফ্রাঙ্ক রস এণ্ড কোং লিঃ - কলিকাতা

রূপেয়ার মাংস শিকারে তার অরুচি এসেছে। চম্পা আর প্রতি রাতে নতুন নতুন অলজ্জিত বাসর শয্যাতে বধূবেশে কিঙ্কিনী বাজিয়ে যাচ্ছে না।

আর বাস্তবিক, কার্তবীর্যকে সে তো তার রূপের নাগপাশেই বাঁধেনি। সে তো খালি কার্তবীর্যের প্রেয়সীই নয়, স্নেহে জননী, শুশ্রূষায় ভগিনীও যে। মায়ের মত শঙ্কিত আঁখিপল্লব মেলে সে চেয়ে রয়েছে কার্তবীর্যের দিকে সোৎসুক উৎকণ্ঠায়। তার প্রতি খেয়াল মেটাচ্ছে, মুছিয়ে দিচ্ছে শ্রমের সব ক্লান্তি। কার্তবীর্যের প্রণয়ের জারক রসে ওর নারীত্ব আবার নতুন করে জারিত হয়ে উঠেছে।

তাই দেখা যায় চম্পার আজকাল বেশভূষার দিকে নজর নেই। আধময়লা শাড়িটাই পরে আছে তো পরেই আছে। শেমিজটা পর্যন্ত নেই,—শরীরের ওপর অবিশ্রান্ত তাচ্ছিল্য, জর্জেট ভয়েল তোরঙে উঠলো,—লালপেড়ে শাড়িটাই হ'যে উঠলো আট পৌরে, দু'বেলা গা ধোয়ার ঘটাও আর নেই; নেই সূর্যাস্তের আলোয় জানালায় আর্শি রেখে সযত্নে কবরী বিন্যাস। ভুরুযুগলে পেন্সিলের রেখা টেনে অনেক দিন সে ধনুকে জ্যা আরোপন করে নি। আসলে চম্পার এখন স্থির বিশ্বাস হয়েছে, এসবের আর প্রয়োজন নেই। কার্তবীর্যকে এই সব ইতর ছলাকলা ছাড়াও বশে রাখা যাবে। চম্পা ত শুধু প্রিয়া নয়, চম্পা যে মাও।

কার্তবীর্যের কাছে সে যে আত্মসমর্পন করছে তার মধ্যেও যেন শিরা উপশিরার স্পন্দন নেই। নিবিড়তম অশ্লেষের সুখ দিয়ে কার্তবীর্যের চুল গুলোর মধ্যে হাত বুলিয়ে দেয়, মা যেন ছেলের হাতের মোয়া তুলে দিয়ে কান্না থামাচ্ছে, এমনি ভাবে। ব্লাউজের খোলা বোতামগুলোর ফাঁকে ফাঁকে সুপরিপুষ্ট স্তন দুটি দেখা যায়, স্তনের ওপর

'নমস্তের' নায়ক ওয়াস্তি

কয়েকটি নীল শিরার দাগ, কার্তবীর্য সে দিকে চেয়ে থাকে মোহিত দৃষ্টিতে, কিন্তু চম্পা লজ্জিত হয়ে আঁচলটা টেনে দেয় না নববধূর মতো কম্পিত ব্রীড়াভরে। চম্পার আর কোন দৈহিক অনুভূতি নেই। সে যেন তার প্রণয়াস্পদকে নিয়ে এক অশরীরী রাজ্যে বাসা বেঁধেছে।

কার্তবীর্য মাঝে মাঝে ধমকে দেয়। বলে, তুমি জংলি হচ্ছ চম্পা; নখগুলো পর্যন্ত কাটোনি। আমার বুকটায় আঁচড় লাগলো।

ছিটকে চম্পা বিছানার উপর উঠে বসে; কার্তবীর্য ওকে ঠেলে দিয়েছে সেই আপশোষে নয়, ওর নখে দয়িতের বুকে আঁচড় লেগেছে সেই লজ্জায় কান্না আসে। তাড়াতাড়ি আয়োডিনের শিশিটা এনে কার্ত্তবীর্যের বুকে লাগিয়ে দেয়। হোমিওপ্যাথির বইটা খুলে দেখে নখের আঁচড়ে সেপ্‌টিক হবার কোন আশঙ্কা আছে কি না, তারপর কার্তবীর্যের দাড়ি কামানো সেট থেকে পুরানো ব্লেড নিয়ে হাতের নখ কাটতে বসে।

সর্বক্ষণই কার্তবীর্য অসন্তুষ্ট। অতি নোংরা, অতি নোংরা তুমি চম্পা। গা ধোওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছ; ঘামের গন্ধে বমি আসে।

কিম্বা—

চুলগুলোকে কী করে রেখেছ বলো দিকি। উকুনের বাসা, তেল পড়েনি কোন জন্মে। যাও, দূর হয়ে যাও আমার সমুখ থেকে, আর লজ্জায়, ভয়ে কাঠ হয়ে চম্পা থর থর করে কাঁপে।

সারাদিন কার্তবীর্যের আজ কাল বাইরে বাইরে কাটে। কী করে, কে জানে; বলে, ম্যাজিক দেখিয়ে পয়সা পাই। কিন্তু চম্পা বিশ্বাস করে না। কেন না কার্তবীর্যের পয়সা কই পকেটে ও দুটো যে বরাবরের মতো শু মরুভূমির মতো ধু ধু করছে।

অনেক রাতে আজকাল কার্তবীর্য বাড়ি ফেরে। ভা বেড়ে নিয়ে চম্পা রান্নাঘরের চৌকাঠ ধরে বসে থাকে ঘন ঘন জানালার কাছে এসে তাকায়। হরি স্যাক দোকানের কপাট বন্ধ করছে; রাস্তার ভিড় ফিকে হ এলো। একটা লোক গলির সব আলো নিবিয়ে দিচে একটার পর একটা করে। রাস্তায় এখন শুধু চল রিক্সায় ক্রুদ্ধ মাতালের প্রলাপ। মালিনীর ঘরের হ্ল থেমে এলো। সোনা বুঝি তখনও চেঁচাচ্ছে ভাঙা গলায় যশোদার বাবু কোঁচায় পা জড়িয়ে পড়তে পড়তে লাই পোষ্টটা ধরে টাল সামলে নিলে, আর ছায়াছবির মতে একে একে চম্পার চোখের সমুখে অভিনীত হয়ে যায়।

কার্তবীর্য তবুও আসে না।

বুক দুরদুর করে চম্পার, চোখের কূল ছাপিয়ে কান্না আ নারকেল গাছের আড়ালে লম্পট চাঁদ চম্পট দিলে; সম পাড়াটার গোপন ব্যাধির ক্ষত ডুবে গেছে অন্ধকারের প্ চট বসনে। কার্তবীর্য কই?

চম্পার বুঝতে বাকি থাকে না, পাখি শিকলি কাটছে বুনো জানোয়ার আবার পেয়েছে আরণ্যক রক্তের আঘ্রাণ কার্তবীর্যকে ধরে রাখা শক্ত হবে।

শেষ রাতে কার্তবীর্য ফিরলো বটে, কিন্তু সে আলাদা মানুষ। চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু লালচে, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কাৎ হয়ে পড়লো বার তিনেক।

কোথায় ছিলো এতক্ষণ, সেটা জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজন হ'ল না। শেষ রাতে যারা এ ভাবে বাসায় ফেরে তারা যে কোথায় থাকে, চম্পার তা ভালো করেই জানা আছে।

ঢাকা দেওয়া ভাতগুলো কুকুরটাকে দিয়ে এসে চম্পা কার্তবীর্যকে পরিচর্যা করতে বসলো।
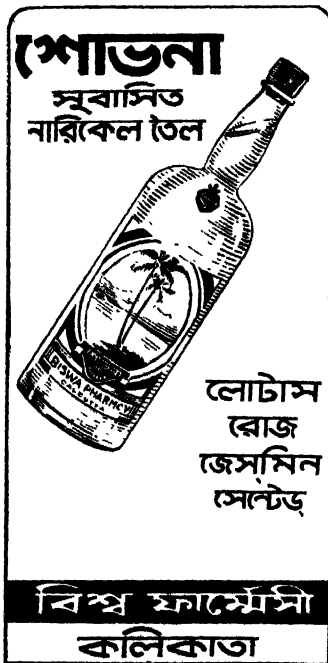
দু'দিন ভালো ভাবে কাটলো। কার্তবীর্য সদর দরজার কাছাকাছিও গেল না। চম্পা একবার গান গাইতে বলেছিল; মুখটা বিকৃত করে কার্তবীর্য হার-মোনিয়মটা ঠেলে দিয়েছিল শুধু। একটা অপরাধ ধরা পড়ে গিয়ে অনুতাপ এসেছে লোকটার, বুঝি বিরাগী হয়ে যাবে। এ দু'দিন খালি ভোঁস ভোঁস করে মেজের ফরাসে কার্তবীর্য পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছে।

কিন্তু তৃতীয় দিনে আবার খিটিমিটি বাঁধলো।

চম্পার শাড়িটার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত গলায় কার্তবীর্য বললে, ফের তুমি এই ময়লা শাড়িটাই পরেছ চম্পা? ভালো শাড়িগুলো কি সব গোল্লায় গেছে নাকি?

চম্পাও বুঝি জেদের বশে কী একটা জবাব দিয়েছিল; রাগের মাথায় গট গট করে কার্তবীর্য বেরিয়ে গেল এবং দু'দিন আর বাড়ি মুখোই হ'লো না। তার পর আবার একদিন শেষ রাতে এলো, ঠিক আগের বারের মতো অবস্থায়।

আবার মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরেছে এই লজ্জাতেই বুঝি কার্তবীর্য দু'দিন আরো বেশি বেশি বাইরে কাটিয়ে এলো; চম্পার কাছে দেখাবার মুখ নেই তার; পর পর ক'দিন রাতেও তাই বুঝি তার মুখ দেখা গেল না।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মালিনী বলে কী গো রাই বিনোদিনী কার ধ্যান করছ? তোমার কেষ্ট ঠাকুরটিতো ওদিকে কুঞ্জে কুঞ্জে...

চম্পা একটা ফুলদানি নিয়ে মারলে মালিনীকে তাক করে; মালিনী ঘাড় নিচু করে সে যাত্রা মাথা বাঁচালে। পরমুহূর্তেই আবার মুখ তুলে হাসি-মুখে বললে, আর তোকেও বলি বাছা তুই ব্যাটা ছেলেকে মোটেই বাঁধতে জানিস নে? নইলে কি অমন ফলাও ব্যবসাটা মাটি হয়। সোনা ফেলে আঁচলে গেরো বাঁধলি, শেষে সেই গেরোও খসলো।

চম্পা জানালার কাছ থেকে সরে এলো।

দেয়ালে টাঙানো আয়নাটার দিকে তাকিয়ে চম্পার মুখে তিক্ত একটা হাসি খেলে গেল; সাবান নিয়ে ঢুকলো কলতলায়। রঙ যাই হোক দেহটা আশ্চর্য সুন্দর চম্পার। পা থেকে জানু অবধি একটা শিশুর মতো; কিন্তু তারই ওপর থেকে নারী দেহের সমস্ত ছন্দিত বিস্ময় যেন তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে উঠে গেছে। পিঠের ত্বক আশ্চর্য মসৃণ; আতিশয্যহীন দেহযষ্টির অপরূপ রূপ,—স্তনাভিরাম স্তবকাভিনম্র।

ঝামা দিয়ে ঘষে ঘষে চম্পা পায়ের মাটি তুলে ফেলে দিলে; সাবানের ধোপে ফিরিয়ে আনলে সমস্ত অবয়বের সেই পেলব চিক্কণতা।

ঘরে ফিরে এসে চম্পা সেদিন অনেক দিন বাদে অনেকক্ষণ ধরে সাজগোজ করলে। তোরং থেকে নির্বাসিত রঙ

'কানুন'এর মেহতাব

বেরঙের চটকদার শাড়িগুলো বার করলে। আয়নার সমুখে দাঁড়িয়ে বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করলে কোনটা বেশি মানায়; হালকা রঙের স্তনবন্ধে উচ্ছসিত যৌবনকে বন্দী করলে। টেনে টেনে এঁকে ভুরু জোড়কে করলে ধারালো। সমস্ত শরীর গন্ধ দ্রব্যে ভিজিয়ে, বাঁধলে বিসর্পিত বেণী; তারপর আয়নায় সারা শরীরটা দেখে এক টুকরো হাঁসি, ওর কঠিন ঠোঁটে খেলে গেল।

কার্তবীর্য সেদিন সন্ধ্যার মুখে ফিরলো; চম্পার দেহে নব পত্রিকার অকাল বোধন দেখে ওর চোখে ধাঁধাঁ লেগে গেল। হাতের বেলফুলের মালাটা জড়িয়ে দিল ওর খোঁপায়। কানের দুল দুটোয় টোকা দিয়ে ওর খুশি অন্তরের আদর জানালো। তারপর চম্পাকে খাটের কাছাকাছি এনে বসিয়ে দিয়ে হাটু পেতে বসলো পূজার্থীর ভঙ্গীতে। ওর বুকে মুখ রেখে বললো,—সুন্দর, কী রূপ তোমার চম্পা। বুক ভরে অগুরুর সুবাস নিয়ে বললো।— কী মিষ্টি গন্ধ তোমার চুলে। তারপর পাগলের মতো অজস্র আদরে চম্পার বেপথু শরীরটাকে প্লাবিত করে দিলে। পরণের শাড়িটার পাড়টা হাতে নিয়ে বললে, শাড়িটা কি চমৎকার।

হঠাৎ চম্পার কী হ'লো, কার্তবীর্যকে সরিয়ে দিয়ে উঠে বসলো সে। ছি, ছি, এ সে করছে কী। তার নারী মনের সর্বস্ব দিয়ে যা পায়নি, আজ দু' আনার সাবান আর দু' আনার আতর তার হাতে সেই স্বর্গ তুলে দিয়েছে। প্রসাধনের কাছে এ কী বিষম হার হ'লো তার।

বিছানা ছেড়ে উঠে এসে চম্পা জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো; আনন্দের সব ফেণা উঠে গিয়ে মনের পাত্রে এখন অবুঝ একটা কান্না টলমল করছে। খোঁপার বেল-ফুলের মালাটা যেন কামড়াচ্ছে বিছের মতো। ছিঁড়ে ফেললে মালা। কঙ্কন বলয় গুলো কব্জির মাংস যেন চেপে ধরেছে। চম্পা সেগুলো খুলে নিলে। রঙচঙে শাড়িটা বদলে ফের সেই লালপেড়ে ময়লা শাড়িটাই অঙ্গে উঠলো; সারা শরীর ধুয়ে এলো টবের জলে।

পরিত্যক্ত শয্যায় কার্তবীর্য তখনো হতভম্ব হয়ে শুয়ে; কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না।—কোন্ খানটাতে বেজেছে চম্পার?

নায়ক

অজয় ভট্টাচার্য

সকাল থেকে কাজের আর অন্ত নেই। কাঁচের জানালায় শীতের রোদ এসে পড়ে সেই সাত-সকালে—বেলা ন'টায়। কাশ্মিরী কাপড়ের লেপের নীচে গরম অন্ধকার হয়ে ওঠে তামাটে, বিশ্রী, অস্বস্তিকর। রাকেশ জাগে! দস্তুর মত একটি ধ্যানভঙ্গের নিস্তব্ধ সমারোহ! 'বয়' এসে এগিয়ে দেয় চীনা ড্রাগন-আঁকা কিমনো, বর্মা-দেশের চটি, আর উমদাবাদের বেগমের দেওয়া ফরাসী সিল্কের রুমাল।

বত্রিশখানা ছবির নায়ক রাকেশ।

চায়ের টেবিলে বসতে বাজে দশটা।

জম্মুর চা—যে চা রোহিলখণ্ডের কোন এক জমিদারের সব চাইতে প্রিয়, আর ফিরপোর কেক্—যে কেক্ পাঠিয়েছেন লাভ্-লক্ প্রেসের মিস কেলি চৌধুরী!

মেক্রোপোলো সিগারেটের বাক্সে হাত দিয়ে রাকেশ ডাকে, "বেয়ারা, কাগজ", রবিবারের পত্রিকা!

ষ্টুডিও সেট! ষ্টিল ফটো! তারই চল্তি ছবির একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি! রাকেশ পড়ে! কি কি তার 'হবি' মানে খেয়াল তাই নিয়ে দামি কাগজের দেড় কোলাম প্রায় ভ'রে উঠেছে! সারা ভারতবর্ষ সেটুকু জানবার জন্যে উদ্‌গ্রীব!

রাকেশ খুসি হয়! দুঃখিতও হয় লেখক য়্যালসেশিয়ান কুকুর পোষার রাজসিক বাতিকটা বাদ দিয়েছে ব'লে।

পত্রিকা চলে যায় ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে। ষ্টালিন-গ্রাদের যুদ্ধের খবর বড় বড় হরফের জগদ্দল পাথর নিয়ে প'ড়ে থাকে বাস্কেটের এক ধারে—দুমড়ানো তাচ্ছিল্যে।

নীচের ঘরে নেমে আসে রাকেশ বেলা এগারোটায়!

"নমস্কার!"

অন্ততঃ বারোটি কণ্ঠের কন্‌সার্ট!

রাকেশ সবাইকে নমস্কার জানায়, হাসে, মেক্রোপোলো সিগারেট খায়, দেয়!

প্রশ্ন হয়, "আপনার নোতুন ছবিখানা কবে দেখতে পাবো স্যার?"—

"ছবিতে নেমেই খালাস," রাকেশ উত্তর দেয়, "কবে বেরুবে তার খোঁজ রাখি নে।"

আগন্তুকদল হেসে ওঠে, যেন মস্ত বড় একটা রসিকতার সন্ধান পাওয়া গেল, জীবনের প্রথম রসিকতাই যেন!

অটোগ্রাফের খাতাটি এগিয়ে দিয়ে ইস্কুলের ছেলেটি বলে, "শুধু সই করলে ছাড়বো না রাকেশ দা', একটা কিছু বাণী দিতেই হবে—দিদি বলেছে—"

রাকেশ বাণী লিখে দেয়।

হাতের কব্জি ভেঙ্গে সরু সরু আঙ্গুলগুলিকে একটু এলিয়ে দিয়ে এক কোনে ব'সে যুবক সিগারেট টানছিলো। গায়ে ছিটের সার্ট রাকেশের প্যাটার্ণের। গাঢ় সবুজের উপর গাঢ় লালের ডুরিকাটা। চুলের ধরণটা ঠিক ঠিক বাগাতে পারে নি অমনোযোগিতার জন্যে নয়, কেশের অজস্র অবাধ্যতার দরুন।

—"একটা কথা বলবো স্যার," যুবক এক চোখ ছোট ক'রে কথা বলে, "আপনার 'মাতাল' ছবিটিতে বোতল নিয়ে যে ভঙ্গিতে নর্দমায় পড়েছিলেন তার একটা ফটো দিতে পারেন?"

—"তা দিয়ে কি হবে?" রাকেশ হাসে।

—"ঐ ভঙ্গিতে আমি একটা ফটো তুলবো।"

সশব্দে বোমা ফাটার ঠিক পরেরকার নীরন্ধ্র নিস্তব্ধতা

নিরানন্দ দেশে আনো
আনন্দের বার্ত্তা অভিনব
লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে রাখো
শরতের কল্যাণ-বৈভব
দেশে দেশে জনে জনে
জানাই সাদর সম্ভাষণ
নিরন্ন দেশের মাঝে
অন্ন-সত্রে শুভ আমন্ত্রণ
HINDUSTHAN CO-OPERATIVE INSURANCE SOCIETY, LD.
হিন্দুস্থান
কো-অপারেটিভ ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি, লিঃ
কলিকাতা

চেপে বসলো ঘরের ভেতর। মেক্রো-পোলের ধোঁয়া, উম্‌দাবাদের বেগমের দেওয়া সিল্কের রুমাল থেকে ছিটকে পড়া আতরের গন্ধ, শব্দের অভাব পূরণ করতে লাগলো। প্রশস্তি প্রশংসনীয়, স্তাবকতা-ও নিন্দনীয় নয়, কিন্তু এটা যে কী হলো তা বুঝে উঠবার আগেই বাইরে বেজে উঠলো মোটরের হর্ণ।

—"তা হলে—এখুনি আমাকে ষ্টুডিওতে বেরুতে হচ্ছে" রাকেশের মুঠোর মধ্যে যেন অনেকগুলো শব্দ ধরা দিলো, "আপনি আর এক দিন আসবেন, ফটো খুঁজে দেখবো'খন।"

যুবক নমস্কার ক'রে বেরিয়ে গেল। বিজেতা সৈনিকের গতি, সুস্পষ্ট, সাজা, হয়তো একটু উদ্ধত। তার পর কে কখন গেল তাতে আর দরকার নেই।

বিকেল বেলা। সভা। পঁচিশে বৈশাখ উপলক্ষ শুধু। আসলে রাকেশের গান, যে রাকেশ বত্রিশখানা ছবির নায়ক, যাকে শুধু পর্দার উপরই দেখা যায়।

হেনা বাকৃচি বলে, "ছবিতে আপনি এমন দুষ্টু আর মাতাল হতে পারেন যে, মাগো, কি বিচ্ছিরি লাগে!" বল্‌তে গিয়ে প্রত্যেকটি স্বরবর্ণে একটু দীর্ঘ টান পড়ে। তার মানে, হেনা বাকৃচির ভাল লাগে রাকেশকে!

অমিতা বসু কিছু বলে না, শুধু চেয়ে থাকে, হাসে আর গড়িয়ে পড়ে নেলি রায়ের গায়ের উপর।

নবাগতা অভিনেত্রী নাজমা

কার ধাক্কা খেয়ে এগিয়ে আসে বিদ্যুৎ চাকি! রুমাল দিয়ে মুখে চেপে বলে, "বেলা বলছিলো, আপনি কি মিষ্টি!"

সভাসমিতিতে প্রায়ই এমন ঘটে আর এ ভাবেই দিন কাটে রাকেশের।

বত্রিশখানা ছবির নায়ক রাকেশ!

পৃথিবীর বয়েস বাড়ে। দিগন্তে আগুন জ্বলে। চাটগাঁয় বোমা পড়ে। তার ধাক্কা এসে লাগে কোলকাতার ছকুখানসামা লেনে।

সকাল থেকে কাজের অন্ত নেই। দড়ি-বাঁধা ভাঙ্গা জানালায় শেষরাত্তিরের হিম, কিন্তু ঘুমায় কার সাধ্য। পেট-রোগা ছোট মেয়েটার ট্যাঁ ট্যা শব্দ।

ন'টা না বাজতেই কলতলায় স্নান, নাকে মুখে ডাল ভাত গুঁজে ডালহৌসি স্কোয়ারের ট্রাম। ফটকার বাজারে দালালি! সংসার চলে, যেমন মধ্যবিত্তের চলে। মানে জীবন নয়, কোন রকমে বেঁচে থাকা।

ফিরতে সন্ধ্যা হয়। শীতের সন্ধ্যা। মিঞার হোটেলে এক পেয়ালা চা মন্দ নয়। কিন্তু ঐ এক পেয়ালা চা-ই শুধু। তার বেশী খরচ করবার উপায় নেই। পেপ্‌-লিভার আজ কিনে নিতেই হবে—ছোট মেয়েটা যা পেটরোগা!

ট্রাম থেকে নামতেই চোখে পড়ে গলির মোড়ে সিনেমার ইন্দ্রপুরী। চুণখসা এবড়োখেবড়ো একরাশ ইঁটের পাঁজার মাঝখানে অতিকায় ইমারৎ। ডাষ্টবিনে সিল্কের সাড়ী!·········ছবি পুরণো হলে কি হবে, ভীড় চিরন্তন! একবার ঢুঁ মারলে মন্দ হয় কি! ন' আনার টিকেট ছ'টাকা! গুণ্ডা বলা ভুল, আসলে খাঁটি ব্যবসাদার। ফিরে আসতে হয়। পেপ্‌লিভার আজ না কিনলেই নয়।

একটি ছোকরা এগিয়ে এসে বলে, "ফিরে যাচ্ছেন কেন মোশাই, এ সুযোগ আর পাবেন না—রাকেশবাবুর ছবি—দশ বছর আগেকার।"—

শুনে লোভ হয়। রাকেশবাবুর ছবি! দশ বছর আগেকার! বত্রিশখানা ছবির নায়ক যে রাকেশবাবু তাঁর শেষ ছবি।

পকেটে হাত পড়ে। ন'আনার টিকেট আড়াই টাকা! তাই সই! ছবি চলে পর্দায়, মন চলে দশ বছর আগে। কত ঘটনা, কত গান, কত ভালবাসা ছবিতে, আর কত বসন্ত জীবনে!

বাড়ি ফিরতে ন'টা বাজে।

—"বাবা, ওষুধ?"

—"দোকানে আছে।" ইচ্ছে করে, এক চড় বসিয়ে দেয় পেটরোগা মেয়েটার গালে। কিন্তু তাকিয়ে থাকে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে। ল্যাম্পপোষ্টে হিমের ছানি! পৃথিবী অন্ধকার!

বত্রিশখানা ছবির নায়ক রকেশ।

জনৈক সুপুরুষের কাহিনী

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

কলেজে মাষ্টারি করলে যা হয়। আগে যদি বা লণ্ড্রির ধোওয়া পাঞ্জাবীটা সাতদিন গায়ে ঝুলত—এখন তিন দিনের বেশি নৈব নৈব চ। অত্যন্ত ফিটফাট থাকা উচিত; দাড়ির কুঁচি যেন মুখের চামড়া খুঁচিয়ে না ওঠে—জুতোর পালিশ যেন একটুও বিগ্‌ড়ে না যায়। ছেলেদের কাছে কোনোদিক থেকেই দৈন্য দেখাতে নেই। সামান্য একটা ত্রুটীর পথে তোমার সম্ভ্রম খোওয়া যেতে পারে। বুড়ো মাষ্টারদের কি হয়? অধ্যাপণায় হয়ত কোন গলদই নেই, কিন্তু পোষাক-আষাকে তাঁরা একদম বেহুঁস। তাই ছেলেরাও তাঁদের পেয়ে বসে। পণ্ডিত মশাইরা যে সার্বজনীন উপেক্ষা পেয়ে আসছেন, তা শুধু ওঁদের টিকির জন্যে। বিমল তাই পাঁচদিন পরপরই সেলুনে গিয়ে পরিষ্কার করে ঘাড়টা ছাঁটিয়ে নেয়। সরু ঘাড়ে ওটা মানান সই হল না বলে একটুও ঘাব্‌ড়ায় না সে। চোখা-চৌকস থাকা আসল কথা।

বাইরের স্মার্টনেস্‌-এ স্তম্ভিত হলেও ছেলেরা কিন্তু নিরস্ত হয় না। খুঁজতে থাকে বাচনভঙ্গীর বা বিদ্যার গলদ। সেদিক থেকে বিমল সবচেয়ে নিরাপদ। সুপারিশ জড় করে এম-এ-তে সে ফার্ষ্টক্লাশ নিয়ে বেরিয়ে আসেনি। নিজের মেধার উপর তার যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল। প্রথম স্থান অধিকার না-ই বা হ'ল—সুপারিশ থাক্‌লে যা হ'ত—অনায়াসেই ত কলেজের চাকরিটা হয়ে গেল! ইংরিজি সাহিত্যের চসার থেকে এলিয়ট পর্যন্ত সবাই বিমলের জিহ্বাগ্রে। কাজেই বলা যেতে পারে, তার বিদ্যার দৌড়টা খুব লম্বা এবং অনন্যসাধারণ। বাচনভঙ্গীতেও খুঁত কোথায়? রবীন্দ্রনাথ যতদিন বেঁচে ছিলেন তাঁর কণ্ঠস্বর শুন্‌বার কোনো সুযোগই সে নষ্ট করেনি। রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তির রেকর্ডও কেনা আছে তার। সে-রেকর্ড চালিয়ে দিয়ে এখনো সে সশ্রদ্ধ হয়ে বসে থাকে।

শুধু বাইরের প্রয়োজনে বা ব্যবহারেই নয়, ভেতরটাকেও যথাসম্ভব স্মার্ট রাখবার চেষ্টা করে বিমল। রুচিকেও ধারাল রাখা চাই, নইলে তুমি সম্পূর্ণ হলে কিসে? যে যা-ই বলুক কলেজের মাষ্টারির খানিকটা উচ্চতা আছে। তোমার মিহি আদ্দির পাঞ্জাবী বা ধর্মতলায় তৈরী স্যুটই তার চিহ্ন বহন করতে যথেষ্ট নয়, মনটাকেও সাধারণ স্থূল স্তর থেকে একটু উঁচুতে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তবেই হল নিটোল সম্পূর্ণতা।

সে-সম্পূর্ণতার কোথাও টোল নেই—যতক্ষণ বিমল বাইরে থাকে। এমন কি শিয়ালদ'র নোংরা সার্কুলার রোডে পায়ে হেঁটেও নিজেকে সে বিক্ষত মনে করে না; কিন্তু রাসবিহারী এভিন্যুতে নিজের ফ্ল্যাটে ঢুক্‌লেই তার মনের আর শরীরের ছন্দ যেন ভেঙ্গে পড়ে। এখুনি দেখা যাবে আশাকে—হয়ত কাপড় কুঁচিয়ে রাখ্‌ছে আলনায়, নয়ত ইংরিজি ফার্ষ্ট বুকের পড়াটায় চোখ বুলোচ্ছে বোকার মতো বা তার চেয়েও একটা নিকৃষ্ট কাজ করছে—ক্ষুদে ক্ষুদে জামা সেলাই। দৃশ্যগুলো ছুরীর ফলার মতো এসে বিমলের চোখে বেঁধে। তক্ষুনি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কোথায় যাবে বিমল—নিজের বাড়িতে, নিজের স্ত্রীর কাছেই যে এসে দাঁড়িয়েছে সে!

বিমলকে দেখেই আশা ব্যস্ত হতে চায় কিন্তু পা যেন সরে না। এখন অবিশ্যি দিন দিন সে ভারি হয়ে উঠ্‌ছে, কিন্তু আগেও পা তার ঠিক এম্নি আটকে যেত। উনুনে চাকর গুঁড়ো কয়লা ঢেলে রেখে যায়—জল চড়িয়ে দেয় আশা-ই। খাবার তৈরী আছে—এখন শুধু চা তৈরী করে

পদ্মের পাপড়ির
পরশ
সুতী শাড়ী
সুতি ও আদ্দি
আর্ট সিল্ক
প্রভাতীর
জর্জেট
ক্রেপ সিল্ক
পরিধানে
পাইবেন
প্রভাতী টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ
ম্যানেজিং এজেন্টস্ - কে, সি, বিশ্বাস কোং
একমাত্র পরিবেশক —
দি সিলকটন লিঃ
পাইকারী বিক্রয়-কেন্দ্র ও অফিস — ৪ নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা
খুচরা বিক্রয়-কেন্দ্র
৫৭।১ই, কলেজ ষ্ট্রীট (কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের সম্মুখে)
১৪০-সি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট (হাতিবাগান মার্কেটের সম্মুখে)
৭০, আশুতোষ মুখার্জি ষ্ট্রীট (জগুবাবুর বাজারের সম্মুখে)

দেওয়া বিমলকে। চা-তৈরীর আগ্রহটা চোখেমুখে যতটা ফুটে ওঠে আশার, কাজে ততটা এগোয় না।

চা-টা তৈরী করে এনেও আশার মনে হয় ওটা হয়ত বা বিস্বাদই লাগ্‌বে। কিন্তু খাবার তৈরীর সময় এমন কথা মনে হয় না কখনো। কাজকর্মে সত্যি সে আনাড়ি নয়। তবে বিমলের সামনে কিছু করতে হলে কেমন যেন ঘুলিয়ে যায় তার বিদ্যা। চা নিয়ে এগোতে হোঁচট খেয়েই হয়ত বা পড়ে—কাপ থেকে চল্‌কে শাড়ীর খানিকটা জায়গায় হয় ত খয়েরী রং ধরে যায়।

"এ কি?" পায়চারি থামিয়ে দিয়ে বলে বিমল: "বেহুঁশ হয়ে চলো না কি?"

"পাড়টা জড়িয়ে গেল আঙুলে—" লজ্জাটা আশার মুখে ভয়ের মতই দেখা যায়।

"পাড়ের আর দোষ কি—কাপড়টাও ত গুছিয়ে পরতে পার না!"

আশা কথা বলে না। সঙ্কোচে শুকিয়ে ওঠে। কালো রং-টা রুক্ষতায় চোখকে পীড়িত করে তোলে। বিমল অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে কতক্ষণ। তারপর জানালার ধারে চেয়ারটায় বসে ছোট্ট আকাশটুকুর অবকাশে চোখ ডুবিয়ে দেয়। টিপয়ের উপর চা আর খাবার রেখে ওটাকে তুলে নিয়ে বিমলের সামনে বসিয়ে দেয় আশা। অত্যন্ত সাবধান তার পা। উবু হলেই শ্বাস নিতে কষ্ট হয়—তবু উবু হয়েই শ্বাসরোধ করে টিপয়টা এগিয়ে আনে! শ্বাস নিয়ে বাঁচে সে রান্নাঘরে ঢুকে—তা-ও বিমলের সামনে নয়।

রান্নাঘরের পার্টিশনের দরজায় এসে আবার দাঁড়ায় যখন আশা, বিমল তখন খাবার শেষ করে পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে।

"এগুলো চা? মহিম যায় কোথায়, চা-টা করে দিয়ে যেতে পারে না ও?"

"বল্‌ব ওকে।" দূর থেকেই বলে আশা: "আরেক কাপ করব?"

কাপে খানিকটা চা থাকতেই টিপয়টা ঠেলে দিয়ে বিমল বলে: "কি লাভ? এ রকমই হবে!" বিমল সিগারেট ধরায়—আধুনিক ইংরিজি কবিতা সম্বন্ধে সর্বাধুনিক একটি সমালোচনা গ্রন্থে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

"যদি ভালো হয়—করব আরেক কাপ?" অনুনয়ের রেখায় আশার পুরু ঠোঁটের ধারগুলো বিশ্রী দেখায়। তাই হয়ত বিমল চোখ তুলে তাকায়না আশার দিকে। আশার কুৎসিত মুখটা দেখে অনর্থকই হয়ত তার মেজাজ খারাপ হয়ে উঠবে।

"দরকার নেই।" গম্ভীর হয়ে যায় বিমল।

আশা আঘাত পায়। করুণ হয়ে ওঠে তার মুখ। কিন্তু সে অস্থির হয়ে ওঠে না। আঘাতটা যেন তার প্রাপ্য। সত্যি তাছাড়া আর কি? চেহারা তার ভালো নয়, এ কথাটা তার চেয়ে আর বেশি কে জানে? লেখা-পড়াও হয়নি। অন্য মেয়েদের সঙ্গে দাঁড়াবার মত সত্যি বল্‌তে কি আছে তার? কি স্পর্দ্ধা বা ছিল বিমলের পাশে এসে স্ত্রী হয়ে দাঁড়াবার? তবু ত বিমলের কাছে সে খুব খারাপ ব্যবহার পায় নি। তার জন্যে কৃতজ্ঞতার তার অন্ত নেই। সে-কৃতজ্ঞতা যতটুকু সাধ্য প্রকাশ করবার চেষ্টা করে আশা। তার চেয়ে বেশি কিছু করবার ক্ষমতা তার নেই।

বিমলের কাছ থেকে একটু দূরে একটা চেয়ারে ব'সে থাকে আশা। শরীরটা তার সত্যি ভালো যাচ্ছে না কদিন। এরকমই হয়ত চল্‌বে। বিমলকে জানানো দরকার। কিন্তু জানাতে পারে না। হয়ত ওঁর অস্বস্তি হবে, বিরক্ত হবেন। এ সব ঝঞ্ঝাটে বিমলকে টেনে আন্‌তে আর সঙ্কোচের সীমা থাকে না। অনেক উঁচুতে উনি—মেয়েলি ব্যাপারে খবর রাখা ওঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

নৃত্যশিল্পী **সাধনা বসু** অমর পিকচার্সের 'পয়েগমে' আত্মপ্রকাশ করবেন।
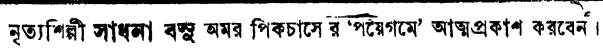
কিন্তু উপায়ও বা কি? অনেকদিন আগে হাসপাতালের কথা একবার বলেছিল বিমল। এখন আর হয়ত ওর মনে নেই। কিন্তু আশাকে ত চোখের উপর দেখ্‌ছে বিমল। নিশ্চই কোনো ব্যবস্থা এঁচে রেখেছেন। এটুকু ভরসাতেই আশা মনে মনে খুসী হয়ে ওঠে। খুসী হয় মুখ ফুটে তাকেই কথাটা বল্‌তে হবে না বলে'।

বই-এ মনোযোগটা বিমলের বারবার কেটে যায়। আশার উপস্থিতি শুধু ঘরে নয় তার মনেও বোঝার মত হয়ে উঠে।

"দুপুরে কেউ এসেছিল?" বইটা কোলের উপর বন্ধ করে রাখে বিমল।

"তোমায় খুঁজতে? নাত!" আশার মনে হয় এবার বিমল হয়ত তার দিকে ভালো করে তাকাবে—তারপর নিজে থেকেই হয়ত তুল্‌বে কথাটা।

"সুশীলবাবুর স্ত্রী নাকি বলেছিলো আসবেন তোমার সঙ্গে আলাপ করতে—কাল কলেজে বলেছিলেন সুশীলবাবু—"চিবিয়ে চিবিয়ে অদ্ভুত ধরণে বিমল কথাগুলো বলতে লাগল—তারপর নাটকীয় ধরণে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বল্‌ল: "আমি অবিশ্যি বলেছি তোমার শরীর খারাপ।"

"ওঃ—" আশা খুসি হয়ে উঠ্‌ল।

"তা ছাড়া কি বা বলা যায়!" বিমল বইটার উপর আরেকটা সিগারেট ঠুক্‌তে সুরু করল। "এ না বল্‌লে হয়ত সত্যি এসে উপস্থিত হতেন! তাতে তোমারও বিপদ, আমারও।"

অসহায়ের মত আশা খানিক্ষণ চেয়ে থাকে। তার পর ব্যথিত মুখে বলে: "শরীর আমার সত্যি খারাপ হয়ে পড়ছে।"

অত্যন্ত ক্ষিপ্রতায় আশার উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বিমল অন্ধকার হয়ে থাকে। শরীরের কোথায় যে একটা ব্যথা আশার হৃদপিণ্ডটা নীচের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল এতক্ষণ—বিমলের দিকে তাকিয়ে তা যেন আর অনুভব করতে পরছিল না আশা। এ সময়ে শরীর ত সবারই খারাপ হয়—কেন সে বলতে গেল বিমলকে সে-কথা? নিজের জীবনের সাধারণ গণ্ডীতে কেন সে টেনে আন্‌ছে বিমলকে? বিষণ্ণতায় সমস্ত শরীরটা আশার অবশ হয়ে যায়।

"হাসপাতালে খোঁজ নিতে হবে, না?" সহজ সাদা গলায় বিমল প্রশ্ন করে।

আশা কথা বলতে পারে না।

"বিকেলেই যাব তাহলে!" বিমলের চোখ সিগারেটের ধোঁয়া অনুসরণ করতে থাকে।

"আজ না গেলেও হবে।" সঙ্কোচে আশার গলাটা খুবই অস্বাভাবিক শোনায়।

আজ না গেলেও দুদিনের পর বিমলকে যেতে হয়

ম্যাটারনিটি ওয়ার্ডে। অল্প পরিচিত হাসপাতালের একজন ডাক্তারকে ভাবতে হয় বন্ধু। নিজেকে হাটে বিকিয়ে দেবার সমস্ত আক্রোশটা বিমলের আশার উপর গিয়ে জড় হয়। কেবল স্ত্রী হবার অধিকারে আশা তাকে ক্রমেই নিচে টেনে নিয়ে যাচ্ছে! ডাক্তার ভদ্রলোক যে ভীড় সরিয়ে আশার জন্যে একটা বেড্ দখল করে নিলেন—তার জন্যে কি বিমলের খানিকটা সম্ভ্রান্ততা খরচ হয়ে গেল না? কেন সে নিজেকে এমন টুকরো টুকরো করে বিলিয়ে দেবে? কার জন্যে? সাধারণের চেয়েও নীচুতে পড়ে আছে যে একটা মেয়ে তার জন্যেই ত!

ট্রাম থেকে নির্জীব দেহটাকে কোনরকমে টেনে নিয়ে নামিয়ে নেয় বিমল। বাড়ী এসে যখন ঢোকে সে যেন সত্যি ফুরিয়ে গেছে।

রান্নাঘরে মন্টুকে কি বোঝাচ্ছিল আশা। ইচ্ছা করেই বিমল শুনতে চাইল না কথাগুলো। আশার গলাটাই ভালো লাগছিলনা তার। অন্যমনস্ক হয়ে একটা চেয়ারে বসে রইল সে খানিকক্ষণ।

নলিনী জয়ন্ত

'মিছিমিছি তুমি ভাব্‌ছ মা—আমি আছি তবে কি করতে? ফিরে এসে দেখবে খেয়ে-দেয়ে বাবুর চেহারা

ফিরে গেছে!" কথা শেষ করেই কড়াই-এ খুন্তির আওয়াজ চড়িয়ে দিল মহিম।

"আর বাড়ী ছেড়ে যেওনা কিন্তু—কথ্ নোনা। ওঁর সব দামী দামী বই আছে। জানোত আজকাল কেমন চুরি হয়ে যায়!"

"সে আমায় কিছু বল্‌তে হবে না—" এককথায়ই মহিম আশাকে নিশ্চিন্ত করে দেয়। বিমল জুতোর খস্‌খস্ শব্দ করে নিয়ে ডাকে: "মহিম—"

চক্‌চকে চোখে মহিম উঁকি দেয়।

"একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আয়--বল্‌বি হাসপাতাল--"

মহিম চলে গেলে আশা এসে বিমলের কাছে দাঁড়ায়। খুব অনিচ্ছা নিয়েই বিমলকে কথা বল্‌তে হয়: "তৈরী হয়ে নাও—এখুনি যেতে হবে।"

"তৈরী কি? যাব।" আশা বিমলের দিকে নিবিড় ভাবে চেয়ে থাকে।

"ভালো। ট্যাক্সি আসুক—" অন্যমনস্কের মত বলে বিমল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে উদাস হয়ে আসে তার চোখ।

অনেক কষ্টে শরীরটাকে নুইয়ে আশা বিমলের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। পায়ে ছোঁয়া পেয়ে চম্‌কে উঠে বিমল। সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে আশা তখন হাঁপাচ্ছে—কিন্তু মুখে তার হাসি।

"প্রণাম করতে হয়—শুনেছি।" ঠোঁটে হাসি নিয়েই আশা বিমলের চোখের প্রশ্নের জবাব দেয়।

বিমল বলবার মত কোনো কথা খুঁজে পায় না। তবু কঠোর ভাবে জিজ্ঞাসা করে: "কেন?"

"মরেও ত যেতে পারি। যদি আর দেখা না-ই হয়!"

বিমল দেখ্‌তে পেল কুৎসিৎ মুখের চোখগুলোও ছলছল করে' জলে ভরে উঠতে পারে। বিস্মিতের মতই সে তাকিয়ে রইল কতক্ষণ।

নিজেকে স্বাভাবিক মনে করেই বিমল কলেজে আসে। দশনম্বর বাসের এ-সময়কার দৈনন্দিন আরোহীরা আদ্দির পাঞ্জাবীতে চাদর জড়ানো একটি সুশ্রী যুবকের উপর তাদের অভ্যস্ত চোখ বুলিয়ে নেয়। হাতে তার মোটা দুখানা বই—চশমার ভেতর দিয়েও চোখ-গুলো উজ্জ্বলমুখে একটা ক্যান্ডে-ণ্ডার পুড়্‌তে সুরু করেছে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা শেলির 'ক্লাউডে' সেক্সপীয়রের 'মিরা-ণ্ডায়' আচ্ছন্ন হয়ে থাকে বিমল। অবসরের ঘণ্টায় আর আর মাষ্টাররা যখন তেল-নুন-লক্‌ড়ির আলাপে মত্ত হয়ে'যান—তখনও বিমল ভার্জ্জিনিয়া উল্‌ফের একটা উপন্যাসে নিজকে নিবিড় করে রাখে। চারটায় ছুটি আজ। পাঁচটার সময় একবার হাঁসপাতালে যেতে হবে। অনেক কর্ত্তব্যের মতই একটা কর্ত্তব্য ওটা। তাছাড়া ডাক্তার ভদ্রলোক বিকেলে যেতেও বলেছেন তাকে। যেতে হবে। বিমল যাবে। কর্ত্তব্যে সে ত্রুটী রাখ্‌তে চায় না। ভার্জ্জিনিয়া উল্‌ফের বাচলতার মধ্যেও হঠাৎ থেমে থেমে বিমল কর্ত্তব্যের কথাটা স্মরণ করে নেয়। না গেলে ডাক্তার ভদ্রলোকও হয়ত অনেক অদ্ভুত কথা ভেবে নিতে পারেন। বিমলকে যে যেতে বলেছেন তিনি নিশ্চয়ই তা তাঁর মনে আছে। যেতেই হবে বিমলকে।

রমা দেবী—'দম্পতি'তে দেখা যাবে।

কলেজ থেকে একটু দেরি করেই বেরুল বিমল—যাতে পাঁচটায় গিয়ে পৌছনো যায়। কিন্তু ডাক্তার ওখানে থাক্‌বেন কি না কে জানে! না-ই যদি থাকেন তিনি

ভারতের সমস্ত ইস্পাত লৌহ ব্যবহারকারীদের
আমরা শারদীয়ার প্রীতি সম্ভাষণ
জানাইতেছি।
TATA

কার কাছ থেকে খবর সে পেতে পারে? কেমন আছে আশা এ খবরটা অন্তত নেওয়া উচিত। নেওয়া উচিত কর্তব্যের খাতিরেই।

ডাক্তারকে পাওয়া গেল। খুবই ব্যস্ত তিনি কিম্বা ব্যস্ততা তাকে দেখাতে হয়। তবু বিমলকে ভুলে যাননি—খানিকটা আশ্বস্ত হল বিমল।

"খুবই কষ্ট পাচ্ছেন মিসেস্ রায়—টাইমটা ঠিক বলা যাচ্ছে না। তবে আমি সব সময়ই অ্যাটেণ্ড করছি—" ডাক্তার সাহেব হাতটা উপর দিকে টেনে তুলে টেবিলের উপর কানুই-এ ভর দিলেন।

বিমল একটু ম্লান হয়ে গিয়েও সিগারেটের প্যাকেটটা খুলে ডাক্তারের সামনে ধরল।

"থ্যাঙ্কস—" একটা সিগারেট খুঁটে তুলে নিয়ে বললেন ডাক্তার: "কি জানেন মিঃ রায়, এজ্-টা ওঁর খারাপ—হয়ত শেষ পর্যন্ত ফরসেপ্ দরকার হবে।"

"আমাকে থাকতে বলেন?" জিভ দিয়ে ঠোঁটগুলো ভিজিয়ে নিলে বিমল।

"না—তেমন কিছু, আশা করি, হবে না। আপনাকে এ ভরসা দিতে পারি মিঃ রায়—এ কেস্-এ মেডিক্যাল-এড্-এর অভাব হবে না—"

মুখে কিছু বলতে চাইল না বিমল—বলতে হয়ত সঙ্কোচ হচ্ছিল হয়ত বলতে পারছিলই না। কিন্তু চোখে যতটুকু কৃতজ্ঞতা ফুটিয়ে তোলা যায় তাই নিয়ে সে ডাক্তারের দিকে চেয়ে রইল।

"আচ্ছা—" ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন: "রাত্তিরে একবার খবর নেবেন—"

কতক্ষণ বসে থেকে বিমলের হঠাৎ মনে হল তারও এখন উঠে পড়া উচিত। ডাক্তারকে হয়ত এখুনি ওয়ার্ডে যেতে হবে। অন্য কাজও থাকতে পারে। এতক্ষণ বসে বসে সে তাঁর কথা শুনছিল কোন্ অধিকারে! লজ্জিত হয়ে উঠল সে।

রাত্রিতে একবার ভেবেছিল বিমল মহিমকে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দেবে। যদি খবর থাকে। কিন্তু পাঠানো হয়নি। মহিম খাওয়া দাওয়া সেরে, বাসনপত্র গুছিয়ে রেখে সিঁড়ির নীচে ঘুমুতে চলে গেল কোলের উপর একটা বই খুলে রেখে চেয়ে চেয়ে সবই দেখল বিমল—কিন্তু আদেশটা জানাতে পারলনা মহিমকে। কি দরকার মহিমকে পাঠিয়ে? তেমন কিছু ভয় নেই। আর সত্যিত—এতে ভয়ের কি আছে? বই-এর লাইনগুলোর উপর

নিউ থিয়েটার্সের ওয়াপসের একটি দৃশ্যে অসিতবরণ।

'ছদ্মবেশী'র একটি প্রেম-মুখর দৃশ্যে মিহির ভট্টাচার্য ও সন্ধ্যারাণী

চোখ ফিরিয়ে আনে বিমল। একটা পাতার উপর থেকে নীচ পর্যন্ত একটানা পড়ে যায় কিন্তু কি যে ওতে লেখা আছে মনে করতে গিয়ে বলতে পারে না বিমল। বই বন্ধ করে শেষটায় বিমল দরজায় হুড়কো টেনে দেয়। তারপর বাতি নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে।

চোখ বুঁজে থেকেও বিমল চোখের উপর কতকগুলো হিজিবিজি রেখার আঁচড় দেখতে পায়। কিল্‌বিল্‌ করে উঠছে রেখাগুলো। এলোমেলো চিন্তাই হয়ত রেখায় ছবি হয়ে ভেসে ওঠে। চিন্তার কীট। এঁকেবেঁকে নড়তে থাকে। কীট—কীট—মনে-মনে কথাটা উচ্চারণ করতে থাকে বিমল। এম্নি একটা কীট মানুষের দেহের অন্ধকারে একদিন আত্মহত্যা করে—কিন্তু ফিনিক্সের মতো তার মৃত্যু নেই—সেই শব থেকে গড়ে ওঠে প্রাণময় একটি জীবকোষ। কোষের অণু-দেহে অফুরন্ত প্রাণ—নিজকে বিলিয়ে দিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে তা শুধু বিস্ফারিত হয়ে চলে। কোথায় সূর্য, আলো-বাতাস, জল-মাটি—প্রাণের বিচিত্র উপাদান? কেউ নেই। আছে শুধু একটি মানবী—সাবিত্রী মানবী, সমস্ত দেহে সে সূর্যকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—নিয়ে যাচ্ছে সূর্য-প্রাণ তার দেহের গভীর গহ্বরে সেখানে ধরিত্রী-জরায়ু! ধরিত্রীর আশীর্বাদ জীবনের ভ্রূণদেহ ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে দিনের পর দিন—মাসের পর মাস। মানবীর দেহের নিগূঢ় রহস্য স্নেহের অজস্র ধারায় অভিষিক্ত করে দিচ্ছে প্রাণের বিচিত্র উদ্বোধনকে। সেই শিশুপ্রাণের কতো বিচিত্র রূপ! কি শাণিত ক্ষিপ্র অভিযান তার! মুহূর্তে সে পার হয়ে যাচ্ছে সহস্র সহস্র বছর—ছুটে চলেছে মানুষের সীমায় এসে পৌঁছুবে বলে।

মানুষের জন্ম হল। তারপর? তারপর তার আলোর কামনা। মানবীর দেহের অন্ধকারে ডুবে থেকেই তার তা-ইচ্ছা আর্তনাদ করে ওঠে। চায় সে জননী থেকে বিচ্ছিন্নতা—বাঁচতে চায় পৃথক সত্তায়। আত্মজকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার ব্যথা জননীর সমস্ত স্নায়ু-তন্তুতে টনটন করে ওঠে। ছিঁড়ে যায় দেহ, ছিঁড়ে যায় হৃদয়। তবু দিতে হয় মানুষের শিশুকে মানুষের মধ্যে এনে। ব্যথার হোমাগ্নিতে নিজের দেহকে ঝল্‌সে দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হয় আত্মজকে।

বিমল জোর করে চোখ বুঁজে থাকে। খুবই কষ্ট পাচ্ছে আশা—ডাক্তার বলছিলেন। কি রকম সে কষ্ট?

কত শক্তি সে ব্যথার? বিমল জানে না। দুমাস আগে দরজার চাপ লেগেছিল বিমলের আঙুলে। ব্যথা পেয়েছিল খুবই—নীল হয়ে গিয়েছিল আঙুল। তার ব্যথিত মুখের দিকে চেয়ে থেকে আশার চোখ দিয়ে জল পড়েছিল, মনে আছে বিমলের। মনে আছে সে ব্যথা কেমন। কিন্তু তার চেয়ে বড় ব্যথার অনুভূতি বিমলের নেই। কেমন ব্যথা আশার, সে কি করে জানবে!

জানে না, আর তাই হয়ত নিজেকে কেমন ছোট, সঙ্কুচিত, লজ্জিত মনে হয় বিমলের। মনে হয় আশার কাছে যেন সে গিয়ে আর দাঁড়াতে পারবে না। অসহ্য যন্ত্রণায় আশার মুখটা গভীর কালো হয়ে যাচ্ছে, চোখের সামনে তা দেখ্তে পেলে কি বিমল দাঁড়িয়ে থাকতে পারত? বালিশে মুখ গুঁজে দেয় বিমল। মনে হয়, মুখ লুকোচ্ছে।

দেরীতে ঘুমিয়েও খুব ভোরেই বিমলের ঘুম ভেঙে গেল। মহিমকে এসে কড়া নাড়তে হল না—বরং পাঞ্জাবীটা গায়ে চড়িয়ে সিঁড়ির মুখে গিয়ে বিমলই ডেকে তুলে আনল তাকে। বিছানার পুটুলিটা বগলদাবা করে চোখ রগ্ড়ে মহিম উঠে আসছে দেখেই সিঁড়িতে পা চালিয়ে দিল বিমল—বল্লে: "চা খাব না—বাইরে যাচ্ছি, বুঝ্লি?" ঘাড় নাড়তে হয় বলেই মহিম ঘাড় নাড়ল—কিছু বুঝ্তে পেরেছে তা বলা চলে না।

আধ ঘণ্টার উপর হাঁসপাতালের গেটের সামনে পায়চারি করে চল্ল বিমল। গেট বন্ধ—ঢুক্তে সাহস হচ্ছিল না।

একটা ট্র্যাম থেকে ডাক্তার নাম্লেন--গেটে ঢুক্তে বিমলের সঙ্গে দেখা: "গুড্ মর্ণিং মিঃ রায়—আপনার টেলিফোন নেই, না? কাল রাত্তিরে আমি ফোন গাইড খুঁজে হয়রাণ! রাত্তির তখন দশটা—"

ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিমল এসে হাসপাতালের কম্পাউণ্ডে ঢুকল। সম্মোহিতের মত তার যেন হুঁস ছিল না।

ডাক্তার তাঁর কামরায় ঢুকে টেবিলের কাগজপত্রের দিকে এক পলক চেয়ে নিলেন—তারপর একটু হেসে বল্লেন: "নাউ ইউ আর এ ফাদার—ফাদার অব্ এ মেল চাইল্ড—"

হয়ত মুখের চেহারাটা ঢাকবার জন্যে বিমল ঠোঁটে একটা সিগারেট গুঁজে প্যাকেটটা টেবিলের উপর ডাক্তারের কাছে রেখে দিলে।

রূপ-মঞ্চ

"শুধু সিগারেট—অ্যাঁ?" ডাক্তার হাস্‌তে লাগ্‌লেন: "আপনার ভাগ্যি ভালো মিঃ রায়—সি ইজ সেফ্—কষ্ট পেয়েছেন—ট্রিমেণ্ডাস্—ঘাবড়ে দিয়েছিলেন আমাদেরও—তবে শেষটায় সব ইজি হয়ে গেল!"

"আপনাদের ধন্যবাদ—" তাড়াতাড়িতে ওকথাটাই বিমলের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

"আমাদের? বাই নো মিন্‌স্। পুন্নাম নরক থেকে আপনার উদ্ধারের ব্যবস্থা করলেন যিনি, তিনিই ধন্যবাদের যোগ্য। বাট্ ইয়োর বেবি ইজ ভেরী আন্‌গ্রেট্‌ফুল! আপনার চেহারাটা নিয়েই আবির্ভূত হয়েছে—অথচ মা বেচারীকে কষ্ট দিয়ে মারতে বসেছিল!"

বিমল ডাক্তারের কথাগুলো শুনছিল কিনা বলা যায়না। কানে তার আওয়াজ হচ্ছিল কিন্তু সবই অর্থহীন, হিজিবিজি আওয়াজ। সিগারেটও ফুঁকে চল্‌ছিল সে যন্ত্রের মতো—কোনো স্বাদ না পেয়ে।

"পুত্রমুখ দেখ্‌বেন চলুন—" ডাক্তার উঠ্‌লেন: "যদিও হাসপাতালের আইন নেই—তবু আপনার বেলায় না-ই খাট্‌ল সে আইন।"

ডাক্তারের পেছনে পেছনে অনুগত ছাত্রের মতই চল্‌তে লাগল বিমল। ওয়ার্ডের সামনে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে বল্‌ল: "ওঁর সঙ্গে দেখা করা যায় না এখন?"

ডাক্তার দু'পা ফিরে এসে বললেন: "তাও আইনের বাইরে!"

"ও" বিমল অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইল ডাক্তারের মুখের দিকে।

"চলুন—" অন্য একটা দরজার দিকে পা বাড়ালেন ডাক্তার।

"কোথায়?" হতাশ হয়ে বল্‌ল বিমল।

"ওর সঙ্গে দেখা করতে—" ডাক্তারের ঠোঁটে বিশুদ্ধ ঠাট্টার হাসি।

পাণ্ডুর হয়ে গেছে আশার মুখ ঠোঁট বুঁজে আছে অসহ্য ক্লান্তিতে—কিন্তু চোখ তার এত কালো, এত গভীর, এত উজ্জ্বল, বিমলের মনে হল বুঝি বা তা সত্যি সুন্দর। চোখে হাসি নিয়েই আশা তাকিয়েছিল বিমলের দিকে—সে হাসি ম্লান, মৃদু রেখায় নেমে এলো শুক্‌নো, শীর্ণ ঠোঁটের প্রান্তে।

"ভালো আছ?" জিজ্ঞাসা করল বিমল।

অদ্ভুতভাবে হেসে ঘাড় নাড়তে চেষ্টা করল আশা। বিমলের কণ্ঠে এমন ধ্বনি জীবনে বুঝি সে এই প্রথম শুনল। অবাক হয়ে গিয়েছিল বুঝি বিমলও—সত্যি একি তারই কণ্ঠ!

'কানুনে' মেহতাব

ফিল্ম্ ধার দেওয়ার ব্যবস্থা

(৩৫ মিলিমিটার এবং ১৬ মিলিমিটার)

বার্ম্মা-শেলের 'একটি কেরোসিন টিন' নামক সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় শিক্ষামূলক চিত্রের একটি দৃশ্য

সর্ব্বসাধারণের রুচী অনুযায়ী নানা প্রকার মনোজ্ঞ বিষয় অবলম্বন করে' বার্ম্মা-শেল এবং অন্যান্য ফিল্ম্ প্রস্তুত কেন্দ্রগুলিতে নির্ম্মিত বহুসংখ্যক প্রচার চিত্র এখন সকলের পক্ষেই দেখার সুবিধা হয়েছে। যে কেহই শিক্ষামূলক অথবা ঘরোয়া প্রদর্শনীর জন্য আবেদন করলেই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এগুলিকে পেতে পারবেন। এদের সম্পূর্ণ তালিকার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানাগুলির যে কোনটিতে লিখ্‌লেই হবে।—পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্ট, বার্ম্মা-শেল; বোম্বাই, কলিকাতা, নিউদিল্লী, করাচী এবং মাদ্রাজ।

নীতিন বসু পরিচালি
শ্রী ফিল্মসএর "বিচারে
শ্রীমতী লীলা দেশা

প্রমথর প্রেম

—শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু—

অরুণের বিয়ে না করাই উচিত ছিল, কারণ বিয়ের পনেরদিনের মধ্যে তাকে পাশাখেলার আড্ডায় দেখা গেল। ঘরে ম্যাট্‌কপাশকরা আল্‌গার্ব্বকের নতুন বউ, গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যাবেলাটি মনোরম, শুক্লপক্ষের রাত, ওদের মস্ত ছাদ্—সব ফেলে দোকানটি বন্ধ ক'রেই বন্ধুর বাড়ীতে এসে ওঠার কোনো মানে হয়? মিঠে মিঠে প্রেম নিবেদন ছেড়ে—'হবে নাকি এক হাত?' শুনে প্রমথরও ইচ্ছা করে তাকে এক হাত নিতে।

সে বলে, তুই কী রে? তুই একটা কী? ঘরে তোর নতুন বউ, আর তুই কিনা পুরাণ পাশায়!—ধেৎ! বলি খেলা ত চিরদিন আছে, বউ ত চিরকাল নতুন থাকবে না—বাড়ী যা, খেলা পালাচ্ছে না।

বৌও পালাচ্ছে না।—ও বলে।

বৌএর বয়স পালাচ্ছে। এম্‌নিই ত তার গাছ-পাথর নেই।

যাক্‌গে, তুই খেল্‌বি কিনা বল্, নয়ত আমি মুকুন্দর সঙ্গে বসি।

খেলা চলে, রাত সাড়ে এগারোটা অবধি। এম্‌নি রোজ।

শ্বশুরবাড়ীও তার তিনখানা বাড়ীর পর। যেন নেশাই লাগেনি ছোক্‌রার। বিয়ের আগেও যা, পরেও তাই।

কিন্তু প্রমথ বেচারার অবস্থা অন্যরকম। অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করে, একখানা ঘর ভাড়া ক'রে থাকে, হোটেল থেকে খাবার এনে খায়।

সেই ছোট ঘরটিতে পাশা আর দাবার আড্ডা বসে, এক কোণে চৌকীর নীচে চায়ের সরঞ্জাম।

বিয়ে ক'রেও বৌকে কাছে রাখ্‌তে পারে না এ দুঃখ তার অসীম। দেখা করব বল্‌লেই দেখা হয়না। মন তার ছট্‌ফট্ করে।

অরুণের মতন অবস্থা হ'লে সে বোধ হয় হাতে স্বর্গ পেত। আর এম্‌নি একটি দক্ষিণে হাওয়ার সন্ধ্যায় মুখোমুখি বসে থাকত দুটিতে।

কল্পনা করতে গিয়ে মনটা আরো খারাপ হয়ে যায়, দীর্ঘশ্বাস জোরে পড়ে।

অরুণ বলে, তোর যে দেখি দারুণ বিরহ!

গরম যায় বর্ষা আসে। মন আরো হু হু করে। কবিতা সে লিখ্‌তে পারে না, বোঝে। কলেজের পড়ার মধ্যে ইংরেজী আর সংস্কৃত প্রেমের কাব্য তাকে পড়তে হয়েছে, বাইরে এসে বাংলা কবিতা পড়েছে। এই বর্ষার দিনে মিলন যেন আরো ঘনীভূত হবার কথা।

তবু তার সময় হয় না, পয়সা জোটেনা। এ'লো শরৎ। তখনো বর্ষার আমেজ আছে। ভরা ভাদর, মাহ্ ভাদর। তার বাড়ী যেতে আস্‌তে আগে খরচ ছিল এক টাকা, ষ্টীম লঞ্চের প্রতিযোগীতায় ক'দিন যাওয়া আসা চার আনায় হ'য়ে যাচ্ছে। কতকগুলো কাজ ফেলে রেখেই সে উত্তর কলকাতার দিকে চল্‌ল।

দেশবন্ধু পার্কের পূর্ব্বদিকে খাল থেকে লঞ্চ ছাড়ে, সাড়ে দশটায় একটা ছাড়বে। মাল্লারা চীৎকার করছে—'তারকবাবুর ষ্টীমার, আগে যাবে' দু আনা—দু' আনা ভাড়া!

আরেকদল ও-পাশে চেঁচাচ্ছে—দু আনা দু আনা।

কম্পিটিশনের মার্কেট, যাত্রীদের পোয়াবারো। যাত্রী নিয়ে কাড়াকাড়ি, পাণ্ডাদের মতন হাত ধ'রে একটু

আধটু টানাটানি, মাথাটা ধ'রে ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া চল্‌ছে, ব্যাপারটা সকলেই উপভোগ করছে। যখন সব জিনিসের দাম চতুর্গুণ, তখন চার ঘণ্টার ষ্টীমার জার্নি দু আনায়!

ঠাসাঠাসি ভিড় হ'য়ে গেল। কেরোসিন তেলের গ্যাস্ আস্‌ছে, যন্ত্রের বিকট আওয়াজ। মেয়েদের ওপাশে পর্দা টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। জল কেটে চলেছে 'লক্ষ্মী' মানে ষ্টীমলঞ্চ।

প্রোপ্রাইটর প্রমথকে পরিষ্কার জামা-কাপড় পরা দেখে বল্‌লে, যান্ না ছাতে গিয়ে বসুন, মেঘলা আছে, হাওয়া পাবেন।

ছোট্ট সিঁড়ি দিয়ে ও উঠে গেল, মাথা বাঁচিয়ে পা খুব সতর্কতার সঙ্গে মোটর লঞ্চে ঘোরাফেরা করতে হয়। তবু খানিকটা তেল লেগে গেল পাঞ্জাবীতে।

মেঘে ঢাকা আকাশ, মাঝে মাঝে সোণালী রোদ উঁকি দিচ্ছে, দাসপাড়া ছাড়িয়ে রেলওয়ে ব্রীজ পার হ'য়ে দুধারে দিগন্ত বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র আর সল্ট্ লেক্ রেখে ওরা এগিয়ে চল্‌লো।

এক জায়গায় কিছু লোক নামা-ওঠা করলে, জায়গাটা আঘাটা। পিছনে এসে পড়েছে—সোনাতন, আর একখানি ষ্টীমার।

চালাও কম্পিটিশন্...চালাও!

সারেংএর হাত ঘোরে, বেল্ বাজে তিনটে ক'রে. মেশিনের ব্যস্ততা বাড়ে।

লুঙ্গীপরা খালাসী মাল্লা লুঙ্গীপরা সারেংকে বলে, সুগন্ ঘোরাও জোরে—বাবুদের লঞ্চ এগিয়ে যায়। হাতে হাত দাও মিঞা...

পনেরো মাইল চ'লে এসে দূরে দেখা যায় হাওড়ার পোল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল!

দুপাড়ে আমজাম কাঁঠালের ছায়া, কেনালের স্বচ্ছজল তর্‌তর্ ক'রে ব'য়ে যায়, একটা নাগাদ্ ভোজের হাট পৌঁছয়।

দুখানা ষ্টীমার পাশাপাশি দাঁড়ায় গা ঘেষে। সিণ্ডিকেট কি বলে? যাত্রীরা একখানা ষ্টীমারকে জিজ্ঞেস্ করে।

সারেং বলে, বল্‌বে আবার কি?—সামনে ও কে দাঁড়িয়ে? হাটো।' ছোট্ট ঘর দুধারে পর্দা ফেলা, সারেং বস্‌লেও মাথা ঠেকে যায় ছাদে। খুব আরামের নয়, ছোট ছেলেরা দূর থেকে যতটা ভাবে।

ছাদেও যাত্রী কম ওঠেনি, জিওল মাছের আর পোনার হাঁড়ি নিয়ে, মাছ ধরা খাচা নিয়ে। দুপাশে নিস্তব্ধ নির্জ্জন প্রান্তর, ডাকাত পড়লেও কেউ নেই। কাল ভোরে যে সব নৌকো কলকাতা ছেড়েছে, গুণ টেনে চলেছে তারা এখনো পাড়ের ওপর দিয়ে দুতিনজন লোক দড়ি ধরে টানতে টানতে যাচ্ছে, এক পা এক পা ক'রে নৌকো এগোচ্ছে, পাটের বোঝার ওপরে দোতলার ঘরে বসে বুড়ো মাঝি তামাক টানে।

ভাঙোড়ের হাট ছুটোর সময় দেখা গেল, টিনের লাল ঘরগুলি। রেজেষ্ট্রী অফিসের হলদে বাড়ীটা, খেয়া নৌকোয় লোক পারাপার হচ্ছে, তাদের বাঁচিয়ে এক ধারে ষ্টিমলঞ্চ দাঁড়ালো, সরু তক্তা ফেলে। বেগুন আর ওল, আর নোটেশাক আর ডেঙোর ডাঁটা থোড় বড়ি আর খাড়া—হাট জমে উঠেছে।

এখান থেকে প্রমথকে হাঁটতে হবে পাক্কা দুক্রোশ তবে পাবে পাইঘাটি, সেখান থেকেও তিন মাইল পশ্চিমে তার ঘর সেই পিয়ালী নদীর কাছে।

বেলা সাড়ে চারটেয় ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বাশবাগানের ধারে পুরানো জীর্ণ বাড়ীর প্রাঙ্গনে এসে ও দাঁড়ালো, প্রতিমা তখন ঘাট থেকে জল আনতে যাচ্ছে।

একটুখানি হাস্‌লো সে, শাশুরীর সাম্‌নে কথা বল্‌তে পারলোনা, কিন্তু সেই হাসিতে সমস্ত পথশ্রম দূর হ'য়ে

গেল, সমস্ত কষ্ট সার্থক হ'য়ে গেল।

এ যেন অনেক সাধনায় পাওয়া!

একখানি ডুরে কাপড় প'রে প্রতিমা সারা সন্ধ্যা ঘরের কাজ করছিল, মুগ্ধচোখে প্রমথ কেবলি দেখে।

টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি এলো, মিটমিটে আলো ঘরে, বাইরে অন্ধকার রাত।

প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত মূল্যবান, প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত আনন্দের। রাত্রি প্রভাতেই সেখানে বিদায় নিতে হবে।

ভীষণ মাথা ধরেছিল সেদিন প্রমথর। প্রতিমার অম্বলের ব্যথা—তবু একজন ভুল্লো পরের চাকরী, পৃথিবীর যুদ্ধ, দুর্ম্মূল্যের বাজার, আর একজন ভুল্লো সংসারের খাটাখাটুনী, দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই, ব্যর্থ যৌবন বেদনা।

অঘোরে ঘুমোচ্ছে ক্লান্ত প্রমথ। দরজায় টোকা পড়লো তিনবার রাত তখন কত ঠিক নেই। প্রতিমা বেরিয়ে গেল আস্তে কাকে বল্লে—আজকে ও এসেছে। ভোরেই চলে যাবে। ছায়া মিলিয়ে গেল।

তার পর দিন রাত বারোটায় বস্তির মেয়ে আঙ্গুর জিগেস করলে কাল আসোনি কেন গো প্রমথবাবু, কোথায় ছিলে কার কুঞ্জে?

বাংলায় ফিল্ম এর দৈন্য

শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ

বাংলার এই অভূতপূর্ব্ব ও অভাবনীয় দৈন্য ও দুরাবস্থায় সিনেমা সম্বন্ধে কিছু লিখতে যাওয়া অনেকেই হয়ত পছন্দ করেন না। আমার অভিমতও তাই, কিন্তু এই পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের আদেশ—ফিল্ম নিয়ন্ত্রণে বাংলায় যে দুরাবস্থা অবশ্যম্ভাবী, যার করাল ছায়া এই আগামী চৈত্র মাস থেকেই বাংলার প্রত্যেক চিত্রগৃহের উপর এসে পড়বে তার সম্বন্ধে দুই এক কথা লিখতে হবে।

ফিল্ম-এর দৈন্য ও দুর্দ্দিন যে সব চিত্র গৃহে বাংলা ছবি দেখান হয় তার উপরই পড়বে। যারা ইংরাজী বা হিন্দি ছবি দেখায় তাদের উপর বিশেষ কিছুই হবে না বলে আমাদের মনে হয়। হতভাগ্য বাঙ্গালীর আর ভাববার কিছু নেই। ঘরে বসে নিরন্ন নরনারীর অফুরন্ত হাহাকার শুনতে হবে। যারা বাংলা ছবি দেখতে চান—বাঙ্গালীর মধ্যে বাংলা ছবির দর্শক বেশী হওয়াই স্বাভাবিক—তারাও সেই পুরাতন ছিন্নাবশেষ ছবি দেখবেন না হয় "তেরা জান মেরী জান" নূতন অবস্থায় দেখবেন। হিন্দি ছবি খারাপ এ কথা আমি বল্‌ছি না। বাঙ্গালীর মধ্যে যারা বাংলা ছবি দেখতে ভালবাসেন তাদের কাছে অবশ্য বাংলা ছবি আদরণীয়।

এ দুরবস্থা—চিত্রামোদীর পক্ষেই। কিন্তু এটাও ভাবতে হবে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এ দুরবস্থা আসবেই। বাংলার শ্যামল শস্যক্ষেত্রে অফুরন্ত ধানের ঢেউ শ্যামল বনানীতে শ্যামা দোয়েলের সঙ্গীত, বাংলার নীলাকাশে মেঘের খেলা, বাংলার হাটে মাঠে বাটে চাষীর গান, বাংলার সুদূরপ্লাবী নদীতে বাংলার অফুরন্ত ভাবধারা কবি চিত্তকে বিমোহিত ক'রে এসেছে। বাংলার উৎসব, দোল দুর্গোৎসব, যাত্রা ও কবিগান বাঙ্গালীকে চিরকাল আনন্দ দিয়ে এসেছে। কিন্তু আজ বাংলার সেদিন নেই। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারে বেশীরভাগ নিরন্ন বা একবেলা খাওয়ার কোনরূপ ব্যবস্থা করতে পেরেছেন—তাদের অনেকের লজ্জানিবারনের উপায় নাই। সে দেশে চিত্রগৃহ চলে কি করে তাই অনেকের সমস্যা হয়েছে। যে দেশ থেকে অর্থাভাবে যাত্রা দোল দুর্গোৎসব কমে আসছে, সেখানে একটা সস্তা আমোদের স্থান থাকবেই কারণ শতকরা ১০জন লোক অর্থচিন্তায় অতব্যবস্থায়। তারা কিছু আমোদের চেষ্টায় চিত্রগৃহ ভাল বাসবেই।

তথাপি আমি বলবো—বাংলা দেশ বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব হারিয়ে একটা খিচুড়ীর মধ্যে কোন রকমে থাকবে। কাজেই বাংলার চলচ্চিত্রে অতল জলে তলিয়ে গিয়ে চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের অনেকে কোন রকমে বেঁচে থাকবে। কিন্তু সে বাঁচা বাঁচা নয়। মুমূর্ষু রোগীর চোখের সামনে অনন্ত অন্ধকার যখন আস্তে আস্তে নামতে আরম্ভ করে সেও ত বাঁচে বা বেঁচে থাকতে পারে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে বাংলার এ দুর্দশা কেন? উত্তর—বাংলার নিজস্ব নেই। যারা রাজ্যশাসন ক'রছেন তাদের মক্কাশরীফ বেঁচে থাকলে সব থাকবে। যারা রাজার জাত তারা বাংলাকে আলাদা করে—চণ্ডীদাস জয়দেবের বাংলা, কাশীদাস ও কৃত্তিবাসের বাংলা, বঙ্কিমচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্রের বাংলা বা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বাংলা সুরেন্দ্র নাথ বা বিপিনচন্দ্রের বাংলা বলে ভাবতে পারেন না। তাদের মতে অরাজকতা দোষে বাংলা চিরদোষী—অনুকম্পার পাত্র কিছুতেই হতে পারে না। অর্দ্ধশতাব্দীর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমরা চাহিব কোন দিকে? সে প্রশ্ন আজও আছে। যারা রাজ্য শাসন

করছেন যারা চাষ করছেন পূর্ব্বে তারা হিন্দু ছিলেন। আশ্চর্য্য! ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেছেন বলে আরবের মরু-প্রান্তরই হ'ল সব, আর ১৫৮ পুরুষের বাংলা তাদের কিছুই নয়? বাংলার ফিল্মশিল্পে আরবদৃষ্টিসম্পন্ন লোক খুব কম এই ফিল্ম শিল্পের অপরাধ—এই আজকালকার নূতন ব্যবহারিক আইনে গুরুতর অপরাধ। এই অপরাধে গভীর পণ্ডিত ও মূর্খ আর লাঙ্গলধরা চাষাও বিদ্বান। রাজধানী বাংলার বাইরে গিয়েছে, বাংলার নিজস্ব শুভানিষ্ঠও শাসকের দৃষ্টির বাইরে গিয়েছে।

ফিল্ম এখন ইংলণ্ডে রপ্তানীর জন্য তৈরী হয় না। আমেরিকায় সামান্য কিছু রপ্তানীর জন্য তৈরী হয়, তার কতক পরিমান এখানে আসে। বোম্বাই এই সঙ্কীর্ণ আমদানীর বেশীর ভাগ দখল করতে আরম্ভ করেছে। কেন তা জানিনা। পাঞ্জাবে মাত্র ১১টি শিল্প প্রতিষ্ঠান কিন্তু ফিল্ম এর অনুমতি পত্র পেয়েছে অনেক। এখানে বলে রাখা ভাল যে নূতন নিয়মানুযায়ী ভারত সরকারের বিশেষ অনুমতি পত্র ভিন্ন কেউ ফিল্ম কিনতে পারেন না। আর অনুমতি পত্রে একটি বা দুটি ছবির নাম আর ফিল্ম এর পরিমান লেখা থাকে। উদ্বৃত্ত ফিল্ম সরকারকে ফেরত দিতে হয়। একে অন্যের ফিল্ম ব্যবহার ক'রতে পারে না। মান্দ্রাজেও প্রার্থীরা বিশেষ অকৃতকার্য্য হয় নি। যা কিছু ফিল্ম কমাবার প্রচেষ্টা তা বোধ হয় এই হতভাগ্য বাংলা দেশের উপর দিয়েই গেল। এই হতভাগ্য দেশে শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী চালু ষ্টুডিওতে এক ইঞ্চি ফিল্ম দেওয়া হয় নি। বাইরের দু-একজন যারা কোনদিন ফিল্মে ছিলেন না তাদের দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে। এমন সব কাণ্ড হ'য়েছে ও হ'তে যাচ্ছে দেখলে সত্যই মনে হয় যে এসব ব্যাপারে বুঝবার বা বোঝাবার কেউ নেই—অন্ততঃ ভারত সরকারের প্রতিষ্ঠানে।

নালিশ করে দরখাস্ত করে কত দিনে ফল হয় তা অনেকেই জানেন। আমরা জানিনা এ মাৎস্যন্যায়ের মূলে কে বা কারা। কিন্তু ফল একই, যেমন খাদ্যশস্যের ব্যবস্থা তেমন ফিল্ম এর ব্যবস্থা। এতগুলি প্রথম শ্রেণীর চিত্রগৃহ থাকা সত্ত্বেও আগামী চৈত্রমাসের পর থেকে দেখা যাবে ২।৩মাসে একটি নূতন ছবি আসে কি না সন্দেহ। আর সেই ছবির চার খানার বেশী কপির ফিল্ম পাওয়া যায় কি না আরও সন্দেহ। এ অবস্থায় চিত্রগৃহের অবস্থা কিরূপ হবে সহজেই আমরা ও পাঠক পাঠিকারা তা বুঝতে পারবো। কিন্তু যারা ফিল্মএর নিয়ন্ত্রা তারা কিরূপে বুঝাবেন? কে বোঝাবে—কে জানে?
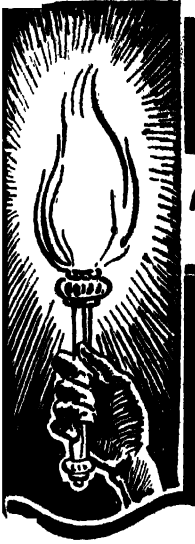
দেহ ও দেহী

পরনির্ভরতা প্রণয়ের পরিপন্থী

বিভাগীয় পরিচালক — ইউসুফ

এই বিভাগে যৌন-সম্পর্কিত বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা সাদরে গৃহীত হয় 'ইউসুফ'। রূপ-মঞ্চ সম্পাদকীয় বিভাগে চিঠিপত্র বা প্রবন্ধাদি প্রেরিতব্য। সম্পাদকঃ রূপ

পৃথিবীর ঐতিহাসিক, সামাজিক বা কৃষ্টিমূলক বিবর্তনের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিণত বয়স্কদের নিকট শিশুর স্থান যতটুকু নারীর অধিকার তাহা অপেক্ষা এক তিলও বেশী নয়। জীবনের সংগ্রামে তাদের কার্যক্ষমতাকে বিন্দুমাত্র উৎসাহও দেওয়া হয় না। পরন্তু তারা যে সর্বপ্রকার কার্যের অযোগ্য এবং তাদের সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয়তা পুরুষের কাছ থেকেই পেতে হবে,—এইটাই তাদের বলে দেওয়া হয়। পুরুষের বিচার-সিদ্ধান্তে একান্ত নির্ভরশীলতা বা তার প্রতি অন্ধ-আজ্ঞানুবর্তী হতে পারলেই এই জন্ম-জীবনে বা জন্ম-মৃত্যুর পরে স্বর্গেও তাদের জন্য আনন্দ সঞ্চিত থাকবে ইহাই তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। পুরুষের ভূমিকায় আমরা কেমন করে মেয়েদের সামাজিক, রাজনৈতিক বা শিক্ষা জীবন গড়ে তুলতে প্রয়াস পাচ্ছি সে আলোচনা এখানে আমি কর্তে চাই না, কিন্তু আমি নিশ্চিত বিশ্বাস করি যে বিগত মহা সমর, তৎপরবর্তী সময় বা বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতিকেই যদি এই বিচারের মাপকাঠি বলে চিন্তা কর্তে চাই, তা'হলে বলা যায় যে—পুরুষের দ্বারা এই পৃথিবীতে বর্তমানে যে দুর্গতি নেমে এসেছে, মেয়েদের দ্বারা নিশ্চয়ই এই দুরবস্থার সৃষ্টি হতো না।

আমি নিঃসন্দেহে বলতে চাই যে হাজার হাজার বছরের এই নিরুৎসাহেই আজ তারা (মেয়েরা) তাদের নিজেদের দক্ষতা সম্বন্ধেও হতাশ হয়ে পড়েছে—এবং তাই যেন তারা তাদের এই অসহায় অবস্থার জন্য ক্ষতিপূরণের দাবী জানাতে আজ বাধ্য হচ্ছে। পৃথিবীর বুকে দেবতার ভূমিকায় আত্ম-প্রশংসমান পুরুষ যতই তার আধিপত্য বিস্তারে প্রয়াসী হচ্ছে—নারীর এই অসহায় বোধ ততই হয়তো জাগ্রত হয়ে উঠ্ছে। শুধু যৌন-জীবনেই নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই পুরুষ তার এই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা কর্তে ব্যগ্র, অথচ ব্যক্তিগত ভাবে যখন কোন নারীর দায়িত্ব পুরুষের নিকট অসহনীয় ভার বলে মনে হয়, তখনই সে তাকে এড়িয়ে চলবার কৌশল অবলম্বনে ত্রুটী করেন।

নিজেদের অসহায় অবস্থাকে বরণ করে নেবার যে শিক্ষা মেয়েরা পেয়ে আস্ছে, তারই জন্যে তাদের ব্যক্তিত্ব আদৌ বিকশিত হতে পাচ্ছে না এবং এই একই কারণে তাদের পরিত্যক্ত হবার আশঙ্কা সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। কারণ, আজ বা কাল এই অসহনীয় বোঝা যে কোন পুরুষ ফেলে পালাবার চেষ্টা করবেই। আবার মেয়েদের দিক থেকে, যতই তাদের পরিত্যক্ত হবার সম্ভাবনা বেশী করে দেখা দেয়, নিজেদের অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করে ততই তারা পুরুষকে অধিকতর ব্যগ্রতায় আঁকড়ে ধরতে তৎপর হয়ে ওঠে এবং অবশেষে শৌর্য বা উদারতার দুয়ারে আবেদন জানান ব্যতীত কোন গত্যন্তরই তাদের থাকে না। এইরূপে যে দূষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়, নর ও

নারী উভয়েই তার পঙ্কিল আবর্তে জড়িয়ে পড়ে। বিবাহিত জীবনের এমন বহু চিঠিপত্র আমার নিকট রয়েছে, যা থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে স্বামী স্ত্রীর যে বন্ধন প্রকৃত পক্ষে বহু পূর্বেই ছিন্ন হয়ে গেছে, কেবলমাত্র সমাজ, আইন বা প্রতি পক্ষের প্রতিশোধের ভয়ে অসহ্য নির্যাতন সহ্য করেও কোন পক্ষই তাদের বিবাহকে বিচ্ছিন্ন বা অস্বীকার কর্তে সাহসী হয়নি।

এই সমস্যার বিচার বা আলোচনা করবার পূর্বে একটী বাস্তব ঘটনার উল্লেখ না করে আমি পাচ্ছি না। সম্প্রতি যতগুলি চিঠি আমার কাছে এসেছে তারই একখানির কিয়দংশ আমি উদ্ধৃত কচ্ছি ;—

"আমি শিক্ষিতা মহিলা। সর্বপ্রকার আন্তরিকতায় আমি স্বামীকে ভালবেসে এসেছি। তাঁর আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছায় সর্বদাই আমি সম্মতি দিয়ে এসেছি। নিজেকে অপমানিত করেও আমি যুক্ত করে তার নিকট ভাল ব্যবহার প্রার্থনা করেছি। অনেক সময় তিনি আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করেন না। যখন আমরা অপর লোকের সঙ্গে রয়েছি তিনি আমাকে শুধু জ্বালাতন নয় অপমান কর্তেও কুণ্ঠা বোধ করেন না। প্রয়াসই বলে থাকেন,—তোমার যেখানে খুশী চলে যেতে পার, তোমার ভরণপোষণ আমি চালাতে রাজী নই। তুমি মর বা বাঁচ আমার তাতে কিছুই যায় আসে না। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার প্রতি তার উদাসীনতা

হয়ত একটা ভাণ বা ছলা মাত্র। আবার কখন ভাবি আমি হয়তো তার পক্ষে একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছি। নিজে উপার্জন করে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থার জন্য অনেকবার আমি মুক্তি চেয়েছি কিন্তু তাও তিনি আমাকে ছেড়ে দিতে সম্মত নন। আর যাই হই, আমরা অসহায়া নারী, আপনি অনুগ্রহ করে বলুন তাঁর সাথে আমার কি ভাবে চলা উচিৎ। আপনি কি মনে করেন যে নিজের জন্য কোন চাকুরী গ্রহণ করে তাঁকে সাহায্য করাই আমার পক্ষে সমীচীন হবে?"

চিঠিখানি থেকেই বোঝা যায়, স্বামীর, মনোভাবকে বুঝতে না পারায় নিবিড় প্রণয় বন্ধনও কেমন করে ব্যর্থ হয়ে যায়। স্বামীর মনোমধ্যে কিসের আলোড়ন চলছে— মহিলাটী তাহা অপরিজ্ঞাত এবং প্রকৃত সমস্যাটা যে কি তাহাও তিনি বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছেন না। বাহ্যিক ঘটনাগুলিই তার চোখে পড়ছে কিন্তু এর কারণ সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাই, আপাততঃ দৃশ্যমান আচরণগুলো নিয়েই তিনি আলোড়ন কচ্ছেন অথচ এর অন্তরালে যে কারণ থাক্‌তে পারে তা তিনি চিন্তাও কচ্ছেন না। তিনি লিখেছেন—তার স্বামী তাকে পরিত্যাগ কর্তেও (মহিলাটী হিন্দু না হলে হয়তো বিবাহ-বিচ্ছেদ এই শব্দটী প্রয়োগ কর্তেন) রাজী নন, আবার তিনি যদি ছেড়ে যান তাতেও মুক্তি দিতে সম্মত হন না। ইহাতেই প্রতিপন্ন হয় যে প্রকৃত সমস্যা তাঁহার অপরিজ্ঞাত। যদি তিনি সত্যই তার স্বামীকে ছেড়ে যেতে চান বা বিবাহ বিচ্ছেদ দাবী করেন, —তা তিনি অনায়াসেই পারেন। আমরা যখনই যা কিছু করি, তা আমরা ইচ্ছা করি বলেই করি। সুতরাং যদি কেহ অন্য ব্যবস্থা সম্ভব জেনেও নির্যাতনের পায়ে নিজেকে বলি দেয়, তা'হলে বুঝতে হবে যে নির্যাতনই তার আকাঙ্খানীয়। এই মহিলাটী সম্পর্কেও ইহাই প্রযোজ্য। তিনি নির্যাতন সহ্য কচ্ছেন, অপমানিত হচ্ছেন, অনুগ্রহ ভিক্ষা কর্চ্ছেন, অথচ অগ্রবর্তীনী হয়ে প্রতিকারের চেষ্টা পাচ্ছেন না। আমাদের দেশের অন্যান্য রমণীগণের ন্যায়, এই মহিলাটীও স্বামীকে দেবতার আসনে বসিয়ে এমন কিছু তার কাছে দাবী কচ্ছেন যা দেওয়া তার ক্ষমতার বাইরে অথচ এই অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাই হয়তো তাদের শূন্যতাকে পূরণ করে দিতে পারে। সমস্যাটী হচ্চে এই যে মহিলাটী বুঝে উঠ্‌তে পারেন না যে তিনি কেবলমাত্র পেতেই চান এবং মনে করেন যে স্বামীকে সব কিছুই দিতে হবে। এবং যেহেতু তিনি তা দিয়ে উঠ্‌তে পারেন না এবং তার অক্ষমতা উপলব্ধি কর্তে বাধ্য হন, তখন স্ত্রীকে অপমানিত করেও তিনি উদাসীন থাকতে প্রয়াস পান। অনুরূপ ক্ষেত্রে ইহার একমাত্র মীমাংসা এই হতে পারে যে স্বামীর স্কন্ধে একধা জীবনব্যাপী বোঝা হয়ে না দাঁড়িয়ে স্ত্রীর কর্তব্য নিজেরই অগ্রনী হয়ে কিছু করা।

বস্তুতঃ এইরূপ মহিলা অনেক আছেন যাঁদের ব্যক্তিগত জীবন এমনই রিক্ত যে পুরুষকে বাদ দিয়ে তারা সর্বহারা হয়ে পড়ে। সুতরাং আশ্চর্য হবার কিছুই নেই যে স্বামীকে আট্‌কে রাখবার সর্বপ্রকার চেষ্টা তারা করবে, এবং এরূপ কর্তে যেয়ে তারা এমন সব অস্ত্র প্রয়োগ করে থাকেন যাতে তাদের স্বামীকে হারাবার সম্ভাবনাই নিশ্চিত হয়ে উঠে। পুরুষের প্রতি একান্ত নির্ভরতাই এই সকল মহিলার বৈশিষ্ট্য এবং ইহাকেই মহিলা সুলভ ব্যবহার বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? অনেক চিন্তাশীল লেখক এ বিষয়ে অনুশীলন করে এই সিদ্ধান্তেই এসেছেন যে পুরুষোচিত অথবা স্ত্রীসুলভ ভাবের যে শ্রেণী বিভাগ তাহা ভ্রান্ত বিচারপদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন বালক বালিকার মনোভাব বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে তারা বিপরীত শ্রেণীর মনোভাব নিয়ে গড়ে উঠেছে। ডাঃ ভেরিং (Dr. Vaering) এই অভিমত পোষণ করেন যে নর-নারীর উভয়ের মাঝে

মাতৃভাব স্বতঃই বিকশিত হতে থাকে, এবং নারীর মাঝে বিপরীত পিতৃত্ব একটা স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ মাত্র। নর-নারীর যৌন অনুভূতির বিশ্লেষণ কর্ত্তে যেয়ে তিনি এই সিদ্ধান্তেই এসেছেন যে একমাত্র প্রাথমিক যৌন চেতনাতেই স্ত্রী বা পুরুষ সুলভ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার বৈশিষ্ট্যই শিক্ষা, সমাজ এবং পারিপার্শ্বিকতায় গড়ে ওঠে।

পুরুষোচিত শৌর্যের উল্লেখে জনৈক লেখক দেখিয়েছেন যে দামোর (Dahomey) রাজার জনৈকা মহিলা-দেহরক্ষী ছিলেন। আমরা যেমন মেয়েদের দুর্ব্বল আখ্যা দিয়ে থাকি উক্ত দেহরক্ষিণীও পুরুষদের দুর্ব্বল বলে মনে কর্ত্তেন। এথেনসের বিরুদ্ধে পারশিক অভিযানের প্রধান সেনাপতি মহিলা ছিলেন এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য। আরও আশ্চর্যের কথা এই যে, মালয় অধিবাসীদিগের মধ্যে শাসন ব্যাপারে মেয়েদের অভিমতের উপর বহুলাংশে যেমন নির্ভর করা হয়ে থাকে, তা ছাড়া অর্থনৈতিক ব্যাপার সম্পূর্ণ ভাবে মেয়েদের দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে। শোনা যায় কামচট্কায় (Kamchatka) পুরুষেরাই

রন্ধনাদি গৃহকার্যে লিপ্ত থাকে এবং মেয়েরাই শাসন কার্যাদি পরিচালনা করে থাকে।

অথচ আধুনিক সভ্যতায় আমরা দেখতে পাই যে একমাত্র উৎসাহের অভাবেই মেয়েদের মনে তাদের দক্ষতার অভাব বদ্ধমূল হয়ে গেছে। ফলে, সর্বপ্রকার দায়িত্ব বা প্রচেষ্টা মেয়েরা এড়িয়ে চল্‌তে চায়, অথবা কোন দিকে তাদের কোন কার্যকারিতা পরিলক্ষিত হলেও তা' সমাধান কর্তে পারে না। এইরূপে তারা স্বাভাবিক-রূপে অসহায় হয়ে পড়ে, এবং নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রতিপালনের জন্য তাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়ে উঠে।

আমরা জানি, স্ত্রী বা পুরুষ প্রত্যেকেরই জীবনের কার্যক্ষেত্র নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হওয়া অসম্ভব। অবশ্য মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে চিন্তা করলে দেখা যায়, পুরুষ বা শিশুদের সহিত সম্পর্কের বাধা বাদ দিলেও কার্যের মধ্য দিয়ে মেয়েদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের এমন কতকগুলি অন্তরায় আছে যা' পুরুষ বা শিশু কাহারও পক্ষে দূর করা সম্ভব নয়, কারণ, সেগুলি হচ্ছে তাদের প্রকৃত সম্পদের অভাব।

বাস্তব জীবনে আমরা দেখে থাকি যে অজস্র স্তুতিবাদে পুরুষকে সর্বপ্রথম অশেষ গুণসম্পন্নরূপে দাঁড় করান হয়। অথচ অতি শীঘ্রই সে বুঝতে পারে যে তার আয়ত্বের বাহিরে; তার ক্ষমতার অতীত এমন কোন ভূমিকায় সে অভিনয় কর্তে নেমেছে। আদর্শ নারী তাকেই বলবে যিনি অন্তরের সম্পদে নিজেকে সর্বদাই পরিপূর্ণ রাখবার চেষ্টা করবেন। অন্যথায় নিজের জীবনকে সঞ্জিবীত রাখতে, নিজের রিক্ততাকে পরিপূর্ণ করে তুলতে, প্রতি নিয়ত তাকে স্নেহ, মমতা বা প্রণয় ব্যাপারে ভিখারী হয়ে দাড়াতে হবে। জীবনে যারা রিক্ত তারা তাদের পারি-পার্শ্বিকতা থেকে, বিশেষতঃ তাদের জীবন-সঙ্গীর কাছ থেকেই এই রিক্ততা পূরণে সচেষ্ট হয়ে উঠে।

অথচ পুরুষের পক্ষে এই শূন্যতা—এই অভাব বোধ দূর করা সর্বদা হয়তো সম্ভব হয়ে ওঠে না; এমন কি অনেক সময় নিরাশ করেই থাকে। জীবনের অশান্তি বা দুরবস্থার মূলীভূত কারণস্বরূপ এই শূন্যতা অপর কাহারও দ্বারা পরিপূর্ণ হবার নয়। পুরুষের পক্ষে যাহা কিছু করণীয়, যাহা কিছু দেয়, সকলই তার স্ত্রীর নূতন দাবীতে ইন্ধন জোগাবে মাত্র। জীবনকে যা' আনন্দময় করে তুলবে তা' আমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই খুজে বের কর্তে হবে,—বাহিরের সন্ধানে তাকে পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং গৃহের শান্তি বা জীবনের সুখ যদি পেতে হয় তা' হলে, কোন প্রকারে কার্যের সুযোগে উপেক্ষা দেখান মেয়েদের নিজেদের স্বার্থের পরিপন্থী, কারণ অসহায় পরনির্ভরতায় কখনও ভালবাসা পাওয়া আদৌ সম্ভব নয়।

ব ন্যা

[একাঙ্ক নাটিকা]

শ্রী অ খি ল নিয়োগী

[মফঃস্বলের দূর পল্লী গ্রামের একটি জমিদার গৃহ। নিশুতি রাত। সমগ্র গ্রাম খানি সুপ্ত। জমীদারের শয়ন-কক্ষে মৃদু দীপের আলোক জ্বলিতেছে। নবীন জমীদার তরুণ ও তাহার স্ত্রী মাধবী জাগিয়া। আশা, আকাঙ্খা ও ভবিষ্যতের মধুর স্বপ্নে স্বামী-স্ত্রী কারো চোখে ঘুম নাই। তাহারা দুইজনেই হয়ত সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতেছে]

তরুণ। তা হলে কাল তোমার ছেলের মুখে ভাত ?

মাধবী। ছেলে কি শুধু আমার একার? তোমার নয় ?

তরুণ। কিন্তু কুড়িয়ে পেয়েছে তুমি...কাজেই দাবী তোমার।

মাধবী। চুপ! দেয়ালেরও কাণ আছে। সত্যি কথা বলবার সাহস তোমার আছে ?

তরুণ। সাহস এককালে আমার ছিল...কিন্তু তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আর ভরসা পাইনে !

মাধবী। যদি বলি আমার সাহসও কারো চাইতে কম নয় ?

তরুণ। মুখ হয়ত তোমার সে কথা বল্‌তে পারে... কিন্তু চোখ উঠ্‌বে ছল্‌ছলিয়ে !

মাধবী। হুঁ! কিন্তু বাজে কথা থাক্। তুমি কি দিয়ে ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করবে তাই আগে বল—

তরুণ। উঁহু! আগে তোমায় বল্‌তে হবে—

মাধবী। আমি শুধু ছোট্ট একটি চুমু খাবো...আর বুকে জড়িয়ে ধরবো।

তরুণ। কিন্তু বুকের মধুত পাবে না...শুধু কান্নাই সার হবে—

মাধবী। যাও! তুমি ভারী দুষ্টু! [একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া] তুমি কি কোনো মতেই আমায় ভুল্‌তে দেবে না যে ওকে আমি পেটে ধরি নি ?

তরুণ। না—না, তা কেন? কিন্তু কি বিদঘুটে উইল ছিল আমার ঠাকুর্দ্দার !

মাধবী। সত্যি! এমনটি বড় একটা শোনা যায় না !...তোমার যদি ছেলে না হয় তবে তোমার ত্রিশ বছরের পর সম্পত্তি চলে যাবে দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভাণ্ডারে। তা থেকে তুমি মাসোয়ারা পাবে।

তরুণ। সেই দুঃস্বপ্নের কথা এখন ভাবতেও ভয় নাই।

মাধবী। তোমার পিশিমাই ত ক্রমাগত দিনে রাতে মনে করিয়ে দিতে লাগ্‌লেন যে তোমার বয়েস ত্রিশের কাছাকাছি এসেছে আর আমি বাজা—

তরুণ। কাজেই আমাকে রাতারাতি একটি বিয়ে করে বংশ রক্ষা আর সেই সঙ্গে সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

মাধবী। আমি সে কাজে সম্মতি যে না দিয়েছিলাম তা ত' নয়। তুমিই ত' আমার কথায় তাল দাও নি !

তরুণ। আমি অত বোকা কিনা! এ যুগের ছেলে...সেকালের কুলীন ত' নয়! অমনি হট্ করে আর একটি বিয়ে করে বস্‌লেই হল আর কি! এক জনেরই মন রাখ্‌তে পারিনে...দু পাশে দুজনকে নিয়ে শেষ কালে ত্রিশঙ্কুর অবস্থা হত আর কি !

মাধবী। কিন্তু পিসিমা সে কথা শুনবেন কেন? তিনি ত' তোমার লুকিয়েই মেয়ে দেখা সুরু করে দিলেন! আমি জানিনে বুঝি কিছু ?

কানন দেবী

তরুণ। কিন্তু তখন আমি কি প্ল্যান ঠাওরালুম সেই কথাই খুলে বল সুন্দরী!

মাধবী। তুমি আর কি করবে? সোজা বলে বস্‌লে যে তোমার শরীর খারাপ; ডাক্তাররা বলেছে কিছুদিন গিয়ে চেঞ্জে থাকতে হবে। এই বলে আমায় নিয়ে রওনা হলে আর তোমাদের মেদিনীপুরের জমিদারীর বাংলোয় গিয়ে সোজা উঠ্‌লে।

তরুণ। তারপর গল্পটা কোণ দিয়ে মোড় ফিরল এবার সেই কথা ব্যক্ত কর মাধবী সুন্দরী!

মাধবী। বাস্তবিক, সে রাত্তিরের কথা মনে হলে এখনো গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। নিশুতি রাত। বোধ-করি আজকের রাত্তিরের মতোই নিশুতি হবে। আমরা ঘুমিয়ে আছি; হঠাৎ মনে হল আমাদের কাণের কাছে হাজার অজগর গর্জ্জন করে উঠ্‌ল। আচম্‌কা ঘুম ভেঙে গেল।

তরুণ। হ্যাঁ, পরিষ্কার মনে পড়ছে। বাইরে থেকে কারা চীৎকার করে উঠ্‌ল—বাণ ডেকেছে···হুঁসিয়ার। তাড়াতাড়ি তোমায় নিয়ে বাইরে এলাম।

মাধবী। সে যে কী দৃশ্য জীবনে ভুল্‌তে পারবো না। মনে হল শুধু রাশি রাশি সাদা ফেণা...ফুলে, ফুলে...ফেপে পাগলের মতো মাতামাতি করে ছুটে আস্‌ছে।

তরুণ। ভাগ্যিস আমাদের কাছারী বাড়ীটা একটা উঁচুতে ছিল তাই···কিছুটা সময় পাওয়া গেল।

তরুণ। তাইত তোমায় টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে নৌকোর ওপর লাফিয়ে উঠ্‌লাম।

মাধবী। কিন্তু বাহাদুরী দিতে হয় মাঝি ছুটিকে। ওরা না থাক্‌লে সেদিন যে আমরা বানের জলে কোথায় ভেসে যেতাম···কেউ কাউকে আর খুঁজে পেতাম না! ভাবলেও আমার বুকের ভেতরটা হিম-শীতল হয়ে যায়।

তরুণ। যাহ্‌! সেই মাঝি ছুটো···আব্দুল আর গণেশ তাদের দয়াতেই আমরা পৈতৃক প্রাণ ফিরে পেলাম ···একথা সোজাসুজি স্বীকার করাই ভালো···কি বল মাধবিকা দেবী?

মাধবী। স্বীকার না করবার কোন যো আছে। ভগবান মাথায় বাজ ফেল্‌বেন না?

তরুণ। কিন্তু তোমার গল্প কোন্ পথে ধেয়ে চল্লো সে দিকে লক্ষ্য রেখো—

মাধবী। গল্প আমার চেনা পথে সোজা রাস্তাতেই চলেছে...হোঁচট্ খেয়ে হুমড়ি দিয়ে পড়বার ভয় নেই—

তরুণ। তারপর কি হল তাই বল না—

মাধবী। এই গল্পটা যে আমার মুখ থেকে কতবার কত ভাবে শুনেছ তার আর ইয়ত্তা নেই।

তরুণ। না হয় আরো একবার শোনালে। মুখখানি যে সুন্দর এবং সে মুখে একটুখানি আলো গিয়ে পড়লে যে আরো সুন্দর দেখায় এবং আশে পাশের লোকেরা যে লোভী হয়ে উঠ্‌তে পারে সে বিষয়ে সাবধান করে দেয়া কর্ত্তব্য বলে মনে করি।

মাধবী। যা-ও! যত তোমার আজে-বাজে কথা! এখন আসল গল্প কোন দিকে বাঁক ঘুরলে সেই কথাই শোনো—

তরুণ। বলো! হাজার হোক্ তোমরা ত মায়ের জাত! তোমাদের মুখ থেকে শুন্‌তে সত্যি ভালো লাগে।

মাধবী। সেদিন সত্যি ভগবান আমাকে মা করে দিলেন...বোধ করি চক্ষের নিমেষে! নৌকোর সামনে তোমার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ চোখে পড়ল—এক রাশি ফেনার মাথায় একটি কচি মুখ···আমি পাগলের মতো ছুটে গেলাম···নৌকার সামনের দিকে। তুমি আমার হাত চেপে ধরলে কিন্তু ইতিমধ্যে সেই এক রাশি ফেনা মাখনের ডেলার মত একটি ছেলেকে নৌকোর পাটাতনের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নৌকোর তলা দিয়ে কোথায় লুকোচুরি খেলে পালিয়ে গেল।

তরুণ। সঙ্গে সঙ্গে তুমি ছেলেটিকে বুকে তুলে নিলে আর উঠ্‌লে "গনেশ জননী"!

মাধবী। হলামই ত' সে কি আমার কম গৌরব। সেই দিন থেকেই ত' আমি সত্যিকারের মা।

তরুণ। তারপর আমি কি প্যাঁচ করলাম—যাতে এক ঢিলে দুই পাখী মারা যায় সেই কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করো সুন্দরী।

সাবিত্রী। সবিস্তার আর কি? বুঝি সোজা পিসিমাকে লিখে দিলে···কি লিখলে তা বাপু আমি বলতে পারবো না।

তরুণ। বেশ ত' না পারো আমার হাতে ছেড়ে দাও না কেন। আমি রয়েছি তবে কি করতে? পিসিমাকে লিখলাম, তোমাদের বৌ সন্তানসম্ভবা ছিল...তা আগে প্রকাশ করা হয়নি। এখানে সে নির্ব্বিঘ্নে একটি পুত্র-রত্ন প্রসব করেছে। শ্রীমতীর শরীর এখন অত্যন্ত দুর্ব্বল, তাই আরো ছ'মাস আমাদের এখানে থাকতে হবে।

মাধবী। তারপর পিশিমার টেলী এলো, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে চলে যাবার জন্যে।

তরুণ। কিন্তু আমি তোমাকে শরীরের অজুহাত দেখিয়ে ছটি মাস সেখানে কাটিয়ে একেবারে স্ত্রী-পুত্রসহ পূর্ব্ব পুরুষের ভিটেয় এসে হাজির হলাম।

মাধবী। আর কাল সেই ছেলের মুখে ভাত! শুধু তাই নয়—এক সঙ্গে স্ত্রীকে রক্ষা, সম্পত্তি রক্ষা এবং পিতা বলে পরিচয় দেবার একটা মস্ত বড় সার্টিফিকেট লাভ! নয় কিনা বলো!

তরুণ। কে সে কথা অস্বীকার করছে?

মাধবী। কি আমি যা জিজ্ঞেস্ করলাম···তার ত' কৈ জবাব দিলে না?

তরুণ। কি জিজ্ঞেস্ করলে বল ত?

মাধবী। কাল ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করবে কি দিয়ে?

তরুণ। কেন? রাস্তা ত তুমি দেখিয়ে দিয়েছ। আমি সেই মহাজনের পন্থা অবলম্বন করবো মাত্র।

মাধবী। সেটি হতে দিচ্ছিনি! দশটি মোহর দিয়ে ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করতে হবে এ তোমায় আগেই বলে দিচ্ছি কিন্তু···

তরুণ। কিন্তু সে মোহরে কি ওর মন উঠ্‌বে? আজ যে ও মায়ের স্নেহ পেয়েছে।

মাধবী। পেলেই বা মায়ের স্নেহ! বাপের আশীর্ব্বাদই ছেলের সব চাইতে বড় কাম্য। তা যদি ও না পায় ত' মায়ের স্নেহের কোনো মূল্যই ওর কাছে থাক্‌বে না।

তরুণ হবে গো···হবে।

[এমন সময় হঠাৎ নহবৎ বাজিয়া উঠিল]

মাধবী। নহবৎ! এত রাত্তিরে নহবৎ বাজে কোথায়?

তরুণ। রাত আর নেই মাধবীতা! এখন বোধকরি শেষ রাত্তির। তোমার ছেলের মুখে ভাতে যে নহবৎ তোলা হয়েছে...তারাই বাজাচ্ছে। কেমন সুর! ভৈরো বাজাচ্ছে···শোনো না!

মাধবী। কিন্তু এই নহবতের সুর ছাপিয়ে কে এমন করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে?

তরুণ। কাঁদে? তুমি বলছ কি মাধু? অতি আনন্দে তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। কাল সারাদিন, তোমার ভয়ানক খাটনী যাবে। যাও—ভোর হবার আগে বেশ একটু ঘুমিয়ে নাও।

মাধবী। ঘুম? ঘুম কি আমার চোখে আছে? সে আজ চোখের পাতা থেকে একদম ছুটি নিয়েছে। কিন্তু ঐ সানায়ের আওয়াজকে হাসিয়ে কে এমন করে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে? আমায় জান্‌লা খুলে দেখ্‌তে হল—

তরুণ। তুমি কি পাগল হলে? আমি বল্‌ছি, কেউ কাঁদছে না...! ও হল গিয়ে তোমার সানায়ের বাজনা!

এমন চমৎকার বাজাচ্ছে সানাইওয়ালা! ওকে আমি সত্যি বক্‌শীস্ দেবো—

মাধবী। না—না তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছো না···তুমি ভুল করছ। ও সানাই নয়। কান্নাটা একেবারে বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আস্‌ছে! আমি জান্‌লা খুলবো...আমি দেখ্‌বো···আমার এমন সুখের রাতে এমন করে কে কেঁদে ভাসায়! তাকে আমি শুধাবো...কেন সে এমন করে কাঁদে!

[হঠাৎ ছুটিয়া গিয়া জান্‌লা খুলিয়া দিল। দেখা গেল একটি জীর্ণ-বসনা কঙ্কাল-সার, নারী ঠিক জান্‌লার নীচে একটি থল্ কমলের গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কাঁদিতেছে]

মাধবী। কে তুমি? কি চাও? এমন ভাবে শেষ রাত্রিরে আমার ঘরের জান্‌লায় নীচে বসে কাঁদছ কেন? জানো ওতে আমার ছেলের অকল্যাণ হবে?

তরুণ। তুমি হঠাৎ এত উত্তেজিত হয়ে পড়লে কেন মাধু? ও হয়ত কোনো ভিখিরী··খিদের জালায় কাঁদছে। শুনেছে জমিদার বাড়ী কাঙালী ভোজন হবে তাই শেষ রাত্তিরেই এসে বসে আছে। এসো এসো দরজা বন্ধ করে দাও···

মাধবী। না—না—ও শুধু ভিখিরী নয়! দেখ্‌চ না ওর চোখ···কি যেন ও খুঁজে বেড়াচ্ছে—

তরুণ। ভিখিরী নয়—তবে বোধ্ হয় চোর।

ভিখারিণী। না—না···আমি খেতে আসিনি···আমি যাচ্ছি···

মাধবী। [দৃঢ়কণ্ঠে] দাঁড়াও! যেও না! কি চাও তুমি খুলে বল···

ভিখারিণী! না—না—আমি কিছু চাইনে···আচ্ছা না হয় চলেই যাচ্ছি···

মাধবী। ভয় নেই তোমার।· আমি বুঝ্‌তে পেরেছি তুমি কি বল্‌তে চাও···
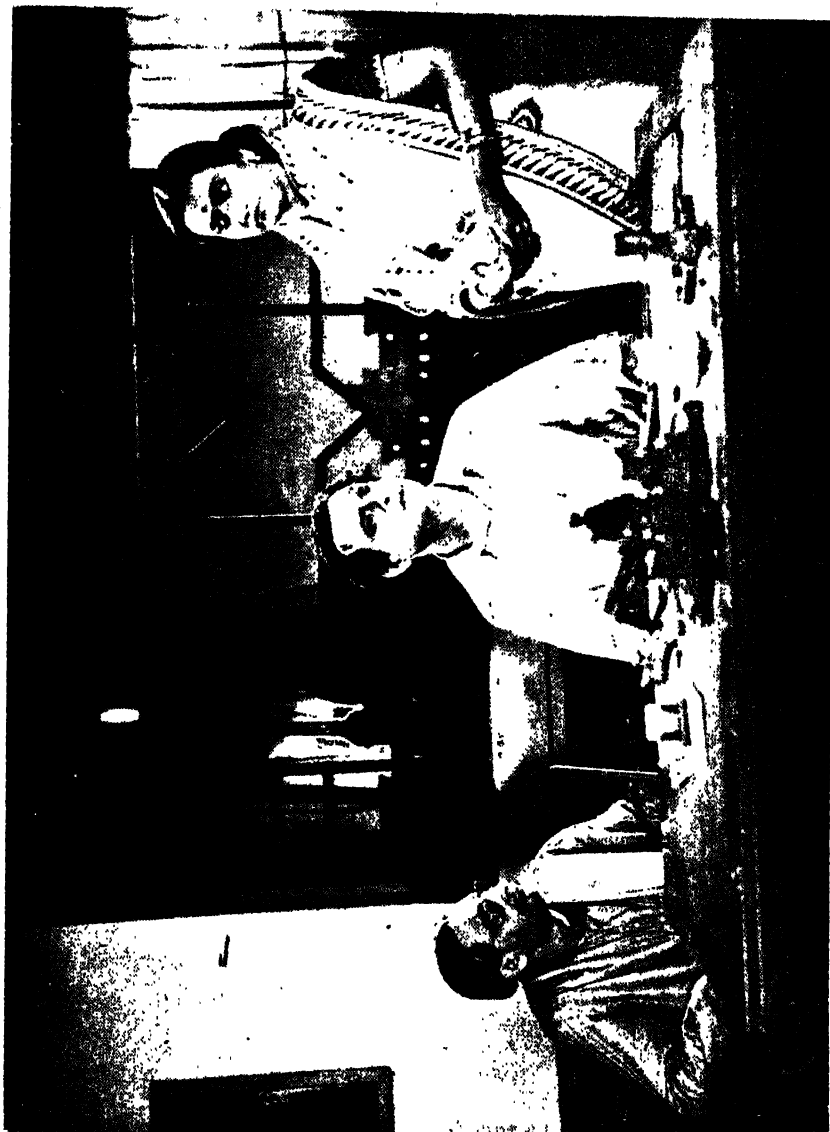
'কলঙ্কিনী'র একটি দৃশ্যে অহীন্দ্র চৌধুরী, জহর ও রেণুকা।

ভিখারিণী। [হঠাৎ ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল] আমি···আমি কি বলব? আমার কথা কি তোমরা বিশ্বাস করবে?

তরুণ। শেষ রাত্তিরে তুমি কি সুরু করলে বল ত? ও নিশ্চয়ই পাগ্‌লী।

মাধবী। না—না—ও পাগ্‌লী নয়···দেখ্‌ছ না ওর চোখ। নিশ্চয়ই ওর কোনো লুকুনো কথা আছে। বল, তোমার কোনো ভয় নেই···

ভিখারিণী। ওই ছেলে—[আর কিছু বলিতে পারিল না···কাঁদিয়া ফেলিল]

মাধবী। ওই ছেলে—! [চরম উৎকণ্ঠায়] বল, কি তুমি বল্‌তে চাও···

ভিখারিণী। [রুদ্ধ কণ্ঠে] ওই ছেলে এই ভিখারিণীর পেটেই হয়েছে মা!

তরুণ। 'শেষ রাত্তিরে পাগ্‌লীর কি আবোল-তাবোল কথা শুনছ···চলে এসো এদিকে···জান্‌লা বন্ধ করে দাও···

মাধবী। না—না—ও যা মুখে বলেছে আমায়, তা' ভালো করে শুন্‌তে হবে। বল ও তোমার ছেলে—

পাগলিনী। হ্যাঁ-মা! আমারই পেটের ক্ষুদ কুড়ো! বন্যার জলে ভেসে গিয়েছিল, জমিদার কাছারীতে গিয়ে শুনলাম তোমরাই পেয়ে নিয়ে এসেছ। খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে এদ্দুর আমি এসেছি।

মাধবী। তোমার ছেলে! তোমার ছেলে! কিন্তু কিসে বুঝ্‌বো যে ও তোমার ছেলে?

পাগলিনী। থুত্‌নীর নীচে একটা জড়ুল আছে মা··· তুমি দেখ্‌লেই বুঝ্‌ছে পারবে।

[মাধবী ছুটিয়া ছেলের দোল্‌নার কাছে গেল। ছেলেকে উন্মাদের মতো বুকে তুলিয়া লইল। তাহার পর কহিল]

মাধবী। হ্যাঁ! ঠিক বলেছ তুমি। জড়ুলইত বটে!

তরুণ। তুমি কি করতে যাচ্ছ বুঝ্‌তে পেরেছ? সরে এসো ওখান থেকে আমি কিছু টাকা দিয়ে পাগ্‌লটাকে বিদায় করে দিচ্ছি—

মাধবী। না—না, তা আমি পারবো না···! মায়ের কোলের ছেলে কেড়ে নিয়ে আমি মা হতে পারবো না। সেজন্যে যদি রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হয় তাও ভালো—এই নাও বাছা তোমার ছেলে নাও।

[ছেলেকে ভিখারিণীর কোলে দিয়ে দিল]

তরুণ। [তীব্র আতঙ্কে] তুমি কি করলে মাধু? কাল যে সত্যি আমাদের গিয়ে পথে দাঁড়াতে হবে।

মাধবী। তোমার হাত ধরে না হয় তাই দাঁড়াবো। [এই বার মাধবী হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তরুণের বুকে লুটাইয়া পড়িয়া কহিল] ওর দিকে আর চেওনা···ও বানের জলে আমার বুকে ভেসে এসেছিল···আবার জলের টানে দূরে সরে গেল!

যবনিকা

বাংলা নাটক ও নাট্যকার

সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

নাটকের সঙ্গে উপন্যাসের খানিকটা সাদৃশ্য আছে—এ দুয়েরই বিষয়-বিন্যাস, ঘটনা-সংস্থান ও চরিত্রসৃষ্টির দিক দিয়ে সেই জন্য উপাদান সংগ্রহ নাট্য আলোচনার প্রধান সূত্র বলে মনে করা যেতে পারে।

শুধু বাস্তব জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নয়, বহির্জগতের প্রত্যেক অভিজ্ঞতাও নাটকের উপাদান। তাই বলে জীবনের প্রচলিত রীতি পদ্ধতি ও আচরণ, সামাজিক আচার বিচার বা বিধি-নিষেধকে মেনে নিয়ে নাট্যকার সহজে হাততালি পেতে পারেন কিন্তু জীবনের জটিল সমস্যা এবং সমাজের চিরাচরিত নীতি অতি প্রাচীন ধর্মভাবকে আঘাত করে নূতন সৃষ্টির পথে চলার মধ্যে নাট্যকারের সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং তার ভবিষ্যত কালের সম্ভাবনা যে অশুভ হয় এমন কথাও বলা যায় না।

নাট্যকারের সঙ্গে নাট্যশালার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা চাই—'a playwright cannot be truley judged except in relation to that stage'—যার জন্য তিনি নাটক লিখে থাকেন। কারণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটকের মধ্যেও এ ইঙ্গিত স্পষ্ট পাওয়া যায়—যে নাট্যকার নাট্যশালার তদানীন্তন অভিনয়-শিল্পীদের কথা ভেবে তার নাটকীয় চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন। এ সম্পর্কের বিশেষ প্রমাণ আমরা পাই সেক্সপিয়রের নাটকে। তার সম্বন্ধে কোন সমালোচক বলেছেন—even his greatest plays show a careful regard for the strength and weakness of the instruments that lay ready to his hand. The world that he lived in, the stage that he wrote for, these have left their mark broad on his plays, সেই জন্যই কোনো সমালোচক যদি "Philosophial Vacuum" থেকে কোনো নাটকের সমালোচনা করেন তাহলে নাট্যকারের উপর সুবিচার করা হবে না। নাট্যকার সম্বন্ধে বলা যায় যে, "he must be bred in the tiring room (dressing room) and on the stage". স্থান কাল পাত্র কার্য্যকলাপ (unity of place, unity of time, unity of impression" এই নাটক লেখার পক্ষে এগুলি যে অনিবার্য্য নীতি এ সম্বন্ধে আমরা বহু আলোচনাই এ যাবৎ করেছি কিন্তু আমি বলব যদি চরিত্রগুলি ঘটনাপরম্পরা ও সংঘাতের ভিতর দিয়ে সুপরিণতি লাভ করে—তাহলে অত বাঁধাধরার মধ্যে না গলা বাড়িয়ে দিলেও চলতে পারে। গ্রীক নাটকে আমরা পেয়েছি "unity, severity of structure, freedom from excess, the beauties of simplicity and order" অর্থাৎ সঙ্গতি ও সংহতি, গঠন সম্বন্ধে কঠোরতা, অত্যুক্তি বা অবাধ কল্পনা পরিহার, সরলতা ও সংযমের সৌন্দর্য্য। কিন্তু সে কাল এখন কেটে গেছে। যে যুগে আজ আমরা এসে পৌচেছি—তাতে এই পরিবেশ, এই মানসিকতা, এই অনুভূতি ও ঘটনা সংঘাতের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার কথাই এখন নাট্যকারকে ভাবতে হবে। আগের দিনের বিদগ্ধ মণ্ডলি বলতেন—nature as a model of thrift and restraint অর্থাৎ প্রকৃতি হচ্ছেন মিতাচার ও সংযমের আদর্শ মূর্ত্তি—কিন্তু এখন আমরা প্রকৃতিকে অন্য চোখে দেখতে পেয়েছি—তার অত্যাশ্চর্য্য আসল রূপের মধ্যে—"the true nature, the goddess of wasteful and ridiculous excess, who pours forth without ceasing, at all times

জাপানের বৃথা আস্ফালন, হিটলারের হৃদয়হীনতা, রাশিয়ার রণক্ষেত্রের খবর, বৃটিশের দুর্জ্জয় সংগ্রাম, মানুষের হাসি-কান্না গান ও আর্ত্তনাদ কোথা হ'তে ভেসে আসছে—চলে গেছি যেন এক সঙ্গে সব পাওয়ার দেশে, মেজকাকা যুদ্ধের খবর ভালবাসেন, কাকীমা ভালবাসেন কীর্ত্তন, বাড়ীর কেউ বলছেন মেয়েদের আসরটা ভাল, ছোটদের আসরের ভক্তেরও অভাব নেই—নাটক হ'লে হরবিলাস আর কিছু চায়না, গজল-গান শুনতে পাগল আমাদের পাশের বাড়ীর রঞ্জনবাবু, বাড়ীর প্রতিদিনের মজলিসের সভ্যদের নানা ফরমাসি আনন্দ তুরস্ক কিম্বা তীব্বত, বোম্বাই অথবা বার্লিন থেকে রেডিও বেছে বেছে নিয়ে আসছে, মনে আসা-সুর-গুঞ্জন মধুরতম স্বরের মাদকতায় প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠছে—আধুনিক জীবন বুঝি রেডিওকে বাদ দিয়ে কল্পনাই করা যায় না। যুদ্ধে কিম্বা জমজমে বাড়ীতে, আড্ডায় কিম্বায় আসরে ভালবাসায় অথবা শত্রুতায়, হতাশায় কিম্বা হর্ষে রেডিও চাই।

and in the most unlikely places, her enormous and extravagant gift of life" অর্থাৎ নাটকের গল্পাংশের উপাদান—shapeless, grotesque, inanimate, like a stone rejected by the curious builders who seek for severity of form. But Nature does not despire it. এ সম্বন্ধে ব্রাউনিংএর কথাগুলি এখানে বেশ জুতসই লাগে।

How long does it lie,
The bad and barren bit of stuff you kick,
Before encroached on and encompassed round
With minute, moss, weed, wild flower—
made alive
By worm and fly and foot of the free bird?

উপাদান যাই হোক না কেন—নাট্যকার আপনার সৃষ্টির তুলি দিয়ে রঙ ফলিয়ে সেই 'barren ugliness'কে দেবেন নূতন রূপ।

শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের গুণই হচ্ছে বিস্ময় সৃষ্টির শক্তি,—অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা তিনি এমন কথা বলান, এমন দৃশ্যের অবতারণা করেন, এমন পরিবেশ ও এমন মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে চমক লাগিয়ে দেন যে মনে হয়—তিনি মানুষের যুক্তি ও সঙ্গত অসঙ্গতের তর্ককে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছেন অথচ তাঁকে এতটুকু বিসদৃশ, অস্বাভাবিক মনে হবে না—মনে হবে এই ত স্বাভাবিক—"He is most natural when upsets all rational forecasts".

গত দশ বৎসরের মধ্যে মাত্র কয়েকখানি নাটক ছাড়া (নাট্যে রূপায়িত উপন্যাসের কথা আমি বলছি না) মূল নাটকের কথাই বলছি) এমন কোনো নাটকই রচিত হয়নি, যাতে আমরা বলতে পারি যে, নাট্যকার দর্শকের মনের কল্পনা বা পূর্ব্বাভাস ছাড়িয়ে চলে যেতে পেরেছেন—যেখানে আমরা তাঁকে অভিনন্দিত করতে পারি। নাটক লিখে ইদানিন্তন যারা নাম করেছেন—তাঁদের মধ্যে শচীন সেনগুপ্ত ও বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের নাম করতে হয় সকলের আগে। ডাঃ মিস্ কুমুদিনীর কেস্ ডিস্‌মিস করলেও, অয়স্কান্ত বক্সীর ভোলা মাষ্টার এ পর্য্যন্ত অনেক হাততালি পেয়েছে এবং তার উপাদানের দিক থেকে যে possible impossibility এই নাটকে আছে তার পরিণতি মনকে পীড়া দেয়—একটা অস্বস্তি ও গ্লানি বোধ হয় ভোলা মাষ্টারের জন্ম, কাজেই নাট্যরসকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা যায় না। তবুও এই নাটকের উপাদান ও প্রতিবাদ্য বা মূল তাৎপর্য্যের বিষয় প্রশংসনীয়। শচীন সেনগুপ্তের নাটকগুলির মধ্যে তার সমাজ, দেশ, ব্যক্তির ও পরিবর্ত্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর যেমন আভাস পাই, তেমনি আভাস পাই তাঁর দেশপ্রীতি ও ব্যক্তিমানুষের প্রতি সমবেদনার। তাঁর নাটকের গতি আছে, ভাষা ও ভাবধারণা তার উচ্চগ্রামে ওঠে কিন্তু সমস্যাকে নাটকীয় ঘটনাসংস্থানে ফুটিয়ে তোলার যে স্বাভাবিক প্রতিবন্ধকতা আছে—তা থেকে সব জায়গায় যে তিনি কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন এমন কথা জোর করে বলা যায় না। বিধায়ক ভট্টাচার্য্য প্রধানতঃ যে সকল উপাদান নিয়ে এ পর্য্যন্ত নাটক রচনা করেছেন—তার মধ্যে বর্ত্তমান সমাজের নগ্নমূর্ত্তি দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন সংস্কারের সঙ্গে বর্ত্তমান জীবনের যে সঙ্ঘর্ষ, প্রাচীন আদর্শ ও নীতির মধ্যে বর্ত্তমান নরনারীর আচার-আচরণের যে অবিরাম সংগ্রাম চলছে, বিধায়ক তাই নিয়েই অনেক নাটক লিখেছেন। বস্তুজগতে রক্তমাংসের মানুষকে তিনি তাঁর পটভূমিকায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, তার দুর্ব্বলতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও স্খলন দেখিয়ে। কিন্তু তাদের বিড়ম্বিত, বিক্ষুব্ধ ও নিরুপায় অবস্থার প্রতি তাঁর যে সমবেদনা আছে, এটা বুঝতে কষ্ট হয় না। বিধায়কের নাটকগুলি দেখতে গিয়ে এই কথাই মনে হয় যে, তিনি প্রচলিত রীতি-পদ্ধতিকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছেন। আমাকে বিশেষ ভাবে

মুগ্ধ করে তার নাটকের সুন্দর ভাষা এবং সুসংযত সুস্পষ্ট সংলাপ।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্ত কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছেন। কেবল কঙ্কাবতীর ঘাট ছাড়া নাটকীয় রস পরিবেশনে তিনি খুব উচ্চ প্রশংসা পেয়েছেন একথা শুনিনি। ঐতিহাসিক এবং গত যুগের নাটকীয় আদর্শের প্রেরণাই তার মধ্যে প্রবল বলে মনে হয়। মহারাজ নন্দকুমার দেখে এই কথাই আমার বার বার মনে হয়েছে যে মহেন্দ্র গুপ্ত সামাজিক মানুষ হিসাবে একটু আত্মকেন্দ্রী হয়ে পড়েছেন নতুবা নাটক দেখতে গিয়ে নাট্যকারের সান্নিধ্য অনুভব করতে পারি না কেন। যে চিন্তা নাট্যকারকে তাঁর নাটকীয় মানুষ ও সমাজের প্রতি সহজ শ্রদ্ধায় উদ্বুদ্ধ করে দেয়—সে চিন্তা করবার প্রয়োজন তিনি মনে করলে তার মহারাজ নন্দকুমার নাটকে ব্যক্তি ও সমাজবিশেষের প্রতি নিরর্থক উক্তি শুনতে পেতাম না। শব্দ প্রয়োগ ও ভাষাবিন্যাসের তারতম্যের উপর নাটকের শ্রেণীবিভাগ নির্ভর করে একথা তাঁকে মনে করিয়ে দিতে হল বলে আমি দুঃখিত।

বাঙলার বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকগুলির সম্পর্কে বল্‌তে গেলে অনেক কথার অবতারণা করতে হয়। কাজেই আমি সংক্ষেপে বৈঠকী আলাপের মতই এই আলোচনা করতে প্রলুব্ধ হয়েছি।

মোটামুটি প্রহসন বা হাস্যরসাত্মক নাটক বল্‌তে খুব কমই আপাতত রচিত হয়েছে বা অভিনীত হয়েছে। আমাদের জীবনে আছে ভরপুর কান্না,—হাসি ঠাট্টা বা অনাবিল তামাসা বা বিদ্রূপ করার সুযোগ সুবিধা আমাদের জীবনে কম বলেই বোধ হয় নাটকের অভাব হয়েছে।

প্রহসন হলেই যে তার মধ্যে সঙ্গতি, পারম্পর্য্য ও সুষ্ঠু পরিণতি থাক্‌বে না এমন কথা বলা অসঙ্গত।

এই পর্য্যায়ের নাটক লিখে কিছুটা যশস্বী হয়েছেন জলধর চট্টোপাধ্যায়—তার পি-ডব্লু-ডি নাটকে, কিন্তু সে নাটকের মধ্যে পরিণতি ও পারম্পর্য্যের অভাব আছে। ইংরাজিতে যাকে বলে Satire সে নাটকের একান্তই অভাব আমাদের দেশে আছে। ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপের কশাঘাতে সমাজের চোখ খোলে কিন্তু স্কুল মাষ্টারের বেত্রাঘাতে ছাত্র যেমন বিগ্‌ড়ে যায়—সমাজও তেমনি মুখ বেঁকিয়ে চলে যায়—তার সম্বিৎ ফিরে আনতে হলে চাই দরদ—লজ্জা পেয়ে মন যদি বিদ্রোহী হয়ে না ওঠে, নিজেকে ফিরে পাওয়ার জন্য মানুষ সচেষ্ট হয়—তাহলেই বুঝতে হ'বে—ব্যঙ্গের রস যেমন ফুটেছে—তার উদ্দেশ্যও সফল হয়েছে ষোল আনা। 'A laugh that hurts nobody' Cowperএর একথাটা প্রণিধান যোগ্য। তিনি তাঁর রচিত কবিতা John Gilpin সম্বন্ধে Rev. Wilhim Unwinকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে বলেছিলেন—I little thought when I was writing the history of John Gilpin that he would appear in print—I intended to laugh and to make two or three others laugh of whom you were one. But now all the world laughs, at least if they have the same relish for a tale rideculous in itself, and quaintly told, as we have—well—they do not always laugh so innocently or at so small an expense—for in a world like this, abounding with subjects for satire, and with satirical wits to mark them, a laugh that hurt no body has at least the grace of novelty to recommand it.

ব্যঙ্গ বিদ্রূপের যে পাত্র তার প্রতি সহানুভূতি না থাকলে সে নাটক লেখাই বিফল—কেন না মানুষের দুর্ব্বলতা তার ত্রুটি বিচ্যুতি দেখ্‌লে মনটা বিষণ্ণ হওয়াই স্বাভাবিক,—সমবেদনার উদ্রেক হওয়া উচিত আপনা থেকেই—The most ludicrous lines have been written in the saddest mood.

১৯০৫ সাল থেকে এ পর্য্যন্ত আমাদের এই হতভাগ্য দেশে ব্যঙ্গ করার মত বৃহৎ কিছু না ঘটলেও জাতীয় আন্দোলনের তরঙ্গ একাধিকবার উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। প্রেস আইনের কড়া শাসন আমাদের স্পষ্ট কথা ও সত্য কথা বলার পথে বহু বাধার সৃষ্টি করে আছে—কিন্তু তবুও আমরা আমাদের নাটকে যে অল্পাধিক জাতীয়তা বোধের আভাস পেয়েছি—তা'তে আমাদের মন ভরেনি সত্য কিন্তু তার যে প্রয়োজন আছে একথা আমরা বোধ হয় সকলেই অনুভব করেছি। জাতির মেরুদণ্ডে আজ আঘাত লেগেছে, নূতন করে দেশে এসেছে আজ এমন দুর্দ্দশা, এমন দুর্গতি, এমন গ্লানি ও বিড়ম্বনা—যার কথা কোনো ইতিহাসে নাই, মানুষের কল্পনারও বাহিরে। এই বিপর্য্যস্ত সমাজ, দীর্ণ-বিদীর্ণ নরনারীর জীবন নিয়ে কে নাটক রচনা করবে? উপাদান যা এসে স্তূপিভূত হয়ে পড়ল আমাদের চোখের সামনে ঘরের আঙিনায় তার আকার দেখে শিউরে উঠ্‌তে হয়—কিন্তু এও মনে হয়—এমনি দিনের এই দুর্ভাগা জীবন নিয়ে নাটক রচনা করার মত শক্তিশালী নাট্যকার কি সত্যই আমাদের দেশে নাই?

একতীর্থা

সুবোধ ঘোষ

শনিবার দিনটা বীণা দিদিমণির কাছে ব্রত-পার্বনের মত। তেমনি আয়োজন উৎসাহ আর নিষ্ঠা—আনন্দের প্রসাদও কিছু কম নয়। বেলা দেড়টার সময় স্কুলের ছুটী হবে। সোজা গিয়ে হোষ্টেলে তাঁর সাজানো ঘরটাতে ঢুকবেন। একখানা দুধে গরদের সাড়ী পরবেন। নরম দেখে একটা ক্যাম্বিসের জুতো পায়ে দেবেন। কোন প্রয়োজন নেই, তবু ছাতাটা নিতে ভুলবেন না। নিকেলের ফ্রেমের চশমাটা পরা চাই-ই—সেটার প্রয়োজন আছে। তারপর বের হবেন। প্রথমে গৌরীদের বাড়ী, তারপর লীলাদের বাড়ী—সেখান থেকে পর পর শান্তি আর অর্চনাদের বাড়ী। চারটী মেয়েই তাঁর ছাত্রী। শনিবার দিন সিনেমাতে গিয়ে একটা ছবি দেখতেই হবে—না দেখলে চলে না। সে ছবি বাংলাই হোক, আর ইংরাজীই হোক্—হিন্দী হলেই বা আপত্তির কী আছে? একা ছবি দেখে সুখ হয় না বীণা দিদিমণির। শিষ্যা কয়টী সঙ্গে থাকে।

বুড়ো মানুষ বীণা দিদিমণি—বিধবা ও নিঃসন্তান। স্কুলটাতেই ত্রিশটী বছর পার করে দিলেন। স্কুলবাড়ীটা যখন একটা আটচালা ছিল মাত্র আর ছাত্রী ছিল ষোলটী—তখন থেকেই তিনি আছেন। এখন না হয় এত বড় একটা দালানবাড়ী হয়েছে—ডবল এম-এ মিস্ নিয়োগী হেড মিষ্ট্রেস রয়েছেন। আরও তেরটী টীচার আছেন।

হোষ্টেলের সবচেয়ে ভাল ঘরটী বেছে নিয়েছেন বীণা দিদিমণি। মিস্ নিয়োগী যেটায় থাকেন—সেটা আরও ছোট ও দেখতে খারাপ। যেদিন ইনস্পেকট্রেস্ আসবার কথা থাকে—সেদিন সকাল থেকে টীচারদের মধ্যে সাড়া আর কাজের তাড়া লেগে যায়। বীণা দিদিমণি সেদিনও নিশ্চিন্ত মনে, নিরুদ্বেগ প্রশান্তির সঙ্গে সাড়ে দশটার সময় স্নানাহার সেরে বিছানার ওপর আর একবার গড়িয়ে পড়েন। মিস্ নিয়োগী খবর পেয়ে বিরক্ত হয়ে বীণা দিদিমণির ঘরে এসে ঢোকেন!—এ কী? দিব্যি শুয়ে পড়ে আছেন? উঠুন এখন, ক্লাসে গিয়ে বসুন।

বীণা দিদিমণি মিস্ নিয়োগীর দিকে একবার তাকিয়ে গা-মোড়া দিয়ে পাশ ফেরেন। হাত তুলে তাকের ওপরে হাতপাখাটা দেখিয়ে দেন। বলেন—এই ঘাড়ের কাছটায় একটু বাতাস কর্‌তো ভুতি।

মিস্ নিয়োগীর সঙ্কট আর বিরক্তি চরম হয়ে ওঠে। পাখাটা নিয়ে উগ্র উৎসাহে ঝট্‌পট্ করে কিছুক্ষণ বাতাস করেন। তারপরেই শশব্যস্তে চলে যান—এগারটা বাজে প্রায়, ইনস্পেকট্রেস আসতে আর দেরী নেই।

বীণা দিদিমণির ছেলেবেলার বন্ধু গীতা। গীতা আজ দশ বছর হলো মারা গিয়েছে। গীতার স্বামী মিষ্টার নিয়োগী মারা গেছেন পনের বছর আগে। সেই গীতার মেয়েই হলো মিস্ নিয়োগী। বীণা দিদিমণি আজও তাঁকে ভুতি বলেই জানেন। ভুতিকে তিনি এতটুকু দেখেছেন। সেই মেয়েই আজ হেড মিষ্ট্রেস হয়েছে। তাতে হয়েছে কি?

বীণা দিদিমণি বেশ আছেন। সিনেমাতে ছবি দেখার বাতিকটা তাঁর নতুন। হাউসটাই তো বছর পাঁচেক হলো হয়েছে। এর আগে গ্রামোফোনের রেকর্ড শোনার সখ ছিল বীণা দিদিমণির। তার আগে পড়তেন উপন্যাস। তার আগে শুধু চিঠি লিখতেন—চেনা, আধ-চেনা, একেবারে অচেনা—কোন একটা সম্পর্ক আর প্রসঙ্গ পেলেই তাদের চিঠি লিখতেন। সংসারে আপন বলতে কেউ ছিল না, তাই চিঠির জাল ছড়িয়ে বিরাট একটা আপনত্বের সংসার ছেঁকে ধরেছিলেন। দিস্তা দিস্তা কাগজ আর ডজন ডজন টিকিট উজাড় করে সেই চিঠির পৃথিবীকে ধরে রাখলেন প্রায় দশটা বছর। লিখতেন

হিমকল্যাণ
আয়ুর্ব্বেদোক্ত
মহোপকারী
সুরভিত কেশপ্রসাধন !
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস·কলিকাতা

—ডিহীরীতে অবনীবাবুকে, কোন্নগরে সাবিত্রীকে, রহমতগঞ্জে গীতাকে···আরও কত কাকে কে জানে? ট্রেণে যেতে আলাপ হলো এক নবদম্পতির সঙ্গে – মীরাটের ডাক্তার শচীন রায় ও তাঁর স্ত্রী চপলা। জীবনে দ্বিতীয়বার আর এঁদের সঙ্গে বীণা দিদিমণির দেখা হয়নি—তবু তিনটী বছর ধরে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত চিঠির বন্ধনে অন্তরঙ্গ করে রাখলেন তাঁদের। চপলার ছেলেব অন্নপ্রাশন পর্য্যন্ত খবর পেয়েছিলেন—তারপর আর কিছু জানেন না।

তারও আগে শুধু ব্রত করার বাতিকে পেয়েছিল বীণা দিদিমণিকে। এই সব পুরাণো ইতিহাসের ঘটনা শুনতে শুনতে প্রায় তার চল্লিশ বছর আগের কথা এসে পড়ে। তখন সবে একটী বছর মাত্র হয়েছে—স্বামী হারিয়েছেন বীণা দিদিমণি।

এখন বীণা দিদিমণির শরীর অশক্ত, স্কুলের কাজে ত্রুটী হয়। এর জন্য তাঁকে কিছু বলে লাভ নেই। বেশী কিছু বলতে গেলে চরম জবাব শুনিয়ে দেবেন—আমার স্কুলের ভাল মন্দ আমি বুঝবো।

স্কুলটা যে তাঁর নয়, কোন কালেই ছিল না—এই সত্যটা তাঁকে বুঝিয়ে বলবে কে?

বীণা দিদিমণির কাছে ছাত্রীরা কত কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে গৌরী লীলা শান্তি আর অর্চনা। স্কুলের মধ্যে বড় মেয়ে বলতে এরাই চার জন।

গৌরীর পিউরিটান দাদা সিনেমা দেখা পছন্দ করে না। লীলার মেজ কাকা কৃপণ মানুষ—সিনেমায় সমস্ত পয়সার অপব্যয় সইতে পারেন না। লীলার বাবা সব সময় কাজে ব্যস্ত—একটুও সময় নেই যে মেয়েদের ছবি দেখাতে নিয়ে যান—ইচ্ছে থাকলেও। অর্চনার বাড়ীতে পুরুষ অভিভাবক কেউ নেই। ওরা মায়ে-ঝিয়ে দুজনেই বিধবা। অর্চনার মা জপ তপ নিয়েই আছেন। স্কুল ছাড়া অর্চনাও বাকী সময়টুকু এমব্রয়ডারীর কাজ নিয়ে জপে সেরে দেয়। তের বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল অর্চনার, সাড়ে তের বছরে বিধবা হয়েছে। মায়ের প্রেরণায় সত্যি করে জপ তপ ধরবে ধরবে—এইরকম একটা দ্বিধা আর আগ্রহেব সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছে গেছে।

এই সব বিপত্তিকে ঠেকিয়ে রেখেছেন বীণা দিদিমণি। চারটী শিষ্যার সিনেমা দেখার সব দায় তিনি নিজেই বরণ করে নিয়েছেন। টিকিট কেনার খরচ তিনিই বহন করেন। ছাত্রীদেব বাড়ী থেকে নিয়ে যান, পৌঁছে দিয়ে আসেন। স্বয়ং উপস্থিত থেকে সাজ সজ্জার নির্দ্দেশ দেন। বীণা দিদিমণির পছন্দ না হলে, সাড়ী বদলাতে হয়। গৌরীকে লালরঙা সাড়ী কিছুতেই পরতে দেন না। শান্তিকে সিল্ক পরতে দেন না।

কোন অভিভাবকের কোন আপত্তি টিকতে পারে না। বীণা দিদিমণি চান বাড়ী ঘুরে চারটী শিষ্যা নিয়ে সগর্বে ও সহর্ষে সিনেমা-যাত্রায় বার হন। বীণা দিদিমণির এই এক বাতিক। এই বয়সে মানুষে তীর্থ-যাত্রা করে। রাত্রি নটার পর কিরণবাবুদের বাগানের পাশ দিয়ে একটা জলন্ত টর্চ হেলেদুলে চলে যায়। বীণা দিদিমণি তাঁর শনিবারের তীর্থ সেরে হোটেলে ফিরছেন। বুড়ো মানুষ—একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটেন।

হাউস ভরা দর্শক ও দর্শকা। তারই একটী অংশে বীণা দিদিমণি—দুপাশে চারটী শিষ্যা। জনতার মাঝখানে যেন নিজের একটা দরবার তৈরী করে সর্বেশ্বরীর মত বসে থাকেন বীণা দিদিমণি। মোটা মনিব্যাগটা দিদিমণির কোলের উপরেই পড়ে থাকে। গৌরী লীলা শান্তি আর অর্চনার যত রকম দুর্বুদ্ধির খোরাক যোগাতে ব্যাগটা ক্রমশঃ চুপ্‌সে আসে। চার প্যাকেট বাদাম খাওয়া শেষ হতে না হতেই শান্তি তেষ্টায় ছটফট করে ওঠে। লেমনেড আসে। অর্চনা দু'বার হাঁচে—এক কাপ চা আসে। তারপর আরও তিন কাপ।

বীণা দিদিমণি বলেন।—কী আরম্ভ করলে তোমরা? খাবে না ছবি দেখবে?

ছবি আরম্ভ হবার আগেই বীণা দিদিমণি বলেন,—চশ্‌মাটা একটু মুছে দাও তো শান্তি।

শান্তি বীণা দিদিমণির নাক থেকে তখুনি চশমাটা তুলে নেয়। গৌরী মুখের ভাপ দিয়ে কাঁচটা বাষ্পধৌত করে। লীলা আঁচল দিয়ে ঘসে ঝক্‌ঝক্‌ করে দেয়। অচনা চশমাটা আবার দিদিমণির নাকের উপর বসিয়ে দেয়।

ছবি আরম্ভ হয়ে যায়। ঐ নগণ্য একটা সাদা পর্দার ওপর মুহূর্তের মধ্যে কী বিচিত্র এক আলোক-কণিকার উৎসব জেগে ওঠে। শব্দে রূপে ও গতিতে মূর্ত কোন এক অদৃশ্য গ্রহবিচ্ছুরিত সুখ দুঃখ—বিরহ মিলন ও পতন অভ্যুদয়ের কাহিনী নৃত্য করতে থাকে। অলীক বাস্তব হয়ে যায়।

দেবদাসী অম্বালিকার গোপন প্রেমের কীর্তি ধরা পড়ে গেছে। মন্দিরের গায়ে মূর্তি উৎকীর্ণ করতো তরুণ একটি ভাস্কর—মাধব তার নাম। অম্বালিকার জীবনযৌবন মাধবের প্রেমে বাঁধা পড়ে গেছে। মন্দিরাধীশ শ্রীধর ভট্টেশ্বর অপমানে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। কত নিশীথে মণিমাণিক্যের ডালা নিয়ে অম্বালিকার অনুরাগ ক্রয় করার চেষ্টা করেছেন। সবই ব্যর্থ হয়ে গেছে। দেবদাসীর সেই ঔদ্ধত্যকে ক্ষমা করতে পারেন না তিনি। তাই শাস্তির আয়োজন হয়েছে। মন্দিরের গোপন একটী প্রকোষ্ঠে শতাধিক লম্পটের এক আসরে অম্বালিকাকে নাচতে হবে—বিবস্ত্রা হয়ে।

অম্বালিকার মুখে উগ্ররকমের একটা শ্রী ফুটে উঠেছে। বিভোর হয়ে নেচে চলেছে। নাচতে নাচতে আজ যেন সে ফুরিয়ে যাবে। আজ যেন নেচে নেচেই আত্মহত্যা করবে অম্বালিকা। নূপুরগুলি ছিঁড়ে ছিটকে পড়েছে।

অম্বালিকা হঠাৎ এক হিংস্র আক্রোশে একটা থাবা দিয়ে তার বুকের নীল নিচোল খিমচে ধরলো—আর এক হাতে নীবিবন্ধ। একটী নিষ্ঠুর টানে অম্বালিকা এখনি ছিন্নভিন্ন করে দেবে সেই লজ্জার শেষে আবরণটুকু।

বীণা দিদিমণির তন্ময়তা সতর্ক হয়ে উঠলো দুপাশে শিষ্যাদের দিকে একবার তাকালেন। স্থির নক্ষত্রের মত সবারই চোখে কৌতুহল ফুটে রয়েছে। সিনেমার পর্দায় কাহিনীর সেই প্রচণ্ড পরিণামকে বরণ করার জন্য যেন সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে।

বীণা দিদিমণির সুগম্ভীর আদেশ বেজে উঠলো।—গৌরী লীলা, চোখ নামাও। শান্তি অর্চনা, চোখ নামাও। আবার যখন বলবো, তখন দেখবে। চোখ নামাও সবে।

দুপাশে সুবাধ্য শিষ্যা চারটী পর্দা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মেজের দিকে তাকিয়ে রইল। চারটে অবনত মুখ মিচ্‌কে মিচ্‌কে হাসছিল। শান্তি একবার খুব সাবধানে ঘাড়টা বেঁকিয়ে বীণা দিদিমণির দিকে তাকাবার চেষ্টা করলো। দিদিমণি আস্তে গর্জন করে উঠলেন।—কী হচ্ছে অবাধ্য মেয়ে!

মাত্র পাঁচটী মিনিট এই অধোবদন দশা। দিদিমণি বললেন।—হ্যাঁ, এইবার দেখতে থাক।

গৌরী বললো।—আর দেখে কী হবে? মাঝখানে এরকম ভাবে বাদ পড়ে গেলে গল্পটা কী আর বুঝবো?

দিদিমণি।—খুব বুঝবে, এমন কিছু ঘটেনি। মাধব হঠাৎ পৌঁছে গিয়ে অম্বালিকার মান বাঁচাবার জন্যে ওড়নার মত একটা কাপড় দিয়ে অম্বালিকাকে ঢেকে দিল। অম্বালিকা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। ছুটো প্রহরী এসে মাধবকে বন্দী করলো। মাধবেরই বিচার আরম্ভ হয়েছে—দেখ সবাই। দেখে যাও গোল করো না।

গৌরী আর লীলা—দুজনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। দুজনেই শ্বশুরবাড়ী চলে গেছে। বীণা দিদিমণির সিনেমা সঙ্গিনী মাত্র ছুটী—শান্তি আর অর্চনা।

দিদিমণি বলেন।—গৌরী আর লীলা আবার আসবেই তো; কিন্তু কে জানে কবে? আবার বেশ স্ফূর্তি হবে একসঙ্গে, কী বল শান্তি?

শান্তি আর অর্চনা একসঙ্গে উত্তর দেয়—হ্যাঁ, দিদিমণি।

কিছুদিন পরেই শনিবারের সিনেমাব্রত আবার আগের মত ফূর্তিতে প্রবল হয়ে উঠলো। বীণা দিদিমণি খবর পেয়েছেন—গৌরী আর লীলা শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে। দিদিমণি দুপুর থেকেই এসে ভিড়লেন। দেখলেন, গৌরীর চেহারাটা গিন্নিগোছের হয়ে গেছে। লীলা আরও সুন্দর হয়েছে।

গৌরীর সামনে দাঁড়িয়ে একেবারে স্পষ্ট ক্ষমাহীন নির্দেশের সুরে বীণা দিদিমণি বললেন,—নাও, আর দেরী করো না। বাক্স খোল। বরের চিঠি দাও।

গৌরী বার বার করুণভাবে অনুনয় করলো।—এর পরের চিঠিটা আসুক, নিশ্চয় দেখাবো দিদিমণি।

অবিচল দিদিমণি বললেন—না, আজ যেটা এসেছে, আমি সেটাই পড়বো।

লীলার অদৃষ্টেও তাই ছিল। লীলা প্রায় কেঁদে ফেললো। খুড়িমা লীলাকে ধমক দিয়ে বললেন,—কী হয়েছে তাতে? বুড়ো মানুষ, এত ভালবাসে বলেই দেখতে চাইছেন চিঠিটা। কোন দোষ নেই তাতে।

খুড়িমা হাসি চেপে অন্য ঘরে চলে গেলেন। বীণা দিদিমণি আদ্যোপান্ত চিঠি পড়লেন। ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, বড় খুসী হলাম। বেশ ভাব হয়েছে, এই ত চাই।

আবার চারটি শিষ্যা নিয়ে বহুদিন পরে সিনেমায় ছবি দেখতে বসলেন বীণা দিদিমণি।

"তপন নামে সুশ্রী সুন্দর ভদ্রলোকের ছেলেটী মিথ্যা দুর্নামের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে সত্যি সত্যিই একটি পাপের ঘরে এসে ঢুকেছে, যাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো, সেই স্নিগ্ধাও এই মিথ্যা দুর্নামকে বিশ্বাস করে ভালবাসা ভেঙে দিয়েছে। তাই মতি বাইজীর ঘরে মদের পেয়ালায় চুমুকে চুমুকে উৎসব রাত্রি প্রমত্ত হয়ে উঠছে। মতি বাইজী এগিয়ে এসে বসেছে তপনের কাছে! তার হাতে একটি গেলাস—সফেন রঙীন মদ টলমল করছে। আর একটি হাত লালসার আমন্ত্রণ নিয়ে ধীরে ধীরে আগ্রহে ফণিনীর মত তপনের গলা জড়িয়ে ধরবে—বুকের কাছে টেনে আনবে।"

বীণা দিদিমণি উসখুস করে উঠলেন। কিন্তু শিষ্যা চার জন ততক্ষণে চোখ নামিয়ে ফেলেছে।

দিদিমণি বললেন,—উহুঁ, গৌরী, লীলা, তোমরা দেখ। চোখ নামাতে হবে না। শান্তি, অর্চনা, চোখ নামাও। যখন বলবো, তখন আবার…।

গৌরী আর লীলা হাসতে হাসতে আবার ছবি দেখতে লাগলো। আড়চোখে শান্তি আর অর্চনাকে একবার দেখে নিল। করুণা হলো।

নতমুখী শান্তি গৌরীকে চিমটি কেটে ফিস্‌ফিস্ করে শুনিয়ে দিল,—হাসতে হবে না তোমাদের। সবে পরশু দে'

প্রেম সংগীতে

শ্রীমতী নীনা

বিয়ে হয়েছে—এরই মধ্যে লাইসেন্স পেয়ে গেছ। দিদিমণির বিচারটা দেখলে অর্চনা?

অর্চনা।—দিদিমণি সুবিচারই করেছেন। তুমি মিছে ওদের হিংসে করছো।

শান্তিকে আর বেশীদিন হিংসে পুষে রাখতে হয়নি। অঘ্রাণেই বিয়ে হয়ে গেল। একমাস শ্বশুরবাড়ীতে থেকে চলে এল।

বীণা দিদিমণির তদন্ত আর চিঠি-তল্লাসী বাদ পড়লো না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব না শুনে ছাড়লেন না। ঘরভরা লোকের সামনে শান্তিকে আচ্ছা করে ধমকে নাজেহাল করলেন দিদিমণি। —এরই মধ্যে বরের সঙ্গে একবার ঝগড়াও করেছ গবেট মেয়ে। খবরদার, ওসব যেন আর হয় না। দুটীতে খুব মিলে মিশে থাকবে।

সিনেমার আসরে আবার বহুদিন পরে চারটী সঙ্গিনী পেয়েছেন দিদিমণি। দিদিমণির উৎসাহে নতুন জোয়ারের আনন্দ লেগেছে। সেদিন ইংরিজী ছবি হচ্ছে।

"স্কটল্যাণ্ডের একটী নদী ধরে একটা জেলের নৌকা চলেছে। তখন সবে রাত্রি ভোর হয়েছে, দেখা গেল দূরে স্রোতের জলে এক রূপসী তরুণী ভেসে চলেছে। এক কিশোর জেলে প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে গিয়ে রূপসীকে ধরলো। খরস্রোতে দু'জনেই ভেসে উধাও হলো। বিকেল হয়ে গেল। নিরালা একটী পাথুরে চড়ায় সেই তরুণ-তরুণীর আলিঙ্গনাবদ্ধ দেহ ভেসে এসে ঠেকেছে। তরুণী সংজ্ঞাহীন। নির্জন পাথুরে চড়ায় বৈকালী রোদের মিষ্টি রঙীণ আলোকের খেলা, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী কলরব করে। এক জলপাই গাছের নীচে রূপসীকে কোলে করে বসে আছে তরুণ জেলেটী। মুগ্ধ হয়ে রূপসীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। একবার হাত দিয়ে রূপসীর কপাল থেকে একগুচ্ছ ভেজা সোণালী চুল সরিয়ে দিল। তরুণ জেলের ঠোঁট দুটী তৃষ্ণার্তের মত কাঁপছে। মূর্চ্ছিতা রূপসীর অসহায় অধরের দিকে লুব্ধ মধুপের মত এগিয়ে আসছে।"

বীণা দিদিমণি হাঁক দিলেন।—চোখ নামাও।

গৌরী আর লীলার লাইসেন্স আছে, চোখ নামাতে হয় না। শান্তি ও অভ্যাস বসে চোখ নামাতে যাচ্ছিল, দিদিমণি বাধা দিয়ে বললেন,—তুমি দেখে যাও শান্তি। অর্চনা, তুমি ভুল করো না কিন্তু। চোখ নামিয়ে রাখ।

শুধু অর্চনা। আর বাকী কেউ নেই, সবাই ছাড়পত্র পেয়ে গেছে। শুধু অর্চনা মাথা নীচু করে স্থির হয়ে বসে রইল।

গৌরী লীলা আর শান্তির ছবি দেখার আনন্দটুকু আর তেমন করে জমলো না; ক্ষণে ক্ষণে ওরা অন্য মনস্ক হয়ে পড়ছিল। হেঁটমুখী অর্চনার দিকে বার বার তাকাচ্ছিল।

অনেকক্ষণ পরে দিদিমণি অল-ক্লীয়ার ধ্বনি ছাড়লেন, এইবার তুমি দেখতে পার অর্চনা।

অর্চনা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। শান্তি একটা ঠেলা দিতেই ধড়ফড় করে উঠে বসলো।

গৌরী লীলা শান্তি—সবাই শ্বশুরবাড়ী। বীণা দিদিমণি মাত্র একটী শিষ্যা নিয়ে সিনেমায় ছবি দেখছেন। আগের দিনের সেই জমাট স্ফূর্তি আজ বড় ফিকে হয়ে গেছে।

ছবি আরম্ভ হ'তে দেরী আছে। দিদিমণি বললেন।—চা খাবে তো, এক কাপ খেয়ে নাও অর্চনা।

একটু বিমর্ষ ভাবেই দিদিমণি আবার বললেন।—ওরা সবাই না এলে, আর তেমন ফূর্তি হবে না। কী বল অর্চনা?

অর্চনা।—হাঁ দিদিমণি।

দিদিমণি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।—শ্বশুরবাড়ী থেকে যা তাগাদা, না যেয়ে আর উপায় কি? বরমশাইরাও

অভিমানে অধীর হয়ে উঠেছেন, দুটো দিন মেয়েগুলোকে তেষ্টাতে দিলে না। আর কখনো একসঙ্গে ছবি দেখা হবে কি না, তাই বা কে জানে?

অর্চনা।—আমার সে-ভয় নেই দিদিমণি। আমি বেশ আছি।

দিদিমণি হঠাৎ বুঝতে না পেরে অর্চনার দিকে তাকালেন। ধীরে ধীরে একটা মূঢ়তার সুপ্তি ভেঙে যেন চমকে উঠলেন দিদিমণি।

তাইতো, অর্চনা বেশ আছে। অর্চনাই শেষ পর্যন্ত ঠিক থেকে যাবে, তাঁর শনিবারের সিনেমা যাত্রার পথে একমাত্র সহচরী। কোথাও থেকে ওর আর ডাক আসবার আশা নেই। তের বছরে বিয়ে, সাড়ে তের বছরে বিধবা। আজ উনিশ পার হয়ে কপালের ওপর ভুরু দুটো কালো প্রজাপতির মত ডানা মেলে ঘুমিয়ে পড়ে আছে। পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়—এমব্রয়ডারী করে; জপতপ ধরতে আর কত দেরী?

বীণা দিদিমণি গুম হয়ে বসে রইলেন। ছবি আরম্ভ হয়ে গেছে।—

"এক কুলবতী সধবা নারী যেমন সুন্দর তেমনি উচ্ছল যৌবনে তার বরাঙ্গ আকুল। নিদারুণ এক ঘটনার ছায়া ওর ভাগ্য গ্রাস করতে বসেছে। পালঙ্কের উপর ব্যাধি-জীর্ণ কঙ্কালসার তার স্বামী মৃত্যুর পদধ্বনি শুনছে। সেই রূপ স্বাস্থ্য আর মেধার আধার—স্বামিটী আজ রোগে কুৎসিত, ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হতে চলেছে। জল তেষ্টা পেয়েছে। তাই ক্ষীণ স্বরে ডাকছে।—মাধবী, মাধু, মধু-মণি—

পাশের ঘরেই এক যুবক সন্ন্যাসীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে মাধবী। থেকেথেকে এক গোপন দক্ষিণ সমীরের স্পর্শ ওর অলস শরীরকে দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। মাধবী হাসছে। মাধবীকে জড়িয়ে ধরার জন্তে সন্ন্যাসী দুটি ব্যগ্র বাহু বাড়িয়ে............।"

বীণা দিদিমণি একটু নড়ে বসলেন। অর্চনার দিকে তাকালেন। অর্চনা নিমেষের মধ্যে চোখ নামিয়ে ফেললো।

দিদিমণি আর একবার ছটফট করে উঠলেন। তার-পর আস্তে আস্তে ডাকলেন।—অর্চনা? শুনছো? চোখ নামাতে হবে না। মাথা ওঠাও। ছবি দেখ।

আমার চিত্রজগতের অভিজ্ঞতা

অসিতবরণ মুখোপাধ্যায়

হঠাৎ রূপমঞ্চ সম্পাদক মহাশয়ের জোর তাগিদ্ দিয়ে চিঠি এলো, সাতদিনের মধ্যে আমার চিত্রজগতের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে লিখ্‌তে হবে; তার পূজা সংখ্যা রূপমঞ্চের জন্যে। প্রথমত খুবই আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম এই ভেবে যে আমি একটা নগণ্য অভিনেতা, সবে তিন বছর চিত্রজগতে লাফালাফি করছি। আমার আবার অভিজ্ঞতা লিখেই কি হবে, আর সেই অভিজ্ঞতা পড়ে পাঁচজনেরই বা কি লাভ হবে। যাই হোক লিখতে যখন হবে তখন অবান্তর কথা না লিখে কাজের কথাই লেখা যাক্।

প্রথমে আমার চিত্রজগতে প্রবেশ কি করে হোলো সেটা লিখতে হয়। আমি তখন Radio ও Gramophone কেম্পানীতে accompanist হিসাবে কাজ করছি। হঠাৎ একদিন নিউথিয়েটার্স থেকে লোক এসে আমাকে তাদের Studioতে গিয়ে একটা Screen test দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। আমিও কিছু বুঝতে না পেরে পরের দিন তাদের Studioতে যেয়ে Test দিলাম। কেন যে দিলাম তা নিজেও জানতে পারলাম না। পরে খবর পেলাম যে কোম্পানী আমাকে তাঁদের আগামী বইর (প্রতিশ্রুতি) নায়ক হিসাবে মনোনীত করবার জন্য আমার Test নিচ্ছে। যাহোক Testএ পাশ করলাম আর Contract formএ সই করেও দিলাম। এ সবই যেন আমার কাছে ভোজবাজী বলে মনে হতে লাগলো এই ভেবে যে জীবনে কোনও দিন যে লোক কোনও সখের থিয়েটার পার্টিতে পর্য্যন্ত অভিনয় করেনি, সে কি ভাবে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় কোরবে?

এই ত গেল আমার চিত্রজগতে প্রবেশের ইতিহাস।
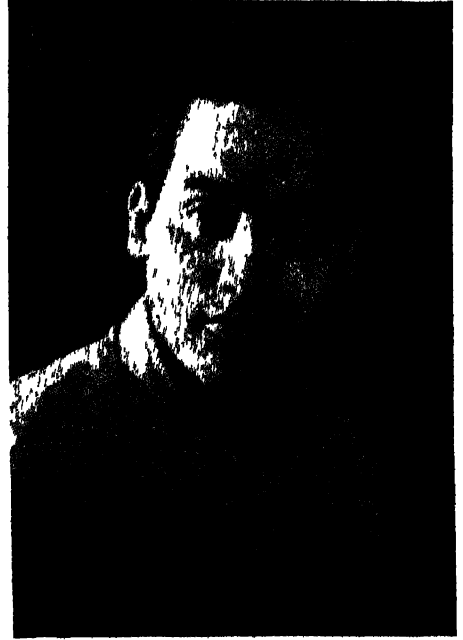
অসিত বরণ

Studioতে আমাকে 'প্রতিশ্রুতি'র একখানা Script পড়তে দেওয়া হোলো আর আমাকে যে অরুণের অংশ অভিনয় কোরতে হবে একথা শুনে খুবই খুসী হলাম। আমি তখন থেকে সব সময়েই অরুণের মত একটি ছেলের কথা চিন্তা কোরতে লাগলাম আর প্রত্যহই মহলা দিতে লাগলাম। এই মহলার সময় আমি প্রায় প্রত্যেকের কাছ থেকে আন্তরিক সহানুভূতি পেয়েছিলাম। বিশেষ করে পাহাড়ী সান্যাল ও হেমচন্দ্রের কাছ থেকে। ঐ দুজনের সম্পূর্ণ সাহায্য ও সহানুভূতি না পেলে যে আমার সাফল্য কতদূর এগিয়ে যেত তা কল্পনাতীত। তবে এটুকু নির্ব্বিঘ্নে বলতে পারি যে হয়ত বা ঐ সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতীত আমাকে চিত্রজগত থেকে অল্প দিনেই

বিদায় নিতে হোত। যাই হোক 'প্রতিশ্রুতি' ছবি তোলা হোলো। বাংলা সংস্করণের সাফল্য দেখে কোম্পানী উহার হিন্দি সংস্করণ তোলা ঠিক করলেন আর আমাকে হিন্দিতে ও অরুণের অংশ অভিনয় করতে হবে একথাও জানিয়ে দিলেন। আমি তখন বুঝতে পারলাম যে হয়ত কর্তৃপক্ষ আমার অভিনয়ে সন্তুষ্টই হোয়েছেন। হিন্দিতেও অভিনয় কোরলাম। তারপর এল 'কাশীনাথ'। জানিনা কর্তৃপক্ষ কাকে দিয়ে 'কাশীনাথ'এর অংশ করাবার মনস্থ করেছিলেন। শেষে নিতান্ত অতর্কিতে আমাকে জানান হ'ল যে, 'কাশীনাথ'এর অংশ অভিনয় করতে হবে। সেই দিন এল আমার চিত্র-জীবনের কিছু সাফল্য। শরৎ বাবুর কোন ছবিতে নায়কের অংশ অভিনয় করতে পাবো, এ আশা আমার চিত্রজগতের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর বেড়ে চলছিল। "কাশীনাথ"এর Script পড়লাম আর শরৎবাবু যে মানসচক্ষে বাংলার যুবক 'কাশীনাথ'এর চরিত্র এঁকেছিলেন, তাকে আমার মনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা কোরতে লাগলাম। সাহসে ভর করে অভিনয় করে গেলাম। এখানে পেলাম নীতিন বাবুর অপরিসীম স্নেহ আর আমাকে গড়ে তোলবার অদম্য ইচ্ছা। তাঁরই মতানুযায়ী দৃশ্যের পর দৃশ্যে অভিনয় করে গেলাম।

আজ কাশীনাথ চিত্রের, জুবিলী সপ্তাহ দেখে মনে মনে গর্ব্বই হোতে লাগলো। ভাবতে পারলাম যে শরৎবাবুর কাশীনাথএর চরিত্র স্ফুটনে বোধ হয় অসমর্থ হয়নি। এ আমার জীবনের একটা মহান্ লাভ।

এই সামান্য তিন বছরের অভিজ্ঞতায় এইটুকুই বুঝতে পারি যে ভাল গল্প না হলে, সে চিত্র লোকচক্ষুর সামনে ধরা উচিত নয় আর ধরলেও সার্থকতা কোন সময়ে তার খুঁজে পাওয়া যায় না। অভিনয় এর দিক থেকে এ কথা বলা যেতে পারে যে ভূমিকা নির্ব্বাচনের উপর ছবির ভাল-মন্দের অনেক কিছু নির্ভর করে। প্রায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে mis-casting এর জন্যে অনেক ভাল ছবি নষ্ট হয়ে গেছে। আর অনেক অভিনেতাকে অল্প সময়ের মধ্যে চিত্রজগত থেকে বিদায় নিতেও হয়েছে। সুবিখ্যাত অভিনেতা Paul Muni কোন এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে, "There is hardly an actor living who does not feel that true satisfaction in his profession comes only when he is in a position to choose the roles he will play and refuse that he does not care to play." এই জন্যই ছবির চরিত্র নির্ব্বাচনের উপর ছবির ভালমন্দ অনেকখানি নির্ভর করে। প্রত্যেক অভিনেতারই প্রথমে দেখা উচিত যে, যে অংশ তাকে অভিনয় করতে হবে সে অংশ তার চরিত্রপযোগী হবে কি না। অভিনয় কোরতে হলে মনে প্রাণে যে অংশ অভিনয় কোরতে হবে সেই অংশটী সব সময়েই নাড়াচাড়া কোরতে হবে। তা বলে সাধারণ লোকের সামনে অভিনেতার মত কথা বলতে বা হাঁসতে হবে, এ ভাবের কোন তাৎপর্য্য দেখতে পাওয়া যায় না। জীবনে অভিনেতা হবার চেষ্টা কোরতে হলে প্রতি কাজে, কর্ম্মে ও চিন্তায় অভিনয় করছি এমন একটি ভাব বজায় রাখতে হবে। পরিশেষে এইটুকু বলে শেষ করতে পারি যে আমার চরিত্র অনুযায়ী অংশ অভিনয় কোরতে পেরেছিলাম বলে আমার চিত্র জগতে প্রবেশ হয়ত সাফল্য লাভ করেছে।

ভারতের প্রবীন ও খ্যাতনামা সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় গত বৃহস্পতিবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা পৌণে আট ঘটিকার পরলোক গমন করেন।

লোকাচার ও অনুশাসনের মিথ্যা অভিনয়ে বাংলার যৌবন-স্রোতের গতি ব্যাহত

ফণীন্দ্রনাথ পাল

অনেকদিন হইতেই আপনাদের 'রূপ-মঞ্চে' একটি রচনা ছাপাইবার বাসনা ছিল। কিন্তু কখনও তিন মিনিটের বেশী একটি subject লইয়া আজকাল ভাবিবার অবসর পাই না, বেশীক্ষণ ভাবিবার চেষ্টা করিলেই নিদ্রাদেবী নিশ্চিন্ত করিয়া দেন।

এই ধরুন না, মনে করিয়াছিলাম আপনার কাগজে পূজার বাজারে একটি চটকদার রোমান্টিক গল্প লিখিয়া ছাড়িব কিন্তু এক বর্ষণআবেগাকুল রাত্রে যখন আমার নায়ক ঘনঘোর দুর্যোগের মধ্য দিয়া প্রায় বিল্বমঙ্গলের মত নায়িকার তিন মাইল দূরস্থ বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল তখন অকস্মাৎ কোথা হইতে জ্যোৎস্নার অজস্র আলোক আসিয়া চারিদিক প্রস্ফুট করিয়া তুলিল, বিধাতার এই রহস্য, এই রস-বৈচিত্র্য, খেয়াল অথবা পরিহাস হজম করিতে পারিলাম না। কারণ, আমার গল্পের নায়ককে পুলিশ বিপ্লবী বলিয়া সন্দেহ করিয়া থানায় টানিয়া লইয়া গেল। রাজদ্রোহের অপরাধে পাছে জড়াইয়া পড়ি এই ভয়ে গল্প লেখা ত্যাগ করিলাম।

পরদিন মনে করিলাম সিনেমার সম্বন্ধে এক জোরালো প্রবন্ধ লিখিয়া আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব। ছবি ভাল হইতেছে না কেন এই লইয়া কিছু আলোচনা ও উপদেশ বিতরণ করিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু উপদেশ দিব কাহাকে! টাকা capitalist-এর, টাকার আওয়াজের কাছে আর সব কথার আওয়াজ অত্যন্ত ক্ষীণ শোনায়, পরিচালকরা personality বজায় রাখিবার জন্ম কাহারও উপদেশ গ্রহণ করিতে রাজী নহেন। শিল্পীদের অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না সুতরাং কাহারও উপদেশের তাঁহারা অনেক উর্দ্ধে। সুরশিল্পীর সুরের দিশী-বিলাতী গোঁজা-মিলে যখন নিজের কাণ কাটিয়া ফেলিবার ইচ্ছা হয়, তখন সুরশিল্পীরা সেই কাণ ধরিয়া অকারণ থামিয়া আসিয়া ঝাঁকুনি দিয়া 'কে জানে' কে জা...নে 'জা-নি-রে জা-নি-রে' প্রভৃতি দোলা-লাগানো গান শোনাইয়া ছাড়েন—ঘরে ঘরে সেই গান ছড়াইয়া পড়ে, তাহার পর কিছু বলিতে গেলে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ বাণে ঘর ছাড়িয়া পলাইতে হয়—এই বাজারে Hotel de Parents-এ নিখরচায় দিনগুলি বেশ ভাল কাটিতেছে, তাহা হারাইতে চাই না। catchy-tune সম্বন্ধে আপত্তি তুলিলাম বলিয়া, আপনি নিশ্চয় অনুমান করিয়াছেন আমি গান জানি না। কথাটা মিথ্যা নয় স্বীকার করিতেছি। কিন্তু তাই বলিয়া এই কথা বলিবার কি আমার অধিকার নাই যে এই ধরণের সুরের দোলায় গতিময় গানগুলি যতই catchy হউক না কেন, তাহার মধ্যে প্রচুর প্রাণস্পন্দন নাই।

উপদেশ বিতরণ করার উদ্দেশ্য যখন প্রায় ব্যর্থ হইয়া যায় তখন মনে হইল, বাঙলা দেশের চিত্রপ্রিয় দর্শকসমষ্টি ত আছে। বাঙলার মানুষ বক্তৃতা শুনিতে পাগল, সব কথাই তাঁহারা নির্ব্বিকারভাবে শুনিয়া যান। চৈতন্যের দেশের লোক ক্ষমা করিতেও জানেন সুতরাং আমার উপদেশ দেওয়ার ধৃষ্টতাও তাঁহারা মার্জ্জনা করিবেন।

কিন্তু দর্শক সমষ্টিকে কি বলিব ভাবিতে গিয়া দেখি, তাঁহাদের যাহা বলিতে চাই তাহা বলিলে বাঙলা সিনেমা ব্যবসায়ের ক্ষতি করা হয়। বাঙলা দেশের সিনেমা-শিল্পটির বয়স কম হয় নাই, কিন্তু এমনই তাহার দুর্ভাগ্য যে সুস্থ-ভাবে কোন দিন তাহাকে বাড়িয়া উঠিতে দেখিলাম না। নানা অভাব, নানা অবিচার ও অনেক অত্যাচার সহিয়া সহিয়া ত্রুটি ও অক্ষমতার মধ্য দিয়া আজও বাঁচিয়া আছে।

রূপ-মঞ্চ

আজকাল কাহিনী ও পরিচালনায়, সুরসংযোজনায়, অভিনয়ে ও টেক্‌নিকে বাঙলা সিনেমা-ছবি যে অনেক উন্নত হইয়া উঠিয়াছে একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই কিন্তু তবু ছবির মধ্যে কোথায় যেন glamour-এর অভাব অত্যন্ত বেশী করিয়া চক্ষু ও মন পীড়িত করে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলাম, বাঙলার যৌবন স্রোতকে যেন কোথায় একটি কৃত্রিম বাঁধ দিয়া বাঁধিবার চেষ্টা করা হয়—তাহার ফলে আকাঙ্খা থাকে নিপীড়িত, হৃদয় থাকে উপবাসী। লোকাচার ও অনুশাসনের মিথ্যা অভিনয় আমাদের কামনার আদর্শ আমাদের প্রাণপ্রাচুর্য্য প্রতিমুহূর্ত্তে সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর গণ্ডীর মধ্যে পড়িয়া মুখচোরা হইয়া ওঠে।
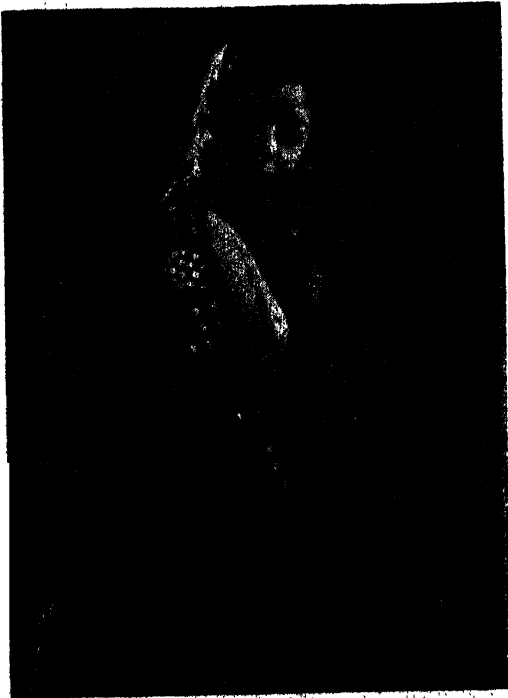
বিভিন্ন রূপ-সজ্জায় কানন দেবী

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতি

গত ১০ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে ৭৪।১ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির এক অধিবেশন হয়ে গিয়েছে। এই সভায় কাপুরচাঁদ লিমিটেডের প্রচার সচিব শ্রীযুক্ত পঙ্কজ দত্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। বহু বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক এই অধিবেশনে উপস্থিত থেকে সভার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছিলেন। শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী, কালীশ মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ ঘোষ, নরেন্দ্র মিত্র, প্রদ্যোত মিত্র এবং সভাপতি স্বয়ং চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্য প্রণালী নিয়ে আলোচনা করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মাসে অন্ততঃ একবার কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন ও বছরে দুইবার সাধারণ দর্শকদের অধিবেশন আহ্বান করা হবে। সভায় ইহাও স্থির হয় যে, চলচ্চিত্র দর্শকদের সত্যকার অভিমত যাতে সংবাদ-পত্রের মারফৎ ব্যক্ত করা সম্ভব হয় তার জন্যে সকল পত্র—পত্রিকার সম্পাদকদের অনুরোধ জ্ঞাপন করা হবে।

সভার প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত প্রদ্যোত মিত্র বলেন যে, আমদের দেশের চিত্র নির্ম্মাতারা দর্শকদের সত্যিকার অভিমত জানবার চেষ্টা করেন না এবং যদিও বা কখনও পত্র—পত্রিকার মারফৎ দর্শকদের মতামত প্রকাশ পায়, তাতেও তাঁরা কর্ণপাত করবার প্রয়োজন বোধ করেন না।

শ্রীযুক্ত কালীশ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, পত্র-পত্রিকায় দর্শকদের কাছ থেকে সাধারণতঃ যে সব সমালোচনা আসে, তা অধিক ক্ষেত্রেই প্রকাশ করবার যোগ্য হয় না এবং তাতে চলচ্চিত্র সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার অভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীযুক্ত সন্তোষ ঘোষ বলেন যে, আমেরিকায় ও ইংলণ্ডের দর্শক সমিতিগুলি বাস্তবিকপক্ষে সেখানকার চিত্র-প্রতিষ্ঠানদের নতুন পথের নির্দ্দেশ দেয় এবং তাদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির কাছে চিত্র-নির্ম্মাতাদের আত্মসমর্পণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। আমাদের দেশেও সেই রকম চলচ্চিত্র দর্শক সমিতিকে দৃঢ় ভিত্তিতে গড়ে তোলা দরকার এবং সকল দর্শকদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া উচিৎ।

সস্ত্রীক ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর প্রসার-সচীব বন্ধুবর অজিত সেন। মিসেস সেন (জ্যোতি) একজন সুধাকণ্ঠি গায়িকা।

এই সভায় দেবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীমতী শ্যামলী মুখার্জ্জি, লতিকা ঘোষ, রত্না মিত্র প্রভৃতির গান বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল এবং রূপ-মঞ্চ কর্ত্তৃপক্ষ উপস্থিত সকলকে মিষ্ট আপ্যায়নে ও জল-যোগে পরিতৃপ্ত করেছিলেন।

এই অধিবেশনে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও চিত্র পরিচালক প্রেমেন্দ্র মিত্র'র সভাপতিত্ব ক'রবার কথা ছিল, কিন্তু অসুস্থতা বশতঃ তিনি শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত হ'তে পারেন নাই।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র মিত্র বলেন যে, আমাদের দেশের চিত্রসমালোচকদের চলচ্চিত্রের খুঁটিনাটি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নিতান্ত কম, এবং সেই জন্যই তাঁদের সমালোচনা নিখুঁৎ হ'তে পারে না। নিখুঁৎ সমালোচনা হয় না বলেই চিত্র নির্ম্মাতারা অনেক ক্ষেত্রেই সে-সব উপেক্ষা করবার সাহস সঞ্চয় করেন।

পরিশেষে সভাপতি শ্রীযুক্ত পঙ্কজ দত্ত চিত্র-নির্ম্মেতাদের নানা রকম অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, এই সব অসুবিধাই দূর হয়ে যাবে, যদি আমাদের দর্শকদের অভিমত সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে এবং চিত্র-নির্ম্মেতারা বুঝতে পারে যে, দর্শকদের সত্যিকারের দাবীটা হচ্ছে এই।

শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ সেন
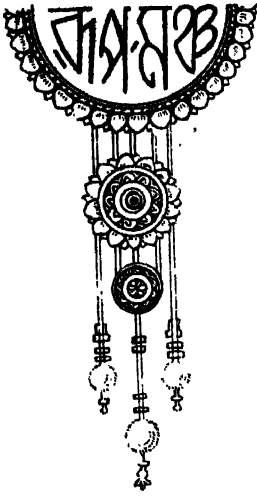
শ্রীমতী প্রতিমা দাশগুপ্তা

বোম্বাইওয়ালী বাঙ্গালী অভি-
নেত্রীদের ভিতর শ্রীমতী
দাশগুপ্তার নাম সর্বাগ্রে করতে
হয়। কারদার প্রোডাকসন্সের
'নমস্তের' রূপসজ্জায়…………

রূপ-মঞ্চ

মঞ্চ, পর্দা ও সাহিত্যকলার সচিত্র মাসিক

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির মুখপত্র

কার্যালয়: ৩০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দশম সংখ্যা : কার্তিক ১৩৫০ : তৃতীয় বর্ষ

গ্রাহক হ'তে হলে :

বার্ষিক সডাক	...	৬৲ টাকা
ষাণ্মাসিক সডাক	...	৩৷৹ টাকা
প্রতি সংখ্যা	...	আট আনা
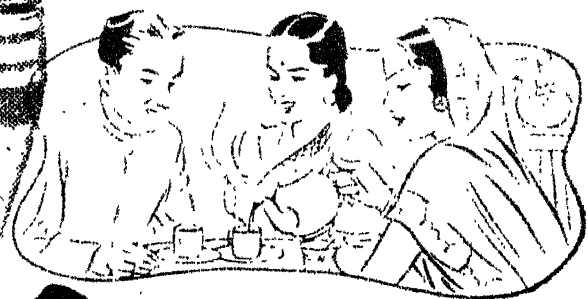
মফঃস্বল হ'তে মনিঅর্ডারযোগে টাকা প্রেরিতব্য।

কোন মাসের কাগজ সময়মত না পেলে ইংরেজী মাসের ১৫ই এর পর স্থানীয় পোষ্ট-অফিসে অনুসন্ধান করে কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।

আমাদের আজকের কথা

অসহযোগ আন্দোলন

ছোটদের উপযোগী আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করবেন। এ নিয়ে কেবলমাত্র আন্দোলন শুরু হ'য়েছে আমাদের দেশে। আমাদের ছোটদের জন্য কার্যতঃ কোন কিছুই করে উঠতে পারিনি আমরা। সোবিয়েত রাশিয়ার কথা স্বতন্ত্র—আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও ছোটদের আমোদ-প্রমোদের যে ব্যবস্থা রয়েছে—তা' দেখে-শুনে অনেক সময় আমাদের আতকে উঠতে হয়। ছোটদের প্রয়োজনে—বয়স্কদের প্রয়োজনের মতই সমান তালে পা ফেলে এ সব দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত গড়ে উঠেছে এক একটি নাট্য-শালা এবং প্রেক্ষাগৃহ, যেসব স্থানে কেবলমাত্র ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্যই প্রযোজকদের প্রচেষ্টা রূপ পেয়েছে, সে-সব রঙ্গালয় বা প্রেক্ষাগৃহে কেবলমাত্র ছোটদেরই প্রবেশ করবার অধিকার আছে। এর পেছনে শুধু ব্যবসায়বুদ্ধি-সম্পন্ন প্রযোজকদের অর্থই ব্যয়িত হয়নি—মূলে রয়েছে দেশের দায়িত্বশীল মনীষীদের চিন্তাশক্তি—উদ্যোগী কর্মী-দের পরিশ্রম এবং জাতীয় সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতা। বেতার—মঞ্চ প্রভৃতির মারফতে কী ভাবে ছোটদের আনন্দ পরিবেশন করা হয়ে থাকে তা' আমরা বিভিন্ন সংবাদপত্র

বা পুস্তিকার মারফতেই কেবলমাত্র পেতে পারি—তাই অনেকে অনেক সময় খুঁটিনাটি বিষয়ে হয়ত অবহিত নাও থাকতে পারি। কিন্তু সেলুলয়েডের ফিতের মারফতে কী ভাবে আনন্দ পরিবেশিত হ'য়ে থাকে—ছায়াছবির বিষয়ে যাঁরা একটু আগ্রহশীল তাঁরা এর প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে থাকেন এবং এই ছোটদের উপযোগী চিত্রগুলি সুদূর সাগর পার থেকে এসে যখন মুক্তিলাভ করে—শুধু ছোটরাই নয়—তার দর্শক হিসাবে আমরা বড়রাও কম আনন্দ বা শিক্ষালাভ করি না। এত গেল নিছক আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত ছবির কথা। ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোল বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষনীয় বিষয়গুলি সেলুলয়েডের ফিতের মারফতে অনেকক্ষেত্রে শিক্ষা দেওয়া হ'য়ে থাকে। ইতিহাসের চরিত্রগুলির এমনি সূক্ষ্মভাবে রূপ দান করে দেখানো হয় যা সহসা ছোটদের মন থেকে মুছে যাবার নয়। এক ঘণ্টায় সেলুলয়েডের ফিতের মারফতে এক মাসের বিষয় বস্তু শিক্ষা দেওয়া হয়। খাইবার পাশ-হিমালয় পর্বতমালা, দাক্ষিণাত্যের মরুভূমি, পুরীর মন্দির, আগ্রার তাজমহল, কলিকাতা, বোম্বাই—দিল্লী—বারানসী প্রভৃতি ভারতের ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক প্রধান স্থান, বিষয় এবং নগরগুলি সম্পর্কে ভারতীয় শিশুদের যে ধারণা বা জ্ঞান না আছে সুদূর সাগর পারের শিশুরা তা থেকে বঞ্চিত নয়। উদ্ভিদবিদ্যা—প্রাণীবিদ্যা কোন বিদ্যাই বা ফিতের মারফতে শিক্ষা দেওয়া না হয়ে থাকে? আর আমাদের এখানে? ছোটদের উপযোগী শিক্ষনীয় নাটক বা চিত্রের কথা ছেড়েই দিলুম—নিছক আমোদ প্রমোদের তাগিদে শিশুদের জন্য ক'খানা নাটক বা চিত্র মঞ্চস্থ বা গৃহীত হয়েছে?

আধুনিক সভ্যতার অগ্রদূত সোবিয়েত রাশিয়ার দিকে দৃষ্টি দিলে কী দেখতে পাই? ছোটদের জন্য আনন্দ পরিবেশনে সোবিয়েত রাশিয়ার কী বিপুল আয়োজন। শিশুদের কথা অন্যান্য বড় সমস্যার মতই সেখানে পরিগণিত হয়েছে। শুধু মস্কোতেই ছোটদের জন্য রয়েছে তিনটী রঙ্গালয় এবং তিনটী চিত্রগৃহ। এখানকার দর্শক, সবই ছোটদের দলের। মঞ্চগৃহের প্রয়োজনায় পেশাদার প্রতিষ্ঠানই গড়ে উঠেছে। খ্যাতনামা নাট্যকারদের দ্বারা ছোটদের জন্য বিশেষভাবে নাটক লিখিয়ে এখানে অভিনয় করা হয়ে থাকে। চিত্রগৃহেও তাই। কেবলমাত্র ছোটদের আমোদ প্রমোদ এবং শিক্ষার উপযোগী চিত্র-গুলিই প্রদর্শিত হয়। শিশু চিত্র প্রস্তুত করবার জন্যই মস্কোতে একটি শিশুচিত্র প্রযোজক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সমস্ত সোবিয়েত ইউনিয়ন-এর অধীনে ১৫০টি শিশু চিত্রগৃহ রয়েছে। এই সব প্রেক্ষাগৃহে নিছক শিশুচিত্র-গুলি অথবা বয়স্কদের উপযোগী চিত্র যা শিশুদের পক্ষে ক্ষতিকর নয় অথচ শিক্ষামূলক সেই সব চিত্রগুলিই প্রদর্শিত হয়ে থাকে। সাধারণ প্রেক্ষাগৃহগুলিতে ষোল বছরের কম বয়স্ক ছেলে মেয়েদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না কিন্তু ছোটদের প্রেক্ষাগৃহগুলিতে প্রত্যেক ছেলে মেয়েরাই অন্ততঃ মাসে একবার করে দর্শক হিসাবে আসবেই। সোবিয়েত ইউনিয়নের অধীনে চিত্রগৃহ ব্যতীত একশ'এর বেশী রয়েছে শিশুদের উপযোগী মঞ্চগৃহ। এ'ছাড়া সংগীত প্রভৃতি কলা বিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্যও সোবিয়েত রাশিয়ায় শিশুদের জন্য ব্যবস্থা রয়েছে। মস্কো এবং লেনিনগ্রাদে দশ বছরের পরিকল্পনা নিয়ে এক একটী সংগীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে এখানে ৬০০।৭০০ ছাত্র শিক্ষা পেয়ে থাকে প্রতিবারে। উত্তরকালে এদের ভিতর থেকেই প্রতিভাসম্পন্ন শিশুরা এক একজন শক্তিশালী সংগীতজ্ঞ হ'য়ে ওঠে।

আমাদের দেশে ছোটদের জন্য এখন পর্যন্তও কোন চিত্র বা নাট্যপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। ছোটদের আমোদ প্রমোদের মূলতঃ কোন ব্যবস্থাই নেই। যে ব্যবস্থা

আছে তা ঐ ছোটদের হাতেই, ছোটরাই নিজেদের খুশীমত পাড়ায় পাড়ায় বা স্কুলে স্কুলে অভিনয় করে। কোন কোন সময়ে বড়দের কাজ থেকে উৎসাহ পায়—কোন কোন সময় আসে বিরোধীতা। ছোটদের উপযোগী আমোদ প্রমোদের প্রযোজনায় পেশাদার সম্প্রদায় গঠন করবার উদ্দেশ্যে এবং পেশাদার সম্প্রদায়দের অবহিত করে তুলতে—সর্বপ্রথম রূপমঞ্চ পত্রিকাকে কর্মক্ষেত্রে দেখতে পাই। রূপমঞ্চ পত্রিকার প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হয়েছে, কিন্তু পরিকল্পনা এখনও ভেংগে যায়নি। এবিষয়ে সর্বপ্রকার আন্দোলন করতে সম্পাদক-মণ্ডলী স্বীকৃত হ'য়েছেন। আনন্দ বাজারের 'মৌমাছি' এবং নবযোগ পত্রিকার 'রূপকার'—এঁদের আগ্রহ এবং আন্দোলনও কম কার্যকরী নয়। কিন্তু দু' একটী প্রতিষ্ঠান বা দু' একজন ব্যক্তি বিশেষের আন্দোলন বা প্রচেষ্টা এই গুরু দায়িত্বের রূপ দিতে পারে না। তাই দেশ এবং জাতির উন্নতিকামী দায়িত্বশীল প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে এ বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠিতে হবে।

ছোটদের অভিভাবকদের কাছে আমার আবেদন—তাঁরা চিত্র এবং নাট্য প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ছোটদের অসহযোগ আন্দোলন করতে উৎসাহিত করে তুলুন। আজ এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে কাজে নামতে হবে—আমাদের দেশে আমোদ প্রমোদের যে ব্যবস্থা রয়েছে, যেহেতু শিশুদের পক্ষে তা ক্ষতিকর, সেহেতু এসবে শিশুদের যোগদান করতে কোন মতেই আমরা অনুমোদন করবো না এবং সংগে সংগে যাতে কোন শিশু নাট্য বা চিত্র সম্প্রদায় গড়ে ওঠে সে বিষয়ে সাধ্যমত সাহায্য করবো।

আগামী সংখ্যা হতে চিত্রজগতের কোন খ্যাতনামা সাংবাদিক রূপ-মঞ্চের সম্পাদকীয় বিভাগে 'শ্রীপঙ্কজ' নামে যোগদান করবেন।

পাঠকপাঠিকাদের কাছে আবেদন

যুদ্ধজনিত অবস্থায় কাগজের অনিশ্চয়তার জন্য রূপ-মঞ্চ প্রকাশে অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। এজন্য পাঠকপাঠিকাদের কাছে বিনীত অনুরোধ, তাঁরা যেন খুব উতলা হয়ে না ওঠেন। 'রূপ-মঞ্চ' প্রতি মাসেই আত্মপ্রকাশ করবে। অবশ্য এই 'উতলা' রূপ-মঞ্চের প্রতি তাদের যে দরদ রয়েছে তারই নিদর্শন। যুদ্ধজনীন অবস্থায় 'রূপ-মঞ্চ' যে সংকটের সম্মুখীন হয়েছে—তা' কাটিয়ে উঠতে পাঠক পাঠিকাদের সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন।

বিনীত—**কার্যাধ্যক্ষ : রূপ-মঞ্চ**

ছবিঘরের আয়নায়

—পঙ্কজ দত্ত—

দর্শক হিসেবে নিজের স্বরূপ দেখেছেন কোনদিন? এমনিতে হয়তো লোক আপনি মন্দ নন কিন্তু চিত্রগৃহে পা দিলেই আপনি হ'য়ে ওঠেন আর এক ব্যক্তি—বিশেষ ক'রে সঙ্গে যদি কোন মহিলা থাকেন তাহ'লে তো আর কথাই নেই। আপনার সে-রূপ অন্য সময়ে ভাবলে আপনি নিজেই হয়তো অবাক হয়ে যাবেন।

কেন জানি না, ঠিক সময়ে আসন গ্রহণ করার কথা যেন আপনার মনেই থাকে না। ছবি আরম্ভ হ'লে বা তৃতীয় ঘণ্টার পর গৃহভ্যন্তর অন্ধকার হ'লে তবেই হাজির হওয়ার কথা আপনার খেয়ালে আসে। অন্ধকারে আর পাঁচজনের ঘাড়ের ওপর হুমড়ী খেতে খেতে এবং তৎসঙ্গে তাদের একাগ্রতা ব্যাহত করার অপরাধে পাঁচজনের কাছ থেকে অজস্র গালাগালি ও অভিশাপ না কুড়িয়ে নিলে বোধহয় ছবি দেখার আনন্দ আপনার পূর্ণাঙ্গ হবে না। তার ওপর সীটের নম্বরে যদি একটু গোলমাল হয়—পরিচারক অন্ধকারে ভুল জায়গায় আপনাকে বসিয়ে দেওয়ার জন্যেই হোক বা টিকিট অফিস থেকে ভুল নম্বর পাওয়ার জন্যে হোক—আপনার রোষের আর সীমা থাকে না। পরিচারক থেকে আরম্ভ ক'রে ম্যানেজার, মালিক সবায়ের বাপান্ত না ক'রলে আপনার মনস্তুষ্টি হয় না কিছুতেই। এই গোলমালে আরও পাঁচজন আপনার সঙ্গে না যোগ দেওয়া পর্য্যন্ত তাকে তীব্র থেকে তীব্রতর ক'রে তুলতে আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। সামান্য ব্যাপার—আপনার 'কেনা-ভৃত্য' ম্যানেজার অথবা পরিচারকের কথায় কাণ দিলে সব সহজেই মিটে যেতে পারে—এ ধারণা কেন জানিনা আপনার মত সমঝদার লোকের মনে আসেই না তখন। সমগ্র হাউসের সবকটি আসন ভর্ত্তি থাকলেও আপনার আসন চা-ই এবং যে ভুল নম্বর টিকিটে লেখা আছে ঠিক সেই নম্বরের আসনটিই; অন্য কোন কথা আপনি শুনতে চাইবেন না—পয়সা ফেরৎ দিলে নেবেন না, অন্য যে-কোনদিন উচ্চতর শ্রেণীতে আপনাকে আসন দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেও নয়—জিদ যা ধ'রেছেন তা অটুট রাখতেই হবে, কিন্তু সেই জিদটা যে আপনার শিষ্টতার মুখোসটাকে কত অনায়াসে খুলে ফেলে দেয় সেটা যদি আপনি জানতেন! শেষে চিত্রগৃহের কর্তৃপক্ষের কথাই হয়তো আপনি মেনে নিলেন—যাই হোক, তবু নিজের আপত্তি এবং ন্যায্য দাবি সরোষে ঘোষণা ক'রে সমাগত জনগণের কাছে চিত্রগৃহের ব্যবস্থাপকদের খেলো ক'রে দেওয়ার বাহাদুরী নেবার এমন সুযোগটা কেনই বা ছাড়বেন আপনি?

প্রেক্ষাগৃহের ভিতরে আসন গ্রহণ করার পূর্ব্বেও আপনি নানা ছলে আপনার ব্যক্তিত্ব ফলিয়ে যাবার লোভ কিছুতেই সামলাতে পারেন না দেখেছি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে গুণ্ডারা চড়াদামে টিকিট বিক্রী ক'রছে সুতরাং তার মধ্যে চিত্রগৃহের কর্ত্তৃপক্ষের একটা বখরা আছেই, অতএব তাদের কেনইবা দু'কথা শুনিয়ে যাবেন না! সেই দিনই সকালে গুণ্ডাদের চাল বুঝতে না পেরে, না-হয় আপনিই ওদের হ'য়ে কখানা টিকিট কিনে নিয়েছেন—কিন্তু সে-তো অজ্ঞাতে—অত ক'রে এসে বললে লোকটা! কে আর খোঁজ রেখে বসে আছে যে ঐ লোকটাই আবার আপনারই কাছে টিকিট বেচতে আসবে এবং চড়া দামে! দোষ তো ম্যানেজারেরই, অতএব তাকে সায়েস্তা করতে হয়। সে-পর্ব্ব অন্তে মনকে নিরাশ হওয়া থেকে বাঁচাবার জন্যেই (মনটা যখন আপনার নিজস্ব) গুণ্ডাদের কাছ থেকে তাদেরই নির্দ্দিষ্ট মূল্যে টিকিট না কিনে আর ক'রবেন কি বলুন? সেদিন

অজয় ভট্টাচার্য পরিচালিত ছদ্মবেশীর একটী দৃশ্যে ছবি বিশ্বাস, প্রমোদ গাংগুলী ও সন্ধ্যারাণী। চিত্রখানি মুক্তি প্রতীক্ষায়।

চটু ক'রে আপনাকে কে অবিশ্বাস ক'রতে পারে বলুন? দু'একটা প্রশ্নে আপনি ধরা পড়ে গেলেন সহজেই কিন্তু লজ্জারূপ মানসিক দুর্ব্বলতার বহিঃপ্রকাশ রোধ করার জন্যেই সম্ভবতঃ আপনি ওটাকে সিনেমাওয়ালাদের জোচ্চুরি বলে রাগে, বেশ মনের সুখে দু'চার কথা শুনিয়ে তবে প্রস্থান ক'রলেন।

আচ্ছা, কোন মহিলার ঠিক পাশের আসনটি পাবার জন্যে সময়ে সময়ে আপনার এত রোখ চাপে কেন বলুন তো? ঘণ্টাখানেক টিকিট ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে সেদিন যাওবা একটা তেমন সীট পেলেন কিন্তু টিকিট বিক্রেতা লোকটার বদমাইশিতে আপনার ঐটুকু আনন্দও ভাগ্যে জুটলো না—কিছুতেই আসনটা দিলে না সে! এমন একটা অন্যায়ের জন্য আপনার পক্ষে রেগে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক কিন্তু তখন যদি একটু ঘাড় ফিরিয়ে চারপাশটা দেখে নিতেন—দেখতেন, চিত্রগৃহের কর্ম্মীবৃন্দ তাদের মুখের ওপরকার গম্ভীরতার আবরণটাকে আর বুঝি সামলে রাখতে পারছে না- ওরা যে অনেক আগেই আপনার উদ্দেশ্য ধরতে পেরেছে!

অপরদিকে নিজে সঙ্গে ক'রে কোন মহিলাকে নিয়ে এলে প্রথমেই আপনি চাইবেন এমন আসন যাতে অপরিচিত কেউ আপনার সঙ্গিনী মহিলার পাশে না বসতে পারে, তা না পেলে ছবি দেখতে দেখতে আপনার অস্বস্তির অন্ত থাকে না—খালি মনে ক'রবেন, মহিলাটির পাশে উপবিষ্ট লোকটি এইবারেই একটা কিছু অসদাচরণ ক'রে বসবে। একবার এই রকম একটা ব্যাপার নিয়ে সে যা কেলেঙ্কারী!

কিন্তু বড় ঠকে গিয়েছিলেন—ছ'টার শোতে কেমন কায়দা ক'রে ওরা ম্যাটিনির টিকিট গছিয়ে দিয়েছিল আপনাকে! গেটে নিতান্ত অন্যায়ভাবেই আপনাকে আটকে দেওয়া হয়। আপনার পরিপুষ্ট বিবেচনাশক্তি এক্ষেত্রেও দুর্ব্বলতার পরিচয় দেয়নি আর দেয়নি ব'লেই তো আপনি হাত গুটিয়ে তেড়ে গিয়েছিলেন ম্যানেজারের কাছে। ম্যানেজার লোকটি সুবিধের মোটেই নয়, যেহেতু, সেই সবেমাত্র আপনি খাস টিকিট ঘর থেকে টিকিট কিনেছেন কথাটা গলা ফাটিয়ে এবং সরোষে ঘোষণা করা সত্বেও আপনার কথা কিছুতেই বিশ্বাস ক'রতে চাইলে না সে। একদিন তো গুণ্ডাদের কাছে ঐভাবে ঠকে তারপর স্রেফ ধাপ্পা দিয়ে কাজ উদ্ধার ক'রে ফেলেছিলেন আর কি! অমন ভদ্রভাবে নিরীহতার ছাপ সর্ব্বাঙ্গে লেপে যদি এসে দাঁড়িয়ে বলেন, আপনার চাকরকে দুপুরে পাঠিয়েছিলেন টিকিট আনতে, সে হতভাগা একেবারেই নিরক্ষর তাই কোন্ প্রদর্শনীর টিকিট দিয়েছে দেখে নিতে পারেনি এবং এখন আপনি দেখছেন যে টিকিট আগের প্রদর্শনীর—অমন ক'রে ব'ললে

আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই ? সে কি তুমুল ব্যাপার! পিছনের ভদ্রলোকটি সত্যিই কিন্তু আপনার সঙ্গিনীর গায়ে ইচ্ছে করে পা লাগিয়ে দেয় নি। চিত্রগৃহের আসনের সামনে কি অপরিসর জায়গা থাকে দেখেছেন তো। ছবি দেখতে দেখতে মসগুল অবস্থায় হঠাৎ পা ছড়িয়ে দিতে গিয়ে সামনের লোকের গায়ে আঘাত লাগা নিতান্তই স্বাভাবিক—আশপাশের লোকের সাক্ষীতে এবং 'আসামী' ভদ্রলোকের চেহারা কথাবার্তা থেকে এটাকে নিছক দুর্ঘটনা বলেই মনে হয়। আর ম্যানেজার তার গোলামি বুদ্ধিতে বিচার ক'রে সেই কথাতে সায় দেওয়াতে আপনি তাকেও যদেচ্ছা গালাগালি ক'রতে দ্বিধা ক'রলেন না। কি সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি আপনার!

ইন্দ্রপুরীর 'দেবরে'র একটি দৃশ্যে অহীন্দ্র ও যমুনা

ছবি দেখবেন যখন পয়সা খরচ ক'রেই তখন টিকিট পাবেন না কেন, 'হাউস ফুল' বোর্ড টাঙানো থাকলেও আপনার মনে এ প্রশ্ন উদয় হওয়ার সুযোগ হয়। কোন জনপ্রিয় ছবির প্রদর্শন আরম্ভ হ'লেই এবং কোনবারই আপনি এর কোন যুক্তিযুক্ত উত্তর খুঁজে পান নি—একটাও আসন খালি থাকবে না এ কখনও হ'তে পারে? এটা টিকিট বিক্রেতাদের বদমাইশি ছাড়া আর কি! টিকিট ওরা লুকিয়ে রেখে দেয় চেনাশোনা লোককে দেবার জন্যে আর না হয় লুকিয়ে বেশি দামে বিক্রী ক'রে ব্যবসা করে। বিক্রী না হয় সাত দিন আগে থেকেই আরম্ভ হ'য়েছে—তার'লে......নাঃ, অগ্রিম কিনে রাখলেই ভাল হ'তো—আফশোষ ক'রলেও কোনবারই আপনি এই ভুল করার মজা থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখতে চান না।

ছবি চলতে থাকলে চিত্রগৃহের মধ্যে সেই সময়ে চেঁচামিচি ক'রলে একটা তুমুল কাণ্ড যে ঘটবেই এ তো জানেনই। এ কায়দাটা খাটিয়ে নেবার উৎকট আগ্রহ মাঝে মাঝে আপনাকে পেয়ে বসে এবং সামান্য সুযোগের সদ্ব্যবহারে আপনার উৎসাহের আর অন্ত থাকে না।

ধরুণ, ছবি দেখতে দেখতে হঠাৎ এক জায়গায় কেটে গেল। সেই সময়ে বিকট হট্টগোল সৃষ্টি ক'রতে অদ্ভুত একতার পরিচয় পাওয়া যায়। অপারেটর লোকটা কিন্তু পাজী এমনি, আপনার হট্টগোলকে গ্রাহ্যেই আনে না—মেশিনের গোলমাল না সেরে আপনার গোলমাল থামাবার দিকে তার যদি একটু ভ্রূক্ষেপ থাকে! ইচ্ছে ক'রে ছবি কেটে কেউ দেয়নি ঠিকই; যাই হোক মাঝখান থেকে তো বেশ খানিকটা হৈ চৈ ক'রে নেওয়া গেল!—চিত্রগৃহের কর্তৃপক্ষকে বাপান্ত করার এমন সুযোগটা ছেড়ে দেওয়া যায় কখনো? বিশেষ যখন দস্তুরমত গাঁটের কড়ি খরচ ক'রে

এসেছেন? মেশিনের আকস্মিক বৈকল্য, তা আপনার কি? তাড়াতাড়ি মেরামত ক'রে ছবি দেখাতে পারে ভাল, না হয় গেল চিত্রগৃহটির সব আসবাব ভেঙে তচনচ হ'য়ে। আপনি স্বভাবতই তখন পয়সা ফেরৎ চাইবেন—কর্তৃপক্ষ উন্মত্ত দঙ্গলের কাছে আগেই হার স্বীকার ক'রে রেখেছে এবং তাদের দাবী মত পয়সা ফেরৎ বা অন্য কোনদিন এসে ছবি দেখবার ব্যবস্থা ক'রে দিতে রাজী—সে ব্যবস্থা আপনার হুকুম মত করাও হ'চ্ছে তবে একে একে—আপনার দান না আসা পর্য্যন্ত ধীরভাবে অপেক্ষা করবার মানে হয় না, সুতরাং হট্টগোল এবং দাঙ্গা বজায় রাখুন, এই ফাঁকে দুচারখানা চেয়ার, শো-কেস, পর্দ্দা অনেক কিছুই নষ্ট ক'রে দেওয়া যেতে পারে। কেমন সভ্য আনন্দ বলুন তো? এই তো এ বছরের ডিসেম্বরে কলকাতায় প্রথম যখন শত্রু বিমানের হানা হয়—ইণ্টারভ্যাল হ'তে অল্প বাকী, এমন সময় বাজলো সাইরেন। সামরিক আইন অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ ছবি বন্ধ ক'রে দিলে এবং আপনাকে জানিয়ে দিলে যে বিপদ কেটে যাবার সাইরেন তাড়াতাড়ি বাজলে আবার ছবি চালানো হবে, কিন্তু যথেষ্ট সময় যদি না থাকে এবং রাত খুব বেশী হ'য়ে যায় তা হলে সেরাত্রি আর ছবি না দেখিয়ে ওই টিকিটেই আর একদিন দেখে যেতে পারবেন। বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর যখন দেখা গেল, ছবি আবার দেখাতে গেলে অনেক রাত হয়ে যাবে তখন কর্তৃপক্ষ সে-রাত্রির প্রদর্শনী স্থগিত থাকবে ব'লে ঘোষণা ক'রে দিলে। ইতিমধ্যেই কিন্তু আপনি নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগে বুঝতে পেরে গিয়েছেন যে, আপনাকে ফাঁকি দেবার জন্যেই কর্তৃপক্ষ শত্রুবিমানকে খবর পাঠিয়ে ডেকে এনেছে!—ওদের এই কারসাজীর উপযুক্ত সাজাও আপনার জানা। খুব প্রাণখুলে হট্টগোল সৃষ্টি ক'রে দিলেন মুহূর্ত্ত মধ্যেই এবং শেষ পর্য্যন্ত বিপদমুক্তির সঙ্কেতধ্বনি শোনার পর আবার ছবি দেখাতে রাজী করিয়ে তবে ছাড়লেন। রাত দুটোয় ছবি ভাঙার পর গাড়ী ঘোড়ার অভাবে বাড়ী ফিরতে আপনার যথেষ্ট কষ্ট হ'য়েছিল এবং অত রাত জাগার জন্যে স্বাস্থ্যেরও হানি হ'য়েছিল বটে, কিন্তু ওদের কেমন জব্দ করেছিলেন বলুন তো!

চিত্রগৃহ পরিচ্ছন্ন কেন থাকবে এ প্রশ্নের জবাব আপনি কোনদিনই খুঁজে পান না। পান না খেলে সিনেমার আনন্দ জমতেই পারে না, আর পান খেয়ে পিকও ফেলতে হয়; তার পাতা সমেত তো খেয়ে ফেলা যায় না, সুতরাং সেগুলো মাটিতে ফেলতেই হয়, তাতে আর হ'য়েছে কি? শো শেষ হ'লেই ঝাড়ুদার পরিষ্কার ক'রে নিয়ে যাবে। এক জায়গায় ঘণ্টা তিনেক বসে থাকতে গেলে অমন কফ থুতু না ফেলে থাকা যায় না, আর কাঁহাতকই বা উঠে উঠে গিয়ে স্পিটুনে ফেলে আসা যায়? দেয়ালে দেয়ালে পোষ্টার বা দেওয়াল-চিত্রে চুণের দাগ লাগিয়ে থাকেনই, তাতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যায়? সিনেমা দেখে ফুর্ত্তি ক'রতে এসে অতশত জেনে, সবদিক নজর রেখে চলা যায় না। বিদেশী কেউ এই সব দেখে কোন মন্তব্য করে তো করুকগে—কারুর আপনি খান, না পরেন?

বিলাতি ছবিঘরগুলোতে গিয়ে একটু অন্যভাবে চলতেই হয়—বলা যায় না, ব্যাটারা কখন কি একটা করে, কি ব'লে বসবে! ওদের ওখানে শান্তভাবে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ—ওদের ওখানে অগ্রিম টিকিট কিনে রাখতে আপনার ভুল হয় না—টিকিট ধরে ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে না হয় থাকতে হ'ল—তবে গোলমাল না করাই ভাল কি জানি... টিকিটের গোলমাল হোক, ছবি কেটে যাক, কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সত্যিই অপরাধজনক ও আপত্তিকর কিছু ঘটলেও কিছু না বলতে যাওয়াই ভাল—কি জানি যদি আপনার মেজাজ ওরা বরদাস্ত না করে! দিশী লোক হ'লে না হয় 'ফাইটাফাইটি' করা যায় কিন্তু এরা কিছু আবার

ক'রে বসতে পাবে। অন্ প্রিন্সিপল্ ওদের ওখেনে ছবি কেটে গেলে হৈ চৈ ক'রবেন না, ম্যানেজার বা যে কেউ যা বলে বিনা প্রতিবাদে মেনে নেবেন, দেয়াল কি মেঝেতে থুতু এবং পানের খোলা, বাদামের খোলা ইত্যাদি ফেলে জায়গাটা নোংরা ক'রবেন না; সময়ে গিয়ে আসন গ্রহণ ক'রবেন—ওদের সঙ্গে লেগে কে মান খুইয়ে আসতে যাবে বলুন?

* * *

আপনার চরিত্রের এই দিকটা নজরে পড়েছে কি কোন দিন? এখন কোন চিত্রগৃহে গেলে না হয় ওদের আয়নায় নিজের চেহারাটা একবার দেখে নেবেন—একটু ব্যতিক্রম নজরে পড়লেও পড়তে পারে।

ন্যাশনাল ষ্টুডিওর 'জোয়ানী' চিত্রের একটি দৃশ্যে হুসনা বানুকে দেখা যাচ্ছে

আমাদের বাঙ্গলা ছবি

শ্রীপ্রদ্যোতকুমার মিত্র

এ্যামেচার থিয়েটার পার্টির অভিনয় ও তাদের নানা রকম ভুল-ত্রুটির আলোচনা বিশেষ মুখরোচক, তাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইদানিং বাঙ্গলা দেশের সিনেমাগুলো এই এ্যামেচার পার্টিকেও ছাড়িয়ে যেতে বসেছে।

সৌখিন অভিনেতা ও সখের দলের এই সব ভুল-ত্রুটি আমরা অনেক ক্ষেত্রে উপভোগ করি; কারণ, পুরো দলটি ও তার অভিনেতারা সৌখীন,—পেশাদার নয়। এই জন্য তাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশার একটা সীমা থাকে। আর তা ছাড়াও, সেখানকার সকলেই আমাদের পরিচিত অথবা বন্ধু বান্ধব। তাঁদের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়েই আমরা সৌখিন দলের অভিনয় দেখতে যাই এবং তাঁদের জন্য আমাদের অজ্ঞাতে বেশ খানিকটা সহানুভূতি ও মার্জনা লুকিয়ে থাকে সে কথাও অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু আমরা সিনেমায় যাই পয়সা দিয়ে,—প্রাণের সকল রস নিঃশেষ ক'রে যে অর্থ উপার্জন করি তারই বিনিময়ে আনন্দ কিনতে। সেখানে আমাদের প্রত্যাশা থাকে অনেক বেশী, আমরা চাই পরিপূর্ণ আনন্দ। এর ব্যতিক্রমে কোন ছেলে-ভুলান কৈফিয়ৎই শুনতে রাজী নই আমরা।

এখন প্রশ্ন: বাঙ্গলা ছবি আমাদের সেই পরিপূর্ণ আনন্দ দিতে পারে কি না? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ভার দর্শকদের ওপর। তবে, এমন অনেক দর্শকও দেখা গিয়েছে, যাঁরা বাঙ্গলা ছবির নামে হাত জোড় ক'রে বলেন, 'মশাই, দয়া ক'রে আপনাদের বাঙ্গলা ছবি আর দেখতে বলবেন না।' এই নির্মম উক্তির জন্য তাঁদের যদি চেপে ধরা যায়, তবে তাঁরা আমাদের ছবি সম্পর্কে এমন সব অপ্রীতিকর মন্তব্য করেন, যা'র অধিকাংশই অস্বীকার করা যায় না। ছবির কাহিনী, পরিচালনা, অভিনয়, সঙ্গীত, দৃশ্যপট সব কিছু সম্পর্কেই তাঁরা তাঁদের অভিমত প্রকাশ করেন।

কি আছে বাঙ্গলা ছবিতে? একই অভিনেতা একই বিশিষ্ট ধরণে অভিনয় করেন ছবির পর ছবিতে। কাহিনীও মোটের ওপর সেই থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়। অধিকাংশ সেটিংই মনে হয়, পেছনে সিন ঝুলিয়ে রেখেছে; তাও ঘটনা ও পরিস্থিতির সঙ্গে যোগ থাকে না সবগুলোর। যেখানে সেখানে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে গান; রবীন্দ্রনাথের অথবা নিতান্ত আধুনিক। নায়কের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করছেন তিনি হয়ত' একজন বিশিষ্ট জনপ্রিয় গায়ক, সুতরাং তাঁকে দিয়ে কয়েকখানা গান না গাওয়ালে তাঁর জনপ্রিয়তাকে ঠিকমত utilise করা হয় না। বিভিন্ন ভূমিকায় যারা অভিনয় ক'রবেন, তাঁরা কিছুটা জন-পরিচিত হলেই হ'ল, সেটাই তাঁদের সবচেয়ে বড় গুণ। হোক না তাঁদের চেহারা বিরক্তিকর, নাই বা পারলেন তাঁরা প্রকৃত শিল্পীর মত রূপদান করতে। এ ছাড়াও হামেশাই দেখা যায়, কোন দৃশ্যে কেউ হয়ত' রাগ ক'রে তাড়াতাড়ি ঘরের থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, সেটিংএর বাইরে এসে তিনি মনে ক'রলেন, তাঁর কাজ শেষ হ'য়েছে, অতএব তাঁর গতি হয়ে এল শ্লথ অথবা ঘুরে গিয়ে তিনি অন্তরালের আর্ক ল্যাম্পের সামনে ছায়া ক'রে দাঁড়ালেন। ক্যামেরার শ্যেন দৃষ্টি এ সবই ফিল্ম-এর বুকে এঁকে দেয়। এডিটিংও সেই রকম। হয়ত কোন চরিত্র সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। ষ্টুডিওর সিঁড়ি। খানিকটা গিয়েই তার সমাপ্তি। সেই সমাপ্তিতে এসে অভিনেতাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। দাঁড়ান পর্য্যন্ত ছবি তোলা হয়েছে, কিন্তু এডিটর দাঁড়ান জায়গাটুকুতে আর

কাঁচি চালাবার ফুরসুৎ পান নাই। এর ফলে দর্শকরা দেখছে যে, নায়ক ওপরে গিয়ে দাঁড়িয়েই আছে। এমনি অসংখ্য।

আসল কথা, আমাদের দেশের চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শিল্পীদের ধীরে সুস্থে, ভেবে-চিন্তে কোন কিছু ক'রবার প্রবৃত্তি বা আগ্রহ নাই। হয়ত' কোন বিভাগের কোন নতুন শিল্পী তাঁর প্রথম বইখানিতে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ ক'রে সাফল্য লাভ ক'রলেন, কিন্তু তাঁর সেই সাফল্য লাভের পরই তাঁর চাহিদা বেড়ে যায় আশাতীত রকম আর কাজের চাপে ও অর্থের নেশায় তাঁর প্রথম দিকের আন্তরীকতা ও অনন্য চিন্তা কর্পূরের মত উবে যায়।

অবশ্য, এর জন্য দায়ী আমাদের দেশের প্রোডিউসররা। কারণ, তাঁরা কোন নতুন শিল্পীকে গড়ে তুলবার জন্যে অথবা কোন নতুন লোককে কাজ শিখিয়ে শিল্পী তৈরী করবার জন্যে কোন আগ্রহ দেখান না। তাঁরা সব কিছুই চান 'রেডি মেইড্'। তাই একটু আধটু কাজ জানা পুরণো শিল্পীদের নিয়ে পড়ে যায় নির্লজ্জ কাড়াকাড়ি। প্রারম্ভে এই সব শিল্পীদের যে প্রতিভা সবে বিকশিত হচ্ছিল, যা' আর কিছু সময় পেলেই পূর্ণ প্রস্ফুটিত হ'ত, প্রোডিউসরদের অনুগ্রহ আকারে নিগ্রহ তাদের সেইসকল আন্তরিকতা, সকল প্রতিভা বিধ্বস্ত ক'রে দেয়। প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ না হওয়ার জন্যেই আমাদের দেশের শিল্পীরা মাত্র কিছুদিনের ভেতরই একঘেয়ে ও পুরণো হয়ে যান।

এই সব বিষয়ে বাঙলার প্রোডিউসরদের অচেতনতা আত্মঘাতী নীতিরই নামান্তর। দেশে যদি নতুন শিল্পী জন্মগ্রহণ করতে না পারল, যদি নতুন শিল্পীদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, নতুন চিন্তাধারার সহায়তাই চিত্রজগৎ না পেল, তবে এ দেশের চিত্র-শিল্পের অগ্রগতি সম্ভব হবে কি ক'রে? একটা মহা আশ্চর্য্যের কথা এই যে, আমাদের দেশে চিত্র-শিল্পানুরাগী কোন যুবক বা যুবতী চিত্র-নির্দ্দেশকদের নেহাৎই করুণার পাত্র!

•কেবল অগ্রগতি নয়, আমাদের দেশের চিত্র-শিল্পকে ও ব্যবসায়কে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য চিত্র নির্দ্দেশকদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য, যত অধিক সম্ভব নতুন আদর্শ, নতুন ভাব, নতুন প্রেরণা, নতুন উদ্যম বিশিষ্ট যুবক যুবতীদের চিত্র-শিল্পে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ দেওয়া। আর সমস্ত কর্ম্মরত পুরণো শিল্পীদের কাজ নিখুঁৎ করবার জন্য তাঁদের পড়া-শুনা, গবেষণা ও চিন্তার প্রচুর অবকাশ দেওয়া। চলচ্চিত্র বিষয়ক পুঁথি-পত্র আমাদের দেশে কোন লাইব্রেরী সাধারণতঃ রাখেনই না; কিন্তু এ বিষয়ে গরজ যাদের বেশী হওয়া উচিৎ, তাঁরা লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করা সত্ত্বেও এদিকে একেবারে লক্ষ্য দিচ্ছেন না।

আসল কথা, চলচ্চিত্র যে চারুকলার একটা আর্ট, এতেও যে সৃজনী প্রতিভা প্রয়োজন, আর্টের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও যে জ্ঞানচর্চ্চা ও অনুশীলনী দরকার, সে বোধ আমাদের দেশের শিল্পী, প্রযোজক, পরিচালক, কারও মনে জাগ্রত হয় নাই। এমন কি, এই বিদ্যাটা কেউ শেখবার প্রয়োজনও বোধ করেন না। অনেকের ধারণা, এটা নিছক instinct-এর ব্যাপার। কিন্তু আসলে তা নয়। চারুকলার অন্য যে কোন বিভাগের মতই, এখানেও instinct-এর সঙ্গে শিক্ষা ও অনুশীলনার দরকার হয়। প্রকৃত পক্ষে, এই ধারণা না থাকবার জন্যই আমাদের দেশের চলচ্চিত্রের এই অবনতি।

একখানা বইকে সার্থক ক'রতে হ'লে যতদূর সম্ভব, division of labour-এর ওপর জোর দেওয়া দরকার এবং যে যে-বিভাগের ভার নেবেন, তাঁকে অনন্যমনা হয়ে শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে সেই বিভাগের সমস্ত দিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হবে, যেমন করে বৈজ্ঞানিক একটা পূর্ণ জিনিষের একটি একটি অংশ মাইক্রোশকোপের ভেতর দিয়ে দেখেন। এই উদ্দেশ্যে একই শিল্পীর একই সময়ে একাধিক বইতে কাজ করা অনেক ক্ষেত্রেই সমর্থনযোগ্য নয়। যে যে বিষয়ের ভার নেবেন, তাঁকে সেই বিশেষ বিষয় সম্পর্কে ভাবতে হবে, জ্ঞান আহরণ করতে হবে, রূপ দিতে হবে, এই কথা সব সময়েই মনে রাখা দরকার। তার তা না হ'লে আমাদের বাঙলা ছবি এ্যামেচার পার্টির থিয়েটারের মতই হাস্যাস্পদ হবে।

অলঙ্কারে বৈচিত্র্য
MBS
অলঙ্কার নির্ম্মাণে — ডিজাইনের সৌষ্ঠব, মনোরম কাজ এবং স্বর্ণের বিশুদ্ধতাই আমাদের বৈশিষ্ট্য। আমাদের দোকানে নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র গিনি স্বর্ণের নানাবিধ হাল ফ্যাসনের অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসনাদি সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে এবং অর্ডার দিলেও অল্প সময়ে পছন্দ মত জিনিষ তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয়। মফস্বলের অর্ডার ভি পি ডাকে পাঠান হয় পুরাতন স্বর্ণের পরিবর্ত্তে নূতন অলঙ্কার পাওয়া যায়। কাজের তুলনায় মজুরী সুলভ এবং প্রত্যেকটি অলঙ্কারের জন্য গ্যারান্টি থাকে।

কলা-প্রসঙ্গ

দলসুখ পাঞ্চোলী প্রযোজিত 'পুঁজি'র' একটি দৃশ্যে জয়ন্ত দেবী আখতার ও ইসমাইল

সিনেমায় গান

কণপ্রভা ভাদুড়ী

রূপ ও বাণীর মত সঙ্গীতও সিনেমা-শিল্পের একটি বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু। কোনও কোনও ছবি আমরা একাধিকবার দেখে থাকি গানের জন্য। সঙ্গীত জিনিষটা এমনি মায়া, মোহ ও মধুময় যে, সকল প্রকার মানুষই তার বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য। কথা আর সুর, ভাব আর ব্যঞ্জনা পরস্পর সংযুক্ত হয়ে এক আনন্দময় সৃষ্টির প্রতীকস্বরূপ হয়েছে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের মূল মন্ত্র ছিল সুর। সেই সুরের লীলা-তরঙ্গে বিশ্ববাসীর হৃদয় প্লাবিত হয়েছিল বলেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের মাহাত্ম এত প্রবল। আবার রবীন্দ্র-সঙ্গীতে দেখি, কথার মায়াই আমাদের প্রলুব্ধ করে বেশী। মানুষ যখন সর্ব্বহারা হয়, তখনও সে গান গায়, আবার যখন সে সম্পূর্ণ থাকে, তখনও সে গান গায়। এই বিশ্ব-সংসারে গান এমনিই সুন্দর বস্তু যে এর তুলনা মেলে না।

সিনেমা দেখতে গিয়ে গান শুনে যদি আমরা আনন্দ না পাই, তাহলে মনে হয় ছবি দেখার অর্দ্ধেক আনন্দ যেন জল হয়ে গেল। কাজেই সিনেমায় যারা সঙ্গীত পরিচালনা করেন, তাঁদের দায়িত্ব অনেক বেশী। কোনও কুশলী সঙ্গীতজ্ঞ যদি মনে করেন যে, আমার নির্ব্বাচন কখনও ভুল হতে পারে না, তবে তা হবে নিতান্ত ভুল। মদ যেমন সুস্থ মানুষকে মাতাল করে, ভুলও তেমনি মানুষের সচল মস্তিষ্কে প্রবেশ করে কাজে বিঘ্ন ঘটায় অজ্ঞাতসারে। কিন্তু এরূপ হয় তখন, যখন মানুষ তার সাধনার কালে একাগ্রতার প্রতি অমনোযোগী হয়। তার ফলে দেখা যায়, সে সৃষ্টির মধ্যে কোনও না কোন স্থানে ফাঁক থেকে গেছে। অবিশ্যি সুগায়ক-গায়িকা হলে, গান যেমনই হোক না কেন, শ্রোতাদের কানে তা' অমৃত বর্ষণ করবেই। কিন্তু বাংলার সিনেমা জগতে সুগায়ক গায়িকা বেশী নেই বলেই সঙ্গীত-পরিচালকদের এই বিষয়ে একটু সচেতন হওয়া প্রয়োজন। ভাব যেমন সুরের সাহায্যে আপনাকে প্রকাশ করে, ব্যঞ্জনার বিকাশ তেমনি গায়কের বিশেষ ভঙ্গীর মধ্যে। হয়ত কেউ দুঃখের গান গাইছেন, অথচ তাঁর চোখে মুখে বেদনার ম্লানাভা ফুটে উঠল না, তাহলে সে গান শুনে আমরা তৃপ্ত হতে পারি না। অর্থাৎ সে সুর মনে কোনও মায়াজাল বিস্তার করতে পারে না। সিনেমার গানে মজা এইখানে। যে গান ছবিতে ভালো লাগল না, সেই গানই আবার ঘরে বসে রেকর্ডে শোন, শতগুণে ভালো লাগবে।

কাশীনাথ বাণীচিত্রের গানগুলি আমাদের বিশেষ ভালো লাগল না। কিশোর কাশীনাথ যখন ঘরের পোষা পাখীটিকে উড়িয়ে দিয়ে নিজেও উড়ে গেল, তখন কিশোরী কমলা যে গানটী গাইল সেটী তার মুখে মোটেই মানায়নি। তার চোখে, মুখে এমন একটা কাঠিন্যের ভাব সর্ব্বদা বিরাজিত ছিল যে, সেখানে গান গাওয়ার সময় মুহূর্ত্তের জন্য কোমলতার উদ্রেক হয়নি। অথচ গানটী বিরহের। বেদনা কি কখনও চপলতার ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে? বালিকা হলেও যখন বেদনা বোধ তার চিত্ত স্পর্শ করে, গাম্ভীর্য্য সেখানে আপনিই এসে ধরা দেয়। কিন্তু অভিব্যক্তিহীন মুখাবয়ব অন্তরের কোনও ভাবই প্রকাশ করতে সমর্থ হয় না। কিন্তু বালিকা বিন্দুর গানটী বেশ লাগল। আবার শেষ দৃশ্যে অভাগিনী কমলা যখন তার সব ফিরে পেয়ে আনন্দে গান গাইছিল, তখনও তার গানে আনন্দ তেমনভাবে ফুটে ওঠেনি। চঞ্চলতা আনন্দের একটি বিশিষ্ট রূপ। তাকে হাজার আড়াল

দিয়ে রাখলেও যেমন করেই হোক, সে আপনাকে প্রকাশ কোরবেই। বেদনাকে যেমন গাম্ভীর্য্য, আনন্দকে তেমনি চাপল্যই সুন্দর করে তোলে। চাপল্যই আনন্দের জীবন। কাজেই যে আনন্দে প্রাণস্পন্দন অনুভূত না হয়, তা' কি অন্যের চিত্ত স্পর্শ করতে পারে? কমলার চোখে-মুখে দেহভঙ্গীমায় তার আনন্দ প্রকাশ পেয়ে থাকলেও কণ্ঠে তার কোনও তরঙ্গই লীলায়িত হয়ে ওঠেনি। কিন্তু বিন্দুর সেখানে আনন্দের তুলনায় চঞ্চলতাই প্রকাশ পেয়েছে বেশী।

এই পঙ্কজবাবুরই পরিচালিত মুক্তি কথাচিত্রের গানগুলি বাঙ্গালীর এক বিশিষ্ট সম্পদ। তাই মনে হয়, চিত্র-নির্ম্মাণের জন্য পরিচালকগণ যা পরিশ্রম করেন, এখন তার চেয়ে একটু অধিক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় তাঁদের করতে হবে। শিল্পী-নির্ব্বাচনকালে কার কণ্ঠে কি গান মানায় এও যেমন দেখা উচিত, তেমনি শুধু সুরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে গানের রচনাটাও একটু দেখা উচিত। সব দিকে সুদৃষ্টি রেখে যদি পরিচালকগণ কাজ করেন, তবে তাঁদের সাধনা সিদ্ধি লাভ করবে।

ফিল্ম্‌ ধার দেওয়ার ব্যবস্থা

বার্ম্মা-শেলের 'একটি কেরোসিন টিন' নামক সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় শিক্ষামূলক চিত্রের একটি দৃশ্য

সর্ব্বসাধারণের রুচী অনুযায়ী নানা প্রকার মনোজ্ঞ বিষয় অবলম্বন করে' বার্ম্মা-শেল এবং অন্যান্য ফিল্ম্‌ প্রস্তুত কেন্দ্রগুলিতে নির্ম্মিত বহুসংখ্যক প্রচার চিত্র এখন সকলের পক্ষেই দেখার সুবিধা হয়েছে। যে কেহই শিক্ষামূলক অথবা ঘরোয়া প্রদর্শনীর জন্য আবেদন করলেই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এগুলিকে পেতে পারবেন। এদের সম্পূর্ণ তালিকার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানাগুলির যে কোনটিতে লিখ্‌লেই হবে।—পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট, বার্ম্মা-শেল; বোম্বাই, কলিকাতা, নিউদিল্লী, করাচী এবং মাদ্রাজ।

রবীন্দ্রনাথ ও ধনঞ্জয়

শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রী

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের যে কয়খানি নাটক বা প্রহসন সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের "পরিত্রাণ" নাটকখানি অন্যতম। সেই 'পরিত্রাণ' নাটকখানি রবীন্দ্রনাথের 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের নবতম সংস্করণ। প্রায়শ্চিত্তের বিষয়বস্তু ও নাটকীয় ঘটনা যাহা, এই পরিত্রাণ নাটকেও তাহাই আছে। প্রায়শ্চিত্ত নাটকখানি কোনও সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হয় নাই, কিন্তু পরিত্রাণ নাটকখানি ষ্টার থিয়েটারে সম্ভবতঃ ১৩৩৪ সালের ভাদ্রমাসে অভিনীত হয় এবং উহা ১৩৩৭ সালের বার্ষিক বসুমতীতে নাটকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রায়শ্চিত্তের প্রতাপাদিত্য, বসন্ত রায়, উদয়াদিত্য, সুরমা ও বিভাই পরিত্রাণের নায়ক নায়িকা। কিন্তু ইহাদেরও পরিত্রাণে সম্পূর্ণ নূতন কলেবর দেখা দিয়াছে। প্রায়শ্চিত্তে যেভাবে দৃশ্য সজ্জা আছে পবিত্রাণে সম্পূর্ণ তাহা নূতনরূপ পাইয়াছে। পরিত্রাণ নাটকের মধ্যে প্রতাপ, বসন্ত রায় প্রভৃতি ছাড়া যে মহান্ আদর্শের একটি চরিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি যুগোপযোগী, পরিত্রাণ নাটকের সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষত্ব ধনঞ্জয় চরিত্র। আমি সেই চরিত্রটির বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

আজ যখন দেশ হইতে শান্তি বিতাড়িত, বিশ্বসংগ্রামে দেশ বিব্রত, সেই বিশ্বসংগ্রামের রসদ যোগাইতে আজ দেশ নিঃস্ব, তাই আজ দেশে দু'মুঠো ডাল ভাতের ব্যবস্থা নাই। প্রজা আজ দেশের রাস্তায় বাঁধিয়াছে ঘর, অন্নের থালা হইয়াছে ভূমি, জলের পাত্র হইয়াছে নালা, শয্যা হইয়াছে রাস্তার ধূলায়। অন্নের জন্য আজ মানুষ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু তাহাদের ভাগ্যে অন্ন জুটিতেছে না। পরণের বস্ত্র জুটিতেছে না। রাস্তায় মানুষ অন্নাভাবে পড়িয়া মরিতেছে। কে তাহাদের হিসাব রাখিতেছে? মানুষ আজ আগাছা, যে বনে আপনিই জন্মাইতেছে আবার সেই বনে আপনিই শুকাইয়া যাইতেছে। কেহই তাহার হিসাব রাখে না। এই দুর্দ্দিনের কথা স্মরণ করিয়াই বোধ হয় বিশ্বকবি খুঁজিয়াছিলেন ধনঞ্জয় বৈরাগীকে। যে বৈরাগী আজ সকলকে বলিতেছে, "ওরে, দেশে যুদ্ধ হউক বিগ্রহ হউক দেশে যা কিছু আসে আসুক তবু তোদের অন্নে তোদেরই ভাগ আছে।" রাজা প্রতাপাদিত্য দেশকে স্বাধীন রাখিবার জন্য যে চেষ্টা, যে সমরায়োজন করিতেছিলেন, তাহাতেও দরকার অর্থের ও রসদের। তার জন্য প্রতাপ দেশের কল্যাণকামী মুক্তির রক্ষক হইয়াও তাঁহার খুল্লতাত বসন্ত রায়কে হত্যার কারণে বলিয়াছেন—"খুন করাটা যেখানে ধর্ম্ম সেখানে না করাটাই পাপ, এই না করাটাই পাপ, এটা এখনো শিখতে বাকি আছে। পিতৃব্য বসন্ত রায় নিজেকে ম্লেচ্ছের দাস বলে স্বীকার করেছেন। ক্ষত হ'লে নিজের বাহুকে কেটে ফেলা যায়। সে কথা মনে রেখো মন্ত্রী।" এই যে দাসত্বের উচ্ছেদকামী মহারাজ প্রতাপাদিত্য তিনিই হইয়াছেন প্রজাদের নিকট শোষক রাজা। তাঁহারই কর দিতে প্রজারা আজ সর্ব্বশান্ত তাহার একমাত্র কারণ দেশে সমরায়োজনে প্রতাপের অর্থ বুভুক্ষা। সেই রাজার মহা বুভুক্ষার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন ধনঞ্জয় বৈরাগী। যখন প্রতাপ চায় ধনঞ্জয়ের কাছে রাজার প্রাপ্য। তখনই বৈরাগী বলিয়াছেন—"না মহারাজ দেবো না।" প্রজারা খাজনা দিবে না কেন? তাহার উত্তরে ধনঞ্জয় বলিয়াছেন—"আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন, এ অন্ন যে তাঁর, এ আমি তোমায় দিই কি বলে।

তাই বাধল রাজায় প্রজায় সংঘর্ষ। তাই হইল তোমাদের ধনঞ্জয় বৈরাগী। ধনঞ্জয় শুনিয়াছিল ধরণীর কান্না, সেদিন তাই তিনি প্রজাদের ডাকিয়া বলিয়াছেন—"দুঃখের দিন আসচে।" প্রজা—"বলো কি প্রভু? ধনঞ্জয়—"হ্যাঁরে, আমি ধরণীর কান্না শুনতে পাই যে!" সে দিন যে কান্না কবি শুনিয়াছিলেন, আজ ধরণীর বুক ফাটিয়া চতুর্দ্দিকে সেই কান্না ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

ধনঞ্জয় বৈরাগী দেশের জন্য যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা যেমনই সত্য তেমনই তথ্যপূর্ণ। তাঁর কাছে মান অপমান নাই, মনে কষ্ট নাই, দুঃখ তাহাকে কোথাও স্পর্শ করে নাই, তিনি দিয়াছেন মানাপমান, তাই যখন তাঁর কাছে সব প্রজারা এসে বল্লে—"রাজার কাছারিতে ধরে মারলে সে বড় অপমান।" ধনঞ্জয়—"আমার চেলা হ'য়েও তোদের মানসম্ভ্রম আছে!" প্রজারা—"বাকি আর রইল কি ঠাকুর? এদিকে পেটের জ্বালায় মরচি, ওদিকে পিঠের জ্বালাও ধরিয়ে দিলে?" ধনঞ্জয়—"বেশ হ'য়েছে, বেশ হ'য়েছে, একবার খুব করে নেচে নে।" 'ধনঞ্জয়ের কাছে মার মার নয়, কটুভাষণ কটুভাষণ নয় তাহার কাছে সবই তাঁহার উদ্দেশ্যে সমর্পিত। তিনি যে মুক্তির দূত, তাই ত' বলিতে পারিয়াছেন—

আরো প্রভু আরো আরো
এমনি করে আমায় মারো।
লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই,
ধরা পড়ে গেছি আর কি এড়াই?
যা কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো?
এবার যা করবার তা সারো সারো!
আমি হারি কিম্বা তুমিই হারো
হাটে ঘাটে বাটে করি মেলা
কেবল হেসে খেলে গেছে বেলা
দেখি কেমনে কাঁদাতে পার!

তাই ধনঞ্জয় মারের ভয়ে পিছপাও না হইয়া চলিল রাজার সম্মুখে সেখানে যে মারের বাবা বসে আছে। তাই ত' ছুটিল ধনঞ্জয়। রাজায় প্রজায় হইল দেখা, কিন্তু কি দাবী লইয়া হইয়াছে উপস্থিত সেই প্রশ্নের উত্তরে ধনঞ্জয় বলিয়াছেন—"সব রাজস্বটাই কি রাজার অর্দ্ধেক রাজস্ব, প্রজার নয় 'ত' কি? তাই ত' হইল রাজায় প্রজায় সঙ্ঘর্ষ। প্রজারা দাবী প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, তাহাদের প্রিয় যুবরাজকে চায় তারা নিয়ে যেতে। রাজা বলে—"যুবরাজকে নিয়ে যাবি দিবি আমাকে খাজনা বাকি। অন্ন বিনে মরছি যে।" "মরতে ত' সকলকেই হবে, বেটারা রাজার দেনা বাকি রেখে মরবি।" এলো ধনঞ্জয়, রাজা বল্লে তুমি সমস্ত প্রজাদের ক্ষেপিয়েছ। ধনঞ্জয় বলে—

আমারে পাড়ায় পাড়ায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায়
কোন ক্ষেপা সে!
ওরে আকাশ জুড়ে মোহন সুরে
কি যে বাজে কোন্ বাতাসে।

রাজা যে, সে কি ক্ষেপার কথায় ভোলে? তাই ত' যুগে যুগে মুক্তিকামীর দলকে রাজারা বলে আসছেন—"কপালে দুঃখ আছে তাই তোমাদের ভোগ করতেই হবে।" চিরকালই ধনঞ্জয়রা বলে চলেছে—"যে দুঃখ কপালে ছিল, তা'কে আমরা বুকে বসিয়েছি, সেই দুঃখই ত' আমাদের ভুলে থাকতে দেয় না, যেখানে ব্যথা সেইখানেই হাত পড়ে। ব্যথাই আমাদের বাঁচিয়ে তোলে জাগিয়ে দেয়। ব্যথা না থাক্‌লে যে আমরা ঘুমিয়ে পড়তুম। তাই যারা ব্যথা বোঝে ব্যথার বেদনা অনুভব করে তারা চিরকালই রাজ-রোষে হয় বন্দী।" তাই ক্ষ্যাপা ধনঞ্জয় হইল বন্দী। মুক্তির দূত ক্ষ্যাপাকে কি ধরে রাখা যায় সে যে চিরমুক্ত, তাই ত' রাজার কারাগারও তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। অগ্নির লেলিহান শিখা দিল বন্দীর বন্ধন মুক্তি। তাই আজ ধনঞ্জয় মুক্ত। তাই রাজার লৌহশৃঙ্খলও বন্দী করিয়া

রাখিতে পারিল না। সর্ব্বগ্রাসী অগ্নির লেলিহান শিখায় লৌহশৃঙ্খল খসিয়া পড়িল। রাজা মুক্ত ধনঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিল—"ধনঞ্জয়, তুমি যাবে কোথায়?" "রাস্তায়।" বৈরাগীর সেই আনন্দমূর্ত্তি দেখিয়া রাজাও বলেন—"বৈরাগী, আমার এক একবার মনে হয় তোমার ঐ রাস্তাই ভাল—আর এই রাজ্যটা কিছু না।" ধনঞ্জয় বলে—"মহারাজ রাজ্যটাও ত' রাস্তা। চলতে পারলেই হল।" এই দুর্গম পথে যুগযুগ ধনঞ্জয় চলিয়াছে। তাহারা চিরকালই চলার পথে আগাইয়া চলেছে, তাই তাহাদের রাস্তায় কোন ভয় ভাবনা নাই, সেখানে দীন দরিদ্র সবাই এসে দাঁড়ায় তাই নির্ভাবনায় ধনঞ্জয় গাহিয়াছে—

সকল ভয়ের ভয় যে তারে
কোন্ বিপদে কাড়বে?
প্রাণের সঙ্গে যে প্রাণ গাথা
কোন কালে সে ছাড়বে?
না হয় গেল সবই ভেসে
রইবে 'ত' সেই সর্ব্বনেশে।
যে লাভ সকল ক্ষতির শেষে
সে লাভ কেবল বাড়বে!

বৈরাগী চলিল রাস্তায়। সে যে রাস্তার ছেলে, তার রাস্তার কোলে কোলেই দিন কাটে। দিনের পর দিন ধূলার ধরণী তাহাকে স্বগত জানায়, তাই সে নির্ভীক। কোথায় যাবে তাই তাহাদের মনে থাকে না। রাস্তাই তাহাদের মজাইয়া রাখে, মাটি দেখিলে তাহারা হয় মাটি। তাই ধনঞ্জয় বলিয়াছে—

গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে?
ওরে কার পানে মন হাত বাড়িয়ে
লুটিয়ে যায় ধুলায় রে?

মনভুলান পথে চিরমুক্ত আনন্দের সাথী মুক্তির বার্ত্তাবহ ধনঞ্জয় চলিয়াছে। ধনঞ্জয় যখন চলে গাহিয়া বলে—

আর ফিরব না রে ফিরব না
এখন হাওয়ার মুখে ভাসল তরী
কূলে ভিড়ব না আর ভিড়ব না রে
ছড়িয়ে গেছে সুতো ছিঁড়ে
তাই খুঁটে আজ মরব কিরে।
এখন ভাঙা ঘরের কুড়িয়ে খুঁটি
বেড়া ঘিরবনা আর ঘিরব না রে।
ঘাটের রসি গেছে কেটে
কাঁদব কি তাই বক্ষ ফেটে?
এখন পালের রসি ধরব কসি
এ রসি ছিঁড়ব না আর ছিঁড়ব না রে।

আজও আমাদের এই জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে বারে বারে মনে পড়ে যে কোথায় সেই মহামানব যে আমাদের জীবন পালের রসি কসিয়া ধরিতে পারে যাহাতে আজ জাতীয় জীবন-তরীর সেই পালের দড়ি না ছেঁড়ে। তাই চাই ধনঞ্জয়কে। কোথায় সে ধনঞ্জয়, তাই ধনঞ্জয়কে বার বার স্মরণ করিতেছি।

মেয়ে

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

নীরদ ঘোষাল এককালে বড় অত্যাচারী ছিল। প্রচুর মদ খেত কিন্তু মাতাল নিয়ে যাদের কারবার সে সব স্ত্রীলোক তার পছন্দ হ'ত না। ভাল অবস্থায়, মত্ত অবস্থায় এ জগতে তার কাছে একমাত্র স্ত্রীলোক ছিল তার স্ত্রী। এ নিয়ে সে রীতিমত গর্ব্ব অনুভব করত। মাতাল কিন্তু চরিত্রহীন নয়, এমন মানুষ কটা আছে এ জগতে!

প্রায়ই মাঝরাত্রে অনুরূপার চাপা কান্নার গোঙানি ও হঠাৎ বাতাস-চেরা তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদ শুনতে শুনতে প্রতিবেশী-দের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। বেশী রাত্রে নীরদ বাড়ী ফিরেছে টের পেলে পাশের বাড়ীর মেয়েপুরুষ কান পেতে থাকত। চোখের আড়ালে মাঝরাত্রির ওই মর্ম্মান্তিক অভিনয় তাদের কল্পনায় এক ভয়াবহ রহস্য হয়ে উঠেছিল, অনুরূপার আর্ত্তিগুলি তাদের সর্ব্বাঙ্গে কেমন একটা অকথ্য অনুভূতির সাড়া জাগিয়ে তুলত: প্রত্যেকে নিজের মধ্যে অমানুষিক নির্ম্মমতায় আনন্দ উপভোগ করত। বেশী পরিমাণে পচনশীল খাদ্য বাড়ীতে এলে পাড়ায় বিলি করার প্রথা আছে। নীরদ যেন আশেপাশের কয়েকটা বাড়ীর স্তিমিত নিস্তেজ একঘেয়ে জীবনে তার উৎকট উল্লাসের স্বাদ পাঠিয়ে দিত।

সে-সব দিন গেছে।

আপনা থেকেই গেছে। নীরদ আর মদ খায় না। হৃদয় আর মনটা তার নরম হয়ে গেছে সত্য কিন্তু সেটা কাউকে মদ ছাড়তে সাহায্য করে না। মদের স্বাদটাই তার কাছে নষ্ট হয়ে গেছে। দেহ-যন্ত্র খারাপ হ'য়ে নয়, তার বিশাল দেহটা বরং আগের চেয়ে শক্তিশালীই হয়েছে এখন, —মাথায় তার স্বাদ লাগে না মদের। মদ খেলে কেমন সে শিথিল অবশ হ'য়ে যায়, সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপে, মাথাটা সর্ব্বক্ষণ আছড়ে পড়তে চায় বুকে। দুর্ব্বল শীর্ণকায়া অনুরূপার সেবা আর সাহায্যই তখন শুধু তার প্রয়োজন হ'ত। অথচ মদ না খেলে অনুরূপার প্যাঙাসে মুখখানা অত্যাচারে রক্তিম করে দেবার ক্ষমতা তার এখনও আছে।

নীরদ একটা কৈফিয়ৎ দেয়।— শোনায় উপদেশের মত!

'ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গেলে ওসব ছাড়তে হয় পুরুষ মানুষকে।'

'লুকিয়ে একটু আধটু—?'

'লুকিয়ে? আরে রাম!'

আপনা থেকেই গেছে। হৃদয় মন নরম হয়ে এলে পারিবারিক জীবনটা তার বড়ই ভাল লেগে গেল। গোড়ার ছেলেমেয়েগুলি বড় হয়ে ওঠায় নতুন জীবনের বিকাশমুখর পরিবারটিও তখন তার সত্যসত্যই বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে। লেখা-পড়া, গান-বাজানা, খেলা-ধুলা, ঝগড়া-ঝাঁটি, অভাব-অভিযোগ, আব্দার-আহ্লাদের সে কি সমারোহ বাড়ীতে! মুগ্ধ হয়ে গিয়ে নীরদের মদের পরিমাণ কমতে লাগল, বাদ পড়তে লাগল। তারপর একবার টাইফয়েডে ভুগে উঠে সে দেখল মদের স্বাদ তার কাছে নষ্ট হয়ে গেছে। শরীর সুস্থ ও সবল হল, শরীরে স্বাস্থ্য ও শক্তি এল, কিন্তু মদ খেতে গিয়ে নীরদ দেখল, মাথায় তার নেশাটা বিস্বাদ হয়ে গেছে।

মদ ছাড়লেও তার কৈফিয়ৎ দিতে হয় মানুষকে। নীরদ একটা কৈফিয়ৎ তৈরী করে নিল। বলবার সময় শোনায় উপদেশের মত। —'ছেলেমেয়ে বড় হলে ওসব ছাড়তে হয় পুরুষ মানুষকে।'

নীরদের কাছে যারা বিনামূল্যে মদ পেত তারা অনেকদিন পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরে পিছু লেগে রইল। এমন কি নীরদকে আবার নেশাটা ধরিয়ে দেবার জন্ম নিজেরা পয়সা খরচ করে মদ কিনে অন্ত ছুতায় তাকে বাড়ীতে ডেকে বলতে লাগল, 'লুকিয়ে চুরিয়ে এক আধদিন—'

'লুকিয়ে চুরিয়ে? আরে রাম রাম!'

এক বাড়ীতে থেকে নিজের ছেলেমেয়ের সঙ্গে যে বেশ একটা মোটারকম ব্যবধান ছিল এটা আবিষ্কার করে কি আশ্চর্য্যই যে হয়ে গেল নীরদ! আনন্দে গদগদ হয়ে সে বলতে লাগল নিজেকে, তাই বটে, তাই বটে! একটু এড়িয়ে গেলেই অনেকটা ফস্কে যায়। নিজের জীবনের অঙ্গ বটে তো সব! ইস্! মেয়েটা ম্যাট্রিক দেবে সামনের বছর! ম্যাট্রিক।

মেয়েটাই প্রথম সন্তান। নাম চারু। অনুরূপার সরু কাঠির মত দেহ থেকে সে যেন বেরিয়ে এসেছে নতুন একটি সংস্করণের মত, রোগার বদলে ছিপছিপে হয়ে। মায়ের প্যাঁতাসে মুখের গড়নটি শুধু পায় নি, চিবুকের অভাব ঘটে গেছে।

চারুর সঙ্গেই নীরদের ঘনিষ্টতা সকলের চেয়ে বেশী। চারু একটু একটু বড় হয়েছে আর অনুরূপা প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারেই একটু একটু করে বাপের সেবার ভাব তাকে ছেড়ে দিয়ে এসেছে। মনের আড়ালে যে বিরোধ ও বিতৃষ্ণা জমেছে অনুরূপার সেটা একদিনের সঞ্চয় নয়, নিজে সে ভাল করে জানেও না যে প্রয়োজন ও অভ্যাস ছাড়া স্বামীর কাছে যাবার তাগিদ সে কখনো অনুভব করে না! মেয়েকে বাপের সেবা শেখানো যে তারই বিদ্রোহের প্রকাশ, এটা কল্পনা করার ক্ষমতাও অনুরূপার নেই। দূরে যাবার, তফাতে থাকার তাগিদ যে অহরহ তার মধ্যে জেগে আছে, অনুরূপা তা জানে না, জানলেও বিশ্বাস করবে না।

বাবার জন্ত ছোট বড় কাজগুলি করে যাওয়া চারুর জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খেয়ে জড়িয়ে গেছে। বড় হওয়ার সঙ্গে যা কিছু বেড়েছে চারুর জীবনে বা নতুন এসেছে, সব মানিয়ে নেওয়া হয়েছে এই কর্ত্তব্যের সঙ্গে। চারু ভাবে না যে বাবার জন্য দশবার উঠে আসতে হওয়ায় পড়ায় তার ছেদ পড়ল। দশবার উঠে আসার ফাঁকগুলিই তার পড়ার জন্য। সংসারের কাজে মা তাকে প্রায় ডাকেই না, সেটা অবশ্য তাকে পড়া করা আর গান শেখার সুযোগ দিতে। কিন্তু বাবার কাজ আলাদা, সংসারের কাজের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। চা করা, খাবার করা, ভাত রাঁধা সংসারের কাজ, ওসব মা করে। চায়ের কাপ, খাবারের রেকাবি, ভাতের থালা বাবার সামনে পৌঁছে দেওয়া তার কাজ। বাবা জল চাইলে মা কলসী থেকে গেলাসে জল গড়িয়ে দেওয়া পর্য্যন্ত করতে পারে, বাবাকে গেলাসটা কিন্তু দিতে হবে তাকেই। বাবার জামা-কাপড়, পোষাক-পরিচ্ছদের হিসাব রাখা, বই-খাতা-কাগজ-পত্র গুছিয়ে রাখা, বিছানা পাতা, চটি এগিয়ে দেওয়া, বাতাস করা, ঘামাচি মারা ইত্যাদি যত কিছু করা দরকার সেগুলি করার জন্ম চারু জন্মেছিল পৃথিবীতে।

নীরদকে যেমন ভয় করে, তেমনি ভক্তি করে চারু। প্রতিদিনের চলতি সেবার অতিরিক্ত কোন সেবা করার সুযোগ পেলে সে যেন কৃতার্থ হয়ে যায়। নীরদের ছোট-খাট অসুখ হলে সে উদ্‌গ্রীব, উৎসুক হয়ে থাকে - যা কিছু করার আছে তারও বেশী কিছু করার সাধ চাপা উচ্ছ্বাসের মত তার ছোট বুকটিতে ঠেলে উঠতে চায়। নীরদ চোখ বুজে পড়ে থাকে সামান্য অসুখের ধাক্কায়, চারু তার ভারিক্কি প্রৌঢ় মুখে ক্ষমতা, শাসন ও মমতায় গড়া স্তব্ধ ভয়ঙ্কর রূপ দেখে দেখে মনের মধ্যে বিহ্বল হয়ে যায়।

অথচ আদুরে মেয়ে সে নয়। সে প্রথম এবং বড় বটে কিন্তু অনেকগুলির বড়। ভাইবোনের বন্যায় তার অতিরিক্ত আদরের দাবী গোড়ার দিকেই ভেসে গেছে। নীরদ তাকে

কোনদিন বেশী প্রশ্রয় দেয় নি, নির্ভরশীলতা যদি প্রশ্রয় না হয়। প্রধান সেবিকা বলে বরং শাস্তি ও শাসনটাই বাপের কাছে সে পেয়েছে বেশী।

তবে পরিচয়টা তাদের হয়েছে গভীর। মুখের ভাবের একটা ভিন্ন ভাষা সৃষ্টি হয়ে গেছে দু'জনের অনৈত্যিক সহানুভূতিতে। চারুর চোখ ভেজা দেখলে নীরদ তাকে আদর দিয়ে ভোলায় না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করে, 'কি হয়েছে রে?'

চারু তখন কাঁদে না, অভিমানের জের টানে না কিন্তু বলে, 'কাপড় নেই। মা বকেছে বাবা।'

নীরদ সত্যই রাগ করে। বলে, 'কাপড় নেই! এই না সেদিন একজোড়া কাপড় কিনে দিলাম তোকে, দু'মাসও হয় নি। অত কাপড় দিতে পারব না তোমাকে। অত নবাবকন্যা হলে চলবে না তোমার।' খানিকক্ষণ একদৃষ্টে মেয়ের মুখখানা দেখে আবার সজোরে মন্তব্য করে, 'লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে!'

কিন্তু কাপড় চারু পায়! ছুটির দিন, সেবার প্রয়োজন ছাড়াই কাছাকাছি একটু এদিক ওদিক নড়ে চড়ে বেড়ালেই নীরদ তাকে সঙ্গে করে কাপড়ের দোকানে নিয়ে যায়।

কাপড় পছন্দ করে' চারু নিজেই দাম জিজ্ঞাসা করে। দাম শুনে বলে, 'বাব্বা! সস্তা দেখে দিন।'

নীরদ বলে, 'নে নে, ওটাই নিয়ে নে। আলাস নে আর।'

স্কুলের পরীক্ষাগুলি চারু এমনই পাশ করে এসেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাটা পাশ করিয়ে দেবার জন্য শেষ বছর একজন মাষ্টার রাখা হল।

অনুরূপা বলেছিল, 'সম্বন্ধ খুঁজে বিয়ে দিয়ে দিলে হয়। বোকা হাবা মেয়ে যদি না পাশ করতে পারে?'

নীরদ বলেছিল, 'বিয়ে! ওইটুকু মেয়ের বিয়ে কি গো! পড়ছে, পড়ুক।'

অনুরূপা তর্ক করে না, কথা কাটায় না। মেয়ের বিয়ের মত বড় কথা বলেই সে বলল, 'মেয়ে তোমার ওইটুকুই আছে। দু'বছর বয়েস ছাপিয়ে ভর্তি করেছিলে মনে নেই? বছর বছর টেনে হিঁচড়ে ক্লাশে উঠেছে। কি হবে ওকে পড়িয়ে?'

তার পরেই চারুকে তালিম দেবার জন্য লোকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জগৎ ছেলেটি ভাল। কারণ, সে গরীব এবং নিজের চেষ্টায় অনেক কষ্ট সহ্য করে পড়াশোনা চালিয়ে এলেও বরাবর ভাল রেজাল্ট করে এসেছে।

জগৎ পড়ায়, চারুর মন পড়ে থাকে অন্দরে। দাঁড়ান, আসছি বলে থেকে থেকে সে উঠে যায় বাপের খুঁটিনাটি সেবা করতে। দিন সাতেক চুপ করে থেকে জগৎ প্রতিবাদ করল।

'পড়ার সময় বার বার উঠে গেলে চলবে না।'

'বাবার কাজ করতে যাই।'

'আর কেউ নেই বাড়ীতে?'

'আমি ছাড়া কেউ পারে না।'

শুনে জগৎ আশ্চর্য্য হয়ে যায় কিন্তু অবস্থাটা মেনে নিতে রাজী হয় না। জগতের মত ছেলেদের আবার বিবেক বলে একটা মনোধর্ম্ম থাকে, অনেক ভাবপ্রবণতা চাপা পড়ে যে বিকারটা সৃষ্টি হয়। সে তাই একদিন সোজা নীরদের কাছেই কথাটা পেড়ে বসে।

নীরদ ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, 'সে কি! পড়ার সময় সংসারের কাজ করতে উঠে যায়? ও তা'হলে পাশ করবে কি করে।'

বহুদিন পরে অনুরূপা সেদিন ধমকের ধাক্কায় মাথা ঘোরা ও থর থর করে কাঁপবার অসুখে অসুস্থ হয়ে বিছানা নিল। নীরদ তবু গর্জ্জে গর্জ্জে শুনাতে লাগল, 'জানি, তোমার মতলব জানি। মেয়েকে তুমি ফেল করিয়ে বিয়ে দিয়ে বিদেয় করতে চাও। আমিও ভেবেছি কি না

নীরেন লাহিড়ী পরিচালিত 'দম্পতি' চিত্রে সাবিত্রী।

ওকে এম, এ টেমে পর্য্যন্ত পড়াব, শত্রুতা না করলে তোমার চলবে কেন।'

মেয়েকে ডেকে নীরদ বলে দিল, 'আজ থেকে তুই সংসারের কোন কাজ করবি নে, শুধু পড়াশোনা নিয়ে থাকবি। ভাল করে পাশ করা চাই।'

'তোমার যে কষ্ট হবে বাবা?'

'বেশী পাকামি করিস নে চারু। কষ্ট হয় তো হবে।'

চারু অগত্যা মনকে সরিয়ে নিল পড়াশোনার দিকে এবং তার ফলে গুরুর প্রতিও একটু মনোযোগ তাকে দিতে হল। প্রথমেই তার খেয়াল হল যে দু'বেলা তিন ঘণ্টা তাকে যে পড়ায় তার গোলগাল নিরীহ ভালমানুষী মুখখানা আর যাই হোক একটি সুনির্দ্দিষ্ট মানুষের মুখ। তারপর সে টের পেল যে লোকটা বই পড়েছে গাদা গাদা। তারও পরে সে নিজের কাছে স্বীকার করল যে লোকটা পড়াতে পারে অতি চমৎকার, পড়ানো শুনতে তার খুব ভাল লাগে।

মেয়ের সেবা আর নীরদ গ্রহণ করে না, যতক্ষণ পারে নিজের কাছে রেখে তার মানসিক উন্নতির সাহায্য করে। জগতও যে শুধু স্কুলের পড়ার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে নি, চারুর মানসিক উন্নতির জন্য তাকে অনেক বিষয়ে অতিরিক্ত জ্ঞান সরবরাহ করছে, নীরদের তা জানা ছিল না। সে যখন মাঝে মাঝে জগতের পড়ানো শুনতে ঘরে গিয়ে বসে জগৎ তখন মধ্যযুগের ব্ল্যাক ডেথের কাহিনী বন্ধ রেখে চারুকে ইংরেজী গ্রামার শেখায়, অঙ্ক বুঝিয়ে দেয়। চারুকে বাড়তি জ্ঞান এবং আদর্শ ও উপদেশ সরবরাহের ভারটা তাই নীরদ নিজেই গ্রহণ করেছে।

চারু বুঝতে পারে, জগতের তুলনায় তার বাপের জ্ঞান-ভাণ্ডার বড়ই সঙ্কীর্ণ, অনেক বিষয়েই জগতের মত তার স্পষ্ট ধারণা নেই এবং কোন বিষয়েই তিনি জগতের মত সহজ ও স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে বলতে পারেন না। জগতের বিরুদ্ধে চারুর মনে একটা প্রবল লালসা জাগে। সে যেন তার বাবাকে অপদস্থ করছে, অবজ্ঞা করছে। সময় সময় মনের রাগ সে সামলাতে পারে না। কথা নেই বার্ত্তা নেই হঠাৎ খাপছাড়া মন্তব্য করে বসে, 'আপনার চেয়ে বাবা ঢের বেশী জানেন। কত পড়েছেন বাবা!'

'জানেন বৈকি। আমি আর কতটুকু জানি বল? বই কেনার পয়সা নেই, চেয়ে চিন্তে ধার করে পড়তে হয় কত কষ্টে যে আমি লেখাপড়া শিখেছি, তুমি ভাবতেও পারবে না চারু।'

তা ঠিক। রাগ উপে গিয়ে চারুর মন সমবেদনায় ভরে যায়। সে ভাবে, জানুকগে জগৎ তার বাবার চেয়ে অনেক বেশী, আর তো কিছুই নেই ওর তার বাবার মত! চাকরী নেই, পয়সা নেই, বাড়ী ঘর নেই, আপনার লোক নেই, কিছুই নেই!

চারুকে হাফ্ইয়ারলি পরীক্ষার সবগুলি সাবজেক্টে পাশ করিয়ে জগৎ নিজেও লেখাপড়া শেখার চরম পরীক্ষায় পাশ করে ফেলল, চাকরী সে একটা পেয়ে গেল চমৎকার। নীরদকে খবরটা জানিয়ে মাথা নীচু করে সে বলল, 'এতদিন আপনাকে বলবার মুখ ছিল না, বলতে সাহস পাই নি। আজ একটা কথা আপনাকে জানাতে চাই।'

কথাটা শুনে নীরদ চমকে গেল।—'তুমি! তোমার মধ্যে এসব আছে তা তো জানতাম না বাপু!'

জগৎ আশ্চর্য্য হয়ে বলল, 'আজ্ঞে, দুশো টাকায় ষ্টার্ট পেয়েছি—'

'আমার তাতে কি? আমি চারুকে পড়াব—এখন বিয়ে দেব না।'

'আজ্ঞে ও আর পড়তে চায় না।'

তার মেয়ে চারু, জগৎ আজ তাকে জানাতে এসেছে, চারু পড়তে চায় না! রাগে নীরদের চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা অনুভব করে।।০

নিজের জানা ও বোঝা অথণ্ড যুক্তি-তর্ক রীতি-নীতি যদি মিথ্যা হয়ে যায়, জগতের কথাই যদি সত্য হয়ে দাঁড়ায় শেষ পর্য্যন্ত! চারুর মতামত না জেনেই কি জগত তার কাছে এ প্রস্তাব করার সাহস পেয়েছে?

কিন্তু তার মেয়ে চারু, তার আবার মতামত!

'তুমি আর এবাড়ীতে এসো না জগৎ।'

জগৎকে তাড়িয়ে দিয়ে নীরদ একেবারে চুপ করে গেল। চারুকে কিছুই বলল না। ধমক হোক, উপদেশ হোক কিছু একটা শুনবার জন্য মেয়ে যে তার উৎসুক হয়ে আছে, বারংবার সেটা টের পেতে লাগল নীরদ। বুঝতে তার বাকী রইল না যে একবার কথাটা তুললেই চারু তার মনের কথা জানিয়ে দেবে এবং জানাবার জন্য সে ছটফট করছে। তবু মনটা তার প্রতিদিন বিগড়ে যেতে লাগল মেয়ের মুখে তার মা'র মুখের প্যাঙাসেপনার আবির্ভাবের সূচনা দেখে। তবু নীরদ হাল যেন ছাড়তে পারল না। মেয়েকে আরও বেশী কাছে রেখে, তাকে পড়িয়ে, গল্প শুনিয়ে, বেড়াতে নিয়ে গিয়ে, সিনেমা দেখিয়ে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগল আগের অবস্থায়। কিন্তু কোন দিক দিয়েই নাগাল সে যেন আর পেল না মেয়ের।

নিউ থিয়েটার্সে'র আগতপ্রায় চিত্র 'দুই পুরুষে' অহীন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীমতী লতিকা ব্যানার্জিকে দেখা যাচ্ছে।...

সর্ব্বদা কি যেন ভাবে তার মেয়ে, কোথায় যেন পড়ে থাকে তার মন। তার কাছে থেকেও কোথায় সে যেন থাকে, যেখানে তার যাওয়ার ক্ষমতা নেই।

জগৎ চাকরী করতে চলে গিয়েছিল, মাস তিনেক পরে ছুটি নিয়ে ফিরে এল। আবার সে চেপে ধরল নীরদকে।

'আপনি যদি ওকে পড়াতে চান, পড়াবেন যতদূর খুসী। আমি আপত্তি করব না। কথাটি বলব না।'

এবার নীরদ শুধু বলল, 'হুঁ।'

অনুরূপা খবর দিল, চারু আর স্কুলে যাবে না বলেছে।

'কেন?'

'ও আর পড়বে না।'

'পড়বে না?'

'পড়বে—জগতের সঙ্গে বিয়ে দিলে পড়বে। পড়তে ওর ভয়ানক কষ্ট হয়, তবু বিয়ের পর তোমার মুখ চেয়ে পড়বে বলেছে।'

এবার নীরদ বলল, 'যাক, ওর আর পড়ে কাজ নেই। আজকেই স্কুলে নাম কাটিয়ে দিচ্ছি!'

স্কুলে চারুর নাম কাটাবার জন্য সেদিন নীরদ আপিস কামাই করল। রাত প্রায় এগারটার সময় বাড়ী ফিরে এল আগের মত মাতাল হয়ে।

চারু এখন বড় হয়েছে। কিছুদিন ধরে বাপের কাছে স্বাধীনতা পেয়ে এসেছে কল্পনাতীত। সে ভৎর্সনা করে বলল, 'ছি বাবা, ছি।'

নীরদ জবাব দিল না। কিন্তু অনুরূপা মেয়ের গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে নীরদের হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেল।

কুমারী মীরা রায় (হুগলী)

দেবদাস, মুক্তি. প্রতিশ্রুতি, জীবন-মরণ, ডাক্তার, কাশীনাথ, বন্দী, রিক্তা ও গরমিল পর পর সাজিয়ে দিন।

: দেবদাস, মুক্তি, প্রতিশ্রুতি, কাশীনাথ, বন্দী, ডাক্তার, গরমিল ও রিক্তা।

রঞ্জন দাশগুপ্ত, সমীর ঘোষ (হাটখোলা, কলিকাতা)।

আমরা চিত্রে অভিনয় করতে চাই এ বিষয়ে আপনার সাহায্যে কোন সুবিধা হ'তে পারে কিনা ?

: সুবিধা হ'তে পারে কিনা বলতে পারি না, তবে অসুবিধার পথটাকে সুগম করে দিতে সাহায্য করতে পারি। বাংলা কাগজের সম্পাদকের কাছে বাংলাতেই চিঠি দেবেন। মাতৃভাষার প্রতি অসম্মান প্রদর্শনে কোন ভাল আছে কী ?

এস, কে, সাহা (খাগড়া, মুর্শিদাবাদ)।

শ্রীমতী মমতাজ শান্তি এবং সন্ধ্যারাণী কোন ষ্টুডিওতে কাজ করিতেছেন এবং তাদের ঠিকানা কি ?

: মমতাজ শান্তি বুম্বের একাধিক ষ্টুডিওতে কাজ করছেন। সন্ধ্যারাণী এম, পি, প্রডাকসন্সের সংগে চুক্তি-বদ্ধা। ঠিকানা জেনে লাভ কি ? মমতাজ শান্তিকে গীতাঞ্জলি পিকচার্সে'র সওয়ালে দেখতে পাবেন চিত্রখানি প্যারাডাইসে মুক্তিলাভ করেছে। অজয় ভট্টাচার্য পরিচালিত ছদ্মবেশীতে সন্ধ্যারাণীর নতুন করে পরিচয় পাবেন।

অমল চন্দ্র দে (নারকেল বাগান লেন, কলিকাতা)

কাশীনাথ ও যোগাযোগ কথাচিত্র সমসাময়িক। যোগা-যোগ কথাচিত্রের প্রতি গানটি প্রতি লোকমুখে গুঞ্জরিত হ'চ্ছে, কিন্তু এ যাবৎ কাশীনাথের গান শতকরা একজন লোকের মুখে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না, কারণ কাশীনাথের গান উঁচুদরের এবং এর প্রত্যেক তাল এবং মাত্রা বজায় রেখে নকল করা লোকের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে। আমি যোগাযোগের গানকে খারাপ বলি না। যোগাযোগের গানে স্বাভাবিক সরলতাটুকু আছে। যার জন্য যোগাযোগের গান এতো সহজভাবে গাওয়া চলে। কিন্তু তবুও আমার মনে হয় কাশীনাথএর গান যোগাযোগের গান অপেক্ষা আরও শ্রুতিমধুর ও উচ্চাঙ্গের। আপনার কী মত ?

: সংগীত বিষয়ে গভীর জ্ঞান আমার নেই, তাই সংগীত বিষয়ে আমার মতামত বিশেষজ্ঞের নয় একজন সাধারণ শ্রোতার মতামত বলেই মনে করবেন। সুরের শ্রেষ্ঠত্বের বিচার করে থাকেন বিশেষজ্ঞেরা। জনপ্রিয়তার ভার হয়ত আম'দের হাতে। যোগাযোগের সুর সংযোজনায়

কমল দাশগুপ্ত জনপ্রিয়তার দিক বিশেষভাবে দৃষ্টি রেখেছিলেন তাই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যোগাযোগের কীর্তনটি ছাড়া বেশীরভাগ সুরগুলোই যেন একটু সস্তা হয়েছে (সস্তা বলতে নিকৃষ্ট নয়)। কাশীনাথে একটু গাম্ভীর্য আছে।

সমর মিত্র (শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা)।

আপনাদের এই বঙ্গীয়-চলচ্চিত্র দর্শক-সমিতির জন্মদাতা কে? এতদিন বেঙ্গল ফিল্ম জার্ণালিষ্ট এসোসিয়েশনই বৎসরের শ্রেষ্ঠ চিত্র পরিচালক, শ্রেষ্ঠ চিত্র এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী বিচার করে আসছিলেন। হঠাৎ এই বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতিকে খাড়া করে আপনাদের এ প্রচেষ্টা কেন? আপনি হয় ত বলবেন এ প্রচেষ্টা খুব শুভ। কারণ দর্শকরা তাদের নিজেদের মতামত ব্যক্ত করতে সুযোগ পায়। তার প্রমাণও দিয়েছেন কিছুদিন পূর্বে আপনাদের কাগজে ভোটার লিষ্ট বার করে। কিন্তু একথা কি সত্য নয় যে প্রকৃত অনুসন্ধান করলে প্রমাণ করা শক্ত হবে না যে, ঐ ভোটারদের ভিতর অনেকেই আপনাদের কল্পনা প্রসূত? যার ফলে শেষ উত্তরের মত একটা trash pictureএর পরিচালক ১৯৪১ সালের শ্রেষ্ঠ চিত্র পরিচালক, যার ফলে বিখ্যাত সংগীত পরিচালক পঙ্কজবাবুর স্থান আজ সংগীত পরিচালকদের আসনের তৃতীয় ধাপে ও ভারত বিখ্যাত রাই বাবুর স্থান চতুর্থে। আমি আপনাকে challange করছি আপনাদের ভোটার লিষ্টের সত্যতা প্রমাণ করতে। আপনাদের কাগজকে 'ফিল্ম জার্ণাল' বললে ফিল্ম জার্ণালের অপমান করা হয়। কেন জানেন? আপনাদের নিজেদের সত্যকার মত বলে কিছুই নেই। একথা হয় ত অনেকেই বুঝতে পারবেন যে আপনাদের কাগজ কয়েকটি চিত্র প্রতিষ্ঠানের অর্থের দ্বারা পুষ্ট এবং প্রতিপালিত। তাদেরই Publicity Organরূপে আপনাদের কাগজ আত্মপ্রকাশ করে। সর্বাপেক্ষা হাস্যকর ব্যাপার এই যে আপনারা প্রশ্ন উত্তর বিভাগ খুলে পরোক্ষভাবে তাদের প্রচার কার্য চালাচ্ছেন। যে চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থে আপনাদের পত্রিকা চলছে তাদের কোন চিত্র, অভিনেতা কিংবা অভিনেত্রীর Publicity দরকার হলেই আপনারা কল্পনা থেকে খাড়া করা এক প্রশ্নকারীর মুখ থেকে প্রশ্ন করিয়ে নিয়ে উত্তরে প্রাণ খুলে তার প্রচার কার্য চালান। আপনাদের মত আর দুই একটি সাংবাদিক যদি আসরে নামেন তাহলে এই মরণোন্মুখ বাংলা ফিল্ম শিল্পকে কিছুতেই বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। আপনারা কি করলে ভাল হয় জানেন না এমন কি ভালকেও রক্ষা করতেও জানেন না। কিন্তু ভাল করেই জানেন কি করে ভালকে নষ্ঠ করতে হয়। তাই আজ কেবল বাংলার নয় ভারতের গৌরব নিউ থিয়েটার্সের 'কাশীনাথ' আপনাদের মতে সমাধানের চেয়ে নিকৃষ্ট ছবি। সমাধান ভালই তবে একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে কাশীনাথের পাশে দাড়াবার যোগ্যতা তার নেই। আপনি হয়ত বলবেন আমি দর্শকদের ভোটের দ্বারা প্রমাণ করতে পারি যে আমার উক্তি সত্য, আশা করি সে চেষ্টা করে আপনি নিজেকে হাস্যাস্পদ করবেন না। আপনারা হয়ত আগামী বৎসর ভোটের তালিকা বার করে 'সমাধান'কে ১৯৪৩ সালের শ্রেষ্ঠ চিত্র বলে ঘটা করে পুরস্কার দেবেন, কিন্তু মনে রাখবেন তাতে কাশীনাথের কোন অসম্মান হবে না এবং নিউ থিয়েটার্সের সুনামও ক্ষুন্ন হবে না। কিন্তু বেশ ভালভাবেই প্রমাণিত হবে যে নিরপেক্ষতা যা জার্ণালিষ্টের প্রধান গুণ তা আপনাদের নেই। আশা করি আগামী সংখ্যায় আপনাদের পত্রিকায় আমার এই চিঠি প্রকাশিত হবে এবং যথাযথ উত্তরও আমি পাবো। আমি যে সকল অভিযোগ করেছি তা মিথ্যা প্রমাণ করবার জন্য আপনাকে আমি আহ্বান করছি। এই চিঠি যদি আপনাদের পত্রিকায় আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত না হয় তাহলে

বুঝবো যে আপনারা চান না যে আপনাদের পত্রিকার আসল রূপ জনসাধারণের চোখে ধরা পড়ে। নমস্কার।

ঃ প্রতি নমস্কারান্তে এবার আপনার চিঠির জবাব দেওয়া যাক। কোন্দলপরায়ণা মেয়েলোকদের মত কোমর বেঁধে আপনার সংগে যুঝবার ক্ষমতা হয়ত আমার নেই—তবে ভুল ভাংগাবার জন্য চেষ্টা করতে যেয়ে আমাব কথাগুলি যদি কার্যকরী হয় তাহলেই নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে করবো।

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির জন্মদাতা বলে কোন ব্যক্তি-বিশেষ নেই—তবে প্রথমে কয়েকজন উৎসাহী চিন্তাশীল দর্শকদের প্রচেষ্টায় এর ভিত্তি গড়ে ওঠে—অদূর ভবিষ্যতে দর্শক সাধারণকে সংঘবদ্ধ করবার দায়িত্ব নিয়ে। দেশীয় চিত্রের উন্নতিই এর প্রধান উদ্দেশ্য। জাতির প্রয়োজনানুযায়ী রুচিসম্মত চিত্র প্রস্তুত করতে প্রযোজকদেব কাছে দাবী জানানো এবং সাধ্যমত তাদের সাহায্য করা। শেষ উত্তরের' পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া শ্রেষ্ঠ পরিচালকরূপে কেন নির্বাচিত হ'য়েছেন তার কৈফিয়ৎ দিতে পারেন বাংলার দর্শক সমাজ। তবে সামান্য একজন দর্শক এবং সাংবাদিকরূপে নিজে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তার অধিকার নিয়ে বলতে পারি আপনার নিজের যদি তা বিচার করবার ক্ষমতা থাকতো তবে এরূপ অর্বাচীনের মত হীন উক্তি করতেন না। কয়েকটী ভোট কম পাওয়াতেই যে রাইচাঁদ বড়াল বা পঙ্কজবাবুর স্থান নিম্নস্তরে নির্বাচিত হয়েছে একথা আপনার মত দর্শকই কেবল মনে করতে পারেন। এই ভোটের দ্বারা এইটুকু শুধু প্রমাণিত হয়েছে নির্বাচিত শিল্পী ১৯৪২ সালে কতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন এবং কেন? শিল্পীদের প্রতিভার তারতম্য মোটেই এভাবে ভোট দ্বারা বিচার করা যায় না। তাহলেত বুঝতে হয় চন্দ্রাবতী কাননের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর অভিনেত্রী—অহীন্দ্র বা ছবি বিশ্বাসও জহর গঙ্গোপাধ্যায়ের চেয়ে নিম্ন

রূপশ্রী লিঃএর 'দম্পতি'র নায়িকা শ্রীমতী সুনন্দা

স্তরের। আপনার বিচারে রূপমঞ্চ যদি ফিল্ম জার্ণালএর গোষ্ঠিভুক্ত বিবেচিত না হয়—তাহলেই রূপমঞ্চের দুর্ভাগ্য বলে আর কেউ মনে করলেও আমি করবো না। কারণ রূপমঞ্চের নিজস্ব স্বাধীন মত ও চিন্তাশক্তি আছে, এবং সে তা প্রকাশ করতে কাউকে ভয় করে না। পাঠক সমাজের কাছে রূপমঞ্চের সমাদরের মূলে এই কথাটাই সবচেয়ে বড়। ধ্বংসমূলক সমালোচনা করে চিত্রশিল্পের শোচনীয় পরিণাম ডেকে এনে রূপমঞ্চ কোন শ্রেণীবিশেষ দর্শকদের কাছে বাহবা পেতে চায় না। চিত্রশিল্পের শত্রুরূপে রূপমঞ্চ আত্মপ্রকাশ করেনি—চিত্রশিল্পের মারফতে দেশ এবং জাতির কতখানি সেবা করা যেতে পারে তারই পরিমাণ উপলব্ধি করে চিত্রশিল্পের মিত্ররূপেই রূপমঞ্চের আত্মপ্রকাশ—চিত্রশিল্পের সেবায় যারা আত্মনিয়োগ করেছেন তাদের সাহায্য করা রূপমঞ্চের কর্তব্য। সেখানে স্বার্থের কোন প্রশ্ন ওঠে না। তবে, 'প্রশ্ন এবং উত্তর' বিভাগের কথা যে বলেছেন—তা যারা প্রশ্ন করে থাকেন, তারাই এর সঠিক উত্তর দিতে পারেন। রূপমঞ্চের মত

পত্রিকা বাংলার চিত্রশিল্পকে আত্মহত্যার হাত থেকে সেদিনই রক্ষা করতে পারবে—যেদিন আপনাদের মত দর্শকদের সত্যিকারের দর্শকরূপে গড়ে তুলতে পারবে—যেদিন চিন্তাধারায়—কার্যকলাপে আপনারা সত্যিকারের রুচিসম্পন্ন দর্শকের পরিচয় দেবেন।

'কাশীনাথ'কে নিকৃষ্ট শ্রেণীর চিত্র রূপমঞ্চের তরফ থেকে কোনদিনই বলা হয়নি—এতে এইটুকু যদি অনুমান করি, রূপমঞ্চের পাতা দয়া করে আপনি খুলেও দেখেননি তাহলে কী ভুল করা হবে?

যে দৃষ্টিভংগি থেকে সমাধানকে আমরা দেখেছি—আপনার সে দৃষ্টিভংগি থাকলে মোটেই এসব হীন অভিযোগ আনতেন না। শুনলে হয়ত বিস্মিত হয়ে যাবেন রূপমঞ্চের পাতায় সমাধানের আশাতীত প্রশংসা দেখে এর প্রযোজনার সংগে সংশ্লিষ্ট কয়েকজনে বলেছিলেন, সমাধান এত ভাল কী করে লাগলো আপনাদের—তার উত্তরে আমি বলেছিলাম—আপনাদের স্থূল দৃষ্টিতে আশ্চর্যই লাগবে- পরিচালককে জিজ্ঞাসা করুন—যে দৃষ্টিভংগী থেকে তিনি চিত্রখানি গ্রহণ করেছেন আমরা তারই সাহায্যে একে বিচার করেছি। যে আলোকের সন্ধানে বৃদ্ধ ভবতোষ নবীন নায়কের হাত ধরে ছুটে ছিলেন—সেই আলোক যেদিন আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের ওপরে প্রতিফলিত হয়ে উঠবে সেদিন আর কোন মারামারি কাটাকাটিই থাকবে না! সেই আলোকের আশাতেই আমরা ভরপুর। প্রেমেন বাবু তার সমাধানে এই আলোর সন্ধান পেয়েছেন বলেই তাকে অভিনন্দন জানিয়েছি। নূতন পরিচালক-রূপে তার যে দোষ ক্রুটী ধরা না পড়েছে তা নয় এবং আমরা তার উল্লেখ করতেও কসুর করিনি।

আমার উত্তরে যদি আপনার ভুল ভাংগে তাহলে বুঝবো যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আপনি আমায় আহ্বান করেছেন তাতে আমিই জয়লাভ করেছি নইলে আমার দুর্ভাগ্য।

শ্রীসত্যপ্রিয় সেনগুপ্ত (ভট্টাচার্যপাড়া বহরমপুর)

গত শ্রাবণ মাসের রূপমঞ্চের সমালোচনা প্রসঙ্গে রূপমঞ্চের তরফ থেকে বলেছিলেন দিকশূল পরিচালক প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর দ্বিতীয় সবাক চিত্র। শ্রাবণ মাসের রূপ-মঞ্চে সুশীল বিশ্বাস ও বলাই বসাক জানিয়েছেন—প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর প্রথম সবাক চিত্র 'চিরকুমার সভা', দ্বিতীয় 'অবতার' এবং তৃতীয় 'দিকশূল'। আমার মনে হয় তারাও ভুল করেছেন। তারা যেন ভবিষ্যতে এরূপভাবে ভুল করে বাহাদুরি নেবার চেষ্টা না করেন। তারা যেন জেনে রাখেন পরিচালক প্রেমাঙ্কুর আরও কয়েকখানি বাংলা ও হিন্দি সবাকচিত্র গ্রহণ করেছেন। তিনি প্রথম সবাকচিত্র গ্রহণ করেন—নিউ থিয়েটার্সের হয়ে—(১) চিরকুমার সভা (২) কারওয়ান-ই-হায়াৎ হিন্দি—এই চিত্রখানি পরিচালক হেমচন্দ্র চন্দ্রের সহযোগিতায় গৃহীত হয়। (৩) কপালকুণ্ডলা (৪) ইহুদি-কি-লেড়কী—হিন্দি। তারপর তিনি শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের হয়ে (৫) অবতার এবং পুনরায় নিউ থিয়েটার্সের হয়ে (৬) দিকশূল চিত্র নির্মাণ করেন।

(খ) গত শ্রাবন সংখ্যায় রূপ-মঞ্চ সম্পাদকের দপ্তরে শান্তি সমিরণ ব্যানার্জি প্রশ্ন করেছেন—নই দুনিয়া চিত্রে কার অভিনয় ভাল হয়েছে। উত্তর এসেছে রোজ এবং জয়রাজ। কিন্তু দুঃখের বিষয় নই দুনিয়াতে শ্রীমতী রোজ কোন চরিত্রেই অভিনয় করেননি। শারদা, নাজমা, রুটি, জমিদার, সিকান্দার এবং আপনা ঘর পর পর সাজিয়ে দিন।

পরিচালক দেবকীকুমার বসুর মেঘদূত কতদূর অগ্রসর হয়েছে জানাবেন। নিউ টকীজের 'অভিসার' এবং আর্ট ফিল্মের 'দ্বন্দ্বে'র পরিচালক যথাক্রমে হেমন্ত গুপ্ত এবং হেমেন গুপ্ত কি একই লোক?

: সমালোচকের বক্তব্য ছিল: অনেক দিন বাংলার বাইরে থেকে ঘুরে এসে শ্রীযুক্ত আতর্থী যে চিত্র গ্রহণ করেন—দিকশূল তার ভিতর দ্বিতীয় চিত্র। প্রশ্ন এসেছিল

নই-কহানীর বিষয়ে। ভুলে নই কহানীর স্থানে নই দুনিয়া হয়ে গেছে। আপনা ঘর, সিকান্দার, রুটী, শারদা, নাজমা, জমিদার। দেরী আছে। না। পৃথক লোক।

প্রদ্যোতকুমার কর (বহরমপুর)।

মোহনবাগান এবং অন্য কোন দলের সাথে খেলা ছিল শ্রীযুক্ত জহর গঙ্গোপাধ্যায়কে মোহনবাগান দলের খেলোয়াড় গণকে উৎসাহ দিতে দেখেছি। তিনি কি মোহনবাগানদলের সভ্য? সিনেমা জগতে যে সমস্ত লোক সংশ্লিষ্ট আছেন অন্যান্য অফিস ফুটবল টিমএর মত তাদের কি কোন ফুটবল টিম গঠন করা সম্ভব নয়?

: হ্যাঁ, আপনার মত আমিও দেখেছি। মোহনবাগান দল জিত্‌লে পাড়ার ছেলেদের নিয়ে জহর বাবু সেদিন ভুরিভোজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। শিল্পীদের নিয়ে খেলার টিম গড়ে উঠবার বিরুদ্ধে আমার অভিমত নেই তবে এমন অনেক কিছু রয়েছে যেগুলি তাদের এর পূর্বে গড়ে তুলতে হবে।

নির্ম্মলেন্দু মজুমদার (বহরমপুর)

অচ্ছুৎকন্যা ছবিতে দেখেছি যখন ভূমিকা ও কর্মীবৃন্দের নাম দেখানো হয় তখন পিছনে একটি প্রতিমূর্ত্তি ছিল। লেখাগুলি কিসের উপর লেখা হয়েছিল, কেমন করে ফটো তোলা সম্ভব হোলো? কোন কোন ছবিতে দেখেছি যে একখানি চলন্ত ট্রেন আসতে আসতে মনে হয় যেন দর্শক-বৃন্দের একদম ঘাড়ে এসে পড়লো। ট্রেণের তলদেশ থেকে কিরকম ভাবে ছবি হয়? সিনেমা এবং রঙ্গমঞ্চের রূপসজ্জা বিভিন্ন এটা কি ঠিক?

: শুধু অচ্ছুৎকন্যাই নয় অনুরূপ বহু চিত্রই গৃহীত হয়েছে। অনেক সময় এসব চিত্র double exposureএ গৃহীত হয়। আবার শিল্পী দ্বারা অঙ্কন করিয়ে নিয়েও গৃহীত হয়ে থাকে।

ট্রেণের ফটোগ্রাফী চলতি ট্রেণ থেকে গ্রহণ করা হয় না —ক্যামেরা খুশী মত বাগিয়ে close-upএ এসব চিত্র গৃহীত হয়ে থাকে।

হ্যাঁ মঞ্চের রূপ-সজ্জা থেকে পর্দার রূপসজ্জা পৃথক। পর্দার রূপ-সজ্জা খুব নিখুঁত হওয়ার প্রয়োজন কারণ ক্যামেরার সামনে সামান্য ত্রুটিও ধরা পড়ে যায়। সাদা রংএর ক্যামেরার চোখে কোন দাম নেই। মঞ্চে সাদা ফেস্ পাউডার বা জিঙ্ক অক সাইডের মূল্য থাকলে পর্দায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 'রূজই' ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রতুলকৃষ্ণ রায় (হেরম্বচন্দ্র দাস লেন

প্রমথেশ বড়ুয়ার ঠিকানা কী? Modern make up for Stage and Screen বইটি কোথায় পাওয়া যায়?

: ১৪ বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড। বইটী যে কোন বড় বইয়ের দোকানে পাওয়া যেত যুদ্ধের পূর্বে। এখন কোথায় পাবেন বলতে পারি না। লেখকের নাম দিতে ভুল মোটেই হয়নি।

থিয়েটারের মেক আপ : সম্প্রতি 'রূপ-মঞ্চ' কাগজের পাঠকরা মেক-আপ বিষয়ে বিস্তারিত খবর কোথায় পাওয়া যায় এমন প্রশ্ন করেছিলেন। সেই কাগজের তরফ থেকে লেখা হ'য়েছিল শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর কাছ থেকে খবর জানা যাবে। অহীন্দ্রবাবু তারপর পাঠকদের কাছ থেকে অনেক চিঠি পেয়েছেন। কিন্তু প্রত্যেককে স্বতন্ত্র-ভাবে চিঠি দিয়ে কিছু জানানো সম্ভব নয়—সেইজন্য তার বক্তব্য তিনি এই কাগজের মারফতে জানাচ্ছেন। তাঁর মতে কোন বই পড়ে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা লাভ হতে পারে না। তবে যিনি আন্তরিক ভাবে মেক-আপ বিদ্যা শিখতে চান তিনি এই বইগুলো থেকে সাহায্য পেতে পারেন।

(১) Making-up : James Young.

(২) Practical Make-up for stage : J. W. Bamford (Pitman)

(৩) The Last Word in Make-up: Rudolph G. Liszet.

(৪) Photographic Make-up: W. Meltman (Pitman)

(৫) বহুরূপী বিদ্যা: গিরিশ চন্দ্র ঘোষ

(৬) অভিনয় শিক্ষা: ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়

(এই বইতে অহীন্দ্রবাবুর লেখা একটা অধ্যায় আছে)

(৭) The Art of Theatrical Make-up: Cavendish morton.

(৮) The Art of Making-up: C. H, Yox.

রঙমহল সংবাদ (৫ম সংখ্যা) হ'তে উধৃত।

প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (সৈদাবাদ বহরমপুর)

বড়ুয়া প্রডাকসনের প্রথম বই কোনটা। বাংলায় কতগুলি চিত্রগৃহ আছে। চন্দ্রাবতী এখন কোন বইতে নামছেন? কাশীনাথ এবং নীলাঙ্গুরীয়তে লতিকা কি নিজে গান গেয়েছে? গ্রিটা গার্বো কোন বইয়ে নামছেন কি?

: রাণী। এ বিষয়ে প্রাইমা ফিল্মস্‌এর প্রচার সচিব শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র নাথ পালকে রূপ-মঞ্চের কথা উল্লেখ করে চিঠি লিখবেন ঠিকানা: রূপবাণী বিল্ডিংস ৭৬-৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

দুই পুরুষ।

না। গ্রিটা গার্বোর বর্তমান ছবি সম্পর্কে আমরা কোন সংবাদ পাইনি। তিনি হলিউডেই আছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ রুদ্র (বালীগঞ্জ)

ভারতীয় চিত্র পরিচালনায় প্রমথেশ বড়ুয়া, নীতিন বসু ও ভি, শান্তারাম এ তিন জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

: তিন জনেই সমপর্যায় ভুক্ত এবং কে কোন দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে বাদানুবাদ আছে। তবে ব্যক্তিগত ভাবে বড়ুয়ার পরিচালনা আমার ভাল লাগে। তাই বলে সম্প্রতি যে চিত্রগুলি তিনি পরিচালনা করেছেন এ সব বড়ুয়ার কাছ থেকে আশা করতে পারিনি।

কুমারী হেনা রায় (চুচুড়া)

শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী বর্তমানে কোন ছবিতে কাজ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত পঙ্কজ মল্লিককে বেতার আসরে পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আপনাদের কতদূর সফল হইল তাহা দয়া করিয়া জানাইবেন। পঙ্কজবাবুকে বেতার আসরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত দেখিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া রহিলাম।

: সন্ধ্যারাণীকে অজয় ভট্টাচার্য পরিচালিত আগামী বাংলা চিত্র ছদ্মবেশীতে দেখতে পাবেন। বর্তমানে তিনি কোন ছবিতে নামছেন না। পঙ্কজবাবুকে বেতারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার আমাদের কী ক্ষমতা আছে? আপনারা অর্থাৎ জনসাধারণ যদি সত্যই তাকে চান বেতারের কর্তৃপক্ষ কোন মতেই সে দাবী উপেক্ষা করতে পারেন না। পঙ্কজবাবু বেতারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হউন বা না হউন সে বিষয়ে আমরা আপনাদের দাবী বা ইচ্ছামত কাজ করবো। তবে তাকে যে ভাবে বেতারের আসর থেকে সরানো হ'য়েছে—কর্তৃপক্ষের এই হিটলারী মনোভাব যদি সত্যই হয় (এবং যতটা জানি সত্য, নইলে তারা কোন জবাব দিচ্ছেন না কেন?) তবে তার বিরুদ্ধে আমাদের যতখানি বলবার বলতে কুণ্ঠিত হবো না। জানি উচু গদিতে প্রতিষ্ঠিত সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত কর্তৃপক্ষের বধির কর্ণে আমাদের ক্ষীণ কণ্ঠ কোন দিনই বাজবে না।

দর্শকদের বিচারে 'বিচার'

শ্রীভুলু গুপ্ত

কয়েক মাস আগে যখন হঠাৎ একদিন শুনতে পেলুম যে নীতীন বাবু নিউ থিয়েটার্সে'র সাথে তার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে বোম্বের জনৈক চিত্র প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সুদীর্ঘ কালের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন সেদিন সারা বাঙ্গলার চিত্র মহলে একটা সাড়া প'ড়ে গিয়েছিলো—মনে আছে, এরকম সাড়া আর একবার পড়েছিলো যেবার প্রমথেশ বড়ুয়া এই নিউ থিয়েটার্স পরিত্যাগ ক'রে অন্য প্রতিষ্ঠানে গিয়ে যোগদান করেছিলেন। নীতীন বাবুর এই আকস্মিক নিউ থিয়েটার্স ত্যাগে আমরা অর্থাৎ বাঙ্গালী দর্শকেরা কম বিস্মিত হইনি—কেননা, নীতীন বাবু তাঁর চিত্র-জীবনের অতি বাল্যকাল থেকেই নিউ থিয়েটার্সে'র সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থেকে একাধিক সুন্দর বাংলা ছবির নির্দ্দেশক রূপে বাঙ্গলার, বাঙ্গালীর তথা নিউ থিয়েটার্সে'র গৌরব বৃদ্ধি কর্‌তে বিশেষভাবে সমর্থ হয়েছিলেন—নিউ থিয়েটার্সে'র অন্তরাল থেকে যে নীতীন বসু আমাদের মুগ্ধ করেছিলেন 'ভাগ্যচক্র', 'দিদি', 'জীবন-মরণ', 'পরিচয়' ও পরিশেষে 'কাশীনাথ' প্রভৃতি চিত্র উপহার দিয়ে, সেই নীতীন বসু যখন নেহাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে চলে পড়্‌লেন বোম্বের আকাশে তখন আমরা বিস্মিত না হয়ে কি করি বলুন? ইদানীং কয়েক বছর যাবৎ দেখে আসছি বাঙ্গলার চিত্রাকাশে যাঁরা পরিচালক ও অভিনেতৃরূপে অধিষ্ঠান করছেন তাঁদের ভেতরে কেমন যেন একটা বোম্বে প্রীতি এসে পড়েছে এবং এখনো পড়ছে। ইতিমধ্যে কয়েক জনকে সেখানে স্থায়ী আস্তানা গেড়ে ফেলতেও দেখা যাচ্ছে। একটু খ্যাতি লাভ করতে পারলেই এঁদের বোম্বে অন্তর্ধানের মধ্যে আর যাই থাকুক না কেন অধিক অর্থো-পার্জ্জনের অদম্য আকাঙ্খা যে এ বিষয়ে প্রবলভাবে কাজ করে তা বোধ করি না বুঝিয়ে লিখলেও চলে। কয়েক মাস আগে জনৈক পত্র-প্রেরকের—"কেন নীতীন বসু বোম্বে গেলেন?"—এই প্রশ্নের জবাবে আপনিও অনুরূপ উক্তি "রূপমঞ্চ"এর পাতায় করেছিলেন বলে আমার মনে আছে। আপনার সেই উক্তি চমৎকারভাবে সমর্থন করেছে, আপনার সেই উক্তির অন্তর্নিহিত সত্য তথ্যটুকু চোখে আঙুল দিয়ে পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছে নীতীন বাবুরই বোম্বেতে গৃহীত প্রথম চিত্রাবদান 'বিচার'। সুখের বিষয় অথবা দুঃখের বিষয় যা-ই বলুন না কেন, বাঙ্গলাদেশ থেকে আজ পর্য্যন্ত যতজন অভিনেতা অভিনেতৃ বোম্বেতে গেছেন তাঁদের একজনও নিজেদের খ্যাতিবৃদ্ধি করতে সক্ষম হন নি এবং আজ পর্য্যন্ত যতজন বাঙ্গালী পরিচালক বাঙ্গলা দেশকে নিষ্ঠুরভাবে ত্যাগ ক'রে গিয়ে বোম্বের চিত্র-প্রতিষ্ঠানগুলোর হয়ে চিত্র পরিচালনা করছেন এবং এখনো করছেন তাঁদের প্রত্যেকে কি বাঙ্গালী দর্শকদের, কি বোম্বের দর্শকদের, সম্পুর্ণরূপে হতাশ করেছেন (এখানে আমি দেবকী বসুর 'আপনা ঘর'এর কথা বাদ দিয়েই বলছি)। এবং এই পরিচালকবর্গের ভেতরে স্বনামধন্য নীতীন বসু-ই সব চাইতে বেশী ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন—অন্ততঃ তাঁর সদ্যমুক্তি-প্রাপ্ত 'বিচার'-তো তা' প্রমাণ করে দিয়েছে। 'বিচার' দেখতে দেখতে ভাবছিলুম আমাদের নিউ থিয়েটার্সে'র নীতীন বসুর কথা—নিউ থিয়েটার্স ছেড়ে গেলে কি হয়, 'কাশীনাথ'এর যশস্বী পরিচালক তাঁর অমন ভারত বিশ্রুত ছবির পরে যে 'বিচার'-এর মতো ছবি আমাদের উপহার দেবেন তা' 'বিচার' দেখতে যাবার আগে ভুলে-ও কল্পনায় আনতে পারি নি। বাস্তবিকই, 'বিচার'-এর কাহিনীর মধ্যে তিনি এমন কি খুঁজে পেলেন যাতে কিনা তাঁকে

বাণীচিত্রে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। 'বিচার'-এর মধ্যে তিনি যে সমস্যার অবতারণা করেছেন তা মোটেই নতুন নয়, অন্ততঃ আমাদের দেশীয় চিত্রক্ষেত্রে তো নয়-ই। ইতিপূর্ব্বে বহুবার বহুভাবে এ ধরণের সমস্যা দেশীয় ছবিতে আলোচিত হয়ে গেছে—কাজেই, নীতিন বাবুর আলোচ্য ছবিতে এই পুরোণো সমস্যাবতারণার মধ্যে কোনো সার্থকতাই খুঁজে পেলুম না। নীতিন বাবুর অন্যান্য ছবিতে যেমন একটা অপ্রতিহত গতিবেগ, সুন্দর প্রাণ-স্পর্শের পরিচয় পাই 'বিচার'-এ তা'র অভাব ভয়ানক ভাবে অনুভব করলুম। সারা ছবিতে এমন একটি সিচুয়েশান দেখতে পেলাম না যেটা কিনা অবশেষে গিয়ে ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছেচে। নীতীন বসুর পক্ষে এটা মোটেই গৌরবের কথা নয়। দুর্ব্বল গল্পাংশ নিয়েও নীতীনবাবু শুধুমাত্র পরিচালনা-নৈপুণ্যে তার কয়েকটি ছবির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন—কিন্তু 'বিচার' সমস্ত কিছুকে অতিক্রম ক'রে গিয়ে তাঁর ললাটে চরম অসাফল্যের কলঙ্কময় রেখা অঙ্কিত করে দিয়েছে। গল্পাংশের পর আর একটি প্রধান বিষয় বস্তু যা কিনা নীতীনবাবুর আলোচ্য অসাফল্যের প্রধান কারণ সেটা হলো 'বিচার'-এর অভিনেতৃ-নির্ব্বাচন। নীতীন বাবুর ছবিতে এ রকম জঘন্য অভিনেতা, অভিনেত্রীর সমাবেশ আর কোনো দিনই ঘটেনি—এটা বেশ জোর গলাতেই বলা চলে। নায়কের ভূমিকা এমন একজনকে দেওয়া হয়েছে যাঁকে একজন অতি সাধারণ শ্রেণীর অনভিজ্ঞ অন্ধ পরিচালকও সামান্য একটা পার্শ্বভূমিকা দিতে লজ্জা বোধ করতেন। হ্যাঁ, আমি দিলীপ বসু'র কথা-ই বলছি। বলতে পারেন, তার এমন কি গুণাগুণ আছে, যাতে কিনা তিনি নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে সক্ষম? অভিনয় করা তো দূরের কথা, ক্যামেরার সামনে কি করে চলা-ফেরা করতে হয়—কি ক'রে সাধারণ কথাবার্ত্তা বলতে হয় তার কিছুই তিনি জানেন না, তবু তাঁকে দেওয়া হয়েছে নায়কের ভূমিকা। তার ওপর তাঁর চেহারাও মোটেই ক্যামেরার উপযোগী নয়, এবং তিনি সুকণ্ঠ গায়কও নন। শুনতে পাই, নীতীনবাবুর সাথে তিনি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ - চমৎকার। বাঙ্গলা দেশের শত শত সুদর্শন, সুকণ্ঠ ও সুঅভিনেতা ভদ্র তরুণ যুবক যখন সামান্য একটা পার্শ্বভূমিকার জন্য ষ্টুডিওর দ্বারে দ্বারে ঘু'রে লাঞ্ছিত ব্যর্থমনোরথ হন তখন কোনো গুণের অধিকারী না হয়েও শুধুমাত্র আত্মীয়তার টিকিটে কেমন সহজভাবে ছবির প্রধানাংশে অভিনয় করা যায়, তা' পরিষ্কার ভাবে প্রমাণ করেছিলেন সেই দিলীপ বসু। আশা করি, দিলীপ বসুকে নায়কের ভূমিকা দেবার প্রতিক্রিয়া নীতিনবাবু খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছেন। নায়কের কথা বাদ দিলেও, 'বিচার'-এ কোনো ভূমিকা-ই সুঅভিনীত নয়। দাদুর ভূমিকায় নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এবং মাত্র কয়েকটি দৃশ্যে শান্তারূপী রাধারাণীর নাম অভিনয় সম্পর্কে সামান্য উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ছাড়া আর প্রত্যেকেই হতাশ করেছেন।

এমন কি স্বনামধন্যা লীলা দেশাই পর্য্যন্ত। 'বিচার'-এর সঙ্গীতাবলীর সুর-সংযোজক বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত-সাধক জ্ঞান ঘোষ। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে 'বিচার'-এ জ্ঞান বাবুর সুনাম মোটেই রক্ষিত হয় নি। তাঁর সুরের একটি গান-ও চিত্রগ্রাহী পর্য্যায়ে পৌঁছে নি—এমন কি রাধারাণীর সুধাকণ্ঠের সাহচর্য্য পেয়েও। নীতীন বাবুর ছবি সাধারণতঃ টেকনিক্যাল গুণাবলীতে সমৃদ্ধ থাকে—কিন্তু 'বিচার'-এ তা'র ব্যতিক্রম বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হলো। মুকুল বসু ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শব্দধরদের একজন হিসেবে সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছেন—কিন্তু 'বিচার' তাঁকে কুখ্যাত করে তুলবে। মুকুল বাবু অন্য কোনো ছবিতে এ রকম নিকৃষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন
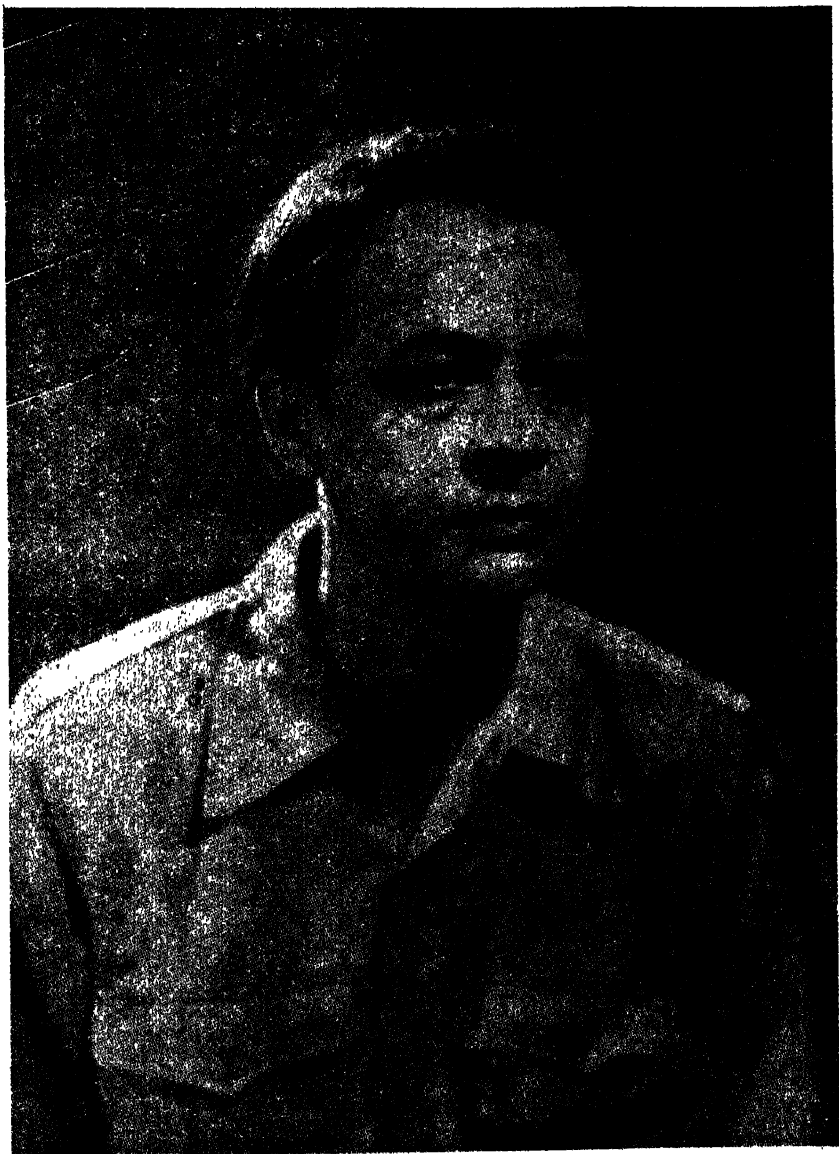
শ্রীযুত প্রমথেশ বড়ুয়ার আগতপ্রায় চিত্র ‘চাঁদের কলঙ্ক’ তার রাণীর কলঙ্ক দূর করবে—এই বিশ্বাসই আমরা রাখি

কিনা সন্দেহ। উদাহরণস্বরূপ ধরা যেতে পারে শেষের দিকের একটি দৃশ্যের কথা যে দৃশ্যে এক সাথে অনেকগুলি শঙ্খের সমস্বর ধ্বনিকে ধারণ করা হয়েছে। আলোচ্য শঙ্খধ্বনিকে সাইরেণের আওয়াজ ধরে নিয়ে যদি কোনো দর্শক হঠাৎ চমকে ওঠেন তবে সেটা মোটেই অহেতুক হ'বে না। মুকুল বাবুর পক্ষে এটা মোটেই গৌরবের কথা নয়। নিউ থিয়েটার্স ছেড়ে যাবার পর প্রমথেশ বড়ুয়া ছবি তোলার বিবিধ বিষয় সম্পর্কে যে সব অসুবিধে ভোগ করছিলেন আমার মনে হয় নীতীন বাবুও সে সব অসুবিধে দ্বারা আজ আক্রান্ত। প্রমথেশ বড়ুয়ার মত নীতীন বসু'র মনে রাখা উচিৎ ছিলো যে ভারতবর্ষের সমস্ত ষ্টুডিও-ই নিউ থিয়েটার্স নয়। 'ফিল্মিণ্ডিয়া'র 'বিগবয়' প্যাটেল নিউ থিয়েটার্সে'র বিরুদ্ধে যত প্রচার কার্য্যই চালান না কেন, বলতে পারেন— নিউ থিয়েটার্সে'র মতো ভারতবর্ষের অন্য কোন ষ্টুডিও একজন পরিচালককে অকৃত্রিম, আন্তরিক ও সর্ব্বাঙ্গীন সাহচর্য্য দান করে থাকে? কোনো ষ্টুডিও-ই না এবং এত বড় কথার যদি প্রমাণ চান তবে দেখিয়ে দেবো প্রমথেশ বড়ুয়া'কে এবং বর্ত্তমানে দেখাবো নীতীন বসুকে। এত বড় দুটি প্রমাণের পর বোধকরি আর কোনো প্রমাণ না দেখালেও চলতে পারে। 'বিচার' ছবির পরেও যদি নীতীন বাবু হীন অর্থলোলুপতার নীচ মনোবৃত্তি পরিত্যাগ ক'রে এ দেশে ফিরে না আসেন তবে আমি তাঁকে জানাতে চাই যে, অনাগত ঘোর দুর্দ্দিনের বিপুল ঘনঘটা তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করছে। শুধু 'বিচার' কেন আরো কত 'বিচার' যে সেদিন তাঁর বিচার করবে সে কথাটা পুনর্ব্বার তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়াটা আমি সম্পূর্ণ নিরর্থক মনে করি।*

* জন সাধারণের কাছে 'বিচার' কি রকম অভিনন্দন পেয়েছে তা' এই চিঠি থেকেই বোঝা যাবে। লেখকের সঙ্গে সম্পাদকীয় বিভাগের মতের একটু পার্থক্য আছে। সেটা হয়ত টেক্‌নিকাল বিষয় সম্পর্কে লেখকের অনভিজ্ঞতার জন্য। শাঁখের ধ্বনীকে সাইরেণ মনে করা এবং তার জন্যে মুকুল বাবুকে দোষী করা যায় না। বরং বিচারের চিত্র ও শব্দগ্রহণ ভালই হয়েছে। আর রাধারাণীর গানগুলোর মধ্যে ঘুমপাড়ানি গানটা আমাদের ভাল লেগেছে। মোটের ওপর, নীতীন বাবুর বিচারে সকল দর্শকের রায়ই হয়ত এক রকম হবে।—সম্পাদক, রূপ-মঞ্চ।

বাংলা চিত্রশিল্পকে বাচিয়ে রাখতে হলে চাই বাংলার সব শ্রেণীর দর্শকদের পূর্ণ সহানুভূতি'- শ্রীপার্থিবের সঙ্গে আলোচনায় এসোসিয়েটেড ডিসট্রিবিউটর্সের গভর্ণিং ডাইরেকটর শ্রীযুক্ত নরেশ ঘোষের অভিমত।—

পূজার কয়েকদিন পূর্বে—'ফ্যান চাই ফ্যান' বলে—রাস্তায় রাস্তায় দুর্ভিক্ষপীড়িতদের যেমনি হাহাকার—ফিল্মের বাজারে তেমনি হা হুতাশ। রথী-মহারথী সব চিন্তাকুল। হবোকার মুখেই চিত্রজগতের ঘনীভূত দুর্যোগের ছাপ। এমনি সময় ঘুরতে ঘুরতে ৩২ এ ধর্মতলা ষ্ট্রীটে যেয়ে হাজির হলুম। সামনে কতগুলি বোর্ড টাঙ্গানো রয়েছে ঃ

Mansata Film Distributor, 1st Floor ; Eastern Film Exchange, 3rd floor ; Associated Distributors 3rd Floor. শেষের বোর্ডখানারই আমার প্রয়োজন ছিল। চল্লিশ টাকা চালের মণ, দৈহিক সামর্থ থাকলেও সিড়ি বেয়ে চারতলায় উঠতে হবে—মনে হতেই মনের জোড় এলো কমে। বাধ্য হয়ে লিফ্টম্যানের শরণাপন্ন হতে হলো। লিফ্ট থেকে নেমে কয়েক পা মোড় ঘুরতেই এক আশ্চর্যরকম দৃশ্য দেখলাম—চারিদিকে স্তুপীকৃত ব্লক—বাণ্ডিলে বাণ্ডিলে বাধা পোস্টার আর হ্যাণ্ডবিল। দেয়ালে দেয়ালে ব্যানারগুলি পাশাপাশি দাড়িয়ে। মাঝখানে যে ফাকটুকু রয়েছে সেটুকু অধিকার করে বিরাট এক টাক। অন্নর্বর মস্তকটী চেনা বলেই মনে হ'লো। এই অনুর্বর মস্তকের উর্বর মস্তিষ্ক দর্শক সাধারণের প্রীতি আকর্ষণে গরমিল ও সহধর্ম্মিণীকে অনেকাংশে সাহায্য করেছিল। তথাপি দৃষ্টি আকর্ষণে জিজ্ঞাসা করলুম ঃ কোন হায় ? উত্তর এলো মায় হু, ম্যায়—এস-স্কয়ার (s²)=(s.s.) এবার আর কোন সন্দেহ রইল না যে অনুর্বর মস্তকটী এসোসিয়েটেড ডিসট্রিবিউটর্সের প্রচার সচিব সুশীল সিংহেরই।

ঃ আরে, শ্রীপার্থিব।

: হ্যাঁ নরেশ বাবু কোথায়?

: ঐ সামনের ঘরে আপনার জন্য অপেক্ষায় আছেন।' আমিও অনতিবিলম্বে যেয়ে শ্রীযুক্ত ঘোষের টেবিলের সামনে একটা চেয়ার দখল করে নিয়ে বসে পড়লুম। শ্রীযুক্ত ঘোষ মুচকী হেসে কব্জি ঘড়িটা ধরলেন আমার সামনে ঠিক কাটায় কাটায় ৭টা। হ্যাঁ ৭টাতেই আমাদের সাক্ষাতের কথা ছিল।

: বেশী নয়—পাঁচ মিনিট' শ্রীযুক্ত ঘোষ বল্লেন, আপনাকে দেখেও ক্ষুধার্ত মনে হচ্ছে আমিও তাই। খাবার আনতে পাঠিয়েছি এই এলো বলে—খেয়ে-দেয়েই অভিযোগ এবং তার খণ্ডনের পালা চলবে।" হাসি টেনে আমি উত্তর দিলাম: ক্ষুধার্ত একথা অসত্য নয়। কিন্তু ক্ষুধা শুধু পেটে নয়—মনেও। পেটের ক্ষুধা নয় মিটিয়ে দিলেন—মনের ক্ষুধা মেটাতে পারবেন কী? আপনার কাছে মনের ক্ষুধার দাবী নিয়েই এসেছি।"

: কি রকম?'—শ্রীযুক্ত ঘোষের চোখমুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে।

: মঞ্চ ও চিত্রলোকের লোক আমি। নাটক ও ছবিই আমার মনের খোরাক। নাটকের কথা আপনার কাছে উল্লেখ করবো না। তা নিয়ে আপনার কারবার নয়। আপনার যা নিয়ে কারবার অর্থাৎ ছায়াছবি সেই মালের বিরুদ্ধেই আপনার কাছে অভিযোগ জানাতে এসেছি। আমাদের মনের যে খোরাক আপনারা পরিবেশন করে থাকেন—তা আর হজম করতে পারছি না—বদহজমীর ভয়ে সমস্ত ক্ষুধার্ত দর্শকদের তরফ থেকে আমি দাবী জানাতে এসেছি—আমাদের মনের মত খাদ্য চাই এবং জানতে চাই—আমরা যখন উপযুক্ত মূল্য দিতে স্বীকৃত তখন বদ্ধি মালেরই বা কারবার করেন কেন? উপযুক্ত মাল সরবরাহের পথে বাধাই বা আপনাদের কী আছে—তাও জানতে চাই।

বলতে বলতে অনেকটা হাঁপিয়ে উঠেছি তখন। অলক্ষ্যে চায়ের কাপটা মুখের কাছে এনেছি—পাত্র এবং পাত্রী দুই-ই তখন মৃতদেহের মত ঠাণ্ডা। এক নিঃশ্বাসে শেষ করে শ্রীযুত ঘোষের দিকে তাকালুম উত্তরের প্রতীক্ষায়। আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলে প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে লোকটার কর্মকুশলতার সাক্ষ্য দেয়—তার মুখাবয়বে ফুটে উঠেছে তখন মরণোন্মুখ রুগ্নের বিষাদক্লিষ্ট মুখের ছাপ—যে রুগ্নের জীবনে আশা রয়েছে অদম্য, জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করবার বাসনা রয়েছে উদগ্র – অথচ একটার পরে একটা রোগ তাকে ঘিরে ধরেছে—দুইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে। মাঝে মাঝে রুগ্নের জীবনে আসে আশার ঝিলিক আবার রোগের নতুন উপদ্রব তাকে হতাশ করে তোলে। এমনি ভাব। ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হয়ে শ্রীযুক্ত ঘোষ বলতে লাগলেন – রুগ্ন যেন সেরে উঠবার ক্ষীণ আলোর শিখা দেখতে পেয়েছে: শ্রীপার্থিব, ক্ষুধার্ত দর্শক সাধারণের দাবী নিয়ে তুমি এসেছো—তোমাদের চাহিদানুযায়ী খোরাক জুগিয়ে উঠতে আমরা পারিনি—আমাদের এই উপায়হীনতার জন্য সমস্ত ক্ষুধার্ত দর্শক সাধারণের কাছে ক্ষমা চাইছি—কিন্তু তাই বলে আমাদের অক্ষমতার অভিযোগ যদি আনো আমরা স্বীকার করবো না। মাল সরবরাহের পথে যে সব বাধা বিঘ্নে ব্লকেড হয়ে আছে তারই কথা প্রথম আমি উল্লেখ করতে চাই। যদি তোমাদের—আমাদের—সবাকার প্রচেষ্টায় এই ব্লকেড ভাংগতে পারি - কোন তরফ থেকেই তাহ'লে আর কোন অভিযোগ থাকবে না। প্রথম মনে করো আমাদের অর্থাৎ চিত্র ব্যবসায়ীদের পুঁজির কথা। দু' একটী প্রতিষ্ঠান ছাড়া আমরা খুব কম পুঁজি নিয়েই ব্যবসা ক্ষেত্রে নামি—(যারা নেমেছে তাদের পুঁজি কম বলেই) ব্যবসা ক্ষেত্রে নেমে প্রথমেই আমাদের চিন্তা থাকে যে অর্থ সংগ্রহ করে নেমেছি—তার যেন ভরা ডুবি না হয়। কারণ তাহ'লে আমার ভবিষ্যতও' সেই

সংগে সংগে ডুববে। ৩০।৪০ হাজার টাকা নিয়ে যদি কাজে হাত দেই অন্ততঃ ১০।১৫ হাজার লাভ যাতে হয় তারই পরিকল্পনা থাকে। তাই নিক্তির ওজনে ঐ টাকার উপযোগী উপকরণ নিয়ে কাজ করতে হয়। সেখানে গতানুগতিক পথ দিয়েই চলতে হয়—এদিক ওদিক দিয়ে চললে রাহাজানির ভয় থাকে। নির্দিষ্ট শিল্পী, অভিনেতা অভিনেত্রী যাদের পর বিশ্বাস আছে—তাদেরই সংগে চুক্তি করতে হয়। 'তোমরা অনেক সময় অভিযোগ করো এবং সে অভিযোগ যে ভিত্তিহীন নয় তা আমরাও স্বীকার করি—"পুরোণ মুখ দেখতে দেখতে আমাদের অরুচী ধরে গেছে।" কিন্তু নূতন মুখ সৃষ্টি করবার মত আমাদের পুঁজি কোথায়? মনে কর আমার চিত্রের নায়িকা একজন নবাগতা। তাকে তৈরী করে নিতে বেশ সময়ের প্রয়োজন অথচ তিন মাসের ভিতর আমার ছবি শেষ করতে হবে। ভাড়া করা স্টুডিও ও শিল্পীদের সংগে যে ভাবে চুক্তি হয়ে থাকে—আবার এদিকে যা সামান্য পুঁজি, বেশী দিন তাত আর ব্লকেড করে রাখা যায় না, তাহলে যে না খেয়ে মরতে হবে। তাই কোন রকমে গোজামিল দিয়ে নায়িকাকে নামিয়ে দেওয়া গেল। নায়িকার আড়ষ্ট অভিনয়—জড়িত চলন প্রভৃতির জন্য চিত্রখানি ব্যর্থ হলো। তখন নবাগতা নায়িকার জন্য কি কেউ আমাকে ক্ষমা করবেন? করবেন না। বরং এই অভিযোগই তোমরা আনবেঃ কোত্থেকে কী একটাকে ধরে এনেছে, একদম জংলী।' কিন্তু এই জংলীই যে সুযোগ পেতে পেতে সহরে হয়ে উঠবে একদিন, একথাও সত্য। অথচ আমি যদি কোন পুরোণ অভিনেত্রীকে নির্বাচন করতাম দোষটা তাহলে সম্পূর্ণ আমার ঘাড়ে পড়তো না। অভিনেত্রীটিরও অংশ গ্রহণ করতে হতো। কারণ তার অভিনয় প্রতিভার সংগে সকলের পরিচয় আছে। আর কোন অভিজ্ঞা অভিনেত্রীর অভিনয় চিত্র বিশেষে খারাপ হলেও মারাত্মক কিছু হবে না, কিন্তু নূতনের বেলায় সে আশঙ্কা রয়েছে। বরং নতুনের বেলায় সেজন্য প্রস্তুত হয়েই থাকতে হবে অথবা গোড়ায় ভাল করে তৈরী করে নিতে হবে সেজন্য পুঁজির প্রয়োজন। আমাদের সে পুঁজি কোথায়? পুঁজি কম ব'লে কোন দায়িত্ব নিতে পারলুম না—ফলে পুরোণ শিল্পীদের দ্বারেই ধর্ণা দিতে হলো। নতুন সৃষ্টির আশা মূলেই মিলিয়ে গেল। শিল্পীর অভাবও আমাদের ঘুচলো না।

বাজারে দশজন ব্যবসায়ী রয়েছেন। শিল্পী—নায়ক নায়িকার উপযোগী হয়ত তিন চার জন। তাই এদের চাহিদা কী রকম বুঝতেই পারো। কাজ যখন এদের নিয়েই চালাতে হবে তখন দশজনই এদের সংগে চুক্তি করে ফেললেন। অসুবিধা আবার দেখা দিল সুটিংএর সময়। শিল্পীকে পেলাম ত স্টুডিও পেলাম না—স্টুডিও পেলাম ত শিল্পীকে পেলাম না। পদে পদে এমনি জোড়া তালি দিয়ে যে মাল তৈরী করা হলো—তার যে শতছিদ্র থাকবে এত জানা কথা। এরই মাঝে কোনটা উতরে গেলত তোমাদেরও ভাগ্য বলতে হবে --আমাদেরও। তাই যে বাধা সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে বড় সে হচ্ছে 'অর্থসমস্যা'। বেশী পুঁজি নিয়ে নামতে হবে। ব্যবসায়ে অর্থনিয়োগে বাঙ্গালীরা সাধারণতঃ ভয় করেন বেশী, তার উপর চিত্র ব্যবসায়ের ত কথাই নেই। ব্যবসা এবং শিল্প হিসাবে আজ পর্যন্ত এই চিত্রশিল্প বাঙ্গালী ধনিকদের সুনজরে পড়লো না যদি পড়তো কোন কথাই ছিল না। অবাঙ্গালী চিত্র ব্যবসায়ীদের মত নতুন মুখ দিতেও আমাদের বাধতো না।

তারপর আর একটি অভিযোগ তোমরা করে থাকো—হিন্দী ছবির তুলনায় বাংলা ছবিতে আমরা খরচ করতে পারি না। অর্থ না থাকলে ত কথাই নেই—অর্থ থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে পারা যায় না। ব্যবসায়ীর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে যদি দেখো—যেখানে আমি দেখছি একখানি বাংলা ছবিতে বড় জোর এক লক্ষ টাকা অর্থাগম হতে পারে সেখানে ৮০
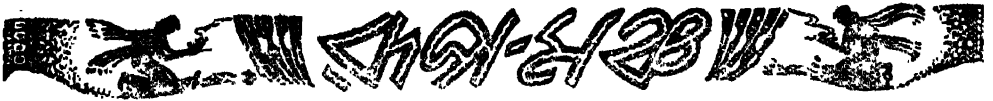
হাজারের বেশী কী করে ব্যয় করতে পারি? কারণ বাংলা ছবি বাংলাতেই চলে বাংলার বাইরে যেসব স্থানে বাংলা ছবি চলে—সপ্তাহে হয়ত একদিন তাও সকালবেলা প্রদর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে। এর পরিধি কত সংকীর্ণ। অথচ হিন্দি ছবি চলে সমগ্র ভারতে। এমন কি বাংলার কলকাতা হিন্দি ছবির সবচেয়ে বড় বাজার। তাই বাংলা ছবির তুলনায় হিন্দি ছবিতে ২৫গুণ বেশী অর্থ ব্যয় করলেও কিছু যায় আসে না, যখন অর্থাগমের সম্ভাবনা রয়েছে যথেষ্ট। তবে একথা ঠিক, যে অর্থ ব্যয় করে হিন্দি ছবি তোলা হয় ঐ অর্থ যদি বাঙালীর হাতে পড়তো—হিন্দি ছবির তুলনায় বাংলা ছবি শতগুণে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারতো। তাই প্রতিযোগিতায় বাংলা ছবিকে বেঁচে থাকতে হলে বাঙালী দর্শকদের সহানুভূতি চাই পুরোপুরি। বদ হজমের ভয় থাকলেও তাকে সে সুযোগটুকু দিতে হবে। আর প্রদর্শক এবং পরিবেশকের সচেষ্ট থাকতে হবে—ব্যবসাক্ষেত্রের বাধ্য-বাধকতায় যাতে তারা বাংলার বাইরেও বাংলা ছবির প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে এর পরিধির বিস্তার করতে পারেন। এ ছাড়া ব্যবসাক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় বাঙালীকে টিকে থাকতে হলে ব্যবসাক্ষেত্রে ভারতের বিভিন্ন বাজারে আধিপত্য বিস্তার করতে অন্ততঃ দুখানা বাংলা ছবির সঙ্গে একখানা হিন্দি ছবি তুলতে হবে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শ্রীযুক্ত ঘোষ বলেন—শ্রীপার্থিব আজ হিন্দি ছবির জয়ঢাকনিনাদে চারিদিক মুখরিত। কিন্তু চিন্তা করে দেখো—দশ বছর পূর্বে চিত্রজগতে বাংলা যা দিয়েছে—হিন্দি চিত্রে তারই হুবহু ছাপ। নিউ থিয়েটার্সের সংগে তুলনায় আজিও ভারতে কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি—সেটা বাংলারই গৌরবের। হিন্দি ছবির কৃতকার্যতার মূলে রয়েছে বাংলার শিল্পীবৃন্দেরই প্রতিভা। তাই বাঙ্গালী দেশবাসীর সহানুভূতি পেলে চিত্রশিল্পেও তার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সমর্থ হবে। এ বিষয়ে আমার দৃঢ়বিশ্বাস আছে।"

বর্তমান কাঁচা ফিল্মের দরুণ চিত্রশিল্পের অগ্রগতি কতখানি ব্যাহত হয়েছে এবং আরো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রায় একঘণ্টার ওপর আলোচনার পর আমি শ্রীযুক্ত ঘোষের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বলে এলাম :—

: শিল্পকলা, সাহিত্য-বিজ্ঞান-রাজনীতি সর্ববিষয়ে বাঙ্গালীর নিষ্ঠা, বিশ্বের বিস্ময় উদ্রেক করেছে—আত্মত্যাগ ও আত্মনিষ্ঠায় বাঙ্গালী জনসাধারণ চিত্রশিল্পকে তেমনিভাবে বাঁচিয়ে রাখবে, এ বিষয়ে রূপ-মঞ্চের দিক থেকে কোন প্রকার চেষ্টার ত্রুটি হবে না।" তাই আজ বাঙ্গালী দর্শক সাধারণের কাছে আমার আবেদন বাংলা ছবি নিকৃষ্ট শ্রেণীর হলে তার বিরুদ্ধে যেমনি আপনারা প্রতিবাদ জানাবেন তেমনি শিল্পকে বাচিয়ে রাখতে হলে পয়সা খরচ করে যেন দেখতেও যান। হিন্দী এবং ইংরেজী ছবি সব ক্ষেত্রেই যে আমাদের আনন্দ দেয়—একথা আমি স্বীকার করি না। বাংলা ছবি যদি কোন সময়ই আমাদের আনন্দ না দেয় তবু বাংলা ছবির উন্নতির জন্য এ আত্মত্যাগটুকু আমাদের করতে হবে—বাঙ্গালী দর্শক যে এ বিষয়ে দ্বিধা করবেন না সে বিশ্বাস আমার আছে।

'রূপ-মঞ্চ'—বার্ষিক সংখ্যা

আগামী মাঘ মাসে 'রূপ-মঞ্চ' চতুর্থ বৎসরে পদার্পণ করবে। 'রূপ-মঞ্চের' জন্ম-বার্ষিকীতে দেশবাসীর আমন্ত্রণ রইল।

দেবর:

বাংলার বয়োজ্যেষ্ঠ (সম্ভবতঃ) পরিচালক জ্যোতিশ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত ইন্দ্রপুরী স্টুডিও প্রযোজিত দেবর চিত্রায় প্রদর্শিত হচ্ছে। শুধু বয়সেই নয়, বাংলা এমন কি ভারতের বিভিন্ন পরিচালকদের স্ব স্ব পরিচালিত চিত্রগুলি যদি জুড়ে জুড়ে পরীক্ষামূলক ভাবে দেখা যায় যে পৃথক পৃথক ভাবে তারা কত ফিট ফিল্ম খরচা করে পরিচালক হয়েছেন এবং শ্রেষ্ঠত্বের বিচার যদি এই সংযোগ করা ফিল্মের দৈর্ঘের তারতম্যে নির্বাচন করা হয়—তাহ'লে এই শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান-মুকুট যে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিরে শোভা পাবে একথা জোর গলায় বলতে পারি। চিত্রগুলির যদি একটা তালিকা করা যায় তাহ'লেও এই Useless paper campaign এর যুগেও শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত চিত্রগুলির তালিকা করতে less paperএ হয়ে উঠবে না। সব ক্ষেত্রেই শ্রীযুক্ত বন্দোপাধ্যায় পুরোভাগে, কিন্তু চিত্রের সার্থকতার কথা যদি বলি তাহ'লে বলতে হয় তার পরিচালিত চিত্র পংকিলতার ভিতরই ডুবে আছে।

তাঁর মিলনে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন শেষ বয়সে একবার দর্শকদের মনে নতুন করে রেখাপাত করতে এই চেষ্টা মৃত্যুর পূর্বে রোগীর দেহে জীবনী শক্তির ক্ষণিক ঔজ্জ্বল্যের মতই যদি আমরা মনে করি তাহলে অন্যায় কিছু করা হবে না। তাই শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত মিলন দেখে মুগ্ধ না হলেও আমাদের মনে সহানুভূতি জেগেছিল এবং সেই সহানুভূতি ধীরে ধীরে শ্রদ্ধায় পরিণত হতো যদি মিলনের পর তিনি আর কোন ব্যবধানের সৃষ্টি না করতেন।

বাংলার দুর্ভাগ্য—আজও এই কাঁচা ফিল্মের অভাবের দিনে দেবরের মত চিত্র প্রস্তুত হয়। ধন কুবের কায় নামী অবাঙ্গালী হয়েও বাংলার বুকে যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন—অনেক বাঙ্গালী চিত্র প্রতিষ্ঠানই প্রতিযোগিতায় হয়ত তার কাছে হার মানবে, কিন্তু দেবরের মত চিত্র গ্রহণ করবার তিনি যে সুযোগ দিয়েছেন—তাতে তিনি বাংলা চিত্র শিল্পের অবমাননা করেছেন। বাঙ্গালী দর্শকদের চিন্তা শক্তি—রুচি—শিল্পকলা বোধ কে অস্বীকার করেছেন। কয়েক বছর পূর্বেকার চিত্রগুলির সংগে তুলনা করলেও দেবরের স্থান সর্ব নিম্নে। দেবর দেখে এসে পরিচালক সম্পর্কে মনে হবে—চরিত্র এবং চরিত্রের সংগতি বোধ বিন্দুমাত্রও তার ভিতর নেই। প্রযোজকের কথায় মনে হবে—তার প্রযোজিত চিত্রগুলি

রামরাজ্যে শোভনা সমর্থ

ব্যবসা ক্ষেত্রের By product অর্থাৎ ষ্টুডিও ভাড়া খাটিয়ে তিনি যে অর্থোপার্জন করেন তারই সুদের অর্থে এই সব চিত্র নির্মিত হয়। আর বদ্ধমূল ধারণা বাংলার দর্শক—মূর্খ, আজে বাজে যা কিছুই দেওয়া যাক না কেন টাকা খরচ করে তারা দেখতে আসবেই। অভিনেতা অভিনেত্রীদের কথা বিশেষ করে ছবি বিশ্বাস এবং অহীন্দ্র বাবুর কথায় মনে হয়, টাকা নিয়ে কারবার। টাকা পেলেই হলো। যেভাবেই আমাদের চালিয়ে নিক না—দুটো মোড় ঘুরলেই হলো। কোন দরদ যেন নেই কারো। চিত্র ব্যর্থ হতে পারে কিন্তু এ ভাবে দরদহীন ব্যর্থ চিত্র সচরাচর চোখে পড়ে না। পরিচালক পতিতা উদ্ধার—বোনের আত্মত্যাগ—দয়িত এবং দয়িতা সমস্যা—পতি-পরায়ণা-পত্নী—তথা দয়িতানুরাগিনী বৌদি প্রভৃতি এতগুলি জটিল সমস্যা নিয়ে ১১ হাজারের ভিতর মীমাংসা করতে যেয়ে হাবুডুবু খেয়েছেন। চিত্রের চারটী গানের প্রথম দুইটীর জন্য শ্রীযুক্ত সুবল দাসগুপ্ত প্রশংসা পেতে পারেন। শব্দগ্রহণ চিত্রের তুলনায় উচ্চাঙ্গের। চিত্রার মত প্রেক্ষাগৃহে দেবরের মত চিত্র মুক্তি লাভ করাতে প্রেক্ষাগৃহের সুনাম ব্যাহত হয়েছে অনেকখানি। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কলঙ্কিনী নামে আর একখানি চিত্রের পরিচালনা করেছেন—চিত্রখানি মুক্তি প্রতীক্ষায়। তাই সমালোচনা প্রসংগে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ জানাই তিনি যেন কলঙ্কিনীর বোঝা মাথায় করেই চিত্র জগৎ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

পয়েগম

কিছুদিন আগে কলকাতার ছায়া ও সিটি সিনেমায় অমর পিকচার্সের 'পয়েগম' দেখান হয়েছিল। 'পয়েগম'-এর প্রযোজক ও পরিচালক সুরেন্দ্র দেশাই। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন—সাধনা বসু, সুরেন্দ্র, প্রতিমা দেবী প্রভৃতি এবং কাহিনী রচনা করেছেন নাট্যকার মন্মথ রায়।

সর্বাগ্রে ব'লে রাখা দরকার, সাধনা বসুর জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগানো ছাড়া পয়েগম্ ছবির অপর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। ভাল পরিচালকের হাতে প'ড়লে তবু হয়ত ছবিখানা কিছুটা উপভোগ্য হ'ত কিন্তু 'পয়েগম' দেখতে দেখতে আমাদের মনে হয়েছে, ভারত সরকারের বহু নিন্দিত এগার হাজার ফিটের আদেশ এই সব বইয়ের কথা মনে করেই জারী করা হয়েছিল। আর সত্যি কথা ব'লতে কি, 'পয়েগম' সম্পর্কে যদি সরকার বাহাদুর পাঁচ হাজার ফিটেরও আদেশ দিতেন তবে দর্শকরা এক তিলও ক্ষুণ্ণ হ'ত না। বইয়ের অপকর্ষতার জন্যই সব সময়ই সকলের মনে হয়েছে, বই শেষ হবে কখন?

সাধনা বসুকে কাজে লাগাতে গিয়ে পরিচালকের কামাতুর মন যে রকম নির্লজ্জভাবে ব্যক্ত হয়ে পড়েছে তাতে দর্শক সাধরণের প্রতিবাদ করবার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রতিক্ষণেই তিনি সাধনা বসুর বিলীয়মান যৌবনের আকর্ষণীয় অংশগুলো (?) দর্শকদের চোখের সামনে প্রকট ক'রে তুলছিলেন। এই উদ্দেশ্যে কষ্টিউমগুলো তৈরী করা হয়েছে নির্লজ্জের মত নোংরা ধরণে, বক্ষদেশকে পীনোন্নত প্রতিপন্ন করবার জন্যে ক্যামেরাম্যানকেও মাথা ঘামাতে হয়েছে ভয়ঙ্কর। আর আসলে এ সবগুলো পরিচালকের অক্ষমতার লক্ষণ ছাড়া আর কিছুই নয়। যখন চিত্র পরিচালনায় প্রকৃত নৈপুণ্য ও দক্ষতার ঘাঁটতি দেখা যায় তখনই এই সব নোংরামি দিয়ে দর্শকদের ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করা হয়।

সাধনা বসুর বইতে সচরাচর যা হয়ে থাকে, এ বইতেও প্রায় তাই। অর্থাৎ তিনি একলাই সারা বই জুড়ে থাকবার চেষ্টা করেছেন। অন্যান্য বইতে তবু নৃত্য ও গীতের প্রাচুর্য থাকে আশাতীত রকম কিন্তু এই ছবিখানাতে তাও নাই। শ্রীযুক্ত বসু তাঁর অভিনয়ে দর্শকদের মুগ্ধ,

তানসেনের তানীরূপে শ্রীমতী খুরশীদকে দর্শকেরা মনে করে রাখবেন অনেক দিন

ক'রবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু সে চেষ্টা যে কতদূর হাস্যকর হয়েছে তা যে-কোন দর্শক স্বীকার করবেন।

একটা ব্যাপার দেখা গিয়েছে যে, সাধনা বসু মন্মথ রায়ের কাহিনী ছাড়া অভিনয় করতে পারেন না অথবা মন্মথ রায় ছাড়া সাধনা বসুর অভিনয়ের উপযোগী কাহিনী কেউ রচনা করতে পারে না। নাট্যকার রায় এ যাবৎ যত কাহিনী রচনা করেছেন, তার অধিকাংশই আমাদের ভাল লেগেছে। কিন্তু 'পদগম'-এর কাহিনী যে-কোন পঞ্চম শ্রেণীর লেখকও লিখতে পারেন। আসলে মন্মথ রায় 'স্যাবটেজ' করেন নাচ ও কাহিনীর নানা রকম সস্তা ও বহু ব্যবহৃত প্যাঁচ, মারা-মারি, স্থূল ঘটনার সংস্থাপনা ও নেহাৎ কুরুচিপূর্ণ 'হিউমার' যে-কোন দর্শককে বিরক্ত করবার পক্ষে যথেষ্ট। এর পর আবার পরিচালনা এমন ঢিলে ও দুষ্ট যে শেষ পর্যন্ত বসে থাকাও অসহ্য হয়ে ওঠে। সারাক্ষণই মনে হয়, অভিনয় ছেড়ে সাধনা বসু কখন নাচবেন। সাধনা বসুর একমাত্র গুণ,— তিনি ভাল নাচতে পারেন। কিন্তু সেদিক দিয়েও দর্শকদের ব্যর্থ হতে হয়েছে।

যাই হোক, সাধনা বসুর সর্বশেষ নৃত্য পরিকল্পনাটি বেশ ভালই হয়েছে এবং দর্শকরা মাত্র এই দৃশ্যটিই ভাল ভাবে উপভোগ করতে পেরেছে বলে আমাদের ধারণা।

দম্পতি

প্রযোজনা : রূপশ্রী লিঃ। পরিবেশনা : এসোসিয়েটেড ডিসট্রিবিউটরস। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : নীরেন লাহিড়ী। গল্পাংশ ও সংলাপ : প্রবোধ সান্যাল। সংগীত পরিচালনা : কমল দাশগুপ্ত। আলোক-চিত্র : অজয় কর। শব্দানুলেখন : গৌর দাস। চরিত্র রূপায়ণে : সুনন্দা দেবী, সাবিত্রী, রবীন, গীতা, বুদ্ধদেব, শ্যাম লাহা, জহর গাংগুলী, রমা ব্যানার্জি, কানু বন্দ্যো (এঃ) প্রভৃতি।

'গরমিল' এবং 'সহধর্মিণী' খ্যাত পরিচালক নীরেন লাহিড়ীর 'দম্পতি'র সমালোচনা করবার পূর্বে পরিচালককে এই কথাটুকু জিজ্ঞাসা করতে চাই—ভবিষ্যতে 'ফরমূলা' বাধা পথে চিত্রগ্রহণে তিনি অগ্রসর হবার দুঃসাহস রাখেন কিনা? যে চিত্র দুখানি পরিচালনা করে নীরেন বাবু দর্শক মহলে পরিচিত হয়েছেন তার একখানাও কোন জটিল সমস্যা নিয়ে গড়ে ওঠেনি। অথবা সে সমস্যার কোনটারই পর আজকালকার দিনে গুরুত্ব আরোপ করা চলে না। তবে সাধারণভাবে নিছক আনন্দ পরিবেশনে দর্শকদের আকৃষ্ট করতে তিনি যে প্রয়াস পেয়েছেন—সেদিক থেকে কতকাংশে কৃতকার্য হয়েছেন। কিন্তু চিত্রজগতে সচরাচর যে সংক্রামক ব্যাধির উপদ্রব দেখতে পাই শ্রীযুক্ত লাহিড়ীও তার হাত থেকে রেহাই পাননি বলে দুঃখিত। যেমন দেখতে পাই—বিশেষ করে হিন্দি ছবিতে। কোন বিশেষ বিশেষ 'মাল মসলার' সন্নিবেশে যদি একখানা চিত্র সাফল্য অর্জন করলো—পরবর্তী চিত্রগুলিও তাহ'লে তার হুবহু ছাপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। দম্পতি তারই সাক্ষ্য দেবে। নীরেন বাবু বয়সে নবীন, নবীনের কাছ থেকে নূতনের সন্ধান পেতে চাওয়া দুরাশা নয়, তাছাড়া তিনি সে প্রতিষ্ঠানের সংগে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন—তার মূলে বাঙ্গালীর অর্থ এবং পরিশ্রম দুই-ই রয়েছে। বাঙ্গালীর কাছ থেকে বাংলা ছবিতে যদি বাংলার খাঁটি রূপ না দেখতে পাই—যদি বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যই তাতে না থাকে—তাহ'লে তার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে!

নীরেনবাবু পরিচালিত চিত্রগুলি দেখে মনে হয় 'পিসিমা জ্যেঠিমাদের' জন্যই যেন তিনি ছবি তোলেন—এরাই তার একচেটিয়া দর্শক—কিন্তু আবার একথাও না বলে পারিনা —এই পিসিমা, জ্যেঠিমাদের সত্যিকারের সন্ধানও যদি তিনি রাখতেন তাহলেও কোন কিছু বলবার ছিল না।

দম্পতির ভিতরে যে দ্বন্দ্ব তিনি বাধিয়ে তুলেছেন—

তার জেরে নায়ক নায়িকার ভিতর এত বড় ছেদ টেনে আনাতে এর অস্বাভাবিকতায় তার নিজেরই লজ্জিত হওয়া উচিত। তারপর নায়ক সম্পর্কে যখন সত্য ঘটনা প্রচারিত হলো তখন পড়শীদের গুরূপভাবে বাড়ীতে এসে নির্যাতন করবার পদ্ধতি নীরেন বাবুর জানা থাকলেও আমাদের নেই। ছোট ছোট বালক বালিকার (অর্থাৎ নায়ক নায়িকার বাল্য বয়সে) মুখ দিয়ে তিনি যে প্রেমের ভনিতা ফুটিয়ে তুলেছেন—তা দেখে শুধু নিন্দা করেই চুপ করবো না। এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাবো। লক্ষ্ণৌএ বন্ধুসহ নায়ক এবং দ্বিতীয়া নায়িকা প্রভৃতি নিয়ে সব দৃশ্যগুলিই অস্বাভাবিকতার ছাপে দুষ্ট।

কাহিনীকার ও সংলাপ লেখকরূপে শ্রীযুক্ত প্রবোধ সান্যালের নাম প্রচারিত হ'য়েছে,— সংলাপে মাঝে মাঝে যে 'ঝিলিক'-এর পরিচয় পেয়েছি তাঁতে প্রবোধ সান্যালীয় সংলাপের মর্যাদা রয়েছে—আবার বেশীর ভাগ স্থানেই মর্যাদা হানী হয়েছে। প্রিয়বান্ধবীর সংলাপ লেখক আর দম্পতির সংলাপ লেখকের মাঝে ব্যবধান যেন অনেকটা। প্রবোধ দা নিজেদের গোষ্টীর লোক হলেও—একথা বলতে কুণ্ঠিত হবোনা যে 'দম্পতি'র গল্পাংশ তার পদস্খলনেরই সাক্ষ্য দেবে।

অভিনয়ে সুনন্দার কথাই সর্বাগ্রে বলতে হয়—কাশীনাথের সুনন্দা 'দম্পতি'তে আমাদের বিশ্বাস হারাননি। রবীন বাবু এবং সাবিত্রীর প্রাণহীন অভিনয় নিন্দনীয় নয়।

সংগীতে কমল দাশগুপ্ত তার পূর্ব গৌরব ক্ষুণ্ণ করতে পারেননি বলেই আমাদের বিশ্বাস। হঠাৎ বাংলা ছবিতে হিন্দি গানের আমদানীর অর্থও বুঝলাম না।

পাপের পথে

প্রাইমা ফিল্মস ও ফিল্ম কর্পোরেশন প্রযোজিত পাপের পথেরূপবাণীতে প্রদর্শিত হচ্ছে। চিত্রখানির পরিচালনা

বড়ুয়ার 'চাঁদের কলঙ্কে' যমুনা দেবীকে দেখা যাবে

করেছেন শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায়। পরিচালকরূপে প্রফুল্ল রায় বাঙ্গলা এবং হিন্দি দর্শকদের কাছে পরিচিত কিন্তু এ পর্যন্ত কতখানি সুনাম অর্জন করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

পাপের পথে একটী 'ক্রাইম ড্রামা'। বাংলা চিত্রের একঘেয়েমীতে মনের স্বাদ যে নষ্ট হয়ে গেছে, পাপের পথে তার ব্যতীক্রম করে—দর্শকদের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে। গল্পাংশটী অতি সাধারণ স্তরের। ছবি দেখতে দেখতে এই ধরণের ছবিতে যে 'বিস্ময়—শিহরণ' প্রভৃতি জাগা স্বাভাবিক তার কিছুই জাগে না। বরং দর্শকেরা যেন পূর্বে থেকেই জানেন এই ধরণেই পরে ঘটবে। 'ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট' নামক ইংরেজী ছবির ছাপ থাকলেও তার তুলনায় এর দুর্বলতা স্বভাবতই ভেসে

উঠে। তবে একটা বিষয়ে পরিচালককে ধন্যবাদ জানাই 'পাপের পথে'র পাপীটীর শাস্তি দিতে তিনি ভোলেন নি। ক্রাইম ড্রামা যে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর নয় সেটুকু তিনি প্রমাণ করেছেন—নায়কের শাস্তি বিধান করে এবং তার প্রত্যেকটা অপরাধ ধরিয়ে দিয়ে।

অভিনয়ে প্রথমেই বলতে হয় জীবন গাংগুলীর কথা। তাঁর অভিনয় চিত্রের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। তারপরই তার স্ত্রীরূপে পদ্মাদেবীর সংযত অভিনয় আমাদের ভাল লেগেছে। পাপের পথে জ্যোতিঃপ্রকাশ (দ্বিতীয় নায়ক) অভিনীত শেষ বাংলা ছবি। শিল্পীরূপে জ্যোতিঃ-প্রকাশের চরিত্রটী পরিচালক যে কেন অংকন করলেন—

এবং শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্যের কোন সার্থকতাও খুঁজে পেলাম না। প্রফুল্ল বাবুকে কী এখানেও সংক্রামক ব্যাধিতে পেয়েছিল? শিল্পীদের জীবনের প্রতি পরিচালকদের যেন সম্প্রতি একটা মোহ পড়েছে—(পাপের পথে—অভিসার—দেবর) অথচ এর সব কয়টা চিত্রেই শিল্পী জীবনের ব্যর্থ রূপ ফুটে উঠেছে। জ্যোতিপ্রকাশের অভিনয় চরিত্রোপযোগীই হয়েছে।

অপরাপর অভিনয় মন্দ নয়।

চিত্রের চিত্রগ্রহণে অজিত সেনগুপ্ত এবং তাঁর যারা সহকারী ছিলেন—তাঁদের বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাপের পথে দেখে এসে দর্শকদের মনে যে দুটী জিনিষ রেখাপাত করবো সে হচ্ছে জীবন গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনয় ও চিত্রের চিত্রগ্রহণ। —গোপাল চট্টোপাধ্যায়

তানসেন

তানসেন রঞ্জিত মুভিটোনের সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত চিত্র পূরবী, জ্যোতি, উত্তরা প্রেক্ষাগৃহে একযোগে প্রদর্শিত হচ্ছে। তানসেনের সমালোচনা লিখবার পূর্বে আনুসঙ্গিক কয়েকটি কথার অবতারণার প্রয়োজন. বাংলার গৌরব নিউ থিয়েটার্সের সৃষ্ট সায়গল যখন রঞ্জিত-এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন —বাংলার চিত্রামোদীরা স্বভাবতঃই যে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন সেকথা বলার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু যখন তারা রঞ্জিতের বিজ্ঞপ্তি দেখলেন তখন ঠিক অনুরূপ খুসী হ'য়েছিলেন—এই মনে করে যে ভারতীয় চিত্রজগতের দুইজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পীর কণ্ঠ পর্দায় না জানি কী অলৌকিক সুরে বেজে উঠবে। খুরসীদ সায়গল সমন্বয়ে রঞ্জিতের প্রথম চিত্র ভক্ত সুরদাস নানাদিক দিয়ে নিরাশ করে। তানসেন সায়গল খুরসীদ অভিনীত রঞ্জিতের দ্বিতীয় চিত্র। দ্বিতীয় চিত্রে রঞ্জিত দর্শক সাধারণদের নিরাশ করেনি। বরং প্রশংসাই পাবে। ভারতের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ আকবরের

সভাসদ ভক্ত তানসেনের জীবনী পর্দায় রূপায়িত করে এবং দুইটি ভূমিকায় খুরসীদ ও সায়গলকে নির্বাচন করে যে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন তাতে কোনই সন্দেহ নেই। পরিচালক জয়ন্ত দেশাই তাব পরিচালক জীবনে যে প্রশংসা পেয়েছেন, তানসেনের পবিচালনায় তার পরিমাপ বেশী বলেই মনে হয়।

তানসেনের ভূমিকায় সায়গল, তানসেনের দয়িতা তানীর (?) চরিত্রে খুরসীদ, আকবর—মুবাবক অভিনীত চবিত্রগুলির প্রশংসাই করতে পারি। অপরাপর অভিনয়াংশ নিন্দনীয় নয়।

তানসেনের সংগীত, সংলাপ, অভিনয় প্রভৃতি বিষয়ে দর্শকের দৃষ্টি নিয়ে সমালোচনা করলে আমাদের বলবার কিছু নেই—বরং রঞ্জিত ইদানীং যেসব চিত্র আমাদের দিয়েছে তার তুলনায় তানসেনের স্থান অনেক উচ্চে। কিন্তু তানসেনের কাহিনী নিয়ে আমাদের কিছু বলবার আছে। তানসেন ঐতিহাসিক চরিত্র। মিঞা তানসেন সম্বন্ধে ছোটবেলা থেকে বহু গল্প, আখ্যায়িকা শুনে এলেও ঐতিহাসিক তানসেনের মূল্য আমাদের কাছে একটুকুও কমেনি বা কমতে পারে না। ইতিহাস যা সাক্ষ্য দেয় পর্দায় তানসেনকে রূপায়িত করার সময় পরিচালক যদি সেমত কাজ করতেন তানসেন চিত্র সম্বন্ধে আমাদের তাহলে কোন অভিযোগ থাকতো না। ইতিহাস থেকে জয়ন্ত দেশাই অনেক দূরে সরে গেছেন। তানসেন চিত্রের মূলে ব্যর্থতা এই জন্যই আমরা বলবো।
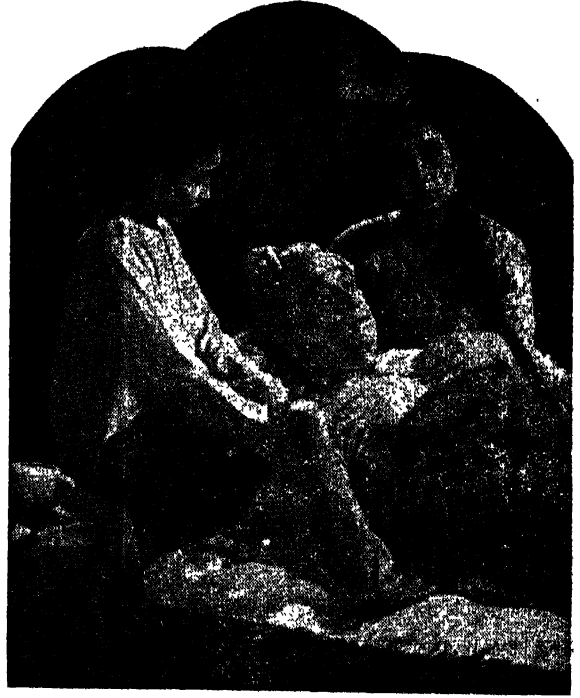
'পোষ্যপুত্রের' একটি দৃশ্যে শিশিরকুমার, মাষ্টার মিন্টু ও সাবিত্রী

তানসেন দেখে চিত্রামোদীদের স্বভাবতঃই তার ধর্ম সম্বন্ধে একটা সন্দেহের ভাব জাগে—চিত্রে তানসেনের জীবনের যে অংশ দেখানো হয়েছে তাতে দর্শক সাধারণের মনে হবে তানসেন মুসলমান ছিলেন। একথা আমার বলবার উদ্দেশ্য—ইতিমধ্যে কয়েকজন দর্শক আমায় চিঠি লিখে এবং ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞাসা করেছেন যে তানসেন প্রথম জীবনে হিন্দু ছিলেন একথা ভুল। হয়ত মধ্যম-জীবনে অর্থাৎ চিত্রে যতটুকু তানসেনের জীবনী দেখানো হয়েছে—তার পরে তানসেন হিন্দু হন। এ ধারণা তাদের অবশ্য তানসেন চিত্র দেখেই জন্মেছে। যাদের এ ধারণা জন্মেনি তাদের কথা স্বতন্ত্র। যাদের জন্মেছে—তাদের জোর করে আমি বলছি তানসেন প্রথম জীবনে যে হিন্দু ছিলেন একথা

শুধু আমিই বলবো না—সুধীজন মাত্রেই স্বীকার করবেন এবং এর সত্যতা সম্পর্কে ইতিহাসের পাতা তারা উল্টে যেতে পারেন।

তানসেনের পিতার নাম মুকুন্দরাম পাঁড়ে। কেউ কেউ অবশ্য মকরন্দ পাঁড়েও বলেন। তিনি গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ। বারাণসীতে কথকতায় জীবিকার্জন করতেন। পাণ্ডিত্যও যেমনি ছিল তার অগাধ, সংগীতে দখলও তেমনি কম ছিল না। অর্থও ছিল প্রচুর। কিন্তু তার পত্নীর ছিল মৃত-বৎসার দোষ। গোয়ালিয়রে হজরৎ মোহাম্মদ গওসম নামে এক সিদ্ধ পীর ছিলেন। তিনি মৃতবৎসার দোষ দূর করতে পারতেন। মুকুন্দরাম তার কাছে যেয়ে একটি কবচ আনেন। হজরৎ কবচটি তার পত্নীর কণ্ঠে ধারণ করাবার এবং সন্তান জন্মাবার পর সন্তানের কণ্ঠে সেটিকে দেবার নির্দেশ দেন। মহম্মদ গউস আরও এক ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে এই সন্তান এক অদ্বিতীয় প্রতিভাবান পুরুষ হবে। এই গেল তানসেনের জন্মরহস্য। তানসেনের পিতৃদত্ত নাম হলো রামতনু। ছোটবেলায় রামতনু ছিল অসম্ভব দুরন্ত। পড়া-শুনা মোটেই করতো না। মাঠে মাঠে, বনে বনে গরু চরিয়ে ঘুরে বেড়াতো। এই সময় রামতনুর সংগে পরম ভক্ত গায়ক হরিদাসের সাক্ষাৎ হয়। সেও এক মজার ব্যাপার। হরিদাস স্বামী শিষ্যসমেত বারাণসীতে আসেন —যখন বারাণসীতে হরিদাস স্বামী শিষ্যসমেত আসছেন, রামতনু অর্থাৎ তানসেন গোচারণে রত ছিল। শিষ্য সহ সাধুকে দেখে তার মনে একটু কৌতুকভাব জাগে। সাধুদের ভয় দেবার জন্য এক গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে ব্যাঘ্রের মত ডাকতে থাকায় শিষ্যেরা ভয় পেয়ে যায়। হরিদাস স্বামী ভাবলেন এখানে ব্যাঘ্র আসবে কোথায়! শিষ্যদের অভয় দিয়ে তখন চারিদিকে অনুসন্ধান করতে আদেশ দিলেন এবং শিষ্যেরা রামতনুকে এনে স্বামিজীর সামনে উপস্থিত করলেন। রামতনুকে দেখে তাকে সংগে রাখবার জন্য হরিদাস স্বামী মুকুন্দরামের কাছে প্রস্তাব করলেন। তিনি স্বীকৃত হলেন। এই সময়েই রামতনুর সংগীতে দীক্ষা হয়। বৃন্দাবনে হরিদাস স্বামীর নিকট রামতনুর দশ বছর সংগীত শিক্ষা লাভ করবার পর পিতার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় রামতনু পিতার কাছে ছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বে মকরন্দ হজরৎ মহম্মদ গউসের বৃত্তান্ত বলে যান এবং তারই কথামত চলতে নির্দেশ দেন। পিতার মৃত্যুর পর হরিদাস স্বামীর অনুমতি নিয়ে রামতনু গোয়া-লিয়রে মহম্মদ গউসের ইচ্ছানুযায়ী বাস করতে থাকেন। গোয়ালিয়রের রাণী মৃগনয়নয়নী রামতনুর সংগীতে খুব সন্তুষ্ট হন। রাণীও খুব ভাল গাইতে জানতেন। তিনি রামতনুকে রোজ আমন্ত্রণ করতেন। রাণীর অনেক শিষ্যা ছিলেন তন্মধ্যে হোসেনা নাম্নী এক মুসলমান ধর্মে দীক্ষিতা ব্রাহ্মণ-ললনা সৌন্দর্যে ও সুমধুর সঙ্গীতে রামতনুকে আকৃষ্ট করে ফেললেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি নিবিড় প্রণয়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন।" রাণীর কাণে একথা গেল। তিনি উভয়কেই ভালবাসেন তাই এদের মিলনের পথে অন্তরায় না হয়ে সহায়করূপেই কাজ করলেন। এ বিয়ের পৌরহিত্য করেন হজরৎ মহম্মদ গউস এবং এরপর রামতনুর নাম হ'ল মহম্মদ আতা আলী খাঁ। মহম্মদ আতা আলী খাঁ অর্থাৎ তানসেন বৃন্দাবনে হরিদাস স্বামীর কাছে ফিরে এলেন— তিনি রামতনু ও মহম্মদ আতা আলীকে পার্থক্যভাবে দেখলেন না। তার উদার মনোভাবের পরিচয় পেয়ে তান-সেন গুরুর প্রতি আরও আকৃষ্ট হয়ে উঠলেন। স্বামী হরিদাস তানসেনকে সঙ্গীতের যৌগিক সাধনা শিক্ষা দিয়েছিলেন। তানসেনের স্ত্রীও সংগীতে পারদর্শীনী ছিলেন। স্বামী স্ত্রী উভয়েই নাদ বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করেন।

তানসেনকে দিল্লীর দরবারে প্রকৃতপক্ষে উপস্থিত করেন রেওয়ার মহারাজ রাজারাম। দিল্লীর দরবারে তানসেনের সংগীত-প্রতিভার যে অলৌকিক কাহিনী আমরা

শুনতে পাই তার সবগুলি বলার কোন প্রয়োজন নেই। দীপক রাগ সম্পর্কে কিছু বলার আবশ্যক। তানসেনকে আকবর সকলের চেয়ে দিন দিন বেশী সমাদর করতে থাকেন, এতে অন্যান্য ওস্তাদরা ঈর্ষান্বিত ছিলেন। এরা তানসেনের জীবননাশের জন্য তানসেনকে দিয়ে দীপক গাওয়াতে মহারাজকে স্বীকৃত করেন। তানসেন অবস্থা বুঝে একমাস সময় নিয়ে তার মেয়ে সরস্বতী এবং হরিদাস স্বামীর এক শিষ্যা রূপমতীকে দিয়ে মেঘমল্লার রাগিণী শিখিয়ে রাখেন। নির্দিষ্ট দিনে—নির্দিষ্ট সময়ে তানসেন দীপক রাগিণী গেয়ে অর্ধদগ্ধ অবস্থায় যখন বাড়ী ফিরলেন রূপমতী 'মেঘমল্লা'র আরম্ভ করতেই চারিদিক মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে এলো বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো। তখন তানসেনের মেয়ে সরস্বতী রাগিণী ধরতেই বৃষ্টি নামলো—এবং তানসেন রক্ষা পেয়ে গেলেন। তানসেনের জীবন-বৃত্তান্ত সম্পর্কে আর বেশী কিছু আমাদের উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই—এবার দর্শকেরা সহজেই বুঝতে পারবেন, পরিচালক *জয়ন্ত দেশাই মূল কাহিনী হ'তে কতখানি বিচ্যুত হয়েছেন। তানী এবং তানসেনের যে প্রণয়কথা চিত্রে প্রাধান্য পেয়েছে ইতিহাসে তার কোনই দাম নেই। এই প্রণয়-কাহিনীর অবতারণা করতে পরিচালক তানীর সৃষ্টি করেছেন—অথচ তানীর পরিবর্তে যদি প্রেমকুমারীর অবতারণা করতেন ইতিহাসকে অবহেলা করা হোত না।" 'প্রেমকুমারী' তানসেনের স্ত্রী হোসেনার পূর্বনাম 'তানী'কে চিত্রে তানসেনের সংগে যে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, ইতিহাসে কোন স্থানেই তার উল্লেখ নেই। তারপর দীপক রাগিণী বিষয়েও পরিচালক নিজের মনগড়া খেয়ালেরই প্রশ্রয় দিয়েছেন।

দীপকরাগিণী যখন তানসেন গেয়েছিলেন তখন তিনি বিবাহিত, এমন কি নিজের কন্যাও বয়স্বসী অথচ এখানে

চঞ্চলা অভিনেত্রী শ্রীমতী রমলা

মনচলিতে এর অভিনয় দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে

তার বিপরীত। ভক্ত তানসেনকে পরিচালক সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করেছেন।

ইতিহাসের কথা বাদ দিলে পরিচালকের সৃষ্ট তানসেন মনে করে যদি তানসেন চিত্রখানি দেখি—প্রত্যেক দর্শকই তৃপ্ত হবেন। অন্ততঃ এরূপ চিত্র-নির্মাণের উপকারিতা যে প্রযোজকরা অনুভব করেছেন, এজন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

বাংলা ছবির উন্নতিই বাঙ্গালী দর্শকেরা কামনা করে।

তিপ্পান্ন

"বিহগের প্রেম ও তার কাহিনী"

ইউসুফ

প্রকৃতি, প্রণয় ও প্রাণ—এই ত্রয়ীর মিলনেই বিশ্বের ধারাবাহিক ক্রমঃবিকাশ। স্বর্গীয় শিল্পী বা যাকে আমরা সৃষ্টিকর্তা বলে অভিহিত করে থাকি তার সৃষ্টিনৈপুণ্যের ইহাই হয়তো আদিম রীতি। প্রেম, ভালবাসা, জীবনী-শক্তিতে সঞ্জীবিত বা প্রাণবন্ত করে তোলা, কোন কিছুরই একক জীবনে সম্ভব নয়,—জন্ম-জীবনের ধারাবাহিকতায় ক্রমশঃ ইহা গড়ে উঠেছে। বেচে থাকা অর্থই অপরকে ভালবাসা এবং অপর কিছু সৃষ্টি করা। সুতরাং জীবনের ক্রমঃবিকাশই প্রেম ইহাই আমার অভিমত।

প্রকৃতির দানে ফুলের মুখে সৌন্দর্য একে ওঠে, বিহগের কণ্ঠে সঙ্গীত ধ্বনিত হয়, প্রজাপতি স্বচ্ছন্দে ভেসে বেড়ায়। জন্তুর শারীরিক সামর্থ্য তাও তারা প্রকৃতির কাছ থেকে পেয়ে থাকে। কিন্তু সর্বোপরি সবার মাঝে প্রকৃতি বিলিয়ে দেয় তার অফুরন্ত আনন্দ, এবং এই আনন্দ বিতরণেই সমস্ত বিশ্বে সে সৃষ্টি-লালসাকে জাগিয়ে তোলে। প্রেম ও সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে প্রকৃতির নিয়মশৃঙ্খলায় কোন কিছুরই কোন প্রকার অস্তিত্ব নেই। "সৃষ্টি কর অথবা ধ্বংসের মাঝে বিলুপ্ত হও",—ইহাই প্রকৃতির মূল সূত্র। কেবলমাত্র জড় প্রকৃতির মাঝেই নয়, মানবের নৈতিক জীবনেও প্রকৃতির এই প্রথম অনুশাসন সমভাবে প্রযোজ্য। সৃষ্টিকর, তোমার প্রতিবেশী বা পারিপার্শ্বিকের পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠো—অথবা বিলুপ্ত হও, পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যাও—ইহাই যেন প্রকৃতির প্রথম অনুজ্ঞা।

অনাবিল আনন্দ-পরিপূর্ণ প্রকৃতির অনন্ত-সৌন্দর্য সম্ভারের প্রতি অবলোকন করলে স্বতঃই মনে হবে যে বৃক্ষলতা, জীবজন্তু, পশুপক্ষী ইহাদের মিলনোৎসবে সে যেন সর্বদাই সুসজ্জিত হয়ে রয়েছে। জল, স্থল, অন্তরীক্ষ সমস্তই যেন সর্বব্যাপী সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। বিশ্বের বুকে প্রণয়ের সুরভি নিঃশ্বাস, যেন নিত্য-প্রবহমান। মানুষ মানুষকে ভালবাসে, পশু পশুর দিকে ছুটে চলে, পাখীর গান পাখীকেই আকর্ষণ করে। সচেতন, অচেতন বা অবচেতন,—বিশ্বের প্রতি অণু-পরমাণুতে এই প্রেমের অভিযান চলেছে, তাই মনে হয়, এই প্রেম প্রীতি বা প্রণয়ের পরিচর্যাতেই আমাদের সত্যিকারের জীবন বিকশিত হয়ে থাকে। পাখীরাও ভালবাসে—তাদের প্রণয়ের তীব্রতাই বেশী করে আমাদের চোখে পরে। অরণ্য-নিকুঞ্জ থেকে তারা প্রেম ও আনন্দের গান গেয়ে ওঠে, তাদের সঙ্গীদের আহ্বান করে, তাদের বাসা নির্মাণ করে, এমন কি অনেক সময় প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রণয়-সংগ্রামে আহ্বান কর্তেও শঙ্কিত হয় না। অনেক পাখীকে দেখা যায় তারা প্রেম-অভিযান নিয়েই সর্বক্ষণ পরিব্যস্ত। স্বর্গের শুভাশীষ শক্তি ও সামর্থ্যানুযায়ী সমানুপাতে সকলের উপর বর্ষিত হয়ে থাকে, কিন্তু মনে হয়, ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ নিয়ে পাখীরা যেন পৃথিবীর বুকে দেখা দেয়। প্রণয় অভিযানের প্রথম নিদর্শনস্বরূপই যেন পাখীরা জন্ম নিয়েছিল এবং বিশ্বের আদিম আনন্দ, প্রথম কমনীয়তা প্রথম ছন্দ, এমন কি পৃথিবীর প্রথম সঙ্গীতও যেন এই পাখীর সঙ্গেই সৃষ্ট হয়েছিল।

ভগবানের রাজত্বে অসম্পূর্ণ বা অর্দ্ধসমাপ্ত কোন কিছু সৃষ্ট হয়নি। তাই তার বিশেষ প্রিয় এই পাখীকে তিনি অপার সৌন্দর্যে বিমণ্ডিত করে রেখেছেন। ময়ূর-ময়ূরী, রুবী, এমারেল্ড, টোপাজ প্রভৃতি অগণিত বিহগের বিচিত্র বর্ণ-বিন্যাস, তাদের সুমিষ্ট স্বরের অপূর্ব ঝঙ্কার, স্রষ্টার শিল্পমনের অনুগ্রহপ্রিয়তার পরিচায়ক। মানুষের পরেই পাখীরা তাদের সঙ্গীতের ছন্দে ভগবানের প্রশংসা কীর্তন কর্তে সক্ষম, এবং মানুষ বা পাখী উভয়েই এজন্য সন্তুষ্ট।

ভালবাসাকে যদি একটা বিলাস-ব্যসন বলেই গ্রহণ করা যায় তা'হলেও এর চরিতার্থতায় প্রথম প্রয়োজন—সুন্দর স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দ-মুক্তি। তাই হয়তো ভগবান একে মুক্ত আকাশের পথে সূর্যের সাথীর মত দেশ-দেশান্তরের স্বর্গীয় বসন্ত উপভোগের জন্য বাতাসের বুকে বিচরণের ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সামুদ্রিক (swallow) এবং ঘুঘুর দাম্পত্য জীবনের আনন্দ কাহিনী সর্বজন বিদিত,—হিমের শীতল স্পর্শও যেমন তাদের অজ্ঞাত; অন্তরের আনন্দ-হীনতাতেও তাবা তেমনি অনভিজ্ঞ।

বাস্তব বিচারে সাধারণ ভাবে শীতপ্রধান দেশের পাখীদের মাঝে একটি পুরুষ পাখীকে বহু পক্ষিণীর সাথে বিচরণ কর্তে দেখা যায়। কারণ অনুসন্ধানে বোঝা যায় শীতাধিক্যে তাদের প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা অত্যন্ত কম। এই প্রসঙ্গে হাস, রাজহংসী, প্লোভার, গ্যালিন্যাক প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যেতে পারে। আবার প্রতিপক্ষে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বিপরীত ভাবে পুরুষের আধিক্যই পরিদৃষ্ট হয়। অবশ্য ইহাও দেখা যায় যে ক্ষয় বা প্রয়োজনের সমতা রক্ষার জন্য শীতপ্রধান দেশের পুরুষের শারীরিক ক্ষমতা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পুরুষ পাখীর চাইতে অনেক বেশী।

বহু সঙ্গিনী নিয়ে যে পাখীরা বিচরণে অভ্যস্ত তারা .এ একটি বাসার গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকবে না ইহা স্বাভাবিক—এবং তারা তা থাকেও না। এমন কি শাবক প্রতিপালনের সময়েও গর্ভিণী পাখীর উপর আহার্য সংগ্রহ প্রভৃতি কার্যের দায়িত্ব ফেলে দিয়ে তারা স্বচ্ছন্দ মনে ...ত্র উড়ে বেড়াতে অভ্যস্ত। বিভক্ত ভালবাসার স্থায়িত্ব ...বং গভীরতা স্বল্পতর হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। অসহিষ্ণু ...ং অতি আগ্রহশীল পাখীর প্রসূতিআগারের বন্ধন থেকে ...দের সঙ্গিনীদের মুক্ত করে নেবার জন্য অনেক সময় ...দের ডিম্বগুলিকে চঞ্চুর আঘাতে ভেঙ্গে ফেলতেও কুণ্ঠা বোধ করে না। এতদ্ব্যতীত, এই পাখীদের প্রায়ই হিংসা-পরায়ণ এবং অত্যাচারী হতে দেখা যায়। শারীরিক সামর্থ্যের জোরে তারা তাদের সমস্ত সঙ্গিনীকে একত্রিত করে একই স্থানে আবদ্ধ রেখে, মোগল হারেমের ন্যায় তথায় তারা একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা কর্তেই ভালবাসে। যদি কখন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী এসে দেখা দেয় অমনি তাদের মাঝে কলহ এবং দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। মোরগ, ময়ূর, তিতির প্রভৃতি এই শ্রেণীর পাখীরা স্বভাবতঃই সাহসী এবং সর্বদাই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকে। এজন্য সৃষ্টিকর্তাও হয়তো তাদের দাত, নখ, ঠোঁট, থাবা ইত্যাদি প্রাকৃতিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করেই সৃষ্টি করে পাঠিয়ে থাকেন। কিন্তু পক্ষিণীর আধিক্য এবং প্রাধান্য যেথানে বেশী, পুরুষ পাখীরা সেখানে শান্ত এবং একজন সঙ্গীণী নিয়েই সন্তুষ্ট। তারা সঙ্গীণীকে বাসা তৈরী করে সাহায্য করে, আহার্য অন্বেষণে নিজেরাই উদ্যোগী হয়, সুখে-দুঃখে তাদের নিভৃত নীড়ে একান্ত বিশ্বস্ততায় সঙ্গীণীকে নিয়ে দিন কাটাতে চায়। অরণ্য-নিকুঞ্জের শান্ত আবহাওয়ায় সমস্ত বিপদ এড়িয়ে, মমতার বন্ধনে তাদের আনন্দ পরিবার ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। ঘুঘু, তোতা এবং ছোট ছোট সঙ্গীতপ্রিয় পাখীগুলিকে এই শ্রেণীর অন্তর্গত করা যেতে পারে। প্রতিপক্ষে অসহিষ্ণু ও অত্যাচারী পাখীরা তাদের গর্বিত মনোভাব নিয়ে প্রতি নিয়তই প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে সংগ্রামের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। উচ্চ চীৎকার, বিস্তৃত ডানা, বক্র গ্রীবা, স্ফীত পালক বা উচ্চ শিরে তারা প্রতিদ্বন্দ্বীকে এমন আঘাত করবে যে সে পলায়নে বাধ্য হবে। তারপর বিজয়ী সৈনিকের অহঙ্কৃত স্পর্দ্ধা নিয়ে তারা তাদের হারেমে (অন্তঃপুর) প্রবেশ করে যদৃচ্ছভাবে তাদের ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে চরিতার্থ করবার জন্য অথবা বিশ্বাস-হন্ত্রী বা বিদ্রোহী সঙ্গীণীকে শাস্তি দেবার জন্য।

আমি পূর্বেই বলেছি যে একক সঙ্গিনী নিয়ে যে

পাখীরা জীবন কাটাতে চায় সাধারণতঃ তারা শান্ত এবং মধুর, কিন্তু বহু সঙ্গিনী নিয়ে যে পাখীরা বিচরণ করে তারা স্বভাবতঃ অত্যাচারী এবং অসহিষ্ণু। অথচ মানুষের মাঝে আমরা এর বিপরীত মনোভাব দেখতে পাই।

সঙ্গীতে, সম্ভাষণে, অবয়বের মৃদু আন্দোলনে, চাপল্য চঞ্চলতার নম্র অভিব্যক্তিতে পুরুষ পাখীরা তাদের সঙ্গিনী-দের এমনভাবেই আকৃষ্ট করে তোলে যে প্রাতদানে তারাও তাদের সঙ্গীর সর্বপ্রকার আকাঙ্খায় তৃপ্তি এনে দেয়। কিন্তু বহু সঙ্গিনীর জন্য যে সকল পাখী ব্যগ্র তারা বুঝেও উঠতে পারে না যে প্রণয়ের এই ছোট ছোট সঙ্কোচ-সম্ভার এমন কি ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার চাইতেও তৃপ্তিপ্রদ।

বিহগের এই প্রণয় অভিযান, তাদের এই কাব্য কাহিনীকে উপলব্ধি কর্তে হলে দুই চারিটী বিশিষ্ট পক্ষীর প্রণয়-লালসা আমাদের বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সচরাচর যে সকল পক্ষী আমাদের চোখে পড়ে, তাদের মধ্যে চড়ুই পাখী, ভরত পাখী, কোকিল, দাঁড়কাক, ক্যানারি, ওরিয়ল প্রভৃতির জীবনযাত্রা প্রণালী পর্যালোচনা করলেই প্রত্যেক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্নতা আমাদের কাছে ধরা পড়বে। দীর্ঘচঞ্চুবিশিষ্ট পক্ষিগণের মধ্যে যেমন প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে বীরত্বের আস্ফালন প্রকাশ পায়, তেমনি যুক্তাঙ্গুলিবিশিষ্ট হাস, রাজহাস বা হংসীজাতীয় পাখীদের মাঝে আবার প্রণয়ের তীব্রতাই পরিদৃষ্ট হয় বেশী। আবার গৃহপালিত মোরগের মাঝে দেখা যায় একটি মোরগ বহুসংখ্যক কুক্কুটি নিয়ে শান্ত আনন্দে দিনাতিপাত কচ্ছে। এইরূপে কুক্কুটির ভীরুতা, গ্রাউসের (Grouse) উৎফুল্লতা, কোয়েল ও তিতিরের অভিনয়, ঘুঘু ও পারাবতের স্নেহ সম্ভাষণ, প্রত্যেকটি বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় আমাদের বিস্মিত করে সন্দেহ নেই। স্থানাভাববশতঃ প্রত্যেক বিভিন্ন শ্রেণীর প্রণয় প্রক্রিয়া আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়, তাই কেবলমাত্র কয়েকটি বিশিষ্ট পাখীর কার্যপদ্ধতি বিশ্লেষণ করেই আমি আমার এই প্রসঙ্গ শেষ করবো।

(ক্রমশঃ)

দুর্গাদাস

স্মৃতি-তর্পণ

রূপ-মঞ্চের ক্রোড়পত্র

গত আষাঢ় সংখ্যার রূপমঞ্চ বাংলার অপরাজেয় অভিনেতা দুর্গাদাসের বিয়োগ ব্যাথার কথা নিয়ে আত্ম-প্রকাশ করে। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী—নাট্যকার মন্মথ রায়—অখিল নিয়োগী—সুধীরেন্দ্র সান্যাল—গীতকার শৈলেন রায়—উক্ত সংখ্যায় শিল্পীর স্মৃতি তর্পণ করেন। এ ছাড়া দুর্গাদাসের নিজের একটা লেখাও প্রকাশ করা হয়। শিল্পীর বিভিন্ন প্রতিকৃতি নানাদিক দিয়ে—উক্ত সংখ্যার সৌষ্টব বৃদ্ধি করেছিল। আষাঢ় সংখ্যাটী আত্ম-প্রকাশ করবার এক সপ্তাহ মধ্যেই সমস্ত কাগজ নিঃশেষ হ'য়ে যায়। তারপর বহু পাঠকদের কাছ থেকে অনুরোধ আসা সত্বেও আমরা দুর্গাদাস সংখ্যা দিতে পারিনি। সম্প্রতি অগণিত পাঠকদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হ'য়ে—এই সংখ্যাটীকে রূপ-মঞ্চের ক্রোড়পত্র করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করবার জন্য তৈরী হচ্ছি। এ বিষয়ে শিল্পীর সুযোগ্য দুই পুত্র আমাদের নানাদিক দিয়ে সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দুর্গাদাসের বহু অনুরাগী দর্শক আছেন।—বন্ধু বান্ধবও যথেষ্ট রয়েছেন—আমাদের এই প্রচেষ্টাকে জয়যুক্ত করে তুলতে তা'দের সবার কাছে আবে-দন করছি দুর্গাদাস সম্পর্কে—যে যা জানেন—আর যার যা বলবার আছে—৩১শে ডিসেম্বরের ভিতর ৭৪।১, আমহার্স্ট ষ্ট্রীটে অথবা ৩০ নম্বর গ্রে ষ্ট্রীটে রূপ-মঞ্চ কার্যালয়ে যেন পাঠিয়ে দেন।

বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পীর এই স্মৃতি তর্পণে আশা করি সকলেই যোগ দেবেন।

বিনীত :—সম্পাদক রূপমঞ্চ

পোষ্যপুত্র ও শিশির কুমার

শোনা যাচ্ছে পরিচালক সতীশ দাশগুপ্ত নাকি আহার নিদ্রা ত্যাগ কোরেছেন। কর্তারা বলেছেন, বড়দিনের আগেই "পোষ্যপুত্র" মুক্তি পাবে—সুতরাং সময় আর কই। হ্যাঁ, তবে ভয় পাবার কিছুই নেই ছবির চোদ্দ আনা প্রায় শেষ হ'য়ে গেছে—বাকী দু' আনা তার ভেতরও হাঙ্গামের কিছু নেই—মুরুব্বি আর্টিষ্ট যারা যেমন শিশির কুমার, শৈলেন, প্রমোদ, বিমান, সন্তোষ রেণুকা, সাবিত্রী, প্রভা এদের অংশ প্রায় শেষ হ'য়ে গেছে। বিশেষতঃ শ্যামাকান্ত-রূপে শিশির কুমারের কাজ আর কিছুই বাকী নেই। এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, একদিন ইতিমধ্যে আমরা শিশির কুমারের অভিনয় দেখ্তে যাই, শিশির কুমারকে দেখ্লুম উৎসাহ ও উদ্দীপনায় দীপ্ত—অভিনয়াংশ-কে প্রাণবন্ত কোরে তুল্বার জন্য তার ভেতর দেখ্লুম নতুন পেরণা। শুধু তাই নয়, খবর নিয়ে শুধু এই দিনই নয়, যেদিন তার শূটিং থাকে তাকে এই মুডেই দেখা যায়। তাকে এই ভূমিকা যখন বণ্টন করা হয়, তখন অনেকেই বেশ ভীত হ'য়ে পড়েছিলেন—এবং কাগজে কলমেও রীতিমত টীকা-টিপ্পনী চলেছিল; কিন্তু শিশির কুমার সকলকে এবার ঠকিয়েছেন। এই দিনকার শূটিংয়ে কথা প্রসঙ্গে শিশির কুমার সতীশবাবুকে বল্ছিলেন—"জান, সতীশ, শ্যামাকান্তকে আমি বড় ভালবাসি, এই চরিত্রের স্নেহ-মমতা ও কঠোরতা আমাকে মুগ্ধ করে। সেইজন্যই যেদিন তুমি আমার কাছে গেলে এই চরিত্রে অভিনয় কর্বার প্রস্তাব নিয়ে—আমি তোমাকে ফেরাতে পার্লুম না। সিনেমায় হয়তো এই আমার শেষ অভিনয়। সেই জন্যই আজ এই চরিত্রকে জীবন্ত কোরে গড়ে তুল্বার জন্য আজ আমি সচেষ্ট। ফলাফল শ্রীভগবানের হাতে।"

আমরাও আশা করি সতীশ বাবু শিশিরকুমারের মর্যাদা রাখতে সমর্থ হবেন।

ছবিখানি আগামী বড়দিনের পূর্বে 'মিনার', 'বিজলী', 'ছবিঘরে' মুক্তিলাভ কোর্বে।

"তাসের দেশ" অভিনয়

শ্রীমতী পার্বতী দেবীর প্রয়োজনায় এবং শান্তিদেব ঘোষের পরিচালনায় শীঘ্রই কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্র নাথের 'তাসের দেশ' নামক নাটনটি অভিনীত হবে। এই অভিনয়ে যাঁরা অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের মধ্যে দক্ষিণী নৃত্যশিল্পী কুমারী সরস্বতী শাস্ত্রী এবং কুমারী দীপ্তি সান্যালের নাম উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণী নৃত্যবিশারদ কেলু নায়ার নৃত্য গীতানুষ্ঠানের একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। ইনি শান্তি নিকেতনের ভূতপূর্ব নৃত্য শিক্ষক এবং ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের একাধিক নৃত্যনাট্যে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

শেষরক্ষা:—পরিণীতা-খ্যাত পরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায় শেষ রক্ষার কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাহিনী—অনাদি দস্তিদার ও দক্ষিণা ঠাকুরের সুর-শিক্ষিতা নায়িকার নূতন মুখ—তাছাড়া প্রযোজনায় রয়েছেন শাসমল পরিবারের শ্রীযুক্তা প্রতিভা শাসমল। সম্ভবতঃ তিনিই সর্বপ্রথম বাঙ্গালী মহিলা যিনি চিত্র-ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেছেন—তাই হয়ত শেষ রক্ষার বিষয় দর্শক সাধারণের কাছ থেকে অজস্র প্রশ্ন এসে আমা-দের অস্থির করে তুলেছে—অথচ 'দ্রুত চলিতেছে' 'অগ্রসর হচ্ছেন' এই সব মামুলী উত্তর ছাড়া আর কিছুই আমাদের তহবিলে নেই। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের ছাত্রজীবনের

অনেকাংশ কেটেছে শান্তিনিকেতনে—কবিগুরুর সান্নিধ্যও তিনি পেয়েছেন। শেষরক্ষার রূপ দিতে এই সান্নিদ্ধ তাকে সাহায্য করবে বলেই বিশ্বাস রাখি।

বিদেশিনী ঃ—পরিচালক প্রেমেন্দ্র মিত্র তার আগামী ছবি বিদেশিনীর প্রাথমিক কাজ শেষ করে ফেলেছেন। প্রেমেন্দ্রবাবুর এই চিত্রে নায়ক নায়িকারূপে আত্মপ্রকাশ করবেন কাননদেবী ও ধীরাজ ভট্টাচার্য। বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্রবাবুর যেমনি নাম—চিত্রজগতে কাননদেবীরও তার চেয়ে কম সুনাম নয়—প্রেমেন্দ্রবাবুর হাতে কানন দেবী অথবা কাননদেবীকে পেয়ে প্রেমেন্দ্রবাবু—দর্শকদের অন্তরে কতখানি স্থান অধিকার করে বসতে সক্ষম হবেন সেই অগ্নিপরীক্ষার দিনের জন্য আমরা উৎসুক মন নিয়ে অপেক্ষা করবো। বিদেশিনীর সুর-সংযোজনার ভার পড়েছে শ্রীযুক্ত কমল দাশগুপ্তের ওপর।

পূর্বাচল ঃ—নিউ থিয়েটার্সের খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত বিমল রায় তাঁর চিত্রের নামকরণ করেছেন পূর্বাচল। শ্রীযুক্ত রায়ের পরিচালক জীবনের যাত্রাপথে আমরা অভি-নন্দন জানাচ্ছি। আশা করি চিত্রশিল্পীরূপে তিনি আমাদের কাছ থেকে যে শ্রদ্ধা লাভ করেছেন পরিচালক জীবনেও তা থেকে বঞ্চিত হবেন না।

দুই পুরুষ ঃ—উপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্চ-সাফল্য নাটক দুই পুরুষের কাজ নিয়ে শ্রীযুক্ত সুবোধ মিত্র খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। দুই পুরুষের বিভিন্নাংশে আত্মপ্রকাশ করবেন অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, চন্দ্রাবতী, লতিকা ব্যানার্জি প্রভৃতি। তারাশঙ্কর বাবুর দুই পুরুষ যেমনি মঞ্চে যথাযথ রূপ পেয়েছিল—আশা করি সুবোধ মিত্রের হাতে চিত্রেও তার মর্যাদা হানি হবে না।

চাঁদের কলঙ্ক ঃ—শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া প্রযোজিত পরিচালিত বড়ুয়া প্রডাকসন্সের চাঁদের কলঙ্ক শেষ হবার পথে। চাঁদের কলঙ্কের সুর দিচ্ছেন সুবল দাশগুপ্ত। ইতিপূর্বে আলেয়া, নীলাঙ্গুরীয় ও দেবরে সুর দিয়ে সুবল বাবু দর্শকদের কাছ থেকে যে অভিনন্দন পেয়েছেন চাঁদের কলঙ্ক তাকে ম্লান করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। বড়ুয়ার চিত্রে সুরশিল্পীরূপে সুবল বাবুকে এই প্রথম দেখতে পাবো।

শহর থেকে দূরে ঃ—ইষ্টার্ণ টকীজ প্রযোজিত শৈলজানন্দ পরিচালিত 'শহর থেকে দূরে' আগামী বড় দিনেই সম্ভবতঃ শহরে আত্মপ্রকাশ করবে। সাহিত্যজগতে যেমনি শৈলজানন্দ সুনাম অর্জন করেছেন—চিত্র জগতেও পরিচালকরূপে তাঁর সুনাম কোন অংশে ব্যহত হয়নি। আমাদের চিত্রজগতের ধুরন্ধর পরিচালকদের তুলনায় 'শৈলজানন্দ' নিজের স্থান একটু উচুতেই বেছে নিয়েছেন। নিছক আনন্দ দান এবং গল্পকে সেলুলয়েডের ফিতের মারফতে কিরূপভাবে সহজে প্রাণস্পর্শী করে তোলা যায় শৈলজানন্দ তাঁর পরিচালক জীবনে সেটুকু প্রমাণ করতে পেরেছেন। জনপ্রিয় অভিনেতা জহর গঙ্গোপাধ্যায়কে নূতন করে সৃষ্টি করবার মূলেও শৈলজানন্দকেই আমরা দেখতে পাই। তার 'শহর থেকে দূরে'র বিভিন্নাংশে অভিনয় কচ্ছেন জহর, নরেশ মিত্র, ফণী রায়, রেনুকা, মলিনা প্রভৃতি। আশা করি 'শহর থেকে দূরে' শহরের এবং শহর থেকে দূরের সর্বশ্রেণীর দর্শকদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হবে।

ভারতীয় ষ্টুডিয়োতে আমেরিকান সৈনিকদল ঃ প্রভাতের চিত্রগ্রহণ-পদ্ধতি পরির্শন

(ইণ্ডিয়ান-টি-মার্কেট এক্‌স্‌প্যানসান বোর্ডের নিজস্ব প্রতিনিধির ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে)

"আমেরিকান ফিল্ড এম্বুল্যান্স ইউনিটের কয়েকজন অফিসারের নিকট থেকে আমন্ত্রণ এসেছিল। সামাজিক

আমন্ত্রণে যেমন আমাদের যেতে হয় তেমনি ভাবেই আমাকে পুণায় যেতে হয়েছিল। যুক্তরাজ্যের বিশিষ্ট স্কুল কলেজে যে সকল ছাত্রেরা স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের অংশটুকু গ্রহণ করবার জন্য পরিপূর্ণ উৎসাহ নিয়ে ছুটে এসেছে, তাদের মাঝে যে সময়টা আমার কেটে গেছে আমি তার উল্লেখ না করে পাচ্ছি না। পুনার নৈশ ক্লাবে নৃত্যের অনুষ্ঠান, ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া টার্ফ ক্লাবে পরিপূর্ণ আহারের আয়োজন, চায়নিজ রেস্তোরায় চীনদেশীয় খাবারের ব্যবস্থা, ঘোড়-দৌড়,—এ সমস্তই যেন আমার কাছে জীবনের একটা উদ্দীপনাময়ী পরিচ্ছেদ বলে মনে হচ্ছে।

তাঁরা আমাকে প্রশ্ন করলেন,—সামাজিক জীবনের বাইরে আর কি এখানে থাকতে পারে? আমি তাদের প্রভাত ফিল্ম কোম্পানীর ষ্টুডিও পরিদর্শনের কথা বল্‌তেই তাঁরা স্কুল বালকের ন্যায় উল্লসিত হয়ে উঠ্‌লেন। আনন্দের কথা এই, প্রভাতের অন্যতম কর্তৃপক্ষ মিঃ বাবুরাই পাই সপ্তাহ শেষে তখন পুণাতেই ছিলেন, এবং তার কাছে এই প্রস্তাব জানাতেই পরম আতিথ্যের সাথেই তিনি আমাদের গ্রহণ করলেন। সেটের অভ্যন্তরেই আমাদের চা পানে আপ্যায়িত করা হলো, কোম্পানীর শিল্পী এবং কর্মচারীদিগের জন্য এখান হতে নিয়মিতরূপে চা সরবরাহ করা হয়।

আমাদের দলে যারা ছিলো তন্মধ্যে রিচার্ড ল্যাথাম, জন ফার্ণলে, কাপ্টেন জন, পেম্বারটন এবং লেফটন্যাণ্ট জন প্যাট্রিকের নাম উল্লেখযোগ্য। লেফ্‌টন্যাণ্ট প্যাট্রিক ছিলেন হলিউডের অন্যতম নাট্যকার ও সংলাপলেখক, আমাদের দলে তাঁর উৎসাহ ও আনন্দই যেন সবচেয়ে বেশী ছিল।

দুর্ভাগ্যবশতঃ সেদিন সুটীং বন্ধ ছিল, তাই বাধ্য হয়ে সেদিন আমাদের ২০০ বৎসর পূর্বেকার মারাঠী যুগের একটা ছবির কিয়দংশ দেখ্‌তে হলো। ছবিটীর নাম 'রামশাস্ত্রী' এবং এতে অভিনয়ে নায়িকার ভূমিকায় নেমেছেন, ভারতীয় শার্লি টেম্পল,—বেবী শকুন্তলা। এর বয়স মাত্র নয় বৎসর।

অনন্তীর স্ত্রী সঙ্গিনীরূপে ক্ষুদ্র বালিকা বেবী শকুন্তলার অভিনয়ে উপস্থিত আমেরিকানগণ প্রত্যেকেই বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন।—কৃষক পল্লীর সম্মুখে বৎস-প্রযুক্তা গাভীর বিচরণ ভূমির মাঝখানে রঙিন শাড়ী পরিহিতা শকুন্তলাকে সত্যই তখন অপরূপ মনে হচ্ছিল। তার ভ্রমর নিন্দিত কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ, তার শুভ্র পুষ্পালঙ্কার তাকে আরও মহিমান্বিতা করে তুলছিল। তারপর প্রদীপ্ত আলোকমালা হাতে সে যখন দেবার্চনায় রত হলো সকলেই তাকে উচ্ছ্বসিত ভাবে প্রশংসা করে উঠেছিল।

উপরের দৃশ্যটি শেষ হবার পর সৈনিকেরা সেটের উপরে যেয়ে শিল্পীদের সঙ্গে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় তাদের নিজেদের ছবি তুল্‌তে এসে দাঁড়ালেন। সকলেই সবচেয়ে বেশী আনন্দ অনুভব করেছিলেন যখন জন প্যাট্রিক তাঁর সামরিক টুপিটা জনৈক কৌতুক অভিনেতার পুরান মারাঠী কালের অদ্ভুত আকৃতির শিরস্ত্রাণের সাথে পরিবর্তন করে ফেললেন। উপস্থিত শিল্পী এবং দর্শকবৃন্দ একেও একটী কৌতুক অভিনয় বলে মনে করেছিল, কেন না ক্যামেরার দিকে চেয়ে প্যাট্রিক যে ভাবে হেসেছিলেন তাতে অন্য ধারণা হওয়া সম্ভব নয়।

আমি বলতে ভুলেছি যে, সেটে প্রবেশ করবার পূর্বে ষ্টুডিওর চারিদিকে লেবরেটরী, মডেল ঘর, মোল্ডিং রুম, এমন কি প্রভাতের আগামী আকর্ষণীয় চিত্র "ওমর খৈয়ামের" পরিকল্পনা কুটীরও আমাদের দেখান হয়েছিল। তন্মধ্যে প্রভাতের সজ্জা-গৃহ দেখে এই সৈনিকদল সবচেয়ে বেশী বিস্মিত হয়েছেন। ভারতের রাজা-রাণীর মহার্ঘ পরিচ্ছদের বিচিত্র বর্ণ-বিন্যাস তাঁরা অপলক নয়নে উপভোগ করেছেন। তাদের তীর, বল্লম, বর্শা, তরবারী প্রভৃতি সমরাস্ত্রও এদের চমৎকৃত করেছে। হলিউডের প্রত্যেকটী

ষ্টুডিও লেঃ প্যাট্রিকের দেখা আছে,—তিনি দৃঢ়তার সাথেই মন্তব্য করলেন যে চিত্র-জগতে ভারতবর্ষ শীঘ্রই তার প্রতিষ্ঠা অর্জন করবে।

প্রচার সচিবের গৃহে যেয়ে তাঁরা আরও আশ্চর্য হলেন যে নিউইয়র্কের কার্ণেগি থিয়েটারে প্রভাতেরই একখানি ভারতীয় ছবি কয়েক মাস হলো দেখান হচ্ছে। ছবিখানি অবশ্য পরীক্ষামূলক ভাবেই পাঠান হয়েছে, এবং ভারতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় ছবির মারফতে আমেরিকায় প্রচার করা কার্যকরী হবে কি না তা এই ছবিটীর কৃতকার্যতা থেকেই বোঝা যাবে।

পুস্তক পরিচয়

মিছিল

শ্রীঅনিলকুমার সিংহ।

ইণ্টার ন্যাশন্যাল পাবলিসিটি, ৮৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিঃ। দাম এক টাকা চার আনা।

'সোভিয়েট নারী' নামক বইখানা লিখে অনিলকুমার সিংহ ইতিমধ্যে পাঠক সমাজে পরিচিত হয়েছেন। ঐ বইখানা ছাড়াও বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় তিনি লিখতে অভ্যস্ত। তাঁর লেখার যে গুণটি পাঠক মনকে সব চেয়ে বেশী করে, তা হচ্ছে তাঁর ভাষা। এই প্রাঞ্জল ভাষায় তি বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজের আলেখ্য আঁকবার চে করেছেন। সর্ব্বত্র যে সফল হয়েছেন, তা নয়; তবু খানি সুখপাঠ্য হয়েছে। 'মিছিল', 'ফসল', 'ঐরাব 'কাহিনী', 'পরিখা', 'নিরিবিলি', 'নির্ম্মোক' ও 'সংকে এই আটটা গল্প নিয়ে বইখানি সঙ্কলিত হয়েছে। আলো গল্পগুলোর মধ্যে 'কাহিনী' গল্পটা ভাল লাগল। কয়েক গল্পতে লেখক অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির সীমা লঙ্ঘন করেছে কলেবর অনুসারে মূল্যটা কিছু বেশী।

অধিনায়ক

শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত। দাম এক টাকা

আলোচ্য বইখানা একটি ছোট নাটিকা। লেখক মু বন্ধে একে symbolical ব'লে বর্ণনা করবার চে করেছেন। তা হ'লেও এই বইখানাকে অন্য পর্য্যায়ে ফেল আটকায় না। বইখানা পড়তে নেহাৎ মন্দ লাগে না

সতীশ দাশগুপ্ত পরিচালিত
"পোষ্যপুত্রে"
শিশির কুমার

শ্রীমতী সরস্বতী শাস্ত্রী

মরমী কবির মনের অসীম বেদনার প্রকাশই হোলো তাঁর গান। সুতরাং তাঁর সঙ্গীতলোক ও সঙ্গীত জীবন—আমাদের সাধারণের সঙ্গীতজীবন থেকে অনেক ভিন্ন ছিল। এবং এ গানে সংস্কৃতিবান মনে যে রস সৃষ্টি করে তার স্থান ও খুব উচুতে। তাই এ গানের রস গ্রহণ করতে হলে আমাদের সকলকেই সেই স্তরে ওঠবার চেষ্টা করা এবং তার পরে সেই রস-লোকে ডুব দেওয়া উচিৎ। কোন বড় শিল্প কোন দিনই জনসাধারণের মনের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সৃষ্টি হয় না। বরং জনসাধারণকে নিজেদের সৃষ্টির প্রভাবে নিজের পথে চালিত করে, কিম্বা জনসাধরণই আকৃষ্ট হয়ে সে পথে এগিয়ে চল্‌তে চেষ্টা করে। ধর্মে-জ্ঞানে-শিল্পে, সবদিক থেকেই আমরা এই কারণে, স্রষ্টাদের যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষরূপে পূজা করি। এই হোচ্ছে প্রকৃত স্রষ্টার সঙ্গে তাঁর চারিদিকের মানুষের সম্বন্ধের স্বরূপ।

চলচ্চিত্রের পরিচালকরা গুরুদেবের গানের ব্যবহার দ্বারা কি ভাবে সমাজের উন্নততর রস বোধের সর্বনাশ করছেন এখন হয়তো সহজে বুঝতে পারা যাবে। চলচ্চিত্রে গানগুলিকে গল্পের এমন আবেষ্টনের মধ্যে সাজানো হচ্ছে—যে আবেষ্টন আমাদের সাধারণ মানুষের খুবই পরিচিত।

উদাহরণ স্বরূপ দু'একটি গানের কথা উল্লেখ করি। "বসন্ত" গীত-নাট্যের "তোমার বাস কোথা যে পথিক ও সে দেশে কি বিদেশে" গানটি কোন এক বাংলা চলচ্চিত্রে দেখা গিয়েছিল এমন এক নোংরা আবহাওয়ার মধ্যে যা চলচ্চিত্রে ব্যবহারের পূর্বে গানটির যে এইরূপ ব্যাখ্যা দাড়াতে পারে কেউ কখনো ভাবতে পারেনি। "আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে" গানটির সময় দেখ্‌লাম আধুনিক নব বিবাহিত তরুণ যখন অত্যাধুনিক প্রসাধনের সরঞ্জাম সহ বিরাট আয়নার সামনে প্রসাধনে মগ্ন, তখন তরুণী একটি পশমের গলাবন্ধ বা চাদর তাঁর গলায় জড়িয়ে দিচ্ছে ও নানা প্রকারে তাকে এই গানে সোহাগ জানাচ্ছে। প্রেমিকের ছবির দিকে তাকিয়ে পরকিয়া প্রেমে মগ্ন আধুনিক নায়িকা গাইছেন "আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে দোলাও"।

এই তিনটি গানই রচিত রচয়িতার মনের সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমে উপলব্ধি থেকে। প্রথম দুটি হোলো দুটি ঋতুর, পরেরটি রচিত কোন এক উপাসনার দিনের জন্যে। গুরুদেবের মনে ঋতু যে আনন্দের উৎস জাগিয়েছিল—বা তিনি মনকে যে লোকে নিয়ে গিয়ে সংসারের সব আবর্জনাকে ভুল্‌তে চেয়েছিলেন। সেই উপলব্ধিতে আমরাও যাতে পৌছুতে পারি সেই চেষ্টাই কি আমাদের করা উচিৎ নয়? গুরুদেব তাঁর গানে, সাহিত্যে আমাদের সামনে মার্জিত রসবোধের যে একটি স্তর এঁকে দিয়ে গেছেন আমরা কি চেষ্টা করবো না সেই স্তরে মনকে নিয়ে যেতে? কিন্তু চলচ্চিত্রের পরিচালকরা তা না করে গুরুদেবের রচনাকে নিজেদের নিম্নস্তরের রুচিতে সাজিয়ে জনসাধারণের কাছে ব্যাখ্যা করছেন। সাধারণ জনগণ তাদের সহজ, অমার্জিত রুচির সঙ্গে সহজে মিলিয়ে নিতে পারলো—এবং সেই কারণেই গুরুদেবের গানগুলি আজ তাদের কাছে এত ছড়িয়ে গেল।

এর দ্বারা কি দেখ্‌লাম। প্রথম দেখ্‌লাম গুরুদেবের জীবনের একটি বিকৃত পরিচয় তারা ফোটালো—কারণ ঠিক কি রকম প্রাণের আবেগ থেকে এ গান উঠতে পারে সাধারণ শ্রোতা তার কিছুই বুঝলো না—এবং যে তিমিরে এনে ছিলো সে তিমিরেই তারা রয়ে গেল। গুরুদেবকে ও তাঁর রচনাকে যত ছোট না করছি কিন্তু তার চেয়েও বড় সর্বনাশ করছি আমাদের দেশের। একটা জাতের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির একটি অবলম্বনকে উল্টো ভাবে প্রকাশ করার দরুণ আমাদের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে একথা

প্রত্যেকেরই বোঝা উচিৎ — বিশেষত চলচ্চিত্রের পরিচালকদের। পরিচালকদের উচিৎ গানগুলির যদি ব্যবহার করতেই হয়, তবে সেই সুরের আবেষ্টনের মধ্যে তাকে সাজাতে হবে, গল্পও খাড়া করা উচিৎ সেই ভাবের। এই পথে চললে পরিচালকরা দেশের ও দশের যে কতখানি উপকার করতে পারেন তা বলা যায় না।

জনপ্রিয়তার সঙ্গে তাল রেখে যে শিল্পী চলবে সে কোনদিনই উচ্চ শ্রেণীর শিল্পী বলে পরিগণিত হতে পারে না। চলচ্চিত্রে বাংলা দেশের পরিচালকদের মধ্যে অনেকেই বড় শিল্পী বলে পরিগণিত হয়েছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে সব পরিচালক এই ভাবে জনচিত্তকে অন্ধকারে রাখবার সহায়তা করছেন তাঁদের সত্যিই বড় শিল্পী বলতে পারি কিনা।

শুনেছি গুরুদেবের বিখ্যাত ধর্ম-সঙ্গীত "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা" ও "সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি" গান এক সময় কলকাতার কোন এক বারবণিতা পাড়ায় খুবই চলিত ছিল। তারা একাজ করতে পারে, - কিন্তু এর দ্বারা কি আমরা গর্ব অনুভব করবো?

আজ এই কথা বলেই আমি শেষ করবো যে—আমরা যেন সহজ লভ্য মনোরঞ্জনের আদর্শে কখনো অনুপ্রাণিত না হই। চিত্র পরিচালকরা সকলেই শিক্ষিত—তাঁদের সামনে এই চিন্তাই থাকা উচিৎ যে দেশের চিত্তকে উন্নততর লোকে ওঠাতে হবে তাদের সৃষ্ট চলচ্চিত্রের দ্বারা। কেবল কতগুলি অনাবশ্যক, অসত্য ও নোংরা আনন্দের পরিবেশন করার দ্বারা কোন দিক থেকে কোন উপকার দেশের বা দশের তাঁরা করছেন না। আমাদের দেশের যুবসমাজের মেরুদণ্ডহীনতার যতগুলি কারণ আজ আমরা দেখছি—তার মধ্যে চলচ্চিত্রের পরিচালকদের মেরুদণ্ডহীন দুর্বল পরিচালনাই একটি মস্ত বড় কারণ!

মিনার্ভা মুভিটোনের
গৌরবোজ্জ্বল প্রায়ৈতিহাসিক
চিত্র-অবদান

পৃথ্বী-বল্লভ

প্রাচীন ভারতের
শৌর্যমহিমা ও
বার্যগরিমায় অবি-
স্মরণীয় চিত্র-রূপায়ণ

পৃথ্বী-বল্লভ

পরিচালনা :
সোরাব মোদী

কাহিনী :
কে, এম, মুন্সী

শ্রেষ্ঠাংশে :
**সোরাব মোদী,
দুর্গা খোটে,
শঙ্কঠপ্রসাদ,
মীনা ও কজ্জন**

চিত্র-নাট্য :
সুদর্শন

দৃশ্যসজ্জা
রুসি ব্যাঙ্কার

— একযোগে চলিতেছে —

মিনার্ভা

— একযোগে চলিতেছে —

ছায়া

**এম্পায়ার টকির
পরিবেষণা-তালিকায়**
আগামী চিত্র-আকর্ষণ।

ভক্ত রায়দাস

মিনার্ভা মুভিটোন-কৃত
মহান ভক্তিরসাত্মক চিত্র

ভক্ত রায়দাস

পরিচালনা :
কে ধাইবার

শ্রেষ্ঠাংশে :
**ললিতা পাওয়ার, অনন্ত
মারাঠে ও পরেশ বন্দ্যোঃ**

কলিকাতার রঙ্গালয়

সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

পুজা-সংখ্যা রূপমঞ্চে বাঙলা রঙ্গমঞ্চের জন্য সম্প্রতি যাঁরা নাটক লিখছেন বা লিখেছেন, তাঁদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছিলাম। এ বিষয়ে আরো বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে—এবং তার অবকাশও আছে—পরে সে বিষয় আবার আলোচনা করা যাবে। বর্ত্তমান সংখ্যায় আমি আলোচনা করব—বাঙলার অর্থাৎ কলিকাতার রঙ্গালয় নিয়ে। কোন রঙ্গালয়ের সঙ্গে আমার কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক নেই বলে পক্ষপাতশূন্য হয়ে আমার পক্ষে আলোচনা করা যে সহজ একথা বলাই বাহুল্য।

সব রঙ্গালয়গুলির মধ্যে একটি বিষয়ে যে সম্পূর্ণ ঐক্য আছে এ আমরা বেশ স্পষ্ট দেখতে পাই। সেটা হচ্ছে তাদের বাহিরের জগত থেকে সম্পর্কহীন হয়ে থাকবার সমবেত চেষ্টা।

একদা আমাদের দেশে রঙ্গালয়ে গিয়ে আমরা আমোদ-আহ্লাদ করতাম, চিত্তবিনোদনের খোরাকের আশায় সেখানে গিয়ে রাত্রি জাগরণে অভিনয় দেখে সকালে গঙ্গাস্নান এবং কালীঘাট সেরে বাড়ী ফিরতাম, এ বিষয়ে আমাদের উৎসাহের অন্ত ছিল না কিন্তু তখন রঙ্গালয়কে আমরা জাতে তুলতে পারি নি,—রঙ্গালয়ের নট-নটীদের প্রতি বিস্মিত প্রেক্ষণে তাকিয়ে আমাদের যে সাধ মিটত না সে শুধু সেই প্রেক্ষাগৃহের অভ্যন্তরেই—অর্থাৎ রঙ্গালয়ের সঙ্গে সাধারণ লোকের সম্পর্ক তখন এতটাই বিচ্ছিন্ন ছিল—যে তাতে রঙ্গালয় থেকে সামাজিক জীবনটা প্রায় নির্ব্বাসিতই হয়ে পড়েছিল। নটীদের মধ্যে কারো কখনো তাদের নিজের সীমাবদ্ধ সমাজ ছাড়া; সাধারণ সমাজে প্রবেশ করবার বা তার সঙ্গে কোন প্রকার ব্যবহারিক সম্পর্ক স্থাপন করবার দুরাশা বা উচ্চাশা ছিল কি না তা আমরা জানি না—তবে ছিল না বলেই আমাদের বিশ্বাস, এ ক্ষেত্রে—, নটদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। তাঁরা ছিলেন আমাদের মতই আমাদের সমাজের শিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত মানুষ। সভ্য—এবং ভদ্র সমাজে তাঁদের "হুঁকা" চললেও—তাঁদের জীবনের চারিদিকে এমনি একটি গণ্ডী তাঁরা নিজেরা টেনে রেখেছিলেন সেখানে তাঁরা একপ্রকার আত্মকেন্দ্রী হয়েই পড়েছিলেন। সমাজ তাঁদের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে নানাপ্রকার অনুমান, অনুসন্ধান, গবেষণা ও বিচার করে মনে মনে তাঁদেরকে অনেকটা সরিয়ে দিলেও, তাঁরা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনধারণ পদ্ধতির ফলে আপনা হতেই যেন আত্ম নির্ব্বাসিত হয়ে পড়েছিলেন। এর মধ্যে অবশ্য তৎকালীন সময়ের দায়িত্ব ছিল। একান্ত নিকট বন্ধু, প্রত্যাশী বা অবশ্য পালনীয় আত্মীয় এবং রঙ্গালয়ের বন্ধু-বান্ধব ছাড়া সমাজের সাধারণ লোকের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল খুব কম। কাজেই নটীদের আরো অন্ধকারে ঠেলে ফেলে রাখার জন্য যেমন তথাকথিত সামাজিক নীতি দায়ী ছিল বা এখনো আছে, তেমনি নটদের আত্মনির্ব্বাসনের জন্য দায়ী ছিলেন বা এখনো আছেন তাঁরা নিজে। এর মূল কারণ হচ্ছে তাদের আত্মপ্রত্যয়হীনতা;—নিজের ব্যক্তিত্ব যে নট বা নটী রঙ্গমঞ্চেও বিকশিত করে তুললে, আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলে—বাহিরের সমাজে তারা যে হয়ে রইল "অপাঙক্তেয়" একথা তারা কোনোদিন ভাবলে না বা নিজেদের ব্যক্তিত্বকে সেখানে তারা স্বীকার করিয়ে নিতে ভরসাও পেলে না—আমাদের বাঙালী জীবনে এর চেয়ে বড় শোচনীয় ঘটনা আর কি হবে?

এই সামাজিক বাধার প্রাচীরে প্রথম গভীর সহানুভূতির সঙ্গে আঘাত করলেন—তদানীন্তন "আর্ট থিয়াটার"এর মালিক ও পরিচালক; উদার স্বভাব বন্ধুবৎসল, সাহিত্য-

রসিক প্রবোধ চন্দ্র গুহ। তিনি এখন রঙ্গালয়ের বহুদূরে চলে গেছেন কিন্তু ভদ্র শিক্ষিত, প্রগতিশীল বাঙালী সমাজ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে এবং আমি মনে করি প্রধানতঃ কৃতজ্ঞ হয়ে থাকা উচিত বাঙলার নাট্যশিল্পীদের। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই আমার বক্তব্য বিষয় স্পষ্ট হবে। গতানুগতিক রীতিপদ্ধতিকে অতিক্রম করে চলবার মত সাহস ও কৃতিত্ব প্রবোধবাবুর ছিল বলেই—তিনি তখনকার দিনে রবীন্দ্রনাথের "চিরকুমার সভা'র অভিনয় করবার ব্যবস্থা করেন। আমি বলব– বর্তমান যুগের সংস্কৃত সুরুচি-সম্পন্ন, রঙ্গালয়ের উদ্বোধন হঠাৎ সেই সময় থেকে। যাকে "মডার্ণ ষ্টেজের" "ল্যাণ্ড মার্ক" বলা যেতে পারে। প্রবোধবাবুই প্রথম নূতন অভিনয় রজনীতে রসিকজনের আমন্ত্রণ, প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। আমি তখন "বিজলী" নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক—আমার মনে আছে এমন কোনো 'অভিনয়'ই প্রবোধবাবুর পরিচালনায় অভিনীত হয় নি—যাতে প্রবোধবাবু সর্ব্বপ্রথম সাহিত্যিক ও নাট্যকার এবং রসিকজনের "রায়" না নিয়ে তৃপ্তি পেয়েছেন। আর একটা দিনের কথা বলব।

সেদিন রবীন্দ্রনাথের "গৃহ প্রবেশ"-এর অভিনয় হচ্ছে—আমরা নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছি। সেখানে গিয়ে দেখি আর্ট থিয়েটার"এর প্রবেশ গৃহে রীতিমত একটা সুসাহিত্যিকও সুরসিকজনের সম্মেলন বসে গেছে-- কলিকাতা শহরের গণ্য মান্য ভদ্রলোক, শিক্ষিত সমাজের শিক্ষক, অধ্যাপক, কবি উপন্যাসিক, নাট্যকার ও সাংবাদিক এবং চিত্রশিল্পীদের একত্র সমাবেশে সেদিন আমার এই কথাই মনে হয়েছিল - যে প্রবোধ বাবুর এই চেষ্টার মূলে রয়েছে (এক কথায়) রঙ্গালয়কে সামাজিক জাতে তোলার চেষ্টা। সে চেষ্টাও তাঁর অনেকাংশে সফল হয়েছিল। কারণ তখনকার দিনের সংবাদপত্র বা সাহিত্য পত্রিকা খুললেই দেখা যাবে– যে বর্ত্তমান রঙ্গালয়কে সংগঠিত ও সুসংস্কৃত করার কাজে

অধ্যাপিকা করুণাকণা গুপ্তা এম-এ, পি, আর-এস [illegible] সাহিত্য বাসরের প্রযোজনায় অভিনীত চিরকুমার সভায় ইনি একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

বাঙলা দেশের লেখকরা কতখানি সাহায্য করেছেন।

তারপর এল শিশির কুমারের "নাট্যমন্দির"; সেখানে নিমন্ত্রণ হ'ত বড়বাড়ীর বড় কাজের মত যাঁদের নিমন্ত্রণ অনিবার্য্য এবং যারা নিমন্ত্রিত হয়ে এসে অভিনয় দেখলে শিশির কুমারের ব্যক্তিগত আনন্দ বা তৃপ্তি হ'বে তাঁরাই।

'রূপ-মঞ্চ'—বার্ষিক সংখ্যা

আগামী মাঘ মাসে 'রূপ-মঞ্চ' চতুর্থ বৎসরে পদার্পণ করবে। 'রূপ-মঞ্চের' এই জন্ম-বার্ষিকীতে পাঠক পাঠিকা তথা দর্শক সাধারণের শুভেচ্ছা প্রধান উৎসবোপকরণ— আশা করি রূপ-মঞ্চ তা থেকে বঞ্চিত হবে না। রূপ-মঞ্চের জন্ম বার্ষিকীতে পাঠক পাঠিকাদের যা বলবার আছে— আগামী ২৫শে জানুয়ারীর ভিতর সম্পাদকীয় বিভাগে এসে পৌঁছা চাই। বিনীত সম্পাদক : রূপ-মঞ্চ।

সভ্য হ'তে হ'লে

বাষিক চাঁদা এক টাকা সহ নীচের স্থানগুলি পূর্ণ করে পাঠিয়ে দিন।

সম্পাদক চলচ্চিত্র
দর্শক-সমিতি
৩০, গ্রে ষ্ট্রীট,

দেশীয় চিত্রের সর্বপ্রকার উন্নতিই আমার কাম্য। তাই দর্শকের দাবী নিয়ে আমি সমিতির সভ্য হ'তে ইচ্ছা করি। প্রতি-মাসে গড়পড়তায় আমি বাংলা, হিন্দি, ইংরেজী ছবি যথাক্রমে........,........, বার দেখি।

স্বাক্ষর..................................

ঠিকানা..................................

দুর্গাদাস

(জীবনী)

কালীশ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
রূপ-মঞ্চ প্রকাশিকার সশ্রদ্ধ নিবেদন—

বাংলার অপরাজেয় মঞ্চ ও চিত্রাভিনেতা
স্বর্গত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শিল্প-জীবনের অনেক জানবার কথা।

শিল্পীর নিজের অপ্রকাশিত লেখা—বিভিন্ন প্রতিকৃতি, অভিনেতা ও খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে মাঘের প্রথমে আত্মপ্রকাশ করবে।

মূল্য: এক টাকা, ভিঃ পিঃ যোগে পাঁচ সিকা।
অগ্রিম টাকা পাঠিয়ে আপনার নাম
তালিকাভুক্ত করে রাখুন।

রূপ-মঞ্চ কার্যালয়:
৩০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তবে একথা সত্য যে শিশির কুমার তার সাজ ঘরে একটি ছোট খাটো রসজ্ঞদের আড্ডা জমাতেন। তার মধ্যে কিন্তু অধিকাংশই ছিল তার পূর্ব্ব পরিচিত অধ্যাপক, সাহিত্যিক বা রসিক জনেরা—কিন্তু এই রকমের "Group" দ্বারা বাহিরের সঙ্গে ব্যাপক যোগাযোগ রক্ষা করা যায় না। এর পরিচয় তিনিও পেয়েছেন। কিন্তু প্রবোধবাবুর নিমন্ত্রণ সকল সময়েই ব্যাপক মনোভাব ও শুভ বুদ্ধির দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল বলেই—তিনি রঙ্গালয়ের মধ্যে সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠায় এতখানি কৃতকার্য্য হয়েছিলেন। একথা আজ বাঙলার রঙ্গালয়গুলি বা তাহাদের শিল্পীবৃন্দ ভুলে যেতে পারেন কিন্তু আশা করি বাঙলার শিক্ষিত সমাজ ও সাহিত্য সমাজ সেবীরা তা এতদিনেও ভোলেন নি। সাহিত্যিক ও রসিক মহলের কাছে তৎকালীন "আর্টথিয়েটার" যে একটা আকর্ষণের কেন্দ্র হয়েছিল সেটার কারণ সেখানকার উচ্চাঙ্গের অভিনয় কলার জন্য নয়—প্রবোধবাবু মানীর মান রাখতেন, যথাস্থানে মর্য্যাদা দিতে জানতেন সেখানকার "মৌতাত" এ মজেনি এমন রসিকলোক কমই দেখেছি।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রবোধ বাবুর এ আদর্শ তাঁর পর আর কেহও সে অনুসরণ করলেন না বা করার দরকার ও মনে করলেন না এবং নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ের মধ্যে পড়ে শেষাশেষি প্রবোধ বাবুকে ও বোধ হয় নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিতে হয়েছিল যে,

"Because I know that time is always time
And place is always and only place
And what is actual only for one time.
And only for one place.
I rejoice that things are as they are.
Because I can not hope to turn again.
Consequently I rejoice having to construct
something. Upon which I rejoice."

সম্প্রতি যে কয়টি রঙ্গালয় চলছে—তার মধ্যে একাধিক প্রথম শ্রেণীর নট নটী—আছেন—প্রতিভা আছে এমন শিল্পীর ও অভাব নাই। এবং কোনো কোনো রঙ্গালয়ের এমন পরিচালক ও আছেন যারা শিক্ষিত সম্ভ্রান্তশ্রেণীর কিন্তু একবারে তৃতীয় শ্রেণীর বণিক বুদ্ধির কিছু না কিছু অভিব্যক্তি আমরা একাধিক রঙ্গালয়ে দেখতে পাই। এর কারণ কি? হয়ত এমনও হতে পারে যে যারা পরিচালক তারা সত্বাধিকারী নন,—যাঁরা প্রযোজক তাঁদিকেও হয়ত আত্মমর্য্যাদা হারিয়ে অন্তরালের পুঁজিপাতি দেবতার সেবা করা ছাড়া উপায় থাকে না। অথবা এমন হওয়াও হয়ত আশ্চর্য্য নয়—যে রঙ্গালয়ের শিল্পীগণ ও আজকাল—শ্রমের বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক পান তাতেই তাঁদের আত্ম প্রসাদ না আসুক অন্ততঃ আত্মসুখ সচ্ছন্দের একটা মোটামুটি উপায় হয় বলেই তাঁরা কোনো রকমে "দিনগত পাপক্ষয়" করে চলেছেন। এতে সবদিকেরই অধোগতির পরিচয় পাওয়া যায়। এবং কারো পক্ষে এটা প্রশংসা ও শ্লাঘার কথা নয়। এছাড়াও অপ্রকাশ্য আরো কারণ থাকতে পারে।

রঙ্গ-মঞ্চ

কিন্তু কারণ যাই হোক না কেন---অবস্থা শুধু যে সব দিক থেকেই শোচনীয় তাই নয় এর ভবিষ্যতও অত্যন্ত আশঙ্কা-জনক। কারণ জাতির সঙ্গে যদি দেশের রঙ্গালয়গুলি এমনি সম্পর্ক শূন্য হয়ে পড়ে তা'হলে এমন দিনও আসতে পারে যখন তার প্রতিক্রিয়ার স্রোতে কে কোথায় ভেসে যাবে কেহ জানে না। দেশের এত বড় দুর্ভাগ্যের সূচনা যাঁরা জ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক করছেন—তাঁদের চিত্তে শুভ বুদ্ধি জাগুক এই প্রার্থনাই আজ ভগবানের কাছে করব।

রঙ্গালয় জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহিরঙ্গ হলেও তার অন্তরঙ্গে যে সুর, যে ধ্বনি, যে বাণীর প্রকাশ হয় তাতে জাতীয় কল্যানের আদর্শ থাকা দরকার। সংগঠনের দিকে রঙ্গালয়ের দান করবার অনেক কিছু আছে বলেই—দেশবন্ধু একদিন একটি "জাতীয় রঙ্গালয়" স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু আমাদের প্রত্যেক রঙ্গালয়টিই বা কেন এক একটি জাতীয় জীবনের আশা আকাঙ্খা আনন্দ ও উন্মাদনার প্রতীক হয়ে উঠ্‌বে না? হয়ে উঠ্‌তে অবশ্যই পারে--যদি তার সঙ্গে যোগাযোগ থাকে তাঁদের, যাঁরা জাতীয় জীবনকে পরিস্ফুট করবার কাজে তাঁদের আপন আপন শক্তিকে নিয়োজিত করে থাকেন। এর মধ্যে প্রধানতম শক্তি দেশের সাহিত্যিক শক্তি তারা কি শুধু আজ সামান্য কিছু অর্থপ্রাপ্তির আশায় নাটক লিখে রঙ্গালয় কর্ত্তৃপক্ষদের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াবে? যারা জনসাধারণের মন গঠন করে থাকে, সুদৃঢ় জনমতের উপর দেশের রঙ্গালয়গুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে থাকে, সেই সাংবাদিকগণ ও কি আজ নিজেদের আত্মমর্য্যাদা ভুলে যাবেন—রঙ্গালয়ে অন্ততঃ তাঁদের সকল সময়ে অবাধ গতি আছে বলে?—যাঁরা নিজেদের স্বভাবগত উপলব্ধি শক্তির জোরে জনসাধারণকে নাটকের প্রকৃত রসের সন্ধান দিতে পারেন সেই রসবেত্তা সুধী সমাজও কি আজ—রঙ্গালয় কর্ত্তৃপক্ষের উদাসীনতার কাছে আত্মসমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাক্‌বেন? তা'হলে যে যোগাযোগের উপর রঙ্গালয়ের অস্তিত্ব ও উন্নতি নির্ভর করছে--সেটার দিন দিন একান্ত অভাবই আমরা দেখতে পাব। বাহিরের সঙ্গে সম্পর্কহীন এই রঙ্গালয়গুলিকে আমরা তখন আর জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলে মনে করব না। অর্থ বিনিময়ে প্রমোদ-উপভোগের যন্ত্ররূপেই এ গুলিকে নগণ্য বলে মনে হবে।

নাট্যকলার সমালোচক একজন ইংরাজ লেখকের লেখায় পড়েছিলাম—যে আমরা যাদের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে হাততালি দিই—আসলে তারা মানুষের সমাজ থেকে ক্রমশঃ নির্ব্বাসিত হয়ে পড়ে। অভিনয় করে তারা অতি ক্ষীপ্রতার সঙ্গে, কিন্তু আসলে তারা দেহে মনে জড়; মানুষের যে সব গুণ ভাঙ্গিয়ে তারা দর্শকের বা শ্রোতার কাছে গুণী শিল্পী বলে প্রশংসা পায়,—সে গুণের স্বাভাবিক বিকাশ আমরা যে সমাজে দেখতে পাই,—সেই মনুষ্য সমাজে তারা নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে না—মানুষ হয়েও তারা সর্ব্বপ্রযত্নে মনুষ্য সমাজকে পরিহার কত্তে চলে—সমাজও যে কখন অজ্ঞাতে তাদের বর্জ্জন করে ফেলে একথা সেও জানতে পারে না। কিন্তু নটশিল্পীদের মধ্যে অনেকের পক্ষে এটা কালক্রমে স্বভাবগত হয়ে পড়লেও কূপমণ্ডুকতা তার মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত হানিকর। যদি দেশের মধ্যে অভিনয়-শিল্পীরা সমাজ থেকে দূরে সরে যান তাতে আমাদের সামাজিক শক্তি যেমন হ্রাসপ্রাপ্ত হবে তেমনি তারাও ক্রমশঃ "automaton" বা পুতুলের জীবন যাপন করেই শেষ করে দেবেন তাঁদের শিল্পীর জীবন। এত বড় Tragedy আমরা কল্পনাও করতে পারি না। "The men are nothing in themselves, if not properly used, but the very hands of the Gods if employed with reason and prudence.

(Hero Philus)
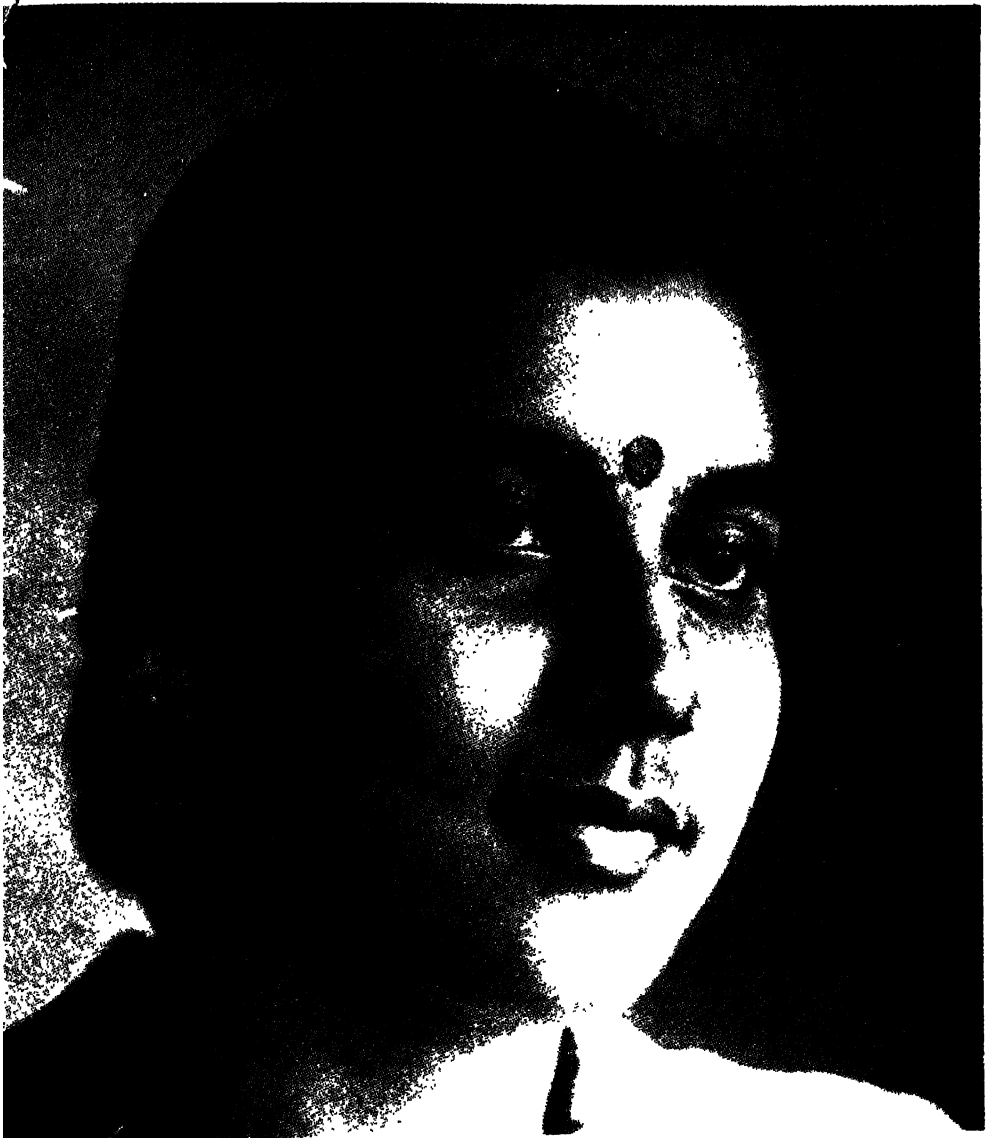
কুমারী মৃদুলা গুপ্তা

সংহিতা বাসরের প্রযোজনায় শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের 'চির-কুমার সভায়' একটী বিশিষ্ট চরিত্রে ইনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

রূপ-মঞ্চ

রূপ-মঞ্চ

দেবিকারাণী দেবী
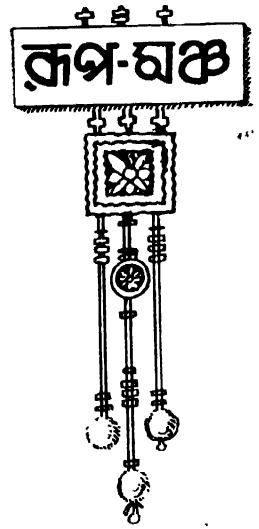
'হামারী বাৎ'-এ এর নতুন করে আবার পরিচয় মিলবে।

মঞ্চ ও পর্দার কথা

শ্রীকামিনীকুমার রায়

বালক বালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধ বৃদ্ধা পর্যন্ত প্রায় সকলকেই থিয়েটার বায়স্কোপের নামে উৎসাহী ও পুলকিত হইতে দেখা যায়। কোনও সিনেমায় ভাল ছবির কথা শুনিলে ঘরে ঘরে সাড়া পড়ে, আবদার উঠে—দেখিতে হইবে, দেখাইতে হইবে। দূর পল্লীগ্রাম হইতেও রৌদ্রজল মাথায় করিয়া, ২০।২৫ মাইল নৌকায় গাড়ীতে ছুটিয়া শহরের সিনেমায় আসিয়া অনেককে ভিড় জমাইতে দেখি। আবার পূজার সময় বাড়ী গেলেও বারোয়ারী তলায় গ্রামের ছেলে বুড়োকে মিলিয়া 'চন্দ্রগুপ্ত' কি 'চকমকি'র রিহার্সেল দিতে শুনি। মানব প্রকৃতির উপর ইহাদের প্রভাব যে কত, তাহা আরও বিশেষ করিয়া উপলব্ধি হয়, যখন দেখি এতটুকু ছেলেরাও খাবার না খাইয়া পয়সা জমাইয়া সিনেমায় ছোটে। কেহ সেখানে যায়, মনে করে,—দেশ বিদেশের কত কিছু দেখিতে শুনিতে পারিবে, কত নাচ গান অভিনয় অভিব্যক্তি—খুশিতে মন ভরিয়া উঠিবে; কেহ সেখানে যায়, মনে করে,—দুঃখ-যন্ত্রণার দাব-দাহ কতক্ষণের জন্যও শীতল হইবে, তাহারই মত কত ব্যথাতুরের ব্যথা দেখিয়া নিজের ব্যথা সে ভুলিবে; কেহ বা সেখানে যায় কর্মক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত জীবনের বোঝা টানিয়া টানিয়া, মনে করে সরস সতেজ হইয়া ফিরিয়া আসিবে, কর্মক্ষেত্রে নূতন প্রেরণা পাইবে। বস্তুত এই দুইটি প্রতিষ্ঠান এমন সব জিনিষ লইয়া কারবার করে, যাহা প্রতিনিয়ত মানুষকে তাহার প্রতি অবসর মুহূর্তে কি সুখের দিনে কি দুঃখের দিনে আকর্ষণ করিতেছে। সে আকর্ষণ, সে আহ্বান কেহ সহজে উপেক্ষা করিতে পারে না। সেখানে সকল শ্রেণীর সকল বয়সের মানুষের চিত্ত-বিনোদনের জন্য যুগপৎ এত সব উপকরণের সমারোহ থাকে যে, কেহই বড় একটা ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসে না; আনন্দের কণাদানা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু পায়। তাই দেখিতে পাই থিয়েটার বায়স্কোপের প্রসার প্রতিপত্তি দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। অন্য দেশের কথা ছাড়িয়া দিই, এই বাংলা দেশে আজ এমন কোন শহর নাই, যেখানে অন্ততঃ দুই একটিও থিয়েটার হল বা সিনেমা হাউস দাঁড়াইয়া নাই এবং তাহা জনসাধারণের অভিনন্দন পাইতেছে না।

কিন্তু এস্থলে উল্লেখযোগ্য এই যে থিয়েটার এবং সিনেমা উভয়ই প্রায় একই উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হইলেও যন্ত্রশিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি-হেতু সিনেমার সঙ্গে থিয়েটার সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে পারিতেছে না, সিনেমা থিয়েটারকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া অতি দ্রুত সগৌরবে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। থিয়েটার যেন স্থান-কালের স্বল্পপরিসর গণ্ডীতে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু সিনেমার শক্তি ও ব্যাপ্তি অপরিসীম, সে স্থান কালকে অতিক্রম করিয়া একই সময়ে বা সময়ে সময়ে দেশে দেশে নগরে নগরে লক্ষ লক্ষ জনের মনোরঞ্জন করিতেছে। এতটুকু সময়ের মধ্যে এতটুকু পর্দার উপর সিনেমা বিশ্বরাজ্যের যে সব রূপ ঐশ্বর্য, কথা কাজ পরিবেশন করে, থিয়েটারের পক্ষে তাহা অসম্ভব। মানুষ স্বল্পায়ু, কিন্তু তাহার কর্তব্য অনন্ত, আকাঙ্ক্ষা অফুরন্ত। এই স্বল্পকালের মধ্যেই সে চায় সমস্ত কর্তব্য শেষ করিতে, জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিতে, পৃথিবীর সব কিছু জানিতে বুঝিতে। এত বড় এই সুন্দর পৃথিবীর কোথায় কি আছে, কোথায় কি বিচিত্র-লীলা সংঘটিত হইতেছে—একদিকে আফ্রিকার সেই অসীম অনবচ্ছিন্ন বনভূমি, অপর দিকে দিগন্ত বিস্তৃত সাহারার ধূ ধূ; তুষার শুভ্র ধ্যান-

রঙ্গ-মঞ্চ

'পুঁজি'র একটি দৃশ্যে শ্রীমতী রাগিণী

মগ্ন হিমালয়, উত্তাল তরঙ্গ সমুদ্রের বুকে মানুষী সৃষ্টির বিজয় অভিযান, নিউইয়র্কের গগন ভেদী বিশাল প্রাসাদশ্রেণী, প্যারী সুন্দরীর হাস্য লাস্য, বলি দ্বীপের নৃত্য গীত, সমুদ্রের বেলাভূমিতে পাশ্চত্য নারী পুরুষের রৌদ্র স্নান, বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠীর সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, তাহাদের বিচিত্র জীবনযাত্রা প্রণালী, আমোদ উৎসব, তাহাদের শিল্পকলা, কলকারখানা—সর্বত্র মানুষের মন ঘুরিয়া বেড়ায়, সব কিছুই মানুষ অল্প বিস্তর জানিতে বুঝিতে চায়। থিয়েটার তাহার সে-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারে না, তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তাই সিনেমা তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়াছে—যুগের আহ্বান, যুগের প্রয়োজনে। কিন্তু সহযোগীর এই ক্রমোন্নতি দেখিয়া থিয়েটারের হতোদ্যম হইবার কোন কারণ নাই; তাহার আসর, তাহার প্রয়োজন সাময়িকভাবে কথঞ্চিৎ হ্রাস প্রাপ্ত হইলেও, তাহার দীর্ঘ গৌরবের দিন পুনরায় আসিতেছে। এই বিজ্ঞানের যুগে কাহারও আধিপত্য বেশীদিন অবিচ্ছিন্ন ভাবে টিকিয়া থাকে না; সিনেমার আধিপত্যও যে বহুদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে না, তাহার সূচনা ইতিমধ্যেই হইয়া গিয়াছে। সমরোত্তর যুগে 'টেলিভিশন' যে সিনেমাকে গ্রাস করিবে এবং আবার যে রঙ্গমঞ্চে হাসির ফোয়ারা ছুটিবে তদ্বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

বর্তমানে, বাংলা দেশে যে আকারে নাট্য মঞ্চাদি দেখা যায় এবং অভিনয়াদি হয়, তাহা পশ্চিমের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ও অনুষ্ঠিত এবং উহার বয়স বড় জোর এক শত বৎসর। বাংলা সিনেমাও পশ্চিমের আমদানী এবং সহযোগীর তুলনায় সে 'না'-না হইলেও বালক মাত্র, ত্রিশের কোঠায় সে পড়ে পড়ে। কিন্তু এই জীবন-কালের মধ্যেই তাহাদের যতখানি উন্নতি হওয়া যুক্তিযুক্ত ছিল, ততখানি উন্নতি তাহারা করিতে পারে নাই। আমাদের দেশে সর্বসাধারণের অভিনন্দন এখনও তাহারা লাভ করে নাই; এখনও অনেকেই ইহাদের দ্বারে পয়সা খরচ করাটাকে সঙ্কোচের বিষয় বা অপব্যয় মনে করে। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশ, বিশেষত আমেরিকা সিনেমাকে অন্যতম প্রধান Industry হিসাবে গণ্য করে এবং দেশ ও জাতিকে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিবার পক্ষে উহার গুরু দায়িত্ব স্বীকার করে। জাতির শিক্ষা দীক্ষা, চরিত্রগঠন, চিত্তবিনোদন তাহারা আজ অতি সাফল্যের সহিত অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করিতেছে। নৃত্য গীত অভিনয়ের ভিতর দিয়া কত সরস সুন্দর করিয়াই না তাহারা নিজেদের ঐশ্বর্য প্রতিপত্তির, নিজেদের আদর্শের

আর্ট ইন্ ইণ্ডাষ্ট্রী একজিবিশন
১৯৪৪

প্রোপাগাণ্ডা করিতেছে। শত শত বৎসরে, অন্য শত উপায়ে যাহা করা দুষ্কর ছিল, মাত্র অল্প সময়ে একটি মাত্র উপায়ে তাহারা তাহা সম্পন্ন করিয়াছে, করিতেছে। অপর সভ্য জাতিরা যাহা পারিয়াছে, আমার দেশ আমার জাতি কি তাহা পারে না? যে সিনেমার প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ আছে, সেই সিনেমার উপর কি আমাদের সমাজ ও জাতিগঠনের ভার অর্পণ করা যায় না? আমরা কি ইহাকে মুষ্টিমেয় 'খেয়ালী' লোকের কেবল চিত্ত-বিনোদনের ও আমোদ প্রমোদের কেন্দ্ররূপেই দেখিয়া আসিব? আজ আমাদের দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিবর্তন আবশ্যক হইয়াছে। আজ আমাদের সম্মুখে সমস্যার পর সমস্যা নূতনতর হইয়া দেখা দিতেছে, জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে; তাহার শক্তি, ধৈর্য, অবলম্বন টুটিয়া যাইতেছে;

ভি, শান্তারাম পরিচালিত 'শকুন্তলায়' শ্রীমতী জয়শ্রী

তাহার আজ আত্মপ্রত্যয় নাই, ঈশ্বরপ্রত্যয়ও সে হারাইয়াছে, কে তাহাকে রক্ষা করিবে; কোন আদর্শে সে আপনাকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না; দ্বারে দ্বারে আজ অযুত সহস্র মৃত্যুপথযাত্রীর আর্তধ্বনি, দুর্দিনের অন্ধকার ভেদ করিয়া কোন দিকে অরুণ উদয়ের আভাস দেখা যাইতেছে না। জাতির এই সঙ্কটমুহূর্তে তাহাকে পুষ্টিকর আহার প্রদান করিয়া সুস্থ ও সবল করিয়া তোলার এবং সত্য শিব সুন্দরের পথে পরিচালিত করিয়া তাহাকে মানুষ নামের মহান গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার গুরু দায়িত্ব এবং সে-দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিবার

ক্ষমতা দেশের সিনেমার আছে বলিয়াই আমি মনে করি। নাচ গান গল্প বলা এবং ছবি দেখানোর ভিতর দিয়া সমাজ ও জাতি গঠনের আদর্শ প্রচার, জাতিকে শিক্ষা সভ্যতা সংস্কৃতি দান সিনেমার পক্ষে যেমন সহজসাধ্য, তেমনটি আর কাহারও পক্ষে নয়।

এই গুরু দায়িত্ব পালন করিতে হইলে (করিতে হইবেই, নতুবা তাহার বাঁচিয়া থাকার কোনই সার্থকতা নাই) বাংলা সিনেমার পরিচালকগণকে সম্যক অবহিত হইতে হইবে। তাঁহাদিগকে ভাল শিল্পী, বৈজ্ঞানিক এবং সিনেমার আঙ্গিকের সহিত বিশেষ পরিচিত আছে এরূপ সাহিত্যিকের শরণ লইতে হইবে। কাহিনী-গৌরব, আলোকচিত্র, শব্দ-নিয়ন্ত্রণ, দৃশ্যসজ্জা যথাযথ পরিচালনা কোনটির দৈন্য ঘটিলেই সিনেমার জয়যাত্রা তথা জাতির জয়যাত্রা পশ্চাতে পড়িয়া গেল। দেশের আবাল-বৃদ্ধ বণিতা যাহার প্রতি স্বভাবতই আকৃষ্ট তাহার সেই আকর্ষণের মর্যাদা সর্বপ্রথমে রক্ষা করিতেই হইবে। সিনেমার কর্তৃপক্ষগণ এমন ছবি পরিবেশন করিবেন, যাহা মনকে কেবল ক্ষণেকের জন্য মুগ্ধই করে না, নির্মল আনন্দ দেয়, উহাকে সরস এবং সবল করিয়া তোলে, আত্মজিজ্ঞাসার তাগিদ জাগাইয়া দেয়, অসুস্থ পঙ্গু সমাজ ব্যবস্থাকে আঘাত করে, কল্যাণ আদর্শের ইঙ্গিত দেয়, জাতি গঠনের বনিয়াদ সুদৃঢ় করে। পরিচালকবর্গ কেবল Sale statement-এ সন্তুষ্ট না থাকিয়া তাঁহারা দেশকে কি দিতেছেন, দেশের কোমলচিত্তে ভবিষ্যতের কোন শুভ ফল ফুলের বীজ ছড়াইতেছেন, তাহা যেন সর্বদা লক্ষ্য রাখেন এবং সেবা মনোবৃত্তি লইয়া কাজ করেন। এতদিন তাঁহারা অনেক ভুল করিয়াছেন, আর যেন সে ভুল না করেন, দুনিয়া আজ অনেক অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, আমরাই শুধু পশ্চাতে পড়িয়া আছি অতীতের কতকগুলি সংস্কার লইয়া।

যে প্রতিষ্ঠানের উপর এরূপ গুরু দায়িত্ব অর্পণ করা যাইতেছে, লক্ষ্য করিয়াছি তাহাতে যাহারা কাজ করেন, তাঁহারা যেন নিজেদিগকে সংসার সমাজ হইতে অনেকখানি আলাদা আলাদা ভাবেন। ভাবিবার যে কারণও না আছে তা' নয়। তবু আমি বলিব এই inferiority complex ভাবটা তাহাদের পরিত্যাগ করিতেই হইবে। তাঁহাদের অবলম্বিত বৃত্তি অতি মহৎ, উহাতে সঙ্কোচের কিছুই নাই। তাঁহারা যে জাতির, দশের দেশের কি মহৎ সেবা করিতেছেন, তাহা মনস্বীমাত্রই শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করেন। তাদের পথ যে মানুষের কল্যাণ প্রতিষ্ঠার পথ, তাহা যেন তাঁহারা সর্বদা মনে রাখেন এবং নিজেদের প্রতি, নিজেদের অবলম্বিত বৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধা রাখেন। জাতিও তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিবে।

মেয়েরা ও সিনেমা

গৌরী দেবী

[এ বিষয়ে মহিলাদের কাছ থেকে বিশেষ আলোচনা এলে যথাযোগ্য স্থান দিতে চেষ্টা করবো, এবং এ নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে বলেই মনে করি। সম্পাদক।]

ভারতের সিনেমাকে আজ আর লালন করবার বাসনা পোষণ করলে চলবে না, এখন তাড়ন করতে হবে। এ কথাটা সকলেই স্বীকার করেন,—দর্শক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, পরিচালক, প্রযোজক—কারও মনে এ সম্বন্ধে একটুকু দ্বিধা নেই। অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে, এ কথাটা সকলেই বুঝে কেমন চুপ করে আছেন। আজকাল সাময়িক পত্রিকায় সকলেই এই সম্বন্ধে এত প্রবন্ধ লিখছেন, এমন কি দু' একজন চিত্র পরিচালকও যখন লিখছেন, তখন আশা করা যায়, ভারতের সিনেমার কিছুটা সংস্কার শীগ্গিরই হবে। হ'লে ভালই।

কিন্তু একটা ত্রুটি চিরকালই থেকে যাবে বলে মনে হয়। কারণ, পরিচালকেরা সকলেই পুরুষ, সুতরাং মেয়েদের দিকটা তাঁরা বরাবরই উপেক্ষা ক'রে যান। আবার মেয়েরাও যদি পরিচালিকা হন, তবে তাঁরাও পুরুষদের কথাটা উপেক্ষা করবেন। সুতরাং সব দিক দিয়ে সুন্দর ছবি আমরা আশা করতে পারি না। সে কখনও হয়ও না।

এই প্রবন্ধে আমি বলতে চাই; আধুনিক ভারতের সিনেমা এবং তার সঙ্গে মেয়েদের সম্বন্ধ। আমরা যত ছবিই দেখি, তার মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়, কাহিনীকার এবং পরিচালক নজর দেন কি রকমে ছেলেদের মন আকৃষ্ট করতে পারেন। এর কারণ অবশ্য এই যে, পরিচালকেরা সকলেই পুরুষ। তাঁদের প্রথম লক্ষ্য থাকে নায়িকা হবে সুন্দরী, চটুল হবে তার অঙ্গভঙ্গী, সুমধুর গাইবে সে গান, হয়তো সে নাচবে এবং কখনও কখন তার বুকের কাপড় খসে যাবে। এক কথায় পুরুষদের বিশেষতঃ ছাত্র সমাজকে লুব্ধ করতে যতগুলি গুণ দরকার, প্রত্যেকটিই প্রয়োগ তাঁরা করেন। যদি এই সব গুণ মেশানো কোনও বই বাজারে বেরোয়, তবে কেল্লা ফতে, আশাতীত সাফল্য—প্রেক্ষাগৃহে একাদিক্রমে পঁচিশ (কি তারও বেশী) সপ্তাহ চলিতেছে বলে বিজ্ঞাপন। নায়িকার বয়স অল্প হ'লে আর বিশেষ কিছু দরকার লাগে না। অভিনয়-প্রতিভা তাঁর থাক বা না থাক, ভারতের একজন স্টার হ'তে তাঁর বাধে না। পরিচালকেরা এই দিকেই নজর দেন, কারণ যিনি ছবির পিছনে টাকা ঢালেন, তিন তাঁর বইয়ে কতখানি লাভ হ'ল তাই দেখেন,—বইটি ভাল কি খারাপ হ'ল, তার বিচার তিনি করেন না। পরিচালকেরও গুণ নিরূপণ হয়, তাঁর বই কত সপ্তাহ চললো তাই দেখে।

দেবকী বসু পরিচালিত 'রামানুজে' নবাগত সুদর্শন নট বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়
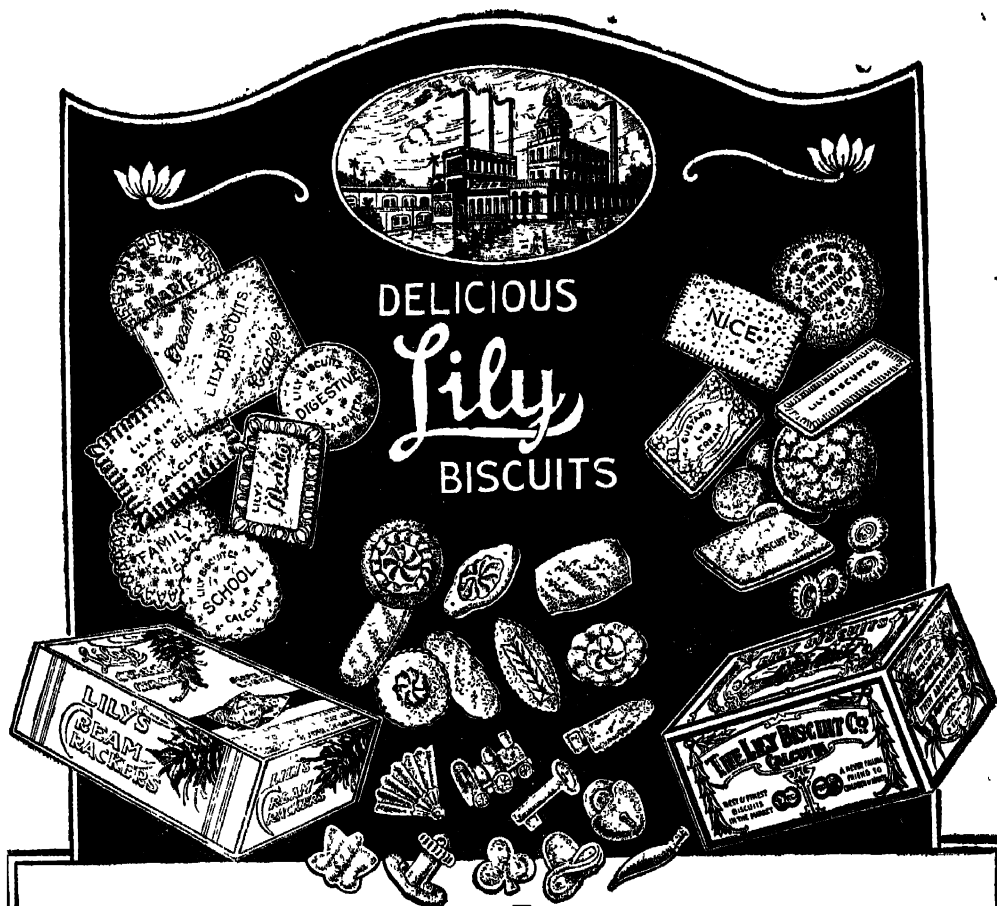
DELICIOUS
Lily
BISCUITS
-FOR
and all "SPECIAL" occasions
লিলি বিস্কুট
রকমারিতায় স্বাদে ও গুণে
অপরাজেয়
লিলি ব্র্যাণ্ড বার্লি
আদর্শ পথ্য ও
পানীয়
LILY BISCUIT Co
CALCUTTA
BOMBAY
MANUFACTURERS OF THE FAMOUS "LILY BRAND" BARLEY

শ্রীমতী সামীম

মানসাটা ফিল্মস ডিসট্রিবিউটর্স পরিবেশিত 'ফরিয়াদের' নায়িকার ভূমিকায়

মেয়েদের চোখে এই সব অভিনেত্রীদের অভিনয়ের নামান্তর ন্যাকামী লাগে অসহ্য। কথায় কথায় নাচ আর গান, দয়িতের ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে নাচ, বাগানের একটা ডাল ধ'রে গান—এ সব কি? ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের প্রেম, ভারতীয় সিনেমায় এত সস্তা হয়ে গেছে যে, মাঝে মাঝে ভাবি, এর পরে তাঁরা নূতনত্ব দেখাবেন কোথায়—নূতন ধরণের প্রেমে, না আরো উর্ধ্বে? কাশীনাথের ছবিটি আমাদের খুবই ভাল লেগেছিল, কিন্তু বিন্দুর স্বামীর আরোগ্যান্তে বিন্দুর (অর্থাৎ ভারতীর) নাচতে নাচতে গান এবং ও ভাবে প্রকাশ্যে—এ সব মাথা খারাপের লক্ষণ নয়? মেয়েরা এটা স্পষ্ট বুঝতে পারে যে এটা ন্যাকামী, কিন্তু ছেলেদের তরফ থেকে তার তো প্রতিবাদ শুনি নি! দম্পতীতে একটি মেয়ে গান গাইছে আর নায়ক সেখানে গা ঘেঁসে এসে দাঁড়ালো, অচেনা লোক দেখে মেয়েটি কিছু বললো না বরং তখনই তার সঙ্গে পলায়ন—এটাকে কি বলবো? পরিচালক এবং কাহিনীকার কোন নারীর মনস্তত্ত্ব ঘেঁটে এইটি আবিষ্কার করেছেন জানি না! 'মুহব্বতের' নায়িকা জলভরা রাস্তায় যে ভাবে জল ছিটিয়ে বেড়াচ্ছে এবং যে সব কীর্তি করে বেড়াচ্ছে তা দেখে কি গাত্রদাহ হয় না? প্রত্যেকটি বইয়ে এই সব ত্রুটি আছে অসংখ্য এবং মেয়েদের উপব করা হয়েছে খুব বেশী অবিচার।

এই ত্রুটিগুলো সংস্কার করতে গেলে প্রযোজক ও পরিচালককে একটু শক্ত হতে হবে এবং একটু একটু হয় তো আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। কিন্তু সে প্রথম প্রথম, ছবি ভাল হলেই ক্ষতি তো হইবেই না, লাভই হবে। সিনেমায় নায়িকাদের ন্যাকামির প্রশ্রয়দাতা কাহিনীকারও। তাঁরও দেখতে হবে যেন তাঁর গল্পে অসম্ভব এবং বিরক্তিকর কিছু না থাকে। অভিনেত্রীরা এই সব ভূমিকায় এই ধরণের ন্যাকামিপণা কি করে সহ্য করে অভিনয় করেন

শা-হেনসা আকবরে কুমার

বুঝতে পারি না। তাঁরা কি একটু প্রতিবাদ করে জানাতে পারেন না যে এসব সত্যি সত্যি কোনও মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয়—এগুলোকে ন্যাকামি ছাড়া আর কিছু বলে না। পরিচালক এবং কাহিনীকারদের উচিত একটু ভাল করে মেয়েদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা। শুধু Box Office hit-য়েই বই ভাল হয় না এবং পরিচালক হওয়া যায় না। যোগ্যতা অর্জন করা চাই।

আর একটা দিকে পরিচালকরা মেয়েদের সম্বন্ধে উদাসীন। তা হয়েছে অভিনেতা এবং বিশেষতঃ নায়ক সংগ্রহে। পরিচালকেরা খোঁজ করেন কদরী অভিনেত্রীর এবং তা পেলেই তাঁদের চলে, কিন্তু সুন্দর বলিষ্ঠ অভিনেতার খোঁজ করাও যে তাঁদের কর্তব্য, তা তাঁরা ভেবে দেখেন না। কেন, নায়কের জন্য জহর, ছবি বিশ্বাস, অশোককুমার তো আছেনই। সুন্দরী এবং নূতন অভিনেত্রী হলে

দর্শক সংখ্যা বেশী হবেই, কিন্তু দর্শিকারা তো তা চান না। তাঁদের তো শুধু সুন্দরী অভিনেত্রী হলেই চলবে না কিংবা সেই একঘেয়ে জহর-ধীরাজ-ছবি-অশোককুমার দেখতে ইচ্ছা করে না। নূতন এবং সুন্দর অভিনেতার খোঁজ করাও পরিচালকের উচিত। আজকাল যে কটি নূতন অভিনেতার দর্শন পাওয়া গেছে, তাঁরা কেউ সুদর্শন নন, তাঁদের অভিনয়-ক্ষমতাও অতি সামান্য—সম্পদের ভিতর তাঁরা গান গাইতে পারেন পরিচালকদের কাছে ওই যথেষ্ট, কিন্তু মেয়েদের কাছে অতটুকুই যথেষ্ট নয়। আমাদের সিনেমা মানেই কি গান? সিনেমায় কি অভিনয়ের স্থান নেই? নয়তো আর প্রায় প্রত্যেকটি বইয়ে দেখি:গান, আর গান—কাউকে অভিনয় করার সুযোগ দেওয়াও হয় না এবং যতটুকুও বা থাকে তাঁরা তা পারেন না। বাংলাদেশের 'নায়ক', দুর্গাদাস আর নেই—তাঁর মত অভিনেতা আর কোন দিন দেখবো বলে আশা করি না। চন্দ্রাবতীর অভিনয় ক্ষমতার এক শতাংশও কোনও অভিনেত্রীর মধ্যে দেখলাম না। এঁরাই আজ বাংলাদেশের 'ষ্টার'! হায় রে বাংলা দেশ!

কিন্তু কি বাজে কথায় এসে পড়লাম। আমি শুধু পরিচালকদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি তাঁরা যেন অভিনয় ক্ষমতা বিশিষ্ট সুন্দর অভিনেতা সংগ্রহের দিকেও একটু নজর দেন। তাতে লাভের খাতা বেড়েই যাবে, কমবে না।

নিউ থিয়েটার্সের 'দুই পুরুষে' লতিকা ও চন্দ্রাবতী

অভিনয় ও অভিনেতা

সুশীল রায়

অভিনয় তপশ্চর্যা। যে ভূমিকাভিনয়ের জন্য অভিনেতাকে নির্বাচন করা হ'লো, সে ভূমিকার সঙ্গে অভিনেতার মনের মিল বিশেষ ভাবে দরকার। অভিনয় আরম্ভের গোড়ায় অভিনেতাকে আত্মসমাহিত হ'তে হবে, মনে মনে তার উপলব্ধি ক'রে নিতে হবে তাঁর ভূমিকার তাৎপর্য কি। অভিনেতার ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে তার ভূমিকায় বিশেষ ব্যক্তিত্বটি আয়ত্ত ক'রে নিতে হবে। অভিনেতাকে এক-পিণ্ড নরম মাটির সঙ্গে উপমা দেওয়া যায়। যে কোনো ছাঁচে ফেলে চাপ দিলে নরম মাটির ঢেলা যেমন বিশেষরূপ ধারণ করে, অভিনেতাকেও ভূমিকার ছাঁচে ঢালাই হ'য়ে সেই বিশেষরূপ নিতে হবে। কিন্তু একাজ সহজে হবার কথা নয়, কেননা মানুষ মাটির ডেলা নয়। সেই জন্যেই তপশ্চর্যার প্রয়োজন। কৃচ্ছ্রসাধনাই হোক্ অথবা সুধু সাধনাই হোক, সেই সাধনার তাপে নিজেকে শোধন করে নেওয়া দরকার। অভিনেতার কাজ দুরূহ কাজ।

অথচ আমরা যে ধরণের অভিনয়ের সঙ্গে পরিচিত, তার মধ্যে কোনো সাধনা বা তপশ্চর্যার আভাস পাইনে। এ আমাদের প্রকৃতই দুর্ভাগ্য। আমাদের অভিনেতারা অভিনয় ক'রে নিজে কৃতার্থ হন না, দর্শকদের কৃতার্থ করেন। সুধু দর্শকদের নয়, প্রযোজকদেরও বটে। এর পিছনে আছে সুলভ যশ, এবং দুর্লভ অর্থের সহজ আগমন। চরিত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্যে অভিনেতাকে ডাকা হ'লো, তিনি হয়ত বিস্তর দর কষাকষির পর এসে চরিত্রকে হত্যা করে মঞ্চ থেকে নেমে গেলেন। দ্বিতীয় দিন আবার তাঁকেই ডাকা হ'লো হয়ত দ্বিতীয়বার চরিত্রের বলিদানের জন্যে। এই বিশেষ অভিনেতাকে ডাকার কারণ তাঁর সাময়িক জনপ্রিয়তা। জনপ্রিয় অভিনেতাকে দিয়ে অভিনয় করালে প্রযোজকের আর্থিক সুবিধে ও দর্শকের উৎসাহ দেখা দেয় বটে, কিন্তু অভিনয় শিল্পের দিককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়।

এর জন্যে প্রযোজক একা দায়ী নন। প্রযোজক কলা-রসিক যত নন, তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যবসায়ী। মঞ্চকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে (এবং তার সঙ্গে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে) তাঁকে জনপ্রিয় অভিনেতার দ্বারস্থ হ'তেই হয়। সেই জন্যে প্রযোজককে একমাত্র আসামী বলে ঘোষণা করা চলে না! এর জন্যে দায়ী দর্শক!

আমাদের দর্শকদের রুচি বদলেছে। এখন তারা সত্যিকারের অভিনয়ের কদর বুঝতে যেন ভুলে গেছেন। এর হেতু কি?

এর হেতু আছে। দর্শকরা প্রায় সকলেই আজকাল বিলাসী। বিলাসী অর্থে জাপানী বাবু—সস্তার বাবু। দর্শকদের মধ্যে আভিজাত্য নেই, বনিয়াদী রুচি নেই। সস্তা জাপানী পণ্য যার বিলাসের সামগ্রী, তার কাছ থেকে

হাসো-হোসো-এ-দুনিয়াওয়ালে চিত্রে সাহাজাদী

ফিল্ম্ ধার দেওয়ার ব্যবস্থা

(৩৫ মিলিমিটার এবং ১৬ মিলিমিটার)

বার্ম্মা-শেলের 'একটি কেরোসিন টিন' নামক সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় শিক্ষামূলক চিত্রের একটি দৃশ্য

সর্ব্বসাধারণের রুচী অনুযায়ী নানা প্রকার মনোজ্ঞ বিষয় অবলম্বন করে' বার্ম্মা-শেল এবং অন্যান্য ফিল্ম্ প্রস্তুত কেন্দ্রগুলিতে নির্ম্মিত বহুসংখ্যক প্রচার চিত্র এখন সকলের পক্ষেই দেখার সুবিধা হয়েছে। যে কেহই শিক্ষামূলক অথবা ঘরোয়া প্রদর্শনীর জন্য আবেদন করলেই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এগুলিকে পেতে পারবেন। এদের সম্পূর্ণ তালিকার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানাগুলির যে কোনটিতে লিখ্লেই হবে।—পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্ট, বার্ম্মা-শেল; বোম্বাই, কলিকাতা, নিউদিল্লী, করাচী এবং মাদ্রাজ।

প্রকৃত সু-রুচি আশা করা চলে না। এই তথাকথিত শহুরে সভ্যতার আওতায় প'ড়ে সব জিনিষের ওপরই আমাদের অরুচি জন্মে গেছে, বিশেষ ক'রে সুকুমার শিল্পের ওপর। সুকুমাব শিল্পের আজ বড় দুর্দিন। দৈন্যে অন্নকষ্টে দুর্দিনের সঙ্গে আমরা বিশেষ পরিচিত হ'য়ে উঠেছি, কিন্তু শিল্পের দুর্দিন তার চেয়েও ভয়াবহ। দেশের আর্থিক দুর্দিন সাময়িক, দশ বিশ বছরে (খুব বেশি হ'লে) সে দুর্দিনের সঙ্গে এঁটে ওঠা সম্ভব, তাকে দমন করাও সম্ভব, কিন্তু শিল্পের দুর্দিন সহজে যায় না, শত সহস্র বৎসরের আপ্রাণ চেষ্টায় হয়ত সে দুর্দিনকে কাবু করা যায়।

শকুন্তলায় দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার ভূমিকায় চন্দ্রমোহন ও জয়শ্রী

সুধু দর্শক শ্রেণীকে একমাত্র দোষী করাও অন্যায়। প্রকৃত পক্ষে দায়ী অবশ্য অভিনেতা। অভিনেতা-জীবন বিলাসের জীবন নয়। পদে পদে—মুহূর্তে মুহূর্তে তাঁকে ভেবে চলতে হবে যে তিনি দুর্গম পথের যাত্রী। সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে চলা তাঁর নিষেধ। দর্শকদের রুচি অনুযায়ী অভিনয় তিনি করবেন না, তিনি অভিনয় করেন তাঁর চরিত্রকে প্রাণ দান করার জন্যে। তাঁর অভিনয় নিপুণতায় দর্শকদের মন আকর্ষণ ক'রে নতুন রুচির সঞ্চার করার ভার অভিনেতার। দর্শক কি চায়, সেদিকে তাঁর দৃষ্টিপাত করার দরকার নেই। দর্শকদের চাহিদার জোগানদার তিনি নন। তিনি এমন জিনিষ দেবেন দর্শকরা প্রফুল্লচিত্তে তা গ্রহণ করতে যেন বাধ্য হন—এইদিকে তাঁকে দৃষ্টি দিতে হবে।

বর্তমানে আমাদের পর্দার ও মঞ্চের অভিনেতারা এদিকে যেন তেমন মন দেন না। প্রত্যেকেরই যেন জনপ্রিয়তা লাভের জন্য কত চেষ্টা। সস্তা হাততালীর জনপ্রিয়তা সাবানের ফেনার মতই ক্ষণস্থায়ী। এতে বিশেষ সুবিধে নেই।

নাম করবো না। তবে, আন্তরিক ভাবে অভিনয় করেন, চরিত্রকে প্রাণদানের জন্য চিন্তা ও চেষ্টা আছে—এমন মাত্র জন দুই অভিনেতা, ও জন তিনেক অভিনেত্রীর দেখা আমরা পাই। এঁদের এই শিল্প-মনের জন্যে এদের ধন্যবাদ জানান দরকার।

কিন্তু ভয় হয়, এদের মতিভ্রম আবার সহসা না এসে যায়। এদের আন্তরিকতা যে কদিন থাকে বাংলার অভিনয় শিল্প সে কদিন লাভবান হবে। তারপর? ভবিষ্যতের কথা বলাও কষ্ট।

সোণালী-স্বপন

[সিনেমার উপযোগী বড় গল্প]

শ্রীঅখিল নিয়োগী

গ্রামে আজ মহা সমারোহ।

জমিদার তার অষ্টমবর্ষীয়া এক মাত্র মেয়েকে 'গৌরী'-দান করছেন।

বিবাহ আসর গম্-গম্ করছে।

মেয়ের এক দূর্সম্পর্কের খুড়ো করালীবাবু বর যাত্রীদের আদর আপ্যায়নেব ভার নিয়েছেন। তিনিই সবাইকে সরবৎ সেধে সেধে বেড়াচ্ছেন।

মেয়ে সোণালীকে চমৎকার করে কণে সাজিয়ে দোতলার একটি জানালার ধারে বসিয়ে রাখা হয়েছে। চাঁদের আলো এসে পড়েছে সোণালীর চোখে মুখে লাল চেলীতে।

হঠাৎ ওড়নায় টান পড়তে সোণালী অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখ্‌লে জান্‌লার ও পাশে তার ভাবী বড় হি-হি করে হাস্‌ছে।

সোণালী বল্লে, এ কি! মাণিক দা! তবে যে ওরা বল্লে, বিয়ের আগে এখন বরের সঙ্গে কথা বল্লে লোকে নিন্দে করবে।

মাণিক কলা দেখিয়ে দেখিয়ে জবাব দিলে, বলুকগে ওরা, বয়ে গেল! আমার সঙ্গে যারা এসেছে···তারা লুচি মণ্ডা ওড়াচ্ছে। এই ফাঁকে দেখ্‌তে এলাম, তোকে কেমন মানিয়েছে!

সোণালী বল্লে, না-না তুমি পালাও মাণিক দা! এক্ষুণি কেউ দেখে ফেল্লে আমায় বক্‌বে।

মাণিক জবাব দিলে, দূর বোকা! আজ রাত্তিরেই ত তুই আমার বৌ হতে যাচ্ছিস, ঠাকুমা বলেছে। তখন দুজনে মিলে সেনেদের বাড়ী লিচু চুরি করে খাবো। তোদের বাড়ীর কেউ আর বারণ করতে পারবে না।

সোণালীও উল্লসিত হয়ে উঠ্‌ল। বল্লে, তাহলে ভারী মজা হবে না মাণিক দা?

মাণিক বিজ্ঞের মত বল্লে, এই সোণালী, এখন থেকে আমায় আর মাণিকদা বল্‌তে পারবি না···ঠাকুমা বারণ করে দিয়েছে···আমি যে তোর বর হব।

হুঁ! আমার মা-ও বলে দিয়েছে—এক দম্ ভুলে গিয়াছিলাম মাণিক দা! সোণালী বল্লে।

মাণিক বল্লে, ফের আবার মাণিক দা।

দুজনেই খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে।

মাণিক বল্লে সোণালী, একটা গান গানা ভাই—

সোণালী ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকিয়ে বল্লে, কিন্তু কেউ যদি এসে পড়ে! আমায় বক্‌বে।

মাণিক বল্লে, পাগল। কেউ জান্‌তে পারলে ত! সব গণ্ডা-গণ্ডা মণ্ডা ওড়াচ্ছে, বল্লুম ত' তোকে।

সত্যি তাই। দেখা গেল। বিরাট জমিদার বাড়ীর অন্য দিকে সবাই ভোজে মহা ব্যস্ত। লুচি আন, পোলাও এই দিকে—ভাজাটা গরম দেখে দিও এই সব নিয়ে মহা ব্যস্ত। মেয়ের সেই দুঃসম্পর্কের খুড়ো খাওয়া-দাওয়ার তদারক করে বেড়াচ্ছেন।

মাণিক বল্লে, এখন তুই গান গা দেখি—

সোণালী এদিক-ওদিক তাকিয়ে গান ধরলে।

মাণিকও মহা উল্লাসে তার সঙ্গে যোগ দিলে।

ওদিকে ভোজের আসর।

পৃথ্বিবল্লভে সাদিক আলি

বরযাত্রের একজনের পাতে পোলাও দেয়া হয়েছে। সে ভদ্র লোক তাতে একবার হাত দিয়েই হাঁকলেন, ও ঠাকুর ও ঠাণ্ডা পোলাও মুখে দেয়া যাবে না···গরম দেখে নিয়ে এসো। এই বলে তিনি পাতের পোলাও গুলো ঠেলে ফেলে দিলেন।

ঠিক সেই সময় মেয়ের খুড়োর আবির্ভাব।

মুখে বিষ মিশিয়ে করালীবাবু বল্লেন বাড়ীতে কে কত পোলাও খান জানা আছে! এমন করে জিনিষ নষ্ট করা!

কন্যাপক্ষের তরফ্ থেকে এই কথায় মৌচাকে যেন ঢিল ছোঁড়া হল। বরযাত্রদের মধ্যে প্রথমে মৃদু কাণাকাণি। কিন্তু ইতিমধ্যে সেই ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠেছেন। চীৎকার করে বল্লেন, কী! বাড়ীতে নেমতন্ন করে এনে অপমান! আমরা জীবনে পোলাও খাইনি! না হয় জমিদারেরই মেয়ে!

বরযাত্রেরা সবাই সায় দিয়ে বল্লে, ঠিক কথা! এখানে আর জল গ্রহণ করা উচিত নয়।

হা-হা করে ছুটে এলেন জমিদার রামসদয়বাবু নিজে··· ছুটে এলেন মাণিকের বাপ তারিণীবাবু। কিন্তু কার কথা কে শোনে! পাতা উল্টে পা দিয়ে জলের গেলাস ঠেলে ফেলে দিয়ে একটা দক্ষযজ্ঞের কাণ্ড বাঁধিয়ে বরযাত্রের দল বেরিয়ে এলেন।

গোলমাল শুনে মাণিকও তাড়াতাড়ি দোতলার সিঁড়ি বেয়ে তর্ তর্ করে নেমে আস্‌ছিল। পড়বি ত পড় সে একেবারে সেই ভদ্রলোকের সাম্‌নে গিয়ে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ল যিনি পোলাও ঠেলে ফেলে দিয়ে এই গোলযোগের সৃষ্টি করেছিলেন।

মাণিককে দেখে তার দু চোখ আনন্দে নেচে উঠ্‌ল। তিনি লাফিয়ে উঠে বল্লেন, এই যে মান্‌কে,—তুই-ও বরের আসন থেকে উঠে এসেছিস?—বেশ করেছিস্। চল আমার সঙ্গে—

মাণিককে কোনো কথা বল্‌বার ফুরসৎ না দিয়ে তিনি ওকে পাঁজা কোলা করে তুলে নিয়ে দলের সঙ্গে জমিদার বাড়ীর ফটক পেরিয়ে চলে এলেন।

জমিদার বাড়ীর সানাই হঠাৎ আর্ত্তনাদ করে থেমে গেল!

দেখা গেল—বাসরের সমস্ত আলো নিভে এসেছে... ফুলের মালা, চাঁদ-মালা এদিক ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে ···দু একটা কুকুর খাবারের লোভে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে···সেই আলো-আঁধারীর মধ্যে দাঁড়িয়ে জমিদার রামসদয় বাবু আর মাণিকের বাবা তারিণী বাবু—

তারিণী বাবু বল্লেন, দাদা আমি যে তোমার মুখের দিকে চাইতে পারছি নে! এত বড় অঘটন আমার তরফ্ থেকে হবে এ যে আমি ভাব্‌তেই পারি নে!

রামসদয়বাবু বল্লেন, ভেবে লাভ নেই ভাই! আমি জানি আমার ঐ গোঁয়ার গোবিন্দ ভাই করালীই এই কাণ্ড বাঁধিয়েছে! যাক্ সবই ভবিতব্য। শুভ কাজে বাধা পড়ল···লগ্ন উৎরে গেছে। কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি— মাণিকের সঙ্গেই সোণালীর বিয়ে আমি দেবো। তবে এখন নয়···ওরা দু'জনে বড় হোক...মাণিক মানুষ হোক

তারপর। গৌরী দান করবার সখ আমার ঘুচে গেছে।

তারিণীবাবু কি বল্‌তে যাচ্ছিলেন—রামসদয়বাবু তাকে থামিয়ে দিয়ে বল্লেন, কিছু তোমায় বল্‌তে হবে না ভায়া! যারা এই কাণ্ড করেছে তারা তোমার সংসারের কেউ নয়—আমার সংসারেরও কেউ নয়। প্রাণের টান তাদের নেই। তুমি আমার ছোট ভায়ের মতো··· তোমায় এই কথাটাও জানিয়ে রাখ্‌ছি—মাণিককে লেখা-পড়া শেখাবার সমস্ত ভার আমার।

পরদিন মাণিক আর সোণালী সবাইকে লুকিয়ে লিচু বাগানে এসে মিলেছে।

সোণালী বল্লে, তুমি ত বেশ মজার লোক মাণিক দা! ঠাকুরমা বল্‌ছিল বরের আসন থেকে বর উঠে পালিয়ে গেছে তাই বিয়ে হল না! মা কত কাঁদছিল কাল।

মাণিক বল্লে, দূর পাগ্‌লি, তাই বুঝি? আমি কেন পালিয়ে যাবো? হারাধন মামা আমায় পাঁজা কোলে করে নিয়ে গেল যে! আমি কত হাত-পা ছুঁড়লুম কিছুতে আমায় ছাড়লে না। নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে আট্‌কে রাখ্‌লে। সবাই পেট ভরে লুচি সন্দেশ খেলে আমি কিছুটি খেতে পেলাম না।

সোণালী বল্লে, বল কি মাণিকদা! তোমায় না খাইয়ে রেখেছিল! এই যে নাও! কাল বরের জন্যে যে সব সন্দেশ তৈরী করে ছিল আমি লুকিয়ে আঁচলের তলায় নিয়ে এসেছি···এই খাও—

মাণিক বল্লে, দে। তারপর গপাগপ সন্দেশ ওড়াতে লাগ্‌লো। খাওয়ার মাঝখানে হি হি করে হেসে উঠে বল্লে, বর হবার আগেই বরের সন্দেশ খেয়ে নিলাম! ভারী মজা না রে?

সোনালী খুসী হয়ে বল্লে, একটা কিন্তু ভারী সুবিধে হয়েছে। মাণিক শুধোলে, কি রে কি?

সোনালী বল্লে; এখন তোমার নাম ধরে ডাকলে কেউ

পৃথ্বিবল্লভে শ্রীমতী মীনা

কিছুই বল্‌বে না! বিয়ে ত আর হয় নি!

দু'জনে মনের আনন্দে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠ্‌ল।

সোনালী যখন মাটিতে আঁচল লোটাতে লোটাতে বাড়ী গিয়ে পৌছল তার ঠাকুমা ডেকে বল্লেন, হাঁরে সোনালী, তোর কি এতটুকু লজ্জা সরম নেই? কাল এই কেলেঙ্কারীটা হয়ে গেল আর তুই আঁচল লুটিয়ে পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছিস?

করালী খুড়ো এসে ফোঁড়ন দিয়ে বল্লে, পাড়া বেড়ানো-তেই তুমি আপত্তি তুলছ, কিন্তু তোমার গুণের নাত্‌নী যে কালকে ভেস্তে-যাওয়া-বরকে সন্দেশ খাইয়ে এলো—আমি নিজ চক্ষে দেখে এলাম।

ঠাকুমা গালে একটা আঙ্গুল রেখে বল্লেন, এ্যাঁ! তুই বলিস্ কি করালী! নাঃ! আজকালকার মেয়েরা পেটে থেকে পড়েই সেয়ানা হয়—

করালী বল্লে, শুধু কি তাই জেঠাইমা! দুজনে গলাগলি ধরে সে কি হাসা হাসি!

সোনালী শুধু বল্লে, কেন তুমি আমার পেছনে লাগ

করালী খুড়ো? আমি তোমার কি করেছি? সে আর কিছু বলতে পারলে না। তার দু চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়তে লাগ্‌ল।

এই সময় রামসদয় বাবু সেখানে এসে হাজির হলেন। সোনালীর সেই অবস্থা দেখে তাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বল্লেন, নাঃ, তোমরা আমার মাকে কিছু বোলো না। ওর চোখের জল আমি দেখ্‌তে পারি না।

আড়াল থেকে সোনালীর মা বল্লেন, উনিই ত আদর দিয়ে মেয়েটার মাথা খেলেন।

রামসদয় বাবু একটু মুচ্‌কি হেসে মেয়েকে নিয়ে চলে গেলেন। সোনালী তখন বাপের বুকে মুখ লুকিয়েছে।

এর সপ্তাহ খানেক পরের ঘটনা।

গ্রামের বুড়ো ভট্‌চাজ মশাই রামসদয় বাবুর কাছে এসে উপস্থিত। তিনি বল্লেন, দেখ ভায়া, তুমি গ্রামের জমিদার, তুমি যদি তোমার মেয়েকে শাসন না কর তবে আমরা ক' ঘর গরীব মারা যাই—

রামসদয় বাবু বল্লেন, কেন, কি করেছে আমার মেয়ে?

ভট্‌চাজ মশাই বল্লেন, তোমার মেয়ের নিত্যি নতুন দৌরাত্ম্যি! আর তার দোসর হয়েছে তারিণীর ছেলে মাণ্‌কে। জমিদারের মেয়ে বলে কেউ কিছু বল্‌তে পারে না। সবাই আমায় উস্কাচ্ছে—আপনি একবার বলে দেখুন! তাই বল্‌ছিলাম ভায়া, বিয়েটাও দিলে না—আবার গ্রামের ওপর বসে ধিঙ্গিপনা—

রামসদয় বাবু একটু বিরক্ত হয়ে বল্লেন, ভণিতা শুনতে চাই না ভট্‌চাজ মশাই, আমার মেয়ে কি করেছে তাই খুলে বলুন।

ভট্‌চাজ মশাই একটু আম্‌তা আম্‌তা করে বল্লেন, আচ্ছা, নিজের কাণেই যখন শুনতে চাইছ…তখন বল্‌ব বৈ কি! শোনো ভায়া—দেখ্‌লাম—

[ভট্‌চাজ মশাই যে কাহিনী শোনাতে লাগ্‌লেন—ছবির

পর্দায় তাই দেখা যেতে লাগ্‌লো। দেখা গেল :]

সন্ধ্যে উৎরে গেছে—ভট্‌চাজ মশাই তার খালি ঘরে পিদিম জ্বালিয়ে রামায়ণ পড়ছেন; এমন সময় সোনালী এসে উপস্থিত। ভট্‌চাজ মশাই বল্লেন, আয় মা বোস্‌—

সোনালী বল্লে, ভট্‌চাজ জ্যাঠা, তোমার মাথার পাকা চুল বেছে দেবো? ভট্‌চাজ মশাই বল্লেন, তা দিবি—দে!

সোনালী পাকা চুল বাছ্‌তে বাছ্‌তে ভূতের গল্প ফেঁদে বস্‌ল। ভট্‌চাজ মশাই একা বাড়ীতে থাকেন—তার ওপর তিনি আবার অত্যন্ত ভীতু! সন্ধ্যের পর আর বেরুবার নামটি নেই!

সোনালী যত ভূতের গল্প শোনায় ভট্‌চাজ মশাই তত গুড়ি-গুড়ি মেরে বসেন। চোখ দুটো হয়ে ওঠে বড় বড়। ওদিকে দেখা গেল—ভট্‌চাজ মশায়ের বাগানে মাণিক এক গাছা দড়ি বাগিয়ে নিয়ে উঠ্‌ছে নারকেল গাছে। চাঁদের আলোয় দেখা গেল বড় বড় সব ডাব আর নারকেল গাছ ভর্ত্তী ঝুল্‌ছে। মাণিকের দায়ের কোপে এক-একটা ডাব মাটিতে পড়ে আর ভট্‌চাজ মশাই চম্‌কে চম্‌কে ওঠেন।

সোনালী বলে, ভট্‌চাজ জ্যাঠা, তোমার বাড়ীতে ভূতের দৌরাত্ম্যি শুরু হল নাকি?

ভট্‌চাজ মশাই ভয় পেয়ে নাম জপেন—রাম! রাম! রাম।

যখন সমস্ত গাছ নিঃশেষ হয়ে গেল—আর কোনো শব্দ শোনা যায় না—সোনালী দুষ্টুমী করে বল্লে, জ্যাঠা, আমার বড্ড ভয় করছে···আমায় একটু এগিয়ে দাও না—

ভট্‌চাজ মশাই আলোর কাছে সরে গিয়ে বল্লেন, তুই একাই যা না মা—তোদের আবার ভয় কি? বাইরে দিব্যি জ্যোৎস্না ফুটফুট্‌ করছে।

হাস্‌তে হাস্‌তে সোনালী বাইরে বেরিয়ে এলো! মাণিক তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। অতগুলো ডাব দুজনে কি টেনে আন্‌তে পারে? তবু তাদের অদম্য উৎসাহ···গায়ে যেন লাখ হাতীর বল! খানিক দূর গিয়ে জঙ্গলের মাঝখানে নিরিবিলি একটি জায়গা! এইটিই বোধ করি মাণিক আর সোনালীর নিভৃত-ভবন। মাণিক বল্লে, দেখেছিস্‌ সোনা, কেমন জ্যোৎস্না...ঠিক যেন রদ্দুর উঠেছে। সোনালী বল্লে, ভট্‌চাজ জ্যাঠার সঙ্গে বকে বকে আমার তেষ্টা পেয়ে গেছে একটু ডাবের জল দাও—

মাণিক বল্লে—একটা গান না শোনালে দেবো না...

সোনালী বল্লে, তেষ্টা পেলে বুঝি গান গাওয়া যায়?

মাণিক জবাব দিলে, ডাবের জল খেলে যে গলা ঢ্যাব ঢেবে হয়ে যাবে···তখন মোটে গান বেরুবেই না...

সোনালী গান ধরে...মাণিক সঙ্গে গলা মেশায়। হাসির গান। গান শুনে পাড়ার হ্যাপ্‌লা ছোঁড়া এসে হাজির। বল্লে, ও! তোমরা দুজনে এই করছ! যাচ্ছি আমি এক্ষুনি ভট্‌চাজ মশায়ের কাছে—

মাণিক বল্লে, ওরে হ্যাপ্‌লা শোন্‌—শোন্‌···তোকেও না হয় ভাগ দিচ্ছি। হ্যাপ্‌লা সে কথা শুনতে পেলে না··· হন্‌ হন্‌ করে এগিয়ে গেল। সোনালী বল্লে, যাক না! ভট্‌চাজ জ্যাঠার যে ভূতের ভয়! কথাটা বিশ্বাসই করবেন না। আর যদিই বা করেন তবে ঘর থেকে বেরুবার সাহস নেই। দু'জনে খিল্‌-খিল্‌ করে হেসে ওঠে।

গল্প শেষ করে ভট্‌চাজ মশাই বল্লেন, হ্যাপ্‌লার কাছে সব শুনে আমি ছুটতে ছুটতে আস্‌ছি—তোমর বিচার করতে হবে ভায়া।

রামসদয় বাবু গুড়ুক গুড়ুক তামাক টান্‌ছিলেন বল্লেন, কোথায় তারা আমায় দেখিয়ে দেবে চল—

ভট্‌চাজ মশায়ের সঙ্গে রামসদয় বাবু বেরিয়ে চলে গেলেন। সোনালী আর মাণিক তখন মহানন্দে ডাব, নারকেল আর বাতাসা চিবুচ্ছে।

রামসদয় বাবু গিয়ে হাঁক দিলেন, সোনা—, মাণিক— এই দিকে এসো—

সতী অনুসূয়ায় শ্রীমতী শোভনা সমর্থ

দু'জনের মুখে তখন আর বাক্যি নেই!

রামসদয় বাবু আবার গম্ভীর স্বরে বল্লেন, আমি কোনো দিন তোমাদের উঁচু কথা বলিনি। কিন্তু আজ আমি তোমাদের আদেশ করবো। শোনো মানিক, তোমাকে লেখাপড়া শিখতে হবে—মানুষ হতে হবে—এই আমার ইচ্ছা। আর কেউ না জানুক, তোমার বাবা তারিণী তা জানে। আর সোনা, তুমিও শুনে রাখো…যতদিন মানিক সত্যিকারের মানুষ না হয়ে ওঠে ততদিন পর্য্যন্ত তোমাদের দেখা শোনা একেবারে বন্ধ।

রামসদয় বাবুর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা Music বেজে উঠে আকস্মিক আদেশের মতো ঝনাৎ করে থেমে গেল। বনের গাছের ওপর থেকে কতগুলো ঝরা পাতা ঝর ঝর করে ঝরে পড়ল—যেন সময়ের আবর্ত্ত থেকে খসে পড়ল কয়েকটা বছর। ক্যামেরা প্যান্ করে দেখালে—রামসদয় বাবু, ভটচাজ মশাই, সোনালী আর মানিক সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। সোনালী এখন তরুণী, মানিক নব্য যুবক। রামসদয় বাবু আরো বৃদ্ধ হয়েছেন—ভট্চাজ মশাই একেবারে ভেঙে পড়েছেন বল্লেই চলে।

রামসদয় বাবু-ই প্রথমটা কথা কইলেন। বল্লেন, দশ বছর আগে তোমাদের যে আদেশ করেছিলাম, তা তোমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছ। মানিক বৃত্তি পেয়ে আই-এ পাশ করলো। এইবার আমার প্রতিশ্রুতি আমি পালন করবো। ভট্চাজ মশাই সাক্ষী। এই যে সাম্নে দেখ্তে পাচ্ছেন—দু'হাজার বিঘে পতিত জমি…ওটা সব আমি মানিককে দেবো। আমার ইচ্ছে ও পুণায় গিয়ে কৃষি বিদ্যে শিখে আসুক…তারপর ফিরে এসে যদি এই জমি চিনে নিতে পারে, তবে গায়ের চাষীদের আর দুঃখ থাক্বে না…

ভট্চাজ মশাই বল্লেন, আর ভায়া বিয়ের কথাটা?…

রামসদয় বাবু মৃদু হেসে বল্লেন, সে ত' আমার মনে-মনেই রইল ভট্চাজ মশাই……

সোনা আর আর মানিক পরস্পরের দিকে তাকালে।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা সোনালী লুকিয়ে এলো মানিকের কাছে।

মানিক বল্লে, হঠাৎ এতদিন পরে দর্শন যে!

সোনালী বল্লে, বাবার নিষেধ ত আর নেই! শোনো, এই দশ বছর ধরে আমি তোমার জন্যে শেলাই করেছি এই রুমাল। ঢাকাই বুটীতে তৈরী। এর প্রতিটি ছুঁচের ফোঁড় আমার প্রতিটি দিনের ইতিহাস। তাই এ শুধু রুমাল নয়! আজ আমি এটা তোমার হাতে তুলে দিলাম। ওটা থাক্বে তোমার বুক পকেটে…আর আমি থাক্বো তোমার মনের পকেটে কেমন?

মানিক বল্লে, মঞ্জুর, তবে এক সর্ত্তে। সোনালী বল্লে কি?

মানিক বল্লে, দশ বছর তোমার গান শুনিনি…

সোনা মানিককে গান শোনালে। এ সেই গান, যে-গান শুনলে যে গায় তার চোখে আসে জল…যে শোনে তার পায় ঘুম!

রামসদয়বাবু রোগ-শয্যায়!

পুণায় মাণিক সসম্মানে কৃষিবিদ্যায় সাফল্যলাভ করেছে। টেলী এসেছে আজ তার ফিরে আসবার দিন। জমিদার বাড়ীতে তাই আজ একটু উৎসবের আয়োজন হয়েছে। সোনালীর মনেও কি আজ সকাল থেকে রঙ্ ধরেছে? আজ তার মুখে গুন্ গুন্ গান লেগেই আছে।

রামসদয় বাবু কিন্তু আজ বড় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। তাঁর ধারণা হয়েছে তিনি আর ওদের দুটির দু'হাত এক করে দিয়ে যেতে পারবেন না। শরীর আর মন অত্যন্ত দুর্ব্বল। তিনি আজ সমস্ত দিন সেই জন্যে উৎকর্ণ হয়ে রয়েছেন···কখন দোর-গোড়ায় গাড়ীর শব্দ শোনা যাবে।

সোনালী ঠাট্টা করে বল্লে, বাবার কিন্তু সব তাতেই বাড়াবাড়ি—

রামসদয় বাবু জবাব দেন, তুই যখন ছেলে-পিলের মা হবি—তখন বুঝতে পারবি। সোনালী মুখ টিপে হেসে পালিয়ে যায়।

অবশেষে সত্যি গরুর-গাড়ী এসে থাম্‌লো জমিদার-বাড়ীর দোর-গোড়ায়। আনন্দের আতিশয্যে বিছানা থেকে উঠ্‌তে গিয়ে রামসদয় বাবুর হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল।

অতি বড় আনন্দের ভেতর জমিদার বাড়ীতে একটা ম্লান বিষাদের ছায়া এসে পড়ল।

খবর পেয়ে করালী খুড়ো ছুটতে ছুটতে এসে সংসারের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব নিজের হাতে নিলেন।

প্রথমে বাড়ীতে ঢুকেই তিনি রায় প্রকাশ করলেন,—ওই মান্‌কে ছেলেটাই অপয়া! দাদা যে ওর ভেতর কি দেখেছিলেন, তিনিই জানেন। গৌরীদান করতে গেলেন... কেলেঙ্কারীর একশেষ। জলের মতো টাকা পয়সা খরচ করে, লেখাপড়া শিখিয়ে আনলেন, ফল কি হ'ল? নিজের প্রাণটুকুই বেরিয়ে গেল। আমি শেষ কথা বলে দিচ্ছি...আমার দেহে প্রাণ থাক্‌তে আমি আমার ভাইঝির সঙ্গে ওই বাউণ্ডুলে ছেলেটার বিয়ে দিতে পারবো না।

করালী খুড়োর কথা শুনে সোনালী চুপ করে গেল—একটি কথাবও প্রতিবাদ করলে না।

মাণিক কৃষি বিদ্যে শিখে এসেছে···কিন্তু তার আসল কাজে বিঘ্ন ঘটালেন করালী খুড়ো। বল্লেন, ক্ষেপেছ তোমরা। দু'হাজার বিঘে জমি অম্‌নি দিয়ে দিলেই হ'ল? দাদার না হয় শেষ বয়সে ভীমরতি হয়েছিল। আমি ত' খুড়ো হয়ে মেয়েটার এমন সর্ব্বনাশ করতে পারিনে!

সেই দিন সন্ধ্যেবেলা পুকুর ঘাটে মাণিকের সঙ্গে সোনালীর দেখা। মাণিক বল্লে, আমি কল্‌কাতায় যাওয়াই স্থির কর্‌লাম সোনা। একটা যা হোক চাকরী-বাকরী জোগাড় করে নিতে হবে ত?

সোনালী বল্লে, ও! এরই মধ্যে কথাটা কানে গিয়েছে বুঝি? করালী খুড়োর কথাই বুঝি সব? আমার ইচ্ছেটা

রামানুজে ছায়া দেবী

বুঝি কিছুই নয় ? আমি বলছি ; তুমি নালিশ করো—

মাণিক অবাক্ হয়ে বলে, নালিশ করে আমি কি করবো ?

সোনালী বল্লে, তোমার জিনিষ তুমি ফিরে পাবে। তোমার সোনা মিথ্যে কথা বলে না—দেখে নিও। এই বলে সোনালী চলে গেল।

মাণিক কি ভাবলে সেই জানে ! একবার সোনালীর হাতের তৈরী রুমালটা বের করে দেখ্‌লে। তারপর দিনই সদর মহকুমায় নালিশ করে বস্‌লে দু'হাজার বিঘে জমির দখলী স্বত্ব নিয়ে।

আদালত লোকে লোকারণ্য…কিন্তু মাণিকের মামলা জয়ের কোনই আশা নেই। করালী খুড়োর উকীলের বক্তৃতার তোড়ে মাণিকের সমস্ত দাবী ভেসে গেল। এমন সময় সবাই অবাক্ হয়ে দেখ্‌লে—সোনালী নিজে এসেছে মাণিকের পক্ষে সাক্ষী দিতে। সে রামসদয় বাবুর ডায়েরী কোর্টে জমা দিয়ে প্রমাণ করে দিলে যে, স্বয়ং জমিদার বহুকাল পূর্ব্বেই এই জমি মাণিককে দান করে গেছেন। বিচারক মাণিকের পক্ষে 'রায়' দিলেন।

মুখ চূণ করে করালী খুড়ো মামলা হেরে ঘরে ফিরে এলেন। বাড়ীতে এসে চীৎকার করে জানিয়ে দিলেন, এমন ভাইঝির মুখ তিনি আর দর্শন করবেন না। আজই তিনি চলে যাবেন।

মুখে বল্লেন বটে চলে যাবেন, কিন্তু মনে-মনে স্থির করে ফেল্লেন, 'এই যৌবন জল-তরঙ্গ' রোধ করতেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক ঘটক নিযুক্ত করলেন। শুধু তাই নয়—গোপনে নির্দ্দেশ দিলেন, যে এমন একটি পাত্র খুঁজে বের করতে হবে—যার অগাধ সম্পত্তি অথচ তিন কুলে কেউ নেই। অর্থাৎ কি না—করালী খুড়োর আন্তরিক বাসনা হল, এই রকম একটি জামাই বেছে নিয়ে তারও অভিভাবক সেজে এক সঙ্গে দুটি সম্পত্তি নিজের মুঠোর মধ্যে টেনে নেওয়া।

দু'দিন পরে মাণিক জান্‌তে পারলে, সোনালীর বিয়ের জন্যে জমিদার বাড়ী ঘটক আনাগোণা করছে।

সে সব কিছু ভোল্‌বার জন্যে নিজেকে আরো বেশী করে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিলে। ইতিমধ্যে সে গাঁয়ের চাষীদের সব নিজের দলে টেনে নিয়েছে। খানিকটা পতিত জমিতে সবাই মিলে একযোগে লাঙল দেওয়া হয়েছে। ধীরে ধীরে কচি ধানের শীষ মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, বাতাসে দুল্‌তে থাকে। মাণিক একটি গাছের ছায়ায় বসে স্বপ্ন দেখে। কি স্বপ্ন দেখে, তা সেই জানে !

এই রকম একটি ঘুঘু ডাকা নিঝুম দুপুর। হঠাৎ সোনালী এসে উপস্থিত মাণিকের কাছে ! বল্লে এদ্দিন ইচ্ছে করেই আসিনি। নিজের জিনিষের ওপর যে তোমার মায়া নেই তা জানতাম না। জমি যেমন করে কেড়ে নিলে…নিতে পারো নাকি আমায়ও তেমনি করে তোমার কাছে টেনে ? বাবার কি মনে-মনে এই বাসনা ছিল না যে, যখন এই পতিত জমিতে লাঙল পড়বে…ফসল ফল্‌বে… তখন আমিও তোমার পাশে থাকবো ?

মাণিক খাণিকক্ষণ চুপ করে। তারপর জবাব দেয়, কিন্তু তোমার করালী খুড়ো যে ঘটক লাগিয়েছেন, তোমার বিয়ের জন্যে।

সোনালী বল্লে, সেই জন্যেই ত' আমার তোমাকে বেশী ক'রে দরকার। তা কি তুমি বুঝ্‌তে পারো না ?

মাণিক হয় ত' অন্ধকারে আলো দেখে। বলে, কি করতে হবে আমায় বল সোনালী।

সোনালী মাণিকের কানে-কানে কি যেন বলে।

ছেলেবেলাকার ভুলে যাওয়ার দিনের একটা দুষ্টুমীর গন্ধ পেয়ে, মাণিক বহুদিন পর পুলকিত হয়ে ওঠে।

মাঠের কাজের পর চাষার দল যখন ঘরে ফিরে যাচ্ছিল, মাণিক এক জনকে নিরালয়ে ডেকে নিয়ে বল্লে, ওরে পঞ্চা, তোর ঐ ক্ষেতে কাজ করা ময়লা ধুতিগুলি আর কাস্তেটা আজ আমায় দিতে হবে।

পঞ্চা অবাক্ হয়ে বল্লে, কি হবে বাবু?

মাণিক মুচকি হেসে জবাব দিলে, একটু থিয়েটার করতে হবে রে।

পঞ্চা বল্লে, ও! গাঁয়ের বাবুরা থিয়েটার করবে বুঝি? আর তুমি বুঝি বাবু চাষা সাজবে?

মাণিক হাসি গোপন করে মাথা নেড়ে বল্লে, হুঁ।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়—করালী খুড়োর কার-সাজিতে কল্‌কাতা থেকে এক ভদ্রলোক এসেছেন, সোনালীকে দেখ্‌তে। সোনালী তাই মাণিককে চুপি চুপি জানিয়ে গেল—ভদ্রলোককে ভাংচি দিতে হবে।

এই জাতীয় একটি অদ্ভুত কিছু কাজ পেলে, মাণিক আর কিছু চায় না।

কল্‌কাতার ভদ্রলোক সন্ধ্যের দিকে করালী খুড়োর সঙ্গে গ্রামের সড়ক দিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন—এমন সময় একটি চাষার বেশে মাণিক এসে খবর দিলে, বাড়ীতে গিন্নীমা বিশেষ কাজে নাকি তাঁকে ডাকছেন। কল্‌কাতার ভদ্রলোক বল্লেন, বেশ ত! আপনি যান—আমি এদিক-সেদিক একটু গ্রামটা দেখে নিয়ে এক্ষুনি ফিরে যাচ্ছি—

করালী খুড়ো তাড়াতাড়ি ফিরে গেলেন। ভদ্রলোক তখন চাষাটিকে বল্লেন, 'ওহে! তুমি আমায় গ্রামটা একটু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিতে পারো না?

মাণিক একটু নিরিবিলিই চায়। খুসী হয়ে, হাত জোড় করে বল্লে, আজ্ঞে কর্ত্তা—এ আর বেশী কথা কি? আমরা ত জমিদারের খেয়েই মানুষ—চলুন ঐ মাঠের দিকটায়—

ভদ্রলোক কথায় কথায় জিজ্ঞেস্ করলেন, জমিদারের মেয়ে কেমন?'

নিউ থিয়েটার্সে'র হিন্দি চিত্র ওয়াপসের একটি দৃশ্যে অসিতবরণ ও ভারতী

মাণিক জিব্ কেটে জবাব দিলে, আজ্ঞে কর্ত্তা, ছোট মুখে বড় কথা কি ভালো শোনাবে? ভদ্রলোকের কেমন সন্দেহ হল। তিনি জিজ্ঞেস্ করলেন—তোমরা ত' এই জমিদারেরই প্রজা…মেয়েটি কেমন, তোমরা ত' জানো, আমি আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাই কিনা—

মাণিক আবার ভণিতা করে বল্লে, আজ্ঞে ও হচ্ছে বড় ঘরের বড় কথা।

ভদ্রলোকের সন্দেহটা আরও বেড়ে গেল। তিনি চট্‌-করে পকেট থেকে একটি টাকা বের করে মাণিকের হাতে গুঁজে দিয়ে বল্লেন—এইবার সত্যি কথা বল ত' বাপু—তোমার কোনো ভয় নেই—

চাষা এইবার খুসী হয়ে মুখ খুল্‌লে। বল্লে, শুনুন বাবু, মেয়েটা বড্ড ঢলানি...কি বলব আমরা মুখ্যু মানুষ...এই গাঁয়েরই একটি ছেলের সঙ্গে বড্ড গায়ে পড়া ভাব। পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলে...বুঝতেই ত' পাচ্ছেন।

এই কথা শুনেই ভদ্রলোকের মুখটা একেবারে গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি বেড়ানো বন্ধ করে, ফিরে চল্লেন। চাষা শুধোলো, এগ্নি মধ্যে ফিরে চল্লেন যে বাবু? ভদ্রলোক জবাব দিলেন, নাঃ. শরীরটা খারাপ লাগছে।

চাষা মুচ্‌কি হেসে, নিজের পথ ধরলে। চাষার গলায় তখন গান জেগেছে।

পরদিন দুপুর বেলা সোনালী সেই ছায়া শীতল গাছ তলায় এসে উপস্থিত। মাণিক বল্লে, কি গো, জমিদার নন্দিনী! তোমার শ্বশুর মশাই গেলেন কোথায়? সোনালীর মুখে আর হাসি ধরে না। জবাব দিলে, তোমার দাওয়াইয়ে চমৎকার কাজ দিয়েছে মাণিকদা। আজ সকালে আমার রূপ পরীক্ষা করবার কথা ছিল। কিন্তু শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে অতি ভোরেই লম্বা—

মাণিক বল্লে, কিন্তু তোমার শ্বশুরের একটি টাকা রয়ে গেছে যে আমার কাছে– তুমি তার ভাবী পুত্রবধূ। রেখে দিও তোমার সিঁদুরের কৌটোতে।

সোনালী মুখ ভারী করে বল্লে–যাও! বাজে বোকো না! তারপর হঠাৎ মুখখানিকে ঝল্‌মলে করে বল্লে, এই যে নাও—নকল শ্বশুরের জন্যে তৈরী করা খাবার, না হয় আসল শ্বশুর-নন্দনের মুখেই উঠুক—সোনালী খাবারের পুঁটুলী এগিয়ে দেয়।

মাণিক বল্লে,—ওতে আমার অরুচি নেই কোনো দিনই। সে তাড়াতাড়ি পুঁটুলী খুলে তাতে বিশেষ করে মনোযোগ দেয়।

এর মধ্যে একটি চাষা তামাক খেতে গাছ তলায় এসে হাজির হল। জমিদারের মেয়েকে দেখে, প্রণাম করে বল্লে, পেন্নাম হই দিদিমণি। কাল তোমায় দেখ্‌তে এসেছিল বুঝি?

সোনালী মাণিকের দিকে একবার কটাক্ষ করে জবাব দিলে, হ্যাঁরে! পছন্দ হয়নি বলে সাফ্‌ জবাব দিয়ে চলে গেল?

চাষা বল্লে, এমন লক্ষ্মী প্রিতিমে! না দিদিমণি, ভদ্র-লোকের তা হলে চোখ নেই।

মাণিক বল্লে, হুঁ দুটো চোখই কানা! তারপর হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল।

এই সময় যুদ্ধের দরুণ গোটা দেশে চালের দাম ধাপে ধাপে বেড়ে যেতে লাগ্‌লো। আমাদের বাঁশ পাপ্‌তা গ্রামে তার ছোঁয়াচ এসে লাগ্‌লো। চাষীরা পেট পুরে খেতেই পায় না ত মাণিকের পতিত জমিতে ভালো করে খাটবে কি? খানিকটা জমিতে ফসল উঠ্‌ছে বটে কিন্তু অধিকাংশ জমিই পতিত রয়ে গেছে। সেই সব জমিতে ফসল দেখতে হলে চাষীদের আগে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হবে।

ওদিকে করালী খুড়ো গোপনে গাঁয়ের সমস্ত আড়ৎ-দারদের টাকায় হাত করে সমস্ত গাঁয়ের জমানো ধান নিজের গোলাজাত করে ফেল্লে। চাষীরা যখন সেই খবর শুন্‌তে পেলে—সবাই কেঁদে কেটে একেবারে মাণিকের পায়ের ওপর গিয়ে পড়ল। বল্লে, বাবু এইবার সব বাচ্চা নিয়ে পেটের জ্বালায় শুকিয়ে মারা যাবো। প্রাণে বেঁচে থাক্‌লে তবে ত' তোমার সঙ্গে মাঠে খাট্‌তে পারবো।

মাণিক এর কোন উপায় খুঁজে পায় না। দু'হাজার পতিত জমি···হয়ত দুশ বিঘেতে ফসল উঠ্‌ছে। এদের পেটের অন্ন সংস্থান করতে পারলে এই হাজার বিঘে পতিত

পৃথ্বীবল্লভে ঃ সোহরাব মোদী
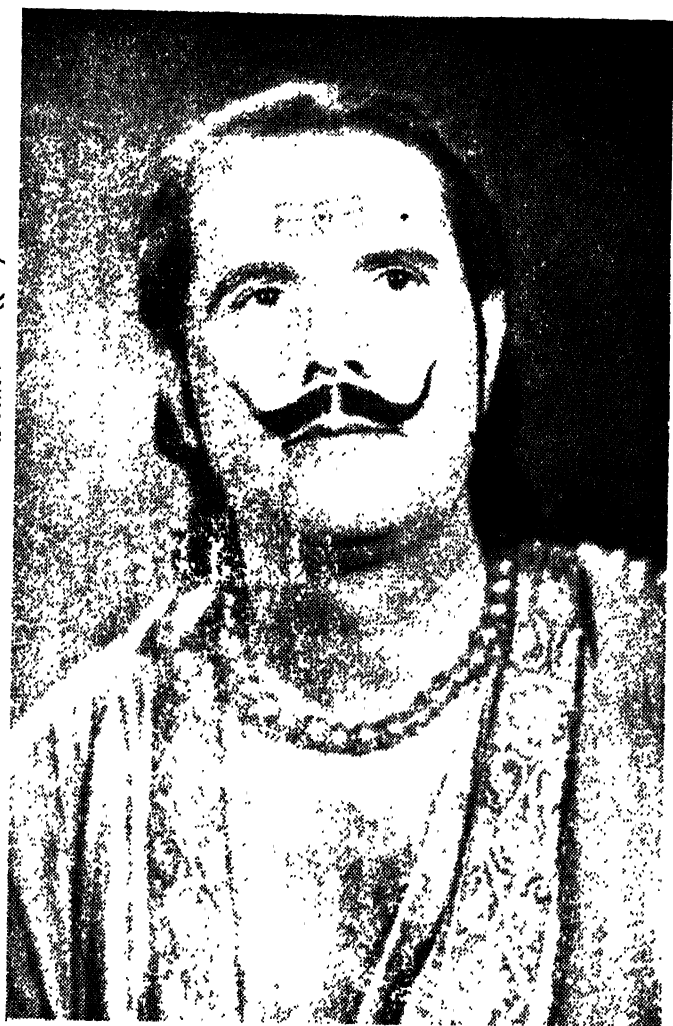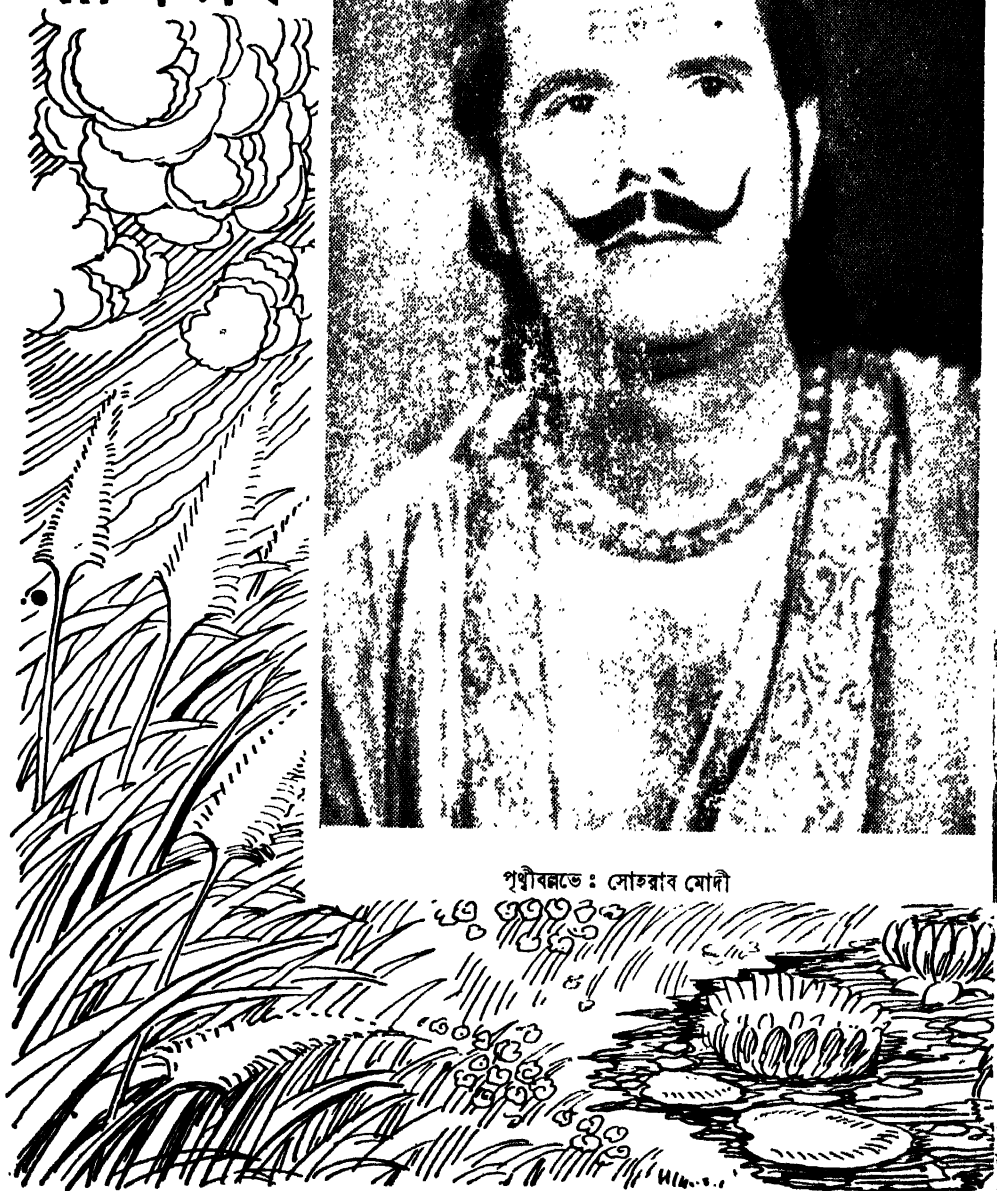
মেট্রোপলিটন ডিস্ট্রিবিউটর্স
পরিবেশিত অঙ্গুঠী চিত্রে
প্রণয়ী - যুগল..................
অশোককুমার ও চন্দ্রপ্রভা

জমিতে ফসল ফলত। তখন গোটা গাঁয়ের লোকের অভাব দূর হত। রামসদয়বাবুর সোণালী স্বপ্নকে বুঝি মাণিক সফল করতে পারে না! একা একা প্রেতের মতো গভীর রাত্রে সে মাঠের চার পাশ দিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

এমনি এক নির্জ্জন রাত্রে সোণালী মাণিকের সঙ্গে ক্ষেতের পাশে এসে দেখা করলে। মাণিক বল্লে, এত সাহস তোমার ভালো নয় সোণা। তোমার ভয় করে না? সোণালী বল্লে, তোমার কাছে আস্‌বো তাতে আবার ভয় কি? জানো তো বাবাই আমার মনে বল দিচ্ছেন।

মাণিক বল্লে, এ কয় রাত্রি আমি শুধু তাঁর স্বপ্নের কথাই ভাব্‌ছি। বুঝি তার কল্পনাকে আমি রূপ দিতে পারলাম না।

সোণালী বল্লে, তুমি হঠাৎ ক্ষেতের কাজ বন্ধ করে দিলে কেন? মাণিক জবাব দিলে, ইচ্ছে করে কি আর দিলাম সোণা? চাষীর দল ক্ষিদের চোটে পেট ভাতায় এখানে-ওখানে কাজে লাগ্‌ছে···হয়ত জমিদার বাড়ীতেই দলে দলে জন খাটতে গেছে। পতিত জমি আবাদ করলে এখন তাদের খোরাকী ধান জোগাবে কে?

দৃপ্ত কণ্ঠে সোণালী বল্লে, জোগাবো আমি।

মাণিক সোণালীর কণ্ঠস্বরে অবাক হয়ে যায়। বল্লে, তুমি জোগাবে? সোণালী বল্লে, হ্যাঁ, এ আমার বাবার কল্পনা···সে কল্পনা আমাকেই সার্থক করে তুলতে হবে। তুমি ত শুনেছ মাণিকদা যে, করালী খুড়ো গোটা গাঁয়ের ধান মজুত করে ফেলেছে। সে ত আমার বাবারই টাকায়। ওই ধান আমি চাষীদের বিলিয়ে দেব। তারা পেটে খেয়ে বাঁচুক আর আমার বাবার স্বপ্নকে সার্থক করে তুলুক—তুমি আমার সহায় হও মাণিকদা—

মাণিক বল্লে, তোমার কথা শুনলে মনে হয়···এই কাল-নিশার অবসান হবে···আবার নতুন সূর্য্য উঠবে। সোণালী ধানে ক্ষেত ভরে যাবে কিন্তু সোণা, তোমার খুড়ো মশাই ওই ধান বিলিয়ে দিতে দেবেন কেন?

সোণালী জবাব দেয়, বিলিয়ে আমায় দিতেই হবে। নইলে রাত্তিরে আমার ঘুম হয় না। মনে হয় বাবা আমার কাণে-কাণে বলছে···ওরে, চিরদিন আমি ওদের বাঁচিয়েছি··· আজ ওদের পেটের ক্ষিদে দূর করে নতুন করে সোণার ফসল ফলিয়ে ওদের বাঁচবার সুযোগ দে—

মাণিক বল্লে, কিন্তু কি করে ঐ ধান আমরা পাবো? করালী খুড়োর সঙ্গে দাঙ্গা ত করতে পারিনে।

সোণালী জবাব দিলে, দাঙ্গা কেন করবে? শোনো, কাল অমাবস্যার রাত। সূচিভেদ্য অন্ধকার। রাত দুটোর সময় তুমি যাবে আমাদের ওখানে। আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে গোলা খুলে দেবো···চাষীরা এক এক করে যাবে আর আমার হাত থেকে ধামা ভর্ত্তী ধান নিয়ে আস্‌বে।

মাণিক বল্লে, কিন্তু করালী খুড়ো?

সোণালী মৃদু হেসে জবাব দিলে খুড়ো মশায়ের কুম্ভকর্ণের ঘুম। খাওয়া-দাওয়ার পর নিদ্রা এলে—পরদিন সকাল ন'টার আগে কিছুতেই ভাঙে না। কাজেই তুমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারো।

পরদিন গভীর রাত্রে কালী বাড়ীর পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল। মাণিক ততক্ষণে চাষীদের নিয়ে ক্ষেতের পাশে জড় হয়েছে। সে বল্লে, প্রথমটা আমি একা যাবো—তারপর শব্দ করলে তোরা এক এক করে যাবি···সাবধান গোলমাল করিস্‌নি কিন্তু।

চাষীর দল মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে।

নিস্তব্ধ নিঝুম রাত। যেখানে তার সকল রকম অধিকার থাক্‌বার কথা মাণিক আজ বহুদিন পর সেই বাড়ীতে যাচ্ছে চোরের মতো। ঝিঁঝিঁ পোকা এক টানা

ডেকে চলেছে। মাণিক কি আর অন্ধকারে অভিসারে বেরিয়েছি?

মৃদু প্রদীপ জ্বালিয়ে গোলাঘরের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে সোণালী নিজে। সোণালী ও আজ অভিসারে বেরিয়েছে। এই আলো আঁধারের মাঝখানে এত চেনা সোণাকে মাণিকের আজ রহস্যময়ী বলে মনে হচ্ছে। সোণাই প্রথমে কথা কইলে: বল্লে, অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছ কি? এই নাও চাবি···গোলা ঘর খুলে দাও—

মন্ত্রমুগ্ধের মতো মাণিক সোণালীর হাত থেকে চাবি নিয়ে গোলাঘর খুলে দিলে···তারপর হাততালি দিয়ে ইসারা করতেই একে একে চাষীর দল এসে ঢুকতে লাগ্‌লো। এলো—কুঞ্জ, এলো পঞ্চা, এলো জাফর আলি, এলো পরাণে মালী···সবাই নিঃশব্দে ধান নিয়ে দিদিমণিকে আশীর্ব্বাদ করে যেতে লাগ্‌ল।

এই সময়ে হঠাৎ দেখা গেল—মশাল হাতে স্বয়ং করালী খুড়ো এসে দাঁড়িয়েছেন। মুখে বিষ মেখে তিনি বল্লেন, ও! সেই কথা বল্লেই হয়। জমিদার বাড়ীর মেয়ে আজ লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে দেবী চৌধুরাণী হয়ে উঠেছেন! তা ব্রজেশ্বরটি জুটিয়েছে ভালো।

সোণালী আগুনের মতো জ্বলে উঠ্‌ল। বল্লে, আপনার বহু অত্যাচার আমি ভুল করে সহ্য করেছি করালী খুড়ো কিন্তু দশ জনের মুখের অন্ন এমন করে ছিনিয়ে এনে লুকিয়ে রাখবার অধিকার কারো নেই। এ আমি বিলিয়ে দেবো। এ সম্পত্তি আমার।

করালী খুড়ো ঠোঁট বাঁকিয়ে বল্লেন, হুঁ। যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর। তারপর হঠাৎ মরিয়া হয়ে হুকুম দিলেন. এই রাম সিং, গোলা ঘরের ফটক বন্ধ করো—

সোণালী পথ রোধ করে বল্লে, তা হলে আমায় মেরে ফেলে সে কাজ করতে হবে। চাষীরা চঞ্চল হয়ে উঠল। মাণিক ডাক্‌লে সোণালী সরে যাও—

সোণালী বল্লে, না, আজ শেষ মীমাংসা হয়ে থাক— বাবার সম্পত্তির মালিক আমি না করালী খুড়ো—

করালী খুড়ো নিজের দুর্ব্বলতাটা বোধ করি বুঝতে পারলেন। তাই বল্লেন, আচ্ছা, যাচ্ছি আমি— বৌঠাকরুণের কাছে—দেখি তিনি এর কি বিচার করেন।

সোণালী সেদিকে দৃকপাত না করে রাণীর ভঙ্গিমায় বল্লে, এসো তোমরা ধান নিয়ে যাও—

চাষীর দল আবার একে একে এগিয়ে এলো।

ধান্য-বিতরণ সমভাবেই চল্‌তে লাগলো।

পরদিন সকাল বেলা সোণালীর মা সোণালীকে ডেকে বল্লেন, ঠাকুরপোর কাছে সব শুনলাম। কিন্তু তুমি ত আর ছোটটি নয়। মাথার ওপর তিনিও নেই—এত জমিদার বাড়ীর কি তুই নাম ডোবাবি?

সোণালী বল্লে, তোমার ঠাকুরপোর বুদ্ধিতে জমিদার বাড়ীর নাম তোমরাই ডোবাচ্ছ মা···বাবা বেঁচে থাক্‌লে এমনটি হতে পারত না!

মা বিরক্ত হয়ে বল্লেন, না-না—এ ত ভালো কথা নয়। মেয়েছেলের এত বাড় ভাল নয়। এখন থেকে তোমার আর মাণিকের সঙ্গে মেলামেশা চল্‌বে না। ছোঁড়াটার ঘর ভাঙ্‌বার মতলব। আর এমন কি ও ভালো পাত্র শুনি? ঠাকুরপো কোন্ জমিদার ঘরের এক মাত্র ছেলের খোঁজ পেয়েছেন—সেইখানেই আমি তোর বিয়ে দেবো।

সোণালীর মা এই রায় দিয়ে রাগ করে চলে গেলেন।

কথাটা যথা সময়ে প্রতিবেশিনীদের দৌলতে মাণিকের মায়ের কাণে গিয়ে উঠ্‌ল। তিনি ছেলেকে ডেকে পাঠিয়ে বল্লেন, দেখ বাপু আজ আমাদের কর্ত্তাও নেই জমিদারবাবুও বেঁচে নেই। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কথারও আর দাম কেউ দেয় না! আমি বহু দিন মুখ বুঁজে অপেক্ষা

করেছি। এমন করে আর আমি সংসার আগ্‌লে থাক্‌তে পারবো না। তোকে বিয়ে করতে হবে। আমি আমার গঙ্গা জলের মেয়ের সঙ্গেই তোর বিয়ে দেবো। না—না–কোন অমতই আমি শুনবো না। গঙ্গাজলকে আমি চিঠি লিখে দিয়েছি। তোর মেশো দুদিনের মধ্যেই এখানে এসে তোকে আশীর্ব্বাদ করে যাবেন।

মাণিক মহা মুস্কিলে পড়ল। এইখানেই ওর দুর্ব্বলতা। মায়ের কথার অবাধ্য ও কোনো মতেই হতে পারে না। ওর দুখিনী মায়ের কোন সাধ-আহ্লাদই ও জীবনে পূর্ণ করতে পারে নি। আজ কি করে তাকে বিমুখ করবে?

অনেক ভেবে চিন্তে মাণিক সন্ধ্যের মুখে জমিদার বাড়ীর খিড়কীর পুকুরের পাড়ে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইল। জান্‌তো সন্ধ্যে বেলা সোণালী একবার গা ধুতে এইখানে আস্‌বেই। ওকে খুব বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না কলসী ভাসিয়ে সোণালী এসে জলে নামল। হঠাৎ ঠুন্ করে একটা ঢিল সোণালীর পেতলের কলসীর ওপর এসে পড়ল। সোণালী এদিক ওদিক তাকাতেই... দুজনের চোখোচোখি হয়ে গেল। সোণালী বল্লে, আজ আমার এত ভাগ্যি, মেঘ না চাইতেই জল?

মাণিক বল্লে, সোণা, চেঁচিয়ে কথা বল্‌তে পার্‌বো না··· সাঁত্‌রে এই পারে এসো—

সোণালী কলসী ধরে সাঁত্‌রে মাণিকের কাছে গেল। বল্লে, ভয় নেই। এই সময়টা এই পুকুরে কেউ আস্‌বে না···যতক্ষণ না আমার স্নান হয়। জমিদারী হুকুম কি জানো তো?

ঠোঁট উল্টে মাণিক বল্লে, জানবার আর সুযোগ পেলাম কৈ? সোণালী বাঁকা হাসি হেসে বল্লে, তপস্যা করো—

মাণিক জবাব দিলে, কিন্তু তপস্যায় যে বিঘ্ন উপস্থিত হয়েছে। সোণালী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চাইলে। মাণিক সব কথা খুলে জানালে সোণালীকে। তারপর বল্লে, এইবার তোমার পালা।

সোণালী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে জবাব দিলে, এইবার আমায় অভিনয় করতে হবে এই কথা ত? ভেবেছ জমিদারের মেয়ে একেবারে হাবা গোবা কিছুটি জানে না! দেখে নিও···তোমার মেশোকে যদি ঘোল খাওয়াতে না পারি তবে আমার নাম পাল্টে রেখো—

মাণিক বল্লে তবে আমি নিশ্চিন্ত?

সোণালী যাত্রার রাণীর ধরণে জবাব দিলে—দূত, তুমি নির্ভয়ে চলে যেতে পারো।

ওদিকে দিন দুই বাদে সত্যি সত্যি—মাণিকের মেশো এসে উপস্থিত হলেন মাণিককে আশীর্ব্বাদ করতে। মাণিকের মা তার গঙ্গাজলের বরকে বেয়াই-আদরে ঘরে ডেকে নিলেন। বল্লেন, এখন থেকে আপনাকেই ওর মুরুব্বী হতে হবে। ওর পেছনে দাঁড়াবার ত আর কেউ নেই। মেশো বল্লেন, সেজন্য আপনাকে ভাব্‌তে হবে না বেয়ান ঠাকরুণ; মাণিকের এ ভাবে চাষার মতো গাঁয়ে পড়ে থাকার দরকার কি? আমি সহরে ওর ভালো চাকরী জোগাড় করে দেবো। মেয়ে আমার সহরে থেকেই মানুষ...তারত' এ অজ পাড়া গাঁয়ের জল হাওয়া সহ্য হবে না।

কথাটা শুনে মাণিকের মায়ের কেমন যেন ভাল লাগ্‌লো না।

সন্ধ্যেবেলা মেশোবাবু মাণিকের বাড়ীর সাম্‌নেকার রাস্তায় পাইচারী করে সিগারেট টান্‌ছিলেন এমন সময় অল্প বয়সী একটি বিধবা স্ত্রীলোক লম্বা ঘোমটা টেনে তার সাম্‌নে এসে হাজির হল। মেশোবাবু শুধোলেন, কি চাই তোমার? মেয়েটি বল্লে, আমি বাগ্‌দীদের মেয়ে গো। এইটি কি মানিকবাবুর বাড়ী?

মেশোবাবু একটু বিরক্তির সুরে বল্লেন, হ্যাঁ। কিন্তু তোমার কি চাই তাই বল না।

মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে উঠে মেয়েটা বল্লে. আমি আর

কি চাইব? মাণিকবাবু রোজ রাত্তিরে আমার দিদির কাছে যায়···তাকে কত গয়না দিয়েছে···ছুদিন হল যাচ্ছে না···তাই দিদি আমায় পাঠিয়ে দিলে কি হয়েছে দেখ্‌তে। তা হ্যাঁগা বাবু, তুমিই বাবুর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এসেছ? আমি মাণিকবাবুকে শুধোবো—আমার দিদির দশা কি হবে!

মেশোবাবু গর্জ্জে উঠ্‌লেন, যা—যা ছোট লোক মাগি··· দিক্‌ করিস নে! সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাগে গর্‌ গর্‌ করতে করতে তিনি আর দিকে চলে গেলেন। তারপর আপন মনে বিড় বিড় করে বল্লেন, তখনই বলেছিলাম···এতদিন পর্য্যন্ত যখন ছেলে আইবুড়ো হয়ে আছে নিশ্চয়ই তার স্বভাব-চরিত্রের দোষ আছে। না:— গিন্নীর একেবারে ধনুক ভাঙা পণ গঙ্গাজলের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে! যত সব·······পাড়া গেঁয়ে কাণ্ড!

ওদিকে ঝোপের আড়ালে সোণালীর হাসি-খুসী মুখখানা দেখা গেল। তারপর সে প্রকাণ্ড একটা ঘোমটা টেনে···নিজের বাড়ীর দিকে তাড়াতাড়ি ফিরে চল্লো।

এই সময়ে মাণিক গাঁয়ের পথ ধরে বাড়ী ফিরছিল। ঘোমটা টানা অচেনা মেয়ে ছেলে দেখে সে পথের এক পাশে সরে দাঁড়ালো

ঘোমটা টানা মেয়েটি হন্‌ হন্‌ করে চল্‌তে চল্‌তে রসিকতা করে বলে গেল, যাও গো হবু বর, এইবার বাড়ী গিয়ে মেশোর পায়ে ধরে সাধাসাধি করলেও আর মেয়ে দিচ্ছেন না!

মাণিক অবাক হয়ে সেই দিকে তাকিয়ে রইল! তারপর তার মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌ল।

ইতিমধ্যে গোটা গাঁয়ে একটা থম্‌থমে ভাব জেগে উঠেছে। পথে ঘাটে চাষীদের চোখে-মুখে একটা লোলুপতার ছাপ। কাঁচা টাকা আর ধানের জন্যে কখন যে সবাই জমিদার বাড়ীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে কেউ বল্‌তে পারে না।

মাণিক সবাইকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে অনেক করে ঠাণ্ডা করে রেখেছে। কিন্তু পেটের ক্ষিদে ত' কারো কথায় বুঝ্‌ মান্‌তে চায় না!

করালী খুড়ো ভয় পেয়ে দরোয়ানের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছেন। তবু তাঁর রাত্রে ঘুম নেই। মশাল নিয়ে একা একা গভীর রজনীতে যখের মতো তাঁকে ঘুরে বেড়াতে গাঁয়ের অনেকেই দেখেছে।

নানা রকম ফসলের বীজ সংগ্রহ করে নিয়ে আস্‌বার জন্যে মাণিককে দিন কয়েকের জন্যে একবার কল্‌কাতা যেতে হবে। চাষের জন্যে কয়েকটি যন্ত্রপাতিও তার কেনা দরকার। মাণিকের ইচ্ছে ছিল যাবার আগে একবার সোণালীর সঙ্গে দেখা করে যায়। কিন্তু কিছুতেই তার সে সুযোগ ঘটল না। বোধ হয় ভেতরে ভেতরে করালী খুড়োর এতে হাত ছিল।

মাণিক গ্রাম ছেড়ে চলে যেতেই করালী খুড়ো সোণালীর মাকে ডেকে বল্লেন, শোনো বৌঠাক্‌রুণ, এতদিন কথাটা কারো কাছে ভাঙিনি। সোণালীর জন্যে রাজপুত্রের মতো বর ঠিক করে রেখেছি। অগাধ সম্পত্তি— কিন্তু মাথার ওপর দেখ্‌বার কেউ নেউ। ওই মান্‌কে ছোঁড়ার চাষার দলকে আমার ভারী ভয় ছিল। আজ ও গ্রামের বাইরে গেছে···আর আমি কাউকে ভয় করিনা। তাই সাম্‌নের বিয়ের তারিখেই দু'হাত এক করে দেবো।

সোণালীর মা বল্লেন, তাই কারো ঠাকুরপো,···খুড়োর কাজ করো। মেয়েটা যে এমন ধিঙ্গি হয়ে থাকবে তা আমি চোখ মেলে তাকিয়ে দেখ্‌তে পারিনে। হাজার হোক···জমিদার বাড়ীর একটা নামডাক্‌ আছে ত!

তাঁর মুখের কথা লুফে নিয়ে করালী খুড়ো বল্লেন, ঠিক

কথা। পূর্ব্ব পুরুষের নাম বজায় রাখ্‌তেই হবে। দাদার শেষ বয়েসে ভীমরতি হয়েছিল। তোমার কোনো ভাবনা নেই বৌঠাকৃরুণ, শুভকার্য্য আমি সমাধা করে দেবই। কথায় বলে গোবধের সময় খুড়ো কর্ত্তা ···এ ত সামান্য বিয়ের ব্যাপার। করালী খুড়ো নিজের রসিকতায় নিজেই বোকার মত হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

আড়াল থেকে সোণালী সব কিছুই শুন্‌তে পেলে।

সোণালী এবার বিয়েতে কিছুমাত্র প্রতিবাদ করলে না শুধুগোপনে বিমল বলে গ্রামের একটি ছেলেকে ডেকে পাঠাল। বিমল মাণিকের নিত্য-সহচর—মাণিকের ছায়া বল্লেও বেশী বলা হয় না। সোণালী সেই বিমলের কাণে-কাণে কি যেন সব বল্লে।

—~~বিমল~~ জবাব দিলে, এ আর বেশী কথা কি সোণালী দি, আমি আজই রওনা হয়ে যাচ্ছি।

এদিকে চাষার দল গোপনে জড় হয়ে শলা-পরামর্শ করছে।

দলের নেতা-জাফর আলি আর পঞ্চা। জাফর আলি বল্লে, ভাই সব, এদ্দিন মাণিকবাবুর মুখের দিকে চেয়েই আমরা করালী খুড়োর বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করিনি। কিন্তু আর আমরা কিছুতেই চুপ করে থাক্‌বো না।

পঞ্চা বল্লে, আমরা ত' পাথর নই···আমাদের ক্ষিদে আছে, তেষ্টা আছে...আমাদের আপনার জন মারা গেলে আমরাও বুক চাপ্‌ড়ে কাঁদি। করালী খুড়ো গাঁয়ের সব ধান মজুত করে ফেলেছে। চাষীরা এক মুঠি খেতে পায় না। কচু সেদ্ধ আর এক মুঠি করে জোয়ার খেয়ে মানুষ ক দিন বেঁচে থাকতে পারে? আমাদের চোখের সামনে জাফর আলির মেয়েটা ছট্‌ফট্‌ করে মারা গেল। আমার বুড়ো বাপ মরবার সময় ও ভাত ভাত করে কেঁদে গেছে। এ অত্যাচার আমরা আর ক'দিন মুখ বুঁজে সহ্য করবো! জাফর আলি বল্লে, ও শুধু আমাদের দুষমণ নয়···গাঁয়ের
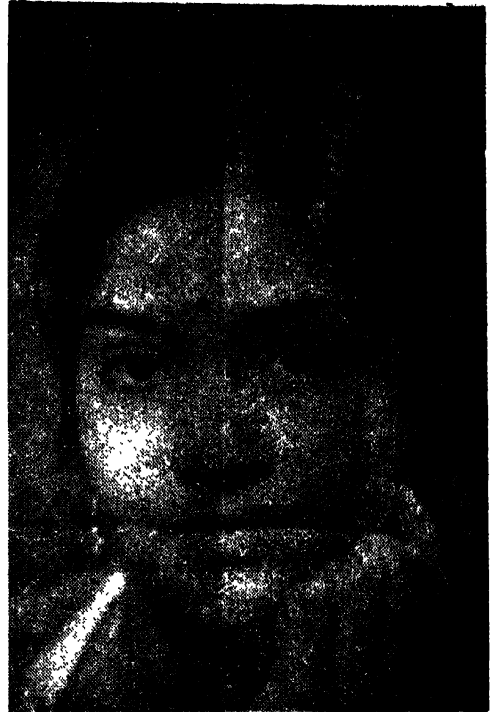
জহুর রাজা পরিচালিত বাদলে একে দেখা যাবে

দুষমণ। ভাই সব তোমরা অনুমতি দাও আজ রাত্রেই আমি ওকে খতম করে ফেলি।

পঞ্চা বল্লে ভাই জাফর আলি, রক্তারক্তি করে কোনো লাভ নেই, তোমার আরও কাচ্চা-বাচ্চা আছে। তাদের মুখ চেয়ে তোমার বেঁচে থাকতে হবে। নইলে তাদের মুখে দু'মুঠো তুলে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবে কে? চল, আমরা দুজনে আজই সদরে চলে যাই...। থানার বড়বাবু আমার চেনা···মাণিকবাবুর সাথে অনেকবার কাজে কর্ম্মে গিয়েছি। তাকে আমাদের দুর্দ্দশার কথা সব খুলে বল্লে নিশ্চয়ই একটা বিহিত হবে। দশজনের পেট মেরে যার ভুড়ি ফুল্‌ছে তাকে আইন দিয়েই বলি দিতে হবে।

সমবেত কৃষকদল পঞ্চার এই প্রস্তাব সমর্থন করল। জাফর আলি আর পঞ্চা সদরের উদ্দেশ্য রওনা হয়ে গেল।

বিমল কলকাতা পৌঁছেই প্রথমে হাজির হল একটি প্রেসে। বল্লে, একটি বিয়ের চিঠি ছাপিয়ে দিতে হবে। প্রেসের ম্যানেজার জিজ্ঞেস্ করলেন কত কপি ছাপা হবে? বিমল হেসে বল্লে, কত কপি আবার, শুধু এক কপি—! কনে নেমতন্ন করছে তার বন্ধুকে।

ম্যানেজার অবাক হয়ে বল্লেন, এক কপি! পাগল নাকি? একখানা চিঠিতে কি হবে? এটা ত' এপ্রিল মাস নয় যে এপ্রিল ফুল করবেন। বিমল বল্লে, এপ্রিল ফুলনয় মশাই। শুধু বরকেই চিঠি দিয়ে নেমতন্ন করতে হবে। না হয় আপনি হাজার কপিরই চার্জ্জ নেবেন। নিন্ চট্‌পট্ ছাপিয়ে দিন্।

চিঠি ছাপিয়ে নিয়ে বিমল মাণিকের মেসে গিয়ে হাজির। চিঠি পেয়ে মাণিক বল্লে, ও! তা'হলে সোণালী এত দিনে তার বিয়েতে আমায় নেমতন্ন করলে! খানিকা চুপ করে থেকে বল্লে, যাবো বৈকি সোণালীর বিয়েতে যাবো না? নিশ্চয়ই যাবো। এখন বুঝতে পাচ্ছি গাঁ থেকে চলে আস্‌বার সময় বহু চেষ্টা করে ও কেন তার দেখা পাইনি। বিমল বল্লে, মাণিকদা আমার অনেক কাজ। আমি আর বস্‌তে পাচ্ছিনে; সোণালীদির বিয়েব সমস্ত জিনিষ পত্র কেনা-কাটা আমারই করতে হবে।

মাণিক বল্লে, আচ্ছা তুই বিয়েব সওদা করে চলে যা বিমল। সোণালীকে বলিস্, আমি ঠিক বিয়ের দিন গিয়ে হাজির হব।

বিমল বল্লে, হুঁ। সোণালীদি বিশেষ করে বলে দিয়েছে। পরিবেশনের ভার তোমায় নিতে হবে।

বিমল সেই দিনই জিনিষ পত্র কেনা-কাটা করে নিজের বাড়ী এসে হাজির।

বিয়ের আর দিন কয়েক বাকি আছে। করালী খুড়ো সোণালীর মাকে ডেকে বল্লেন, বৌঠাকরুণ তুমি সব আয়োজন কর—মাণিক ছোঁড়া ফিরে আসবার আগেই আমি দিন স্থির করেছি। তবে আরো কিছু নগদ টাকা দরকার। আমি কাছাকাছির মহালগুলো একবার ঘুরে আসি। বলাই আছে। বিশেষ দেরী হবে না।

সোণালীর মা কপালে দু হাত জোড় করে বল্লেন, যা ভালো বোঝ ঠাকুরপো। দু'হাত এক হয়ে গেলে আমি ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি।

বিয়ের দিন সকাল বেলা করালী খুড়ো ফিরে এলেন। তাঁর কি আর নিঃস্বাস ফেল্‌বার সময় আছে? বরকে নিয়ে আস্‌বার বিরাট মিছিল যাবে। আর সব চাইতে মজার কথা এই যে মাণিকের চাষার দল সব এসে সেই মিছিলে যোগ দিতে রাজী হয়েছে। করালী খুড়ো খুসী হয়ে বল্লেন, এই ত' তোদের সুবুদ্ধি হয়েছে দেখ্‌তে পাচ্ছি। জমিদার তোদের চিরকাল বাঁচিয়েছে এবারও বাঁচাবে। শুধু সেই বাউণ্ডুলে ছোঁড়াটার কথা শুনেই তোরা মরতে বসেছিলি।

বিকেল বেলা বাদ্য-ভাণ্ড নিয়ে করালী খুড়ো নিজে গেলেন ষ্টেশনে। মিছিল রওনা হবার আগে বিমল চাষীদের কানে কানে কি কথা বলে গেল সেই জানে। চাষীর দল মহা খুসী। সেই গাড়ীতে কলকাতা থেকে মাণিকও এসে নামল।

বিমলের আর চাষীর দলের কারসাজীতে বর আর করালী খুড়োকে বাদ্যভাণ্ড সহযোগে অন্য রাস্তায় নিয়ে যাওয়া হ'ল। আর পাল্‌কীতে চাপিয়ে তাড়াতাড়ি মাণিককে নিয়ে আসা হ'ল সোজা বিমলদের বাড়ী।

কিছুক্ষণ বাদে করালী খুড়ো বুঝতে পারলেন তিনি চাষীদের পাল্লায় পড়ে ভুল রাস্তায় চলে এসেছেন। তখন তার রাগ দেখে কে! এমন সময় তাঁর একটি চর ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলে—জমিদারের মেয়ের আসল বিয়ে হচ্ছে বিমলদের বাড়ীতে—আর বর স্বয়ং মাণিক।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওর দেবরে যমুনা ও অহীন্দ্র চৌধুরী। চিত্রখানি চিত্রায় প্রদর্শিত হচ্ছে। ....
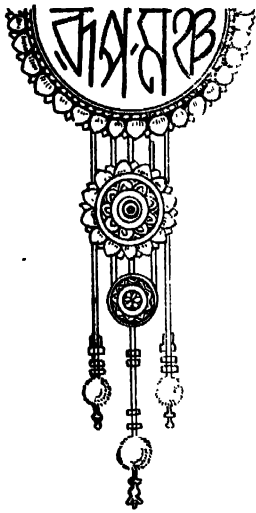
করালী খুড়ো তেলে-বেগুনে জলে উঠে বরের গাড়ী ফেরাতে হুকুম দিলেন। কিন্তু তখন কে কার কথা শোনে। চাষীদলের তখন কী উল্লাস। করালী খুড়ো চোখে সরষে ফুল দেখ্‌লেন! মরিয়া হ'য়ে গাড়ী থেকে লাফিয়ে মাঠে নাম্‌লেন। সাম্‌নেই পেলেন মিছিলের একটি ঘোড়া। সেই ঘোড়ায় চেপে তিনি উর্দ্ধশ্বাসে রওনা হ'লেন বিমলদের বাড়ীর দিকে।

দেখা গেল বিমলদের ভিতর-বাড়ীতে তখন বিয়ে সুরু হ'য়ে গেছে। বিমল আজ একাধারে বর-কর্ত্তা আর কন্যা-কর্ত্তা। কন্যা সম্প্রদান করছে সে নিজে।

করালী খুড়োর ঘোড়া এসে বিমলদের বাইরের উঠোনে থাম্‌লো। তিনি ঘোড়া থেকে নাম্‌লেন। চীৎকার করে উঠলেন, বন্ধ করো—বন্ধ করো সব শয়তানি···আমি সব বেটাকে আজ সায়েস্তা করবো।

এমন সময় দুটি পুলিশ অফিসার এগিয়ে এসে বল্লেন, আপনিই করালী বাবু? করালী বাবু উৎফুল্ল হ'য়ে বল্লেন, থানার লোক আপনারা? আপনারা এসেছেন খুব ভালো হ'য়েছে। এরা জোর করে আমার ভাইঝির বিয়ে দিচ্ছে এক জোচ্চোরের সঙ্গে···সব নিয়ে হাজতে পুরুন—

পুলিশ অফিসার বল্লেন, কিন্তু আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে। প্রয়োজনের বেশী ধান আর খুচরো পয়সা মজুত করার জন্যে সরকারের আদেশে আমরা আপনাকে গ্রেপ্তার করছি।

ওদিকে বাসর ঘরের দৃশ্য দেখা গেল। সোনালী মাণিককে ফিস্ ফিস্ করে বল্লে, কি, বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে এসেছিলে বুঝি? বোকচন্দর! দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বরের গল্প শোনোনি? এইভাবে জাল না ফেল্লে যে নলকে ধরা যায় না!

মাণিক বল্লে, কিন্তু এ খেলায় তোমারই হার হ'ল। গজমতির মালা নিয়ে ওদিকে রাজপুত্র যে তেপান্তরের মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে···

সোনালী মুখ টিপে জবাব দিলে, কিন্তু আসল রাজপুত্র ঠিক পথ খুঁজে পেয়েছে।

Dissolve

মাণিক ও সোনালী জ্যোৎস্না-ধোয়া রাত্রে সোনালী ধানের ক্ষেতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সোনা-মাণিকের কণ্ঠে আজ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে সোনালী ফসলের গান। ওদের সোনালী স্বপন এতদিনে সফল হ'ল।

রূপ-মঞ্চ
ভ্যারাইটি পিকচার্সের
পোষ্যপুত্রে —
শ্রীমতী রেনুকা

ভ্যারাইটি পিকচার্সের নিবেদন—

* এই ধরণীর ধূলোমাটীর ভেতর দিয়ে যাঁদের জীবন গড়ে উঠেছে——সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-পরিণয়, আশা-নিরাশা মান-অভিমান, সর্ব্ব-রসে অভিষিক্ত সেই সব ছেলে-মেয়েদের বাস্তব চরিত্র চিত্রণ এই কাহিনীর অমূল্য সম্পদ।...... .....

লক্ষ্মীপুরের চৌধুরীরা বনিয়াদী বংশ। জমিদার শ্যামাকান্ত চৌধুরীর অনেকগুলি পুত্র-কন্যার মধ্যে অবশিষ্ট বিনোদকে দশ বৎসরের দেখিয়া বিনোদের মা অকালে দেহত্যাগ করেন। মাতৃহীন পুত্র লইয়া শ্যামাকান্ত বড় বিপদে পড়িলেন। প্রথম প্রথম শ্যামাকান্ত পুত্রকে চোখে রাখিয়া নিজেই তাহার দেখা শুনা করিতেন। কিন্তু তিনি বিষয়ী লোক। ছেলে যত শান্ত হইতে লাগিল, তাঁহারও বাহ্যিক যত্নে তত শিথিলতা আসিয়া পড়িল। মাতৃহীন শিশুর মাতৃস্নেহের অভাব কখনই ঘুচে নাই—পিতৃস্নেহের প্রকৃতি বুঝিতে না পারিয়া অভিমানে শুধু অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। পিতা পুত্র কেহই পরস্পরের প্রকৃতি ধরিতে পারিল না।

স্কুলের লেখা-পড়া সাঙ্গ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতে বিনোদ কলিকাতা আসিতে চাহিল। শ্যামাকান্তের সেইরূপ মত নহে। তাঁহার দেওয়ানেরও কলিকাতা সহরের উপর তেমন আস্থা নাই। বিনোদ দৃঢ়স্বরে বলিল, "মার ইচ্ছা ছিল আমি একটু বেশী পড়ি।" তখন শ্যামাকান্ত তাঁহার কলিকাতার উকীল রজনীনাথের হাতে বিনোদের সমস্ত ভার দিলেন। বয়সে নবীন হইলেও রজনীনাথের উপর তাঁহার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল।

বিনোদ এফ-এ, পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছে শুনিয়া শ্যামাকান্ত আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিলেন কিন্তু বাহিরে অধিক আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া কেবল লিখিলেন "অনেক দিন বাড়ী ছাড়িয়া রহিয়াছ কবে ফিরিবে?"

বিনোদ পিতাকে লিখিল, তাহাকে ইংলণ্ডে পাঠান হউক, সেখানে সে অধ্যয়ন করিতে একান্ত ইচ্ছুক।

পত্র পড়িয়া শ্যামাকান্ত স্তম্ভিত হইলেন এবং একান্ত কাতরচিত্তে পরদিনই স্বয়ং কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। আসিবার উদ্দেশ্য তিনি কাহাকেও বলিলেন না।

রজনীনাথের ছয় বৎসরের কন্যা শান্তিলতাকে বধূবেশে দেখিয়া শ্যামাকান্ত তাহাকে কন্যাস্নেহে ভালবাসিয়া ফেলিলেন। শান্তিকে শ্যামাকান্তকে দিতে রজনীনাথের কোনই আপত্তি নাই।—পরিবর্ত্তে কিন্তু পরিহাস করিয়া সে চাহিল বিনোদকে। বিনোদকে ইঞ্জিনিয়ারিং শিখাইতে সে বিলাত পাঠাইবে।

এ পরিহাস শ্যামাকান্তের ভাল লাগিল না। বিনোদের জন্য তিনি রজনীনাথকে পাত্রী দেখিতে বলিলেন। পুত্রকেও বিলাত যাওয়ার কথা ভুলাইতে গৃহে লইয়া গিয়া কয়েকদিন চোখে চোখে রাখিয়া তাহার দেখাশুনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ব্বের মতই ক্রমশঃ তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া নিজের নিয়মানুযায়ী কার্য্য করিতে লাগিলেন।

শেষের মিলন—মধুর মুহূর্ত্ত
সন্তোষ, শৈলেন, রেনুকা, প্রমোদ, শিশির কুমার, তুলসী, সাবিত্রী ও বিমান

—কঠোরাণি বজ্রাদপি মৃদুণি কুসুমাদপি—

মাষ্টার মিন্টু, শিশির কুমার ও সাবিত্রী

বিনোদ বি-এ পরীক্ষায় পাশ হইবার পর শ্যামাকান্ত তাঁহার বিবাহের কথা পাড়িলেন। রজনীনাথের নির্দিষ্ট একটি মেয়েকে তাঁহার খুব পছন্দ হইয়াছে। বিনোদ পুনরায় জানাইল সে বিলাত যাইবে। শ্যামাকান্ত ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং পুত্রের কথা বালকের খেয়াল ও বাতুলের প্রলাপ বলিয়া অগ্রাহ্য করিলেন।

বিনোদ বলিল, "দেশাচারের জন্য কোন সদুদ্দেশ্য ত্যাগ করা মনুষ্যত্ব নয়।"

শ্যামাকান্ত ক্রোধে অধীর হইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "তবে আমার বাড়ী থেকে একেবারে দূর হয়ে যা। যা, আমি আর এ জন্মে তোর মুখ দেখতে চাইনে।"

অভিমানী পুত্র গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তাহার সন্ধান মিলিল না।

* * * * *

বৃন্দাবনে সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণীর কন্যা শিবানীর বিবাহ এক অপরিচিত যুবকের সহিত অদ্ভুতভাবে হইয়া গেল। অসুস্থ অবস্থায় নীরোদকুমার তাহাদের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সিদ্ধেশ্বরী প্রথমটা তাহাকে রাজপুত্র ভাবিয়াছিলেন। বিবাহের পর ক্রমশ

চিত্র-চরিত্র

শ্যামাকান্ত	শিশির ভাদুড়ী
রজনীনাথ	শৈলেন চৌধুরী
বিনোদ	প্রমোদ গাঙ্গুলী
হেম	বিমান বন্দ্যোঃ
ফটিক চাঁদ	জহর গাঙ্গুলী
বিপিন	সন্তোষ সিংহ
সাধুচরণ	তুলসী চক্রবর্ত্তী
যোগেন	ইন্দু মুখোপাধ্যায়
যোগেশ	বেচু সিংহ
পাণ্ডা	ফণি রায়
গাটকাটা	আশু বসু (এঃ)
	কুমার মিত্র
সুখু	মাষ্টার মিণ্টু
সাধু	রবি বিশ্বাস
শিবাণী	রেণুকা রায়
শান্তি	সাবিত্রী দেবী
সিদ্ধেশ্বরী	প্রভা
বসুমতী	দেববালা
মোক্ষদা	রাজলক্ষ্মী
চন্দুরী	মনোরমা
মাতঙ্গিনী	নিভাননী
হারাণের মা	উষা

অন্যান্য ভূমিকায়—বৃন্দাবন, বীরেশ্বর, সুনীল।

কিন্তু মত বদলাইয়া গেল। শিবানীকে একদিন ভুল বুঝিয়া নীরোদকুমারও তাহাদের আশ্রয় ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কিছুকাল বাদে নীরোদকুমারের এক পত্র আসিল। মৃত্যু শয্যা হইতে পত্র লিখিয়া সে জানাইয়া গেল শিবানীর বৈধব্যের কথা।

* * *

মাদ্রাজে মিঃ রায় বা নীরোদকুমার রায়ের সহিত আলাপ করিয়া তাহার বন্ধু যোগেশের কলিকাতা হইতে সদ্য-আগত শ্বাশুড়ী ও শ্যালিকা শান্তি অত্যন্ত মুগ্ধ হইল। যোগেশ ও তাহার শ্বাশুড়ীর ভারি ইচ্ছা যে নীরোদের সহিত শান্তির বিবাহ হয়। শান্তির

কর্ম্মীবৃন্দ

কাহিনী	অনুরূপা দেবী
প্রযোজক	নলিনীরঞ্জন বসু
পরিচালক	সতীশ দাশগুপ্ত
সুর স্রষ্টা	দুর্গা সেন
গীতিকার	প্রণব রায়
চিত্র-শিল্পী	অজয় কর
শব্দধর	গৌর দাস
প্রচার শিল্পী	বিশ্ব রায় চৌধুরী
কার্য্য নির্দেশক	মোহিনী কুণ্ডু
গোষ্ঠি পরিচালক	ননী সান্যাল
ব্যবস্থাপক	সুধীর সরকার
	বিষ্ণুপদ মুখোঃ
রাসায়নিক	ধীরেন দাশগুপ্ত
সম্পাদক	বিনয় বন্দ্যোঃ
শিল্প নির্দেশক	তারক বসু
তড়িৎ নিয়ন্ত্রক	
স্থির-চিত্র-শিল্পী	সত্য সান্যাল
রূপ-সজ্জাকর	সুধীর দত্ত
পরিবেশক	ভ্যারাইটি ফিল্মস্

— হতাশায় আশার সঞ্চার —
প্রমোদ, রেণুকা ও সাবিত্রী

পিতা রজনীনাথ যদিও পত্রে জানিলেন যে, মিঃ রায় তাহার একজন অজানা ভক্ত তথাপি এই বিবাহে তিনি মত করিতে পারিলেন না। একমাত্র পুত্র নিরুদ্দেশ হওয়ার পর শুধু শান্তিকে ঘরে লইবার জন্যই শ্যামাকান্ত হেমেন্দ্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন এবং রজনীনাথও শ্যামাকান্তকে তাহার কথা দিয়াছেন।

* * * *

পুত্রবধূ শান্তিকে লইয়া শ্যামাকান্ত বৃন্দাবনে আসিয়াছেন। সেখানে শান্তির সঙ্গে আলাপিতা শিবানী শান্তিকে তাহার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর কথা বলিল। শিবানীর একটি পুত্র হইয়াছিল তাহার নাম অমূল্য। শিবানীর ধারণা তাহার স্বামী হয়ত বাঁচিয়া আছে। নীরোদকুমারের শেষ চিহ্ন দেখিয়া শ্যামাকান্ত বুঝিলেন যে তাহার বিনোদ ভিন্ন অন্য কেহই নহে। শিবানী তাঁহার পৌত্র অমূল্য ও সিদ্ধেশ্বরী লক্ষ্মীপুরে আসিল।

শিবানী ও অমূল্যকে দেখিয়া হেমেন্দ্র জলিয়া উঠিল। শান্তি তাহাকে বুঝাইতে লাগিল। শেষে সিদ্ধেশ্বরীর কথার জ্বালায় একদিন নিজেই ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিল। হেমেন্দ্রের প্ররোচনায় তাহার সহিত কলিকাতা চলিয়া আসিল।

রজনীনাথ তাহার কন্যাকে ভুল বুঝিল এবং নীচতার জন্য তিরস্কার করিল। হেমেন্দ্র তখন শান্তিকে লইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। শ্যামাকান্তের কথা ভাবিয়া এবং পিতার তিরস্কারের কথা চিন্তা করিয়া শান্তি গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়িল। তাহার চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই। দিনে দিনে সে মৃত্যুর পানে আগাইয়া চলিল।

হেমেন্দ্রের পরামর্শ-দাতা জুটিয়াছিল যোগেশ, তাহারই পরামর্শে যখন বহু অনুসন্ধানের পর রজনীনাথ শান্তিকে লইতে আসিল হেমেন্দ্র তাহাকে জানাইল শান্তি তাহার সহিত দেখা করিতে চাহে না। শয্যাশায়ী শান্তি কিন্তু তাহার আগমনের কথা জানিল না।

বৃদ্ধ শ্যামাকান্তের কি অবস্থা! শিবানী ও অমূল্যকে তিনি পাইলেন বটে কিন্তু পর পর বিনোদ শান্তি ও হেমেন্দ্রের আঘাত তাঁহার সহিবে কি! বিনোদ, নীরোদ-কুমার ও মিঃ রায় কি চিরকালই সবাইকে এড়াইয়া চলিবে!

আর রজনীনাথ! যে শ্যামাকান্তের অনুগ্রহ ভিন্ন মানুষ হইবার তাহার কোন আশা ছিল না—আজ তাহার নিজের কন্যার ব্যবহারে তাঁহাকে মুখ দেখাইবার তাহার কোন উপায় রহিল না! শান্তি — অনভিজ্ঞা কিশোরীকে কি সংসারে সকলে কেবল ভুলই বুঝিবে!

"পোষ্যপুত্র" ছায়া-চিত্রে হয়ত এর মীমাংসা আপনারা মানিয়া লইবেন।

বিদ্রোহের প্রথম সংঘাত
— শিশির কুমার ও প্রমোদ —

জানবার মত

এই চিত্রের বিভিন্ন ভূমিকায় এতগুলি শ্রেষ্ঠ শিল্পীর একত্র সমাবেশ বাঙলা ছবিতে এই প্রথম।

বৃন্দাবন, মথুরা, কাশী, মাতরা প্রভৃতির বহু প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কীর্ত্তির চিত্রগ্রহণ এই চিত্রের বিশিষ্ট আকর্ষণ।

মঞ্চে বা পর্দায় অপরের নির্দেশনায় অভিনয় শিশির কুমারের এই প্রথম।

শিশির কুমার বলেন "শ্যামাকান্তের বজ্রকঠোর অথবা মায়া মমতা ভরা রূপটিকে আমি বড় ভালবাসি। তাই এই চরিত্রকে পর্দায় প্রাণপতিষ্ঠা কোরে জীবন্ত কোরে তুলবার জন্য আমার অভিনয়শক্তি আমি নিঃশেষে উজাড় কোরে দিয়েছি"।

এই ছবির চিত্র-নাট্য দেখে শ্রীমতী অনুরূপা দেবী বলেছিলেন—"সতীশ, আমি সত্যি আশ্চর্য্য হচ্ছি—কোথাও গল্পের গতি ও সব কয়টি চরিত্রের মর্য্যাদা ক্ষুন্ন না কোরে এবং রস বিরূপ না কোরে কোন মন্ত্রবলে তুমি আমার মহাভারত সদৃশ উপন্যাসকে এত ছোট কোরে রূপে রসে, গন্ধে সঞ্জীবিত কোরে তুললে। "পোষ্যপুত্র" আমার প্রাণের জিনিষ তাকে যে বিকৃত-রূপে দেখতে হবে না—এই আশায় সত্যই আজ আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম।

মিনার

আগতপ্রায়

সম্পাদকের দপ্তর

শান্তি সমীরণ ব্যানার্জী (গৌরাঙ্গ লেন, কলিকাতা)

গত আশ্বিন মাসে রূপ-মঞ্চতে 'দাবী'র বিভিন্ন চরিত্রে ধীরাজ, পদ্মা প্রভৃতির নাম আছে কিন্তু অহীন্দ্র চৌধুরীর নাম নাই কেন ?

: আশ্বিন মাসের পূর্বে (ভাদ্র) দাবীর সমালোচনা বেরিয়েছে। দাবীতে অহীন্দ্রবাবু অভিনয় করেন নি। রায়সাহেবের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস অবশ্য পূর্বে উক্ত ভূমিকায় অহীন্দ্রবাবুর অভিনয় করবার কথা ছিল।

আভা দেবী (হরতকী বাগান লেন, কলিঃ)

চিত্রলেখা দেবী কি চিত্র জগৎ থেকে উধাও হ'য়েছেন ? বিচার কেমন দেখলেন ? দম্পতি'তে রবীন বাবু আমাদের নিরাশ করেছেন। সুনন্দা দেবী ও জহর বাবুর প্রশংসা করা চলে। আপনার অভিমত কি ?

: হ্যাঁ। বিচারের বিচার গত সংখ্যায়ই হ'য়ে গেছে। বিচার নীতীন বাবুর পরিচালক জীবনে এই প্রথম কলঙ্কের দাগ এঁকে দিল। রবীনবাবু শেষ পর্যন্ত ধীরাজ-টাইপ না হ'য়ে যান। সুনন্দা ও জহরের অভিনয় আমারও ভাল লেগেছে।

আলী মোহাম্মদ । (বরিশাল)

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর দেখে আসছি, বাংলা ছবির পরামায়ু যেন কমে আসছে। পরিচালক, প্রযোজক, গল্প লেখক এঁরা যদি এদিকে পুরোপুরি ভাবে লক্ষ্য না করেন, তবে বাংলা যে ছবি অচিরেই ম্লান হয়ে পড়বে, তা সহজেই অনুমেয়। আমরা বাঙালী, বাস করি এই বাংলার শ্যামল প্রান্তের এক কোণে ছোট একখানা কুঁড়ে বেঁধে। আমরা চাই খাটি বাঙালীদের উপযোগী ভালো ছবি। চাই ছবির মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভ। কিন্তু, যে সব আমরা ছবি দেখছি, তাতে মনে হয় শুধু পয়সার লোভেই যাকে-তাকে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় নামিয়ে একটা যা-তা ঘটনা নিয়ে ছবি প্রস্তুত করে পরিচালক মহাশয় আমাদের সাম্‌নে কৃতিত্বের দাবী কর্‌তে চান্। গল্প আজে বাজে যা কিছু একটা হলেই হলো।

বাংলা সাহিত্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এমন অনেক গল্প লেখক আছেন, কোন কালেই কোন পরিচালকের দৃষ্টিতে পড়েন না। কারণ, পরিচালক নিজেই গল্প এবং চিত্রনাট্য লিখে ত্রিপদবীতে নিজের কৃতিত্ব জাহির করতে যেয়ে এমন ছেলে-খেলা ও চতুর্থ শ্রেণীর চিত্র তৈরী করেন, যাতে চিত্রামোদীদের ভাগ্যেই লোকসানের ভাগটা বেশী দেখা যায়। এ বিষয়ে প্রযোজকেরা যদি একটু কঠোর দৃষ্টি দেন, তা'হলে পরিচালকরা তাঁদের নিজেদের খামখেয়ালী কার্য্যে পরিণত করতে পারেন না। যদি প্রযোজকরা পরিচালকদের নিযুক্ত করবার পর গল্প নেবার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন, তা'হলে সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর গল্প পেতে তাঁদের একটুও বেগ পেতে হয় না। নামজাদা সাহিত্যিকেরও কোন দুর্ব্বল গল্পকে চিত্রে রূপান্তরিত করাব কোন মানেই হয় না।

বড়ুয়া, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য অমর মল্লিক, অসিতবরণ, জহর গাঙ্গুলী এঁরা প্রত্যেকেই শক্তিমান অভিনেতা। এছাড়া উদীয়মান—অভিনেতাদের নিকট থেকে আমরা ভবিষ্যতে অনেক কিছুই আশা করতে পারি।

আজ স্বর্গীয় দুর্গাদাসবাবুকেও মনে পড়ে। এত বড় শক্তিমান অভিনেতা তার সমসাময়িক যুগে ছিল না বললেই চলে। রঙ্গমঞ্চে হউক আর ছায়াচিত্রে হউক, কোনটাতেই তিনি পিছপাও ছিলেন না। শেষ বয়সেও তিনি যা' করে গিয়েছেন তা' চিত্রামোদীরা কেউই ভুলতে পারবে না।

অভিনেত্রীদের মধ্যে আমাদের চোখের সামনে যাঁরা নড়েচড়ে বেড়াচ্ছেন, তাঁরা কেউই কোন অংশে কম নন, তাঁদের দিয়ে হয়ত কিছুদিন কাজ চলবে, কিন্তু ভবিষ্যতে প্রযোজক, পারচালকরা যদি নূতন অভিনেতা, অভিনেত্রী সংগ্রহ না করেন, তবে বাঙলা ছবির সত্যই দৈন্য দেখা দিবে।

ফজলী ব্রাদার্সের ফ্যাশন চিত্রের একটি প্রণয় মধুর দৃশ্যে চন্দ্রমোহন ও সবিতা দেবী

বাঙলায় এখনও ভালো ভালো লেখক, লেখিকা আছেন, এ অস্বীকার করবার উপায় নেই কিন্তু গল্প লেখা হওয়ার পর, প্রযোজক যদি এই গল্পের প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত করেন, তবে ভালো গল্প পেতে তাঁদের এতটুকুও কষ্ট পেতে হবে না।

আমাদের এখানে পর পর কয়েকজন তরুণ পরিচালক

এসে দাঁড়ালেন, আর অমনি প্রযোজক তাঁর হাতে সব কিছু নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু এর ফল যে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, তা' তাঁরা টের পান তখন, যখন ছবি Complete হয়ে পর্দায় আত্মপ্রকাশ করে। এর প্রতিকার অবিলম্বে হওয়া কর্ত্তব্য।

এই ফাঁকে একটি কথা বলে রাখি, "সমাধান" আরম্ভ হবার কয়েকদিন পরেই আমি কলকাতায় যাই, তখন একে একে প্রায় ৬৭ খানি বাংলা ছবি দেখি, এমন কি "কাশীনাথ" ও দেখতে ভুল করিনি। কিন্তু এক "সমাধান" ছাড়া অন্য কোন ছবি আমাকে আনন্দ দিতে পারেনি।"

"যোগাযোগ" বইর দু'একটা কথা বলে চিঠির শেষ করবো। যোগাযোগের পরিচালক সুশীল মজুমদার এই ছবির মধ্য দিয়ে আমাদের যে কি বুঝালেন, তা তিনিই জানেন। গল্প লেখক মন্মথ রায় নামকরা লেখক স্বীকার করি, কিন্তু যা তা' একটা বই নিয়ে উপস্থিত হলে সেটাকেই পর্দায় রূপ দিতে হবে, এর কোন অর্থই হয় না। তাছাড়া পরিচালক ছবির মধ্যে যে সব ছেলেমি কাণ্ড করেছেন, যা' দেখলে মনে হয়, পরিচালনা' সম্বন্ধে তাঁর কোনও বিশেষ কিছু জানা নেই। যদিও তিনি একাধিক ছবির পরিচালনা করেছেন। যে সব পরিচালক, প্রযোজকদের খামখেয়ালীতে এই সব বাজে ছবি তৈরী হয়, তাদের অবিলম্বে কিছুদিন অভিজ্ঞতা অর্জন করে আবার চিত্রজগতে আসতে অনুরোধ করছি। অথবা চিত্রজগৎ থেকে বিদায়

নেওয়া কর্তব্য। যোগাযোগের কাহিনীতে পাগলের পাগলামী ছাড়া আর কিছু নেই। রিক্তার পরিচালকের কাছ থেকে এ আশা আমরা কোনও দিনই করিনি।

ঃ বাংলা ছবির উন্নতিতে আপনারা দর্শকেরা সচেতন হয়ে উঠলেই প্রযোজকেরা চাহিদানুযায়ী চিত্র প্রস্তুতে আত্মনিয়োগ করবেন—আমাদের দর্শকদের তরফ থেকে এমনি আন্দোলন করে দাবী জানাতে হবে।

মৃণাল কান্তি রায় (সম্পাদক হুগলী, নিউবিল্ডিং ক্লাব)

"শারদীয়া রূপমঞ্চে" আপনার 'দায়ী কে বা কারা' প্রবন্ধ পড়ে দু'একটা কথা না লিখে পারলাম না। অনেক দিন থেকে এমনি একটা কিছু লিখবো ভাবছিলাম এমন সময় আপনার প্রবন্ধটায় আমার মনের কথার সন্ধান পেয়ে কিছু লিখতে বাধ্য হলুম।

আজকের দিনে আমরা বাংলা ছবিকে পদানত করে শুধু নাঁক সিঁটকেই খালাস। তার ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে মাথা ঘামানো তো দূরের কথা বাংলা ছবির প্রতি শ্রদ্ধা হারানের নিদর্শন স্বরূপ বিদেশী ছবি দেখেই আমরা মন ভরিয়ে নিই। কিন্তু সত্যই কি সম্পূর্ণরূপে মন ভরে? বিদেশী ফিল্মের dialogue আমরা সম্পূর্ণ বুঝি না, যেটা ফিল্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণ। তবুও দেশী ছবি কি করে আমাদের মনের ক্ষুধা পূর্ণ করতে পারে সে বিষয় একটুও চিন্তা করি না আমরা। যে কোন বিদেশী ছবি দেশী ছবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এ কথা সকলেই স্বীকার করবে, কিন্তু বিদেশী ছবি কি করে ভালো হয় সে বিষয় একটু চিন্তা করে দেশী ছবির ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করা কি আমাদের পক্ষে একান্তই অসম্ভব?

দেশীয় ছবির অভিনেত্রী সমস্যা! কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? সিনেমার কর্তৃপক্ষেরাই নয় কি? কর্তৃপক্ষেরা যদি শিক্ষিত ভদ্রসন্তান ও ভদ্র-মহিলাদের কিছু কিছু সুযোগ দেন বাংলা ছবি তার বর্তমান খোলস ছেড়ে নতুন রূপ নিতে পারে এ কথা আমি জোর করে বলতে পারি।

বল্‌তে পারেন হয়ত ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েরা সিনেমায় যায় না তাই কর্তৃপক্ষ সে সুযোগ পান না। আমি কিন্তু তাহলে আপনাদের মত সমর্থন করতে পারলাম না। আমি জানি ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েরা এ পথে আসতে চেষ্টা করলেও সিনেমার কর্তৃপক্ষ কোন রকম গা করেন না। আমি নিজে একজন ভুক্তভোগী। দু' এক স্থানে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তারা মুখে ভয়ানক সহানুভূতি জানিয়ে বলেন "আপনাদের মত শিক্ষিত লোকই তো চাইছি।" তারপর এমন গোটাকতক অসুবিধাজনক সর্ত্ত করিয়ে নিতে চান যে আমরা বাধ্য হই ও পথ থেকে সরে আসতে। এই রকম সব জায়গাতেই দেখলাম।

অভিনেত্রী হিসাবে ভদ্রঘরের মেয়েরা তো আসতেই পারেন না; কারণ সেই চিরন্তন। বাংলা ছবির কর্তৃপক্ষদের বাজারে এমন দুর্ণাম যে কোন ভদ্রমহিলা এ পথে আসতে সাহসই করেন না। এলেও তাঁকে ভদ্র' নামটি ঘুঁচিয়ে যেতে হয় এই কর্তৃপক্ষদেরই ব্যবহারে।

তবে কি এর সমাধান নেই? আছে বৈকি। যে পথ পূজা সংখ্যায় আপনি সমাধানের জন্য অনুসরণ করতে বলেছেন তা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে নেবেন।

আমাদের সকলকেই এই শিল্পকলার কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করতে হবে এবং দুর্নীতি যাতে কোন রকমে এ পথে আসতে না পারে সে বিষয় আমাদের সচেষ্ট থাকতে হবে। এর প্রধান দায়িত্ব থাকবে কর্তৃপক্ষের উপর। এরূপ হলে আমাদের দেশীয় ছবি যে সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যে উচ্চতর স্থান অধিকার করতে সমর্থ হবে একথা জোর করেই বলতে পারি।

যদি বলেন বাংলা ছবির মধ্যে ভবিষ্যতের আশার এমন কি রূপ দেখলেন যে এত বড় সমস্যার সমাধান করে দিলেন?

রূপ-মঞ্চ

তানসেন চিত্রে তানী ও তানসেন চরিত্রে যথাক্রমে খুরশীদ ও সায়গল

তৈরী করেন তাহলে আমাদের ছবিও উচ্চতর স্থান লাভ করবে।

: আপনার অভিযোগ-এর সংগে সবাই যে সুর মেলাবেন—একথা নিঃসন্দেহে আমি বলতে পারি। তবে নূতন অভিনেতাদের সুযোগ দেওয়া সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলতে চাই। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষদের তরফ থেকে অনেক সময় যা বলবার থাকে রূপ-মঞ্চ সংখ্যায় (বার্ষিক) শ্রীপার্থিব ও নরেশ ঘোষের আলোচনা থেকেই অনেকটা জানতে পেরেছেন। তবে এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা শুনবেন? আপনার সংগে আমার চাক্ষুষ পরিচয় নেই তাই আমি যাদের বিষয়ে বলবো আপনি তাদের বাইরে। চিত্রে যোগদান করবেন বলে কয়েকজন ভদ্র যুবক আমায় চিঠি লিখলেন—আমি তাদের কোন সাহায্য করতে পারি কি না। আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার সংগে তাদের দেখা করতে অথবা ফটো পাঠিয়ে দিতে লিখলাম। তাদের অনেকেই এলেন কিন্তু সব কয়জনই দেখলাম নিজেদের বিষয়ে মোটেই সচেতন নন। আসবার সময় যদি আয়নায় তারা একবার স্থির মস্তিষ্কে নিজেদের দেখে নিতেন তাহ'লে পর্দায় আত্মপ্রকাশ করবার দুরাশা তাদের থাকতো না। তা সত্ত্বেও কয়েকখানা নামকরা জনপ্রিয় 'নাটক এবং রবীন্দ্রনাথের কয়েকটী বিখ্যাত কবিতা পড়তে দিলাম—আমার এখানে যারা উপস্থিত ছিলেন—তাদের অনেকেই এদের উচ্চারণ পদ্ধতি বা পড়বার ঢং দেখে হাসি চেপে

তাহলে আমি কয়েক বৎসর আগের যে কোন হিন্দি ছবি-গুলির দিকে তাকিয়ে দেখতে বলি। তাদের ছবির মধ্যে না ছিল কোন 'প্লট' না ছিল কোন মানে। কিন্তু আজকের বম্বের ছবিগুলো দেখবার জন্যে সিনেমা গৃহে কোনদিন একটি স্থানও খালি থাকে না! এর কারণ কি? ওদের ছবির গল্প লেখকেরা কি বাংলা ছবির সত্যিকারের গল্প লেখকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ? তা মোটেই নয়। ভালো করে বিচার করে দেখতে গেলে দেখতে পাবেন ওদেশের কর্তৃপক্ষেরা শিক্ষিত ভদ্রসন্তান ও ভদ্রমহিলা নিয়ে ছবি তোলেন, তাই সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার কায়দাটা তাঁরা ভালোরূপেই উপলব্ধি করে যতদূর সাধ্য সাধারণের মন সন্তুষ্ট করে থাকেন।

আজ বাংলা ছবির কর্তৃপক্ষেরা যদি শিক্ষিত সম্প্রদায়কে তাঁদের মধ্যে আহ্বান করেন এবং দর্শকদের চাহিদা মত ছবি তোলেন, আরও উপযুক্ত সাহিত্যিকের গল্প নিয়ে ছবি

রাখতে পারেননি। আমার বক্তব্য হচ্ছে—যদি ভদ্র ঘরের যুবকদের ভিতর থেকে অভিনেতা হবার জন্য এরূপ রত্নরাই আসতে চান তাহ'লে—দরকার নেই আমাদের নতুন মুখের। সুদর্শন প্রতিভাসম্পন্ন—অথবা কোন বিশেষ গুণসম্পন্ন কুৎসিৎ যুবকেরাও যদি ব্যর্থ মনোরথ হ'য়ে ফিরে যান তাহ'লে অবশ্য কর্তৃপক্ষদের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করতে পেছু হটবো না যদি এরূপ কিছু ঘটে তাহ'লে আমায় জানাবেন আমি যথাসাধ্য প্রতিকারের চেষ্টা করবো

নির্ম্মল কুমার হাজরা (মেদিনীপুর)

( ) কানন দেবী, ভারতী, সুনন্দা দেবী, ছায়া দেবী, মমতাজ শান্তি, চন্দ্রাবতী, রেণুকা রায়, পদ্মা দেবী এদের পর পর সাজিয়ে দিন। ( ) কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া রাণীর পর কি কোন ছবি তুলছেন? (৩) নিউ থিয়েটার্সের দুই পুরুষ চিত্রে কে কে অভিনয় করছেন?

: ( ) কানন দেবী, ছায়া দেবী ভারতী চন্দ্রাবতী ...

নিজের ... চিত্র দেখে এদের অভিনয়ের তারতম্য এ মত আপনি ... যেতে পারে। (২) হিন্দি—সুরেশশ্যাম —বাংলা—চাঁদের কলঙ্ক। (৩) ছবি বিশ্বাস, অহীন্দ্র চৌধুরী, চন্দ্রাবতী, লতিকা, নরেশ মিত্র জহর গাঙ্গুলী প্রভৃতি

কুমারী অমিতা ও নমিতা সেন (ভাগ্যকুল ম্যানসন, শ্যামবাজার)

(১) বাংলা কাশীনাথ আমাদের ভালই লাগিয়াছে। উহার হিন্দী সংস্করণ কি গৃহীত হইয়াছে? (২) ছদ্মবেশী, দুইপুরুষ, সহর থেকে দূরে এই চিত্রগুলির মুক্তি পাইতে কত দেরী।

: (১) কাশীনাথের হিন্দি সংস্করণও গৃহীত হ'য়েছে—বাংলার বাইরে প্রদর্শিত হয়েছে—এখানে নিউ সিনেমায় মুক্তি প্রতীক্ষায়। (২) ছদ্মবেশী কোন বাড়ীতে To Let টাঙ্গান বোর্ড দেখতে পাচ্ছে না—সহর থেকে দূরে ২৪শে ডিসেম্বর হয়ত মুক্তি পেয়ে যাবে। দুই পুরুষের বন্ধন দশা ঘুচতে একটু দেরী হবে।

শ্যামাদাস রায় চৌধুরী (উল্টাডাঙ্গা মেইন রোড, শ্যামবাজার)

আপনাদের ৩য় বর্ষের সপ্তম সংখ্যায় ৫০ পাতায় ন্যাশন্যাল ষ্টুডিওর জোবানী চিত্রের উল্লাস ও হুস্না বাহুব যে

হামারীবাত-এ সানওয়াজ, দেবীকারাণী ও জয়রাজ

ছবি দিয়েছেন—উল্হাস সম্পর্কে আমাদের কিন্তু সন্দেহ জেগেছে।

: আপনাদের সন্দেহ অমূলক নয়। সুরেন্দ্র'র স্থলে ভুলবশতঃ উলহাস হয়েছে।

প্রতাপ চন্দ্র বসু (কালীঘাট)

(১) প্রমথেশ বড়ুয়া নূতন বই তুলিবার পূর্বে তাহার অবান্তর প্রতিজ্ঞাগুলি তুলিয়া লইয়াছেন কি? না লইয়া থাকিলে তাহা কি তুলিয়া লওয়া উচিত নয়? (২) বাংলায় এত সুন্দর সুন্দর অভিনেতা ও অভিনেত্রী থাকা সত্ত্বেও বাংলা চলচ্চিত্রের এত অধঃপতন কেন? ইহার জন্য দায়ী কে? (৩ আপনাদের সব শিশুদের দেশে এই বই এবং আর কোন বই কী অভিনীত হইবে? তাহাতে আমি কি কোন অংশ গ্রহণ করিতে পারি? (৪) মণিকা গাঙ্গুলী, সন্ধ্যারাণী, ভারতী, লতিকা মল্লিক, বিজলী, পূর্ণিমা ইহাদের মধ্যে কে কে ভাল অভিনয় করেন এবং নিজে গান গাহিয়া থাকেন।

: (১) কথা তুলে নিন আর নাই নিন সে কোন কথা নয়, যেকথা বলেছেন সেরকম চিত্র পেলেই আমাদের হ'লো। যত-দূর সংবাদ পাচ্ছি চাঁদের কলঙ্কে আপনাদের বিশ্বাস আবার বড়ুয়া ফিরে পাবেন। (২) আপনি এত অভিনেতা অভিনেত্রী কোথায় দেখলেন? বাংলা ছবির ব্যর্থতার মূলে দায়ী আমরা দর্শক সাধারণ যারা বিনা প্রতিবাদে জজসাহেবের নাতনী—দেবর—স্বামীর ঘর—অভিসার প্রভৃতি চিত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করি। (৩) ছোটদের উপযোগী নাটক মঞ্চস্থ করতে আমরা তৈরী হচ্ছি। উপযুক্ততায় বিবেচিত হ'লে আপনিও অভিনয় করতে পারবেন। (৪) এদের সকলেই চিত্র বিশেষে ভাল অভিনয় করেছেন ও ভবিষ্যতে আশা করি করবেন। গান গাইতে জানলেও পর্দায় ধার করা গলা দিয়েই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে চালিয়ে থাকেন, মণিকাকে এদের থেকে পৃথক করে দেখতে পারেন?

কুমারী গীতা গাঙ্গুলী (মুদিয়ালী রোড, কলিকাতা)।

(১) মমতাজ শান্তি কি গান জানেন? এই বিষয়ে কেউ বলেন হাঁ আবার কেউ বলেন 'না'। সেইজন্য আমি আপনার কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইছি—(২) আপনার মতে রবীন মজুমদার ও অসিতবরণ এই দুইজনের মধ্যে কে ভাল গাইতে জানেন?

: (৪) আপনার উত্তর দেবার পূর্বে প্রথমে একটা কথা বলে রাখছি—আশা করি তাতে ক্ষুন্ন হবেন না। পর্দায় কে গেয়ে থাকেন কে থাকেন না—এসব প্রশ্ন ভবিষ্যতে জিজ্ঞাসা করবেন না, অবশ্য আপনার মত অনেকের মনেই এরকম কৌতূহল জাগে। কিন্তু এ সব জেনে দর্শক হিসাবে চিত্রের রসগ্রহণ থেকে আপনাকে অনেকখানি বঞ্চিত হ'তে হবে। মমতাজ শান্তি নিজে গান জানেন একথা সত্য—কিন্তু পর্দায়, তিনি ধার করা গলাতেই গেয়ে থাকেন—যে চিত্রে সবচেয়ে তিনি বেশী সুনাম পেয়েছেন তা কোন বাঙ্গালী মেয়ের গলার দৌলতেই। (·) আমার কাছে দু'জনের গানই ভাল লাগে। তাই ভাল দু'জনেই গাইতে জানেন।

মিসেস প্রদীপশিখা রায় (নিউ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট)

রূপ-মঞ্চে দেখলাম একজন পাঠক প্রশ্ন করেছেন সন্ধ্যারাণীর প্রথম অভিনীত Film কোনটি? এর উত্তরে আপনি লিখেছেন 'বাংলার মেয়ে' কিন্তু এটি আপনার সম্পূর্ণ ভুল। কারণ সন্ধ্যারাণী আজ নূতন Film এ নামেননি, এর আগে আঙ্গুর নামে সন্ধ্যারাণী বেকার নাশন, চানক্য, দেবযানী প্রভৃতি Filmএ ছোট খাটো side part এ এবং নর্ত্তকীর partএ অভিনয় করেছেন। এসব ছাড়া তিনি রঙ্গালয়ের একজন অতিসাধারণ নাচিয়ে ছিলেন (সখির দলে)। খুব ছোট থেকে তাঁকে নাচতে দেখা গেছে। কাজেই আপনাদের সংগে একমত হতে পারা গেলনা। এবার আরও একটী প্রশ্নের প্রতিবাদ

করছি। শ্রীযুক্ত সাঁতরা বাবু প্রশ্ন করেছেন। সন্ধ্যা পূর্ণিমা, ফিরোজা, অঞ্জলী, অমিতা, রেণুকা ও সুনন্দা দেবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী কে?" এর উত্তরে আপনি বলেছেন সন্ধ্যারাণী, কিন্তু কোন হিসাবে সন্ধ্যারাণীকে এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা দেখলেন? কিছুদিন আগে কোন একটী প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন 'রূপমঞ্চ' উপযুক্তের প্রশংসা করতে পিছু হটেনা। তাই আজ জিজ্ঞাসা করি এই কি উপযুক্তের প্রশংসা? পূর্ণিমা, রেণুকা ও সুনন্দা দেবী এঁদের মধ্যে কী কাহারও সন্ধ্যারাণীর মত অভিনয় প্রতিভা নেই! প্রথম Film এ নেমে সুনন্দা দেবী কাশীনাথে যে অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন—সন্ধ্যারাণী Film এ নামার কত বছর পর সুনন্দা দেবীর সমপর্য্যায় দাড়াতে চলেছেন সে বিচার আপনিই করবেন। কিছু মনে করবেন না, সন্ধ্যারাণীর উপর আপনার বেশ একটু দুর্ব্বলতা আছে। হয়তো এই অপ্রিয় সত্য কথাতে আপনি একটু আন্তরীক চটে আমার উপর এক হাত নেবেন। কিন্তু কী করি বলুন! এসব দেখে শুনে আর চুপ করে থাকা গেল না তাই একটু প্রতিবাদ না ক'রে পারলাম না।

: অভিনেত্রী সন্ধ্যারাণীর বাংলার মেয়েতেই প্রথম প্রতিভার সন্ধান আমরা পাই। তাই আপনার বিচারে ভুল হলেও আমার বিচারে আমি নির্ভুল। বেকার নাশন, চানকা, দেবযানী প্রভৃতি চিত্রে অভিনেত্রী সন্ধ্যারাণীর পরিচয় পাননি—পেয়েছেন—নর্তকীরূপী আঙ্গুরের একথাত আপনিই স্বীকার করেছেন।

বাংলার মেয়ে—পরিণীতা—সহধর্ম্মিণী, সমাধান প্রভৃতি চিত্রে সন্ধ্যার অভিনয়-প্রতিভা—শুধু আমি নই সকলেই মনে নেবেন। সুনন্দার চেয়ে সন্ধ্যা বয়সে নবীনা। চপলা এবং শান্ত—পরস্পর বিভিন্নমুখীন দুইটী চরিত্রে অভিনয় করবার যোগ্যতা সন্ধ্যার আছে। আর সন্ধ্যা সম্পর্কে সব চেয়ে বড় কথা—তার অভিনয়ে যে আবেদন হৃদয়স্পর্শ করে—আপনার উল্লিখিত অভিনেত্রীদের অভিনয় তা মোটেই করে না। অভিনয় প্রতিভা থাকলেই যে তিনি শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী হবেন তার কোন অর্থ-নেই বিশেষ করে চিত্রে—দৈহিক গঠন মুখাবয়বের আবেদন তাঁকে অভিনেত্রী হবার পথে সাহায্য করে। তাছাড়া কণ্ঠ-স্বর ও সুনন্দার চেয়ে সন্ধ্যারাণীর মিষ্টি। অভিনেত্রী হিসাবে সুনন্দার নিন্দা কোনদিনই আমরা করিনি—বরং প্রশংসাই করেছি—রূপ-মঞ্চের পাতা খুললেই বুঝতে পারবেন।

সন্ধ্যার প্রতি আপনার জাতক্রোধ (?) আছে কিনা জানিনা—নইলে তার বিষয়ে এত খুটিনাটি খবর জেনেও কেন তাকে এঁদের ভিতর শ্রেষ্ঠা বলা হলো সেটুকু তলিয়ে দেখতে পারলেন না—

দর্শক হিসাবে কোন বিশেষ অভিনেতা বা অভিনেত্রীর প্রতি দুর্বলতা থাকতে পারে এবং আপনার মত সে দুর্বলতায় আমি নাক সিটকে উঠবোনা কিন্তু সম্পাদকতার গুরুভার নিয়ে সে দুর্বলতার যে বিসর্জন দিতে হয় তা আপনি সম্পাদকতার ভার যদি নিতেন তবেই বুঝতেন। কতকগুলি রূঢ় সত্য বললাম বলে ক্ষমা করবেন।

মোঃ হারুনুর রশীদ (এ, কে, ইন্সটিটিউট, বরিশাল)

(১) শ্রীযুক্ত রবীন মজুমদারের প্রথম চিত্র কোনটি?

(২) পৃথিবীর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং ভারতীয় সুরশিল্পী কে? (৩) আপনাদের সব শিশুদের দেশে আবার কি অভিনীত হবে? দ্বন্দ্ব ও শোধবোধের শিশু অভিনেতা মাষ্টার নিমাই নাগ চৌধুরীর ঠিকানাটা কি?

(১) শাপমুক্তি। আইসেনস্টীন, ডোবজেনেকো, পুডবকীন, পলমুনি—চার্লস লোটন - স্যার সিড্রিক হার্ডউইক, শিশির কুমার ভাদুড়ী। গ্রিটা গাবো, নর্মা শীয়ারার—কানন দেবী—দেবীকারাণী, চন্দ্রাবতী—শান্তা আপ্তে, রফিক গজনভি—তিমির বরণ, রাই বড়াল—কমল দাসগুপ্ত……

(৩) ১৬৭।৪।১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রূপ-মঞ্চ

কাজী মামুনুর রশীদ (এ, কে, ইনস্‌টিটিউট, বরিশাল)

(১) এ পর্য্যন্ত বাংলা ছবিতে কোন মুসলমান নায়ক দেখি নাই কেন? প্রযোজকেরা কি মুসলমানদের ফিল্মে ভর্তি করেন না? (২) সাধারণত যুবকদের মন Filmএ যাবার জন্যে ব্যাকুল হয় কেন—এ বিষয় আপনার মত কি? (৩) শ্রীমতী কানন দেবী বর্তমানে কোন চিত্র নিয়ে ব্যস্ত। (৪) বাংলার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, অভিনেত্রী ও সুর-শিল্পী কে?—

: (১) নেই বলে। বাংলার মুসলমান ভাইয়েরা হয়ত চলচ্চিত্রকে সুনজরে দেখেন নি। ভয় নেই আমাদের চিত্র জগতে 'হিন্দুস্থান' বা 'পাকিস্থানের' কোন বিরোধ নেই। উপযুক্ত মুসলমান যুবক বা যুবতী যদি পর্দায় আত্ম-প্রকাশ করতে ইচ্ছুক হ'ন যে কোন প্রযোজক সুযোগ দিতে আপত্তি করবেন না। (২) এর অন্তর্নিহিত বীজের সন্ধান জানে বলে—সৃষ্টি ও কর্ম প্রেরণায় নবীনেরা তাই অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। কিন্তু আমাদের দেশের যুবকেরা 'Film'এ নামবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন—জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যর্থতার গ্লানিতে জর্জরিত হয়েছেন বলে। সত্যিকারের গুনসম্পন্ন আদর্শবাদী যুবকদের দৃষ্টি যেদিন চিত্র জগতের দিকে পড়বে সেদিন—চিত্রজগতের বিরুদ্ধে কারোরই কোন অভিযোগ টিকবে না বলেই আমার বিশ্বাস। (৩) বিদেশীনী। অভিনেতা: জহর, অভিনেত্রী: কানন দেবী, সুরশিল্পী; কমল দাশগুপ্ত—তিনজনেই জন-প্রিয়তার দিক থেকে বিবেচিত।

জগন্নাথ মাড়োয়ারী (মেদিনীপুর)

সন্ধ্যারাণী কি ছদ্মবেশীর পর কোন চিত্রে অভিনয় করিতেছেন? কিসমৎ এর পর অন্য কোন চিত্রে মমতাজ শান্তিকে দেখিবার সম্ভাবনা আছে কি?

: আপাততঃ না। গীতাঞ্জলি পিকচার্সের সওয়ালে মমতাজ শান্তিকে দেখতে পাবেন। বাদল-তী দুনিয়া—নামে মমতাজ শান্তি অভিনীত আর একখানি চিত্র মুক্তি প্রতীক্ষায়।

আর, এন, ভড় (কুসুম মেমোরিয়াল ইন্সটিটিউট, (হুগলী)

(১) নিউথিয়েটার্সের প্রতিষ্ঠাতা কে! চিত্রা, রূপবাণী, উত্তরা, শ্রীর কে, কে উহার স্বত্বাধিকারী? (২) সুবল দাশগুপ্ত এবং কমল দাশগুপ্ত ইহারা কি দুই ভাই (৩) পি, সি, বড়ুয়া, দেবকী বোস, ফণী মজুমদার, পশুপতি চট্টোপাধ্যায় জগদীশ বাবু নীরেন লাহিড়ী এদের ভিতর কার কার ডিগ্রী আছে।

(৪) পঙ্কজ মল্লিক কোন ফিল্মে যোগদান করিয়াছে কি? সায়গল কোন বাংলা চিত্রে নামিতেছেন কি?

: (১) শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সরকার চিত্রা—নিউ-থিয়েটার্স লিঃ, রূপবাণী—প্রাইমা ফিল্মস লিঃ, উত্তরা—শ্রী—এক্সিজিবিউরস সিণ্ডিকেট। (২) দুই ভাই। (৩) পি, সি, বড়ুয়া বি, এস সি পশুপতি চট্টোপাধ্যায় —এম, এ।

পরিচালনার নৈপুন্যের জন্য যদি ডিগ্রী দেওয়া হতো তবে—পি, সি, বড়ুয়া, দেবকী বসু এম, এ, ফণী মজুমদার, নীরেন লাহিড়ী ও পশুপতি চট্টোপাধ্যায় বি, এ, জগদীশ চক্রবর্তী (under graduate) (৪) পঙ্কজবাবু নিউথিয়েটার্সের দুই পুরুষের সুর দিচ্ছেন। বর্তমানে কোন চিত্রে আত্মপ্রকাশ করবেন না। সায়গল সম্পর্কেও আমরা কিছু জানতে পারিনি। সম্ভবত নিউথিয়েটার্সেই তিনি যোগদান করবেন। এবং একখানি হিন্দি চিত্রে তাকে দেখা যাবে।

মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় (চুচুড়া)

বম্বে টকিজের আগামী চিত্র কি? হামারীবাৎ এর পর। ২। ইন্দ্রপুরী এবং নিউথিয়েটার্সের ষ্টুডিওর ঠিকানা কি।

: সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় গৃহীত হবে। নাম এখনও আমরা জানতে পারি নি। (২) ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও টালিগঞ্জ নিউথিয়েটার্স ষ্টুডিও—আনোয়ার সা রোড, টালীগঞ্জ।
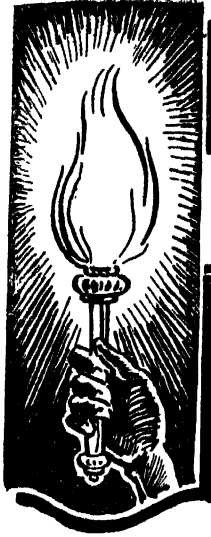
দেহ ও দেহী

"কার কণ্ঠে দেব বরমালা ?"

মেয়েদের চিরন্তনী প্রশ্নের উত্তর।

বিভাগীয় পরিচালক — ইউসুফ

এ সমস্যা শুধু বর্ত-মানেরই নয়,—অতীতের তমসাচ্ছন্ন যুগ থেকে আরম্ভ করে সর্বকালে সর্বদেশের তরুণীই এক প্রতীক্ষায় দিন গুণে থাকে,—কবে, কোন শুভক্ষণে তার স্বপ্নলোকের রাজকুমার এসে বলবে "তুমিই আমার স্ত্রী"।

কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষিতকে পাবার পূর্বে অনেক মেয়েরই তাদের বাঞ্ছিতের স্বরূপ সম্বন্ধে বহু ভ্রান্ত ধারণা থেকে যায়। বিবাহ ব্যবস্থা যদি অন্যের দ্বারা সংঘটিত হয় তা' হলেও সে যেমন ভাবতে থাকে যে নির্বাচিত স্বামী তার মনোমত হবে কিনা, আবার স্বীয় নির্বাচিত স্বামী হলেও তার চিন্তার শেষ হয় না এই মনে করে যে স্বামী তার সত্যই উপযুক্ত হল কিনা অথবা সে তার স্বামীর যোগ্যা হতে পারবে কিনা। এ চিন্তা যে বিবাহের লগ্নক্ষণে দেখা দেয় তা' নয়, বিবাহের কয়েক মাস পূর্বে থেকেই এ চিন্তা জালে তারা আচ্ছন্ন হতে থাকে। কোন জ্যোতিষী, কোন গনৎকার বা কোন রেখা-বিচারক, কেহই তাদের কোন সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করতে পারে না,—কেন না, এ বিচার শুধু তাদের নিজেদের উপরেই নির্ভর করে। যে কোন তরুণীরই কর্তব্য তার নিজেরই বিচার করা,—কার কণ্ঠে সে তার বরমাল্য পরিয়ে দেবে বা কাকে সে প্রত্যাখ্যান করবে। অথবা পিতা-মাতার কর্তব্য, মেয়ের জীবন-মরণ সমস্যা নির্ণয়ে বিচক্ষণতার সহিত বিশেষ ভাবে চিন্তা করা।

—পূর্ণিয়া থেকে জনৈকা তরুণী আমাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছেন যে সত্যিকারের ভাল স্বামী কাকে বলা চলে সে সম্বন্ধে আমি তাকে কোন ধারণা জন্মিয়ে দিতে পারি কিনা। কোন্ বিশেষ ব্যক্তিকে বিবাহ করা উচিত বা অনুচিত, তার এই প্রশ্নের উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে লোকটার জীবনের ভাল মন্দ দুটো দিকেই বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। যদি তার চরিত্রে মন্দ দিকটার চেয়ে গুণাবলীর আধিক্যই বেশী দেখা যায়, তা'হোক বিবাহ-বিচারে তাকেই স্বামী বলে বেছে লওয়া যেতে পারে।

সকলেরই মনে রাখা উচিত যে সম্পূর্ণ নির্দোষ মানুষ পৃথিবীতে নেই, তথাপি বন্ধু বা সঙ্গী হিসাবে প্রত্যেকেরই যথাসম্ভব দোষহীন বা ত্রুটী বিমুক্ত হওয়া কর্তব্য। যে কোন যুবক একের পক্ষে উপযুক্ত হলেও অন্যের পক্ষে অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে। সুতরাং আধুনিক প্রগতি এবং পাশ্চাত্য প্রভাবের দিনে প্রত্যেক যুবতীরই কর্তব্য বিবাহ বিষয়ে নিজের রুচি অনুযায়ী তার স্বামীর উপযুক্ততা বিচার করে লওয়া। প্রেম অন্ধ, সুতরাং বিবাহের পূর্বে যে মেয়েরা প্রেমাকৃষ্ট হয়ে পরে তাদের পক্ষে বিবাহ সম্বন্ধে কোন বিচার—সিদ্ধান্তে আসা অত্যন্ত কষ্টকর। এমতাবস্থায় তাদের কর্তব্য অভিজ্ঞ পরামর্শ নিয়ে তদনুযায়ী মনস্থির করা।

রূপ-মঞ্জুষা

পারিবারিক জীবনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের এমন সব মত ও পথ জানা থাকে যা প্রত্যেক যুবক বা যুবতীকে তাদের এই পরম বিচার্য বিষয়ে বিশেষ রূপে সহায়ক হতে পারে। বিবাহপ্রার্থী যুবকের ভালমন্দ প্রত্যেকটী আচরণ বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ কর্‌বার পর প্রত্যেক তরুণী এবং তার পিতামাতার কোন সিদ্ধান্তে আসা কর্তব্য।

স্বামী নির্বাচনে প্রথমে বিচার্য যে যুবকটী চরিত্রবান কি না, তার জীবন-যাত্রা প্রণালী নিন্দা-বিমুক্ত কিনা এবং জীবনে তিনি কতগুলি সৎকাজ করেছেন বা এমন কোন অন্যায় অনুষ্ঠান হতে তিনি বিরত হয়েছেন কিনা যার জন্য তাকে হয়তো আইনের চোখে দোষনীয় বলে প্রতিপন্ন হতে হতো। তার দৈনন্দিন আচার ব্যবহারও এমন ভাল হওয়া উচিৎ যা'তে বিবাহের পর তার স্ত্রী তার সংসারটীকে সংশোধনাগার করে না তোলেন। বিবাহিত জীবন নিয়ে হারজিতের লটারী খোলা উচিত নয়; কেন-না, দুঃখ-গ্লানিকে যারা বরণ করে নিতে প্রস্তুত নয় তাদের পক্ষে এই পরাজয় সারাজীবনকে দুর্বহ করে তোলে। প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্রের পবিত্রতা শৈশব থেকে আরম্ভ করে বিবাহিত জীবনে প্রবেশের সময় পর্যন্তও বিকসিত হতে থাকে। যুবকের স্বজন বন্ধু বা সংসর্গ থেকেও যুবকটী সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া খুব সহজ, কারণ তার বন্ধুরাই তাকে কতটুকু শ্রদ্ধা করে সেইটীই বিচার্য বিষয়।

প্রত্যেক স্বামীর মধ্যেই যৌন আবেদনের প্রাচুর্য থাকা প্রয়োজন। অবশ্য এজন্য আমি এ কথা বলছি না যে বহু রমণীর সঙ্গে যে যুবক প্রেম-অভিনয় কর্তে অভ্যস্ত তাকেই স্বামীরূপে নির্বাচন কর্তে হবে। তবে এ কথা স্বীকার্য যে প্রণয় নিবেদনে যে যুবক মুখ বা বোবা তাকে স্বামী নির্বাচন না করাই শ্রেয়। তারপর আপনার স্বামীর শারীরিক গঠন অপনার আকর্ষণীয় হওয়া প্রয়োজন। কেননা, শারীরিক সৌন্দর্যের ভিত্তিতেই ভালবাসার বীজ অঙ্কুরিত হতে থাকে, সুতরাং প্রারম্ভেই যদি কোন বিকৃত মনোভাব দেখা দেয় তা' হলে পরিণাম অশান্তি পূর্ণ হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক; কারণ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে নানাপ্রকার যৌন আবেদনের বেগ হ্রাসই পেয়ে থাকে, বর্ধিত হবার কল্পনা করাও ভুল। ভালবাসায় এই যৌন বিচার আদৌ অসঙ্গত নয়, এবং আমি বল্‌তে চাই যে এই যৌন আকর্ষণই স্বামী-স্ত্রীর প্রীতি-বন্ধন দৃঢ়তর করে তোলে, সুতরাং স্বামী-নির্বাচনের এই দিকটাব কখনও উপেক্ষা দেখান উচিৎ নয়।

প্রস্তরের ন্যায় হৃদয়হীন হওয়াও যেমন কোন যুবকের পক্ষে অনুচিৎ, আবার ভাবপ্রবণতায় পরিচালিত হওয়াও তার পক্ষে অন্যায়। এই জটিল সমস্যায় আমাদের সাধারণ বিচার বুদ্ধি দিয়েই আমাদের সিদ্ধান্তে আসা প্রয়োজন। প্রত্যেক ব্যক্তির ভাবপ্রবণতা তার কাছে নিশ্চয়ই ভাল বলে মনে হয়ে থাকে এবং অনেক সময় সাধরণের পক্ষেও মন্দ নয়, কিন্তু এই ভাব প্রবণতার প্রাবল্য যাতে আমাদের বাস্তব বিচার বুদ্ধিকে ভাসিয়ে নিয়ে না যায় সেজন্য আমাদের যথেষ্ট সংযত থাক্‌তে হবে। অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ যুবক কিছুতেই ভাল সঙ্গী হতে পারে না, এবং তার পক্ষে একটু উগ্র স্বভাব হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। সুতরাং যে কোন তরুণীর পক্ষে তাকে নিয়ে জীবনের পথে চলা অত্যন্ত কষ্টকর। এই ধরণের উত্তেজিত বা ভাবপ্রবণ যুবক সাময়িকভাবে খুব প্রীতিপ্রদ বলে মনে হয় কিন্তু জীবনের সঙ্গী হিসাবে তাঁরা ব্যর্থতারই পরিচয় দিয়ে থাকে। অতি সহজেই তাঁরা উত্তেজিত হয়ে পরে, কলহ করে এবং একান্ত শান্তিপূর্ণ গৃহে অশান্তির সৃষ্টি করে। স্বামীরূপে নির্বাচিত যুবকের মনোভাব খুব উদার হওয়া প্রয়োজন কিন্তু অমিত-ব্যয়ী হওয়া উচিৎ নয়। এই উদার মনোভাবের জন্যই সে তার স্বজন, বন্ধু, স্ত্রী বা সন্তানাদির প্রতি কর্তব্য পরায়ণ হবে আশা করা যায়, এবং তার সাধ্যানুযায়ী সুব্যবস্থা বা প্রীতি উপহার থেকে বঞ্চিত করবে না বলেই

রূপ-মঞ্জুষ

মনে হয়। কৃপণ ব্যক্তি যে কোন সংসারকে নষ্ট করে ফেল্‌তে পারে।

আবার, মনোনীত যুবকের বিনয়ী হওয়াও আবশ্যক। নিজের সম্বন্ধে তার অতি উচ্চ ধারণা থাকা উচিত নয় যদিও জীবনের প্রত্যেকটী কর্তব্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করবার শক্তি ও আত্মবিশ্বাস তার যথেষ্টরূপে থাকা প্রয়োজন। অহমিকাপূর্ণ মিথ্যা মানুষকে ভালবাসাও যেমন অস্বাভাবিক তাকে নিয়ে বাস করাও তেমনি কষ্টকর। যুবকের মধ্যে তার চরিত্রের দৃঢ়তা জীবন প্রারম্ভেই বিকসিত হওয়া উচিৎ এবং স্বজন বন্ধুবর্গের ইচ্ছার ক্রীড়নক না হয়ে আত্ম-প্রত্যয়ে তার পথ চলা কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে—রূঢ়তা ও চরিত্রের দৃঢ়তা এক বস্তু নয়। নিজের মত ও পথকে যদি বিচার বিশ্লেষণে ভাল বলে বিবেচিত হয় তা'হলে চরিত্রবান ব্যক্তি অন্য সহস্র প্রকার কারণেও তা' থেকে বিচ্যুত হয় না। ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রবল এক সঙ্গে পথ চলে এবং অপরের প্রতি অতি সহজেই তার প্রভাব বিস্তার করে।

নিজের গৃহকে শক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ কর্তে হলে অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের বাধ্যবাধকতায় কোন যুবকেরই জড়িত হওয়া উচিত নয়। অন্ততঃ মধ্যবিত্ত স্তরে নিজের পারিবারিক মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার ক্ষমতা না থাক্‌লে প্রত্যেক যুবকেরই বিবাহ করা অন্যায়। অবশ্য আমি এ কথা বল্‌ছি না যে পিতামাতা, বা ভাইবোনেদের প্রতি যুবকেরা তাদের কর্তব্য করবে না, পরন্তু ভাইভগ্নী বা মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য পরায়ণ যুবকই প্রেমময় স্বামী রূপে নির্বাচিত হবার যোগ্য। আমি বলতে চাই যে অর্ধাঙ্গিনী বা জীবনের সঙ্গীনিরূপে যাকে গ্রহণ কর্তে হবে, আত্মীয় স্বজনের প্রতি অতিরিক্ত কর্তব্য পরায়ণতায় তার প্রতি যেন অবহেলা প্রদর্শিত না হয়।

মনোনীত যুবক শিশুদের প্রতি স্নেহ প্রবণ কিনা তাহাও লক্ষ্যণীয় বিষয়, অবশ্য শিশু-প্রীতি যে মানব চরিত্রের অপরিহার্য বিশেষত্ব তা' বলা চলে না। তারপর প্রত্যেক তরুণীরই দেখা উচিৎ যে তার ভাবী স্বামীর কর্ম জীবনের উপার্জনের পরিমাণ কিরূপ? তার জীবন যাপন প্রণালীতে ব্যয় নির্বাহ করবার ক্ষমতা তার স্বামীর আছে কিনা? এ কথা সর্বদাই মনে রাখা কর্তব্য যে আর্থিক সঙ্গতি বহুবিধ পারিবারিক মনোমালিন্য বিদূরিত কর্তে সমর্থ হয়। যদিও অর্থই—জীবনের যথা সর্বস্ব নয়, তা' হলেও এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে আর্থিক সঙ্গতি বিবাহিত জীবনের সাফল্য এনে দিতে যথেষ্ট সহায়ক।

এর পরবর্তী বিচার্য বিষয় হচ্ছে যুবকের প্রকৃতি। দেখ্‌তে হবে যে যুবকটী শিষ্টাচার সম্পন্ন কিনা এবং যে সমাজে সে তার সঙ্গিনীকে নিয়ে প্রবেশ কর্তে যাচ্ছে সে সমাজের চল্‌বার উপযুক্ততা তার আছে কিনা। যুবকটী অশিষ্ট অথবা অত্যধিক শিষ্টাচার প্রিয় তাহাও লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

তারপর প্রয়োজন যুবক যুবতীর শিক্ষা ও মনোবৃত্তি সমভাবাপন্ন হওয়া। কোন গ্রাজুয়েট রমণীর পক্ষে কোন মোটর চালকের (অশিক্ষিত) সঙ্গে প্রেমে পড়া যেমন অসম্ভব, তেমনি কোন উদার হৃদয়া নারীর পক্ষে কোন সঙ্কীর্ণ মনা যুবককে নিয়ে সুখী হবার কল্পনাও হাস্যকর। বাঞ্ছিত যুবকের গুনাবলী তার প্রণয়িনীর চেয়ে নিম্নস্তরের না হয়ে উচ্চস্তরের হওয়া প্রয়োজন। দুইটী বিভিন্ন সমাজের নর ও নারীর বিবাহ বন্ধন কদাচিৎ স্থায়ী হয়ে থাকে। উভয়ের স্বজন বন্ধুগণই সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর, —ফলে, তাদের মেলামেশাতেও অনেক অসুবিধা দেখা দেয়।

এই নির্বাচন পরীক্ষায় বর্তমান যুগে যুবকের পূর্ণ স্বাস্থ্য কামনা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। এমন কি যদি দেখা যায় যে মনোনীত যুবকের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের সঙ্গে চলবার

বরণ-মঞ্জুষা

মত যোগ্যতা তরুণীটির নেই তা' হলে তেমন মেয়েদের উচিৎ নয় কোন যুবককে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা।

স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ শান্তিময় গৃহের ধারনা যাদের নেই তেমন ছেলেদের কোন কুমারীরই বিবাহ করা উচিৎ নয়। পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং কর্তব্যপরায়ণ হওয়া প্রত্যেক সন্তানেরই উচিৎ, তা' বলে মায়ের আচলধরা হয়ে থাকা কারও পক্ষে সমীচীন নয়। বরং নির্বাচনে এরূপ আঁচলধরা ছেলে সর্বথা পরিত্যজ্য। অবিবাহিত যুবকরূপে এরূপ ছেলেদের ভাল বলেই মনে হয়, কিন্তু বিবাহিত জীবনে তাদের দীনতার অন্ত থাকে না। স্ত্রীর সঙ্গে তারা যেন আইনগত সম্পর্কই বাঁচিয়ে চলে। এরূপ ছেলেরা মা এবং স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য বিচারে সম্পূর্ণরূপে বিহ্বল হয়ে পড়ে। এদের শারীরিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়া কোন তরুণীরই উচিৎ নয়। হয়তো তারা "নন্দগোপালের" মত দেখ্‌তে সুন্দর কিন্তু তাদের বিবাহ করে ভাগ্যবতী হবার কামনা থেকে বিরত থাক্‌তে প্রত্যেক্ তরুণীকেই আমি নির্দেশ দিচ্ছি। মাকাল ফলের ন্যায় তাদের আভ্যন্তরীন কদর্যতা যে কোন সময় মেয়েদের চোখে ধরা পড়তে পারে। অন্তরের সৌন্দর্য সন্ধান করবার উপদেশই আমি মেয়েদের দিতে চাই, কারণ মাকালফলের চেয়ে নারিকেল ফল সর্বপ্রকারে কাম্য।

চল্লিশ বৎসরের উর্ধ বয়স্ক কোন পুরুষকে কিছুতেই বিবাহ করা উচিৎ নয়। জীবনের এতগুলি বৎসর যদি তিনি অবিবাহিতই কাটিয়ে থাকেন, বাকী দিনগুলিও তার তদ্রূপই কাটান উচিৎ। কারণ, তার মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কোন দুর্বলতা আছে যা' তাকে দাম্পত্যজীবন থেকে এতদিন বঞ্চিত করে রেখেছে। পুকুর থেকে তোলা এমন মাছটিকে পুনরায় পুকুরে ফেলে দেওয়াই সঙ্গত। এরূপ পুরুষেরা সাধারণতঃ স্নায়ুবিক বিকারগ্রস্ত হয়ে থাকে। কোন তরুণীর বিবাহিত জীবনে এরা সুশোভন কখনও হবে না, পরন্তু সমস্ত জীবনটাই ধ্বংস করে দেবে।

মদ্যপায়ী, কৃপণ, দাম্ভিক, অহমিকাপূর্ণ ব্যক্তি, বা স্নায়ুবিক দুর্বল পুরুষ বিবাহের নির্বাচনে সর্বপ্রকারে পরিত্যজ্য, কেননা—আমি পূর্বেই বলেছি যে বিবাহিত জীবন সংশোধনাগার নয়। শুধু তাই নয়, হাস্যাস্পদ ব্যক্তি বা যে ব্যক্তি আকাশের চাঁদ হাতে তুলে দিতে চাইবে তাদেরও কখন বিবাহ করা উচিৎ নয়। অনুরূপ ব্যক্তিরা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা দূরে থাক, এমনকি একান্ত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবস্থাও কর্তে সক্ষম হয় না। আবার কম প্রয়োজনীয় জিনিষের প্রতি—যাদের লক্ষ্য নেই তাদেরও সর্বতোভাবে দূরে রাখা উচিৎ।

পরিশেষে ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে প্রত্যেক যুবতীকেই আমি অনুরোধ করবো,—কেন না ঈর্ষান্বিত স্বামী তার স্ত্রীকে দিনের পর দিন বিভ্রান্তই করে তোলে। অবশ্য প্রত্যেক মেয়েরই মনে রাখ্‌তে হবে যে প্রেম ও ঈর্ষা এক বস্তু নয়; মানব মনে এই দুইয়েরই সম্পূর্ণ দুইটী পৃথক স্বত্বা আছে। পুরুষ তার স্ত্রীকে ভালবাসে, এবং তাকে কম বেশী একান্ত আপনার করে নিতে চাইবেই। কিন্তু সেই সঙ্গে তাকে একথাও মনে রাখতে হবে যে স্ত্রীর চতুর্দিকে বন্দীশালার দেয়াল গেঁথে দিয়ে তাকে যথেষ্ট বিশ্বাস কর্তে হবে। ভালবাসায় এই বিশ্বাসের অভাব হলেই তা' ঈর্ষায় রূপান্তরিত হয়।

আমার এই প্রবন্ধ পড়ে প্রত্যেক তরুণী স্বতঃই আমাকে প্রশ্ন করে বস্‌বেন, "তা' হলে কাকে আমরা বিবাহ করবো, বা কার কণ্ঠে আমাদের বরমালা পরিয়ে দেব?" আমি জানি বরনির্বাচনে যে আদর্শ বা গুনাবলীর উল্লেখ আমি করেছি, অনুরূপ লোক পৃথিবীতে একান্ত বিরল। সুতরাং এই সমস্যার সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক যুবতীর অবশ্য কর্তব্য তার মনোনীত যুবকের মধ্যে আমার লিখিত

গুনাবলীর প্রত্যেকটীর অনুসন্ধান করা। যদি যুবকটীর মধ্যে অধিকাংশ গুণাবলী বিদ্যমান থাকে, তা' হলে তাকে বেছে নেওয়া যেতে পারে, আর অধিকাংশ গুণাবলীর অভাব পরিলক্ষিত হলে সেরূপ যুবককে শুধু প্রত্যাখ্যান নয় সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাওয়াই কর্তব্য। সুতরাং কোন প্রক্যর সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পূর্বে প্রত্যেক যুবতী বা তাদের পিতামাতার অবশ্য কর্তব্য আমার মন্তব্যগুলি বিচক্ষণতার সহিত বিবেচনা করা। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, আমার বক্তব্যগুলি মনে রাখলে বিবাহিত জীবনে মেয়েরা যে শুধু সম্পদ, সৌন্দর্য বা সম্মানের অধিকারিণী হবে তা' নয়, সুখীও হবে। এ বিষয়ে অপরের মতামত, বিশেষতঃ যারা বিশ্বাসী, বিশেষরূপে সহায়ক। কিন্তু কখনও প্রকাশ্যভাবে এই মতামত সংগ্রহের চেষ্টা না করাই সঙ্গত, কারণ গোপন অনুসন্ধানেই যুবকটীর সম্বন্ধে সত্যিকারের স্বরূপ জানা সহজ।

'পৃথ্বীবল্লভে' শঙ্কটপ্রসাদ ও দুর্গা খোটে

তাই আমি পুনরায় বলতে চাই যে বিবাহ বিষয়ে প্রত্যেক যুবতী এবং তাদের অভিভাবকদের চিন্তাশীলতা এবং বিচক্ষণতার সহিত স্থির সিদ্ধান্তে আসা কর্তব্য তা' হলেই মেয়েদের বিবাহিত জীবন সুখ ও শান্তিপূর্ণ হতে পারে। এই বিষয় বিশ্লেষণের অভাবেই আধুনিক মেয়েদের দাম্পত্য-জীবনে কদাচিৎ সুখ ও শান্তি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

শ্রীপার্থিবের সফর-বার্তা

'চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা পংকিলতার মাঝেই ডুবে আছে'। শ্রীপার্থিবের সংগে আলোচনায় বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংঘের (Bengal Film Journalists' Association) সম্পাদক শ্রীযুক্ত এস, এম, বাগড়ের অভিমত।

শ্রীযুক্ত বাগড়ে বর্তমানে কাপুর চাঁদ লিমিটেড পরিচালিত প্যারাডাইস ও রক্সী সিনেমার জেনারেল ম্যানেজার। বহুদিন যাবৎ চিত্রশিল্পের সংগে তিনি জড়িত আছেন। 'এ্যাডভান্স' পত্রিকার সিনেমা-এডিটররূপে সুনাম অর্জন করেন। বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংঘের প্রথম থেকেই তিনি এর সংগে জড়িত। বয়স ৪২।৪৩ হবে। খর্বাকৃতি, চরিত্রের স্বাভাবিক অমায়িকতায় সাংবাদিক

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত এস, এম বাগড়ে।

পরবর্তী

মহলের সকলেই তার বন্ধুত্বে মুগ্ধ। মাতৃভাষা মাহারাষ্ট্র কিন্তু পরিষ্কার বাংলা বলেন, বন্ধুবর শ্রীপঙ্ককে নিয়ে যখন আমি দেখা করতে যাই তখন তিনি তার দপ্তরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। আমার অভিপ্রায় জানিয়ে পাশের চেয়ার টেনে বসলাম। হাতের কাজ সরিয়ে রেখে দিয়ে তিনি বলতে লাগলেন। "আপনি নিজে একজন সাংবাদিক আপনিও স্বীকার করবেন চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা এখনও পংকিলতার মাঝেই ডুবে আছে। নির্ভীক মতবাদ অনেক পত্র-পত্রিকারই নেই। প্রযোজক বা পরিবেশক প্রতিষ্ঠানদের অনুরোধে খুশীমত সমালোচনা করতেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় অন্য কথায় এসব গুলি যেন 'স্টুডিও বুলেটিনস্'। চলচ্চিত্রেব দিন দিন প্রসার ও উন্নতির সংগে আমরা সাংবাদিকেরা পা ফেলে চলতে পারিনি—নিজেদের এই অক্ষমতার কথা অকুন্ঠিত চিত্তে স্বীকার করতে আমি একটুকুও লজ্জা বোধ করি না। আমাদের পত্র পত্রিকাগুলি দেশীয় চলচ্চিত্রের শৈশব যুগের প্রভাব এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আমাদের দৃষ্টি পিছনের দিকেই পড়ে আছে। শৈশব যুগ বা চলচ্চিত্রের জন্মের যুগ বলতে আমি মনে করি যখন কোন প্রকার উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে কেউ এদিকে পা বাড়াননি। চিত্র প্রযোজনায় যেমনি বিলাসপ্রিয়তার মোহে প্রযোজকরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন তেমনি চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার মূলেও এই কথাই নিহিত রয়েছে। নট-নটীদের দু'চার খানা ছবি ছেপে, ছায়া জগতের ভোজবাজীর কথা প্রকাশ করে দিয়েই খালাস! এই ছায়াবাজী বা ভোজবাজী যে শুধু রং তামাসায়ই পরিপূর্ণ নয় একথা প্রমাণ করতে অনেকেই প্রয়াস পান না এই রং তামাসার সত্যিকারের রূপ উদ্ঘাটনের পথে অনেককেই অগ্রসর হতে দেখতে পাই না। এতদিন চলচ্চিত্রের জন্য যেমন কোন বিশেষ দর্শক শ্রেণীকে দেখে এসেছি তেমনি চলচ্চিত্র পত্রিকার জন্যও সেই এক মার্কা-মারা পাঠকদের দেখতে পাই। শিল্প ও শিল্পীর বিষয়ে যতটা না তাদের জানবার ও বুঝবার আগ্রহ দেখা যায় তার চেয়ে বেশী আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন কুরুচিপুর্ণ তথ্য সংগ্রহে। এই শ্রেণীর পাঠক এবং দর্শকদের গড়ে তুলবার দায়িত্ব রয়েছে চলচ্চিত্র পত্রিকাগুলির। এ ছাড়া কোন ধরণের চিত্র হওয়া উচিত না উচিত—সেই ধরণের চিত্র গ্রহণের পথে বাধা বিঘ্ন থাকলে কী ভাবে তা ডিঙ্গিয়ে যাওয়া যেতে পারে সে নির্দেশের ক্ষমতাও রয়েছে আমাদের পত্রিকাগুলির হাতে। জনমত গঠন করে প্রয়োজন ও চাহিদানুযায়ী চিত্র প্রস্তুতে প্রযোজকদের যেমনি বাধ্য করাতে পারেন তেমনি চিত্র গ্রহণে সাহায্য করতে পারেনও এরা অনেকখানি।

চিত্র সমালোচনার কথা বলতে যেয়ে শ্রীযুক্ত বাগড়ে বলেন: সমালোচনা হবে সব সময়ই নির্ভীক। নির্ভীক বলতে ধ্বংসমূলক সমালোচনা নয়—যা চিত্রের উন্নতির পথে সব সময়ই পরিপন্থী। চিত্রের ত্রুটি বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করতে হবে যেমনি, সংগে সংগে ভবিষ্যতে সে ত্রুটি বিচ্যুতি কী করলে না ঘটতে পারে তারও নির্দেশ দিতে হবে। তবে কয়েকখানি পত্রিকার চলার ছন্দে সত্যই আমি আশাপ্রদ। এদের গতি নূতন সুরে কাণে বেজেছে তাই আনন্দ হয়—আশান্বিত হয়ে উঠি, হয়ত আমাদের চলচ্চিত্র সংবাদপত্র জগতের পংকিলময় পরিস্থিতি এদের প্রচেষ্টায় অপসারিত হবে। নির্ভীক সমালোচনার জন্য এই পত্রিকাগুলি অল্প দিনের মাঝেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।'

এই সমালোচনার প্রসংগ টেনে নিয়ে আমি বললাম: দেখুন অনেকে অনেক সময় সমালোচনাব বিষয়ে আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনে থাকেন—টেকনিক (সংগীত, চিত্রগ্রহণ শব্দগ্রহণ প্রভৃতি) সম্পর্কে

আমাদের বাস্তব কোন অভিজ্ঞতা না থাকলে তার বিষয়ে রায় দেবার আমাদের নাকি কোন অধিকার নেই। কোন জনপ্রিয় সংগীত পরিচালকের কোন চলতি ছবির সুর সম্পর্কে আমি খুশী হতে পারিনি বলে তার কোন আত্মীয় বন্ধু এই অভিযোগ এনেছেন আমার বিরুদ্ধে।

: ভুল–ভুল, তারা মস্ত ভুল করেন শ্রীপার্থিব!—যাঁরা একথা বলেন ভুল বুঝেই বলেন।" শ্রীযুক্ত বাগড়ে জোর দিয়ে একথা বল্লেন। "কারণ, দেখতে দেখতে আর শুনতে শুনতে আমাদের চোখ আর কাণ সাধারণের চেয়ে অনেকাংশে বেশী শক্তিশালী। বিকৃত আর বেসুরো ধ্বনি সহজেই আমাদের কাছে ধরা পড়ে। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন শ্রেণীর চিত্র দেখবার আমাদের যত সুযোগ ও সুবিধা হয় অনেকের পক্ষেই তা সম্ভবপর নয়। তাই যা এত দেখি ও শুনি সে সম্পর্কে কিছুটা বলার অধিকারও আমাদের জন্মে ওঠে। এবং এই 'বলা' বা 'রায়' দেওয়ার বিশেষজ্ঞের মাপ কাঠিতে দাম না থাকলেও নেহাৎ উড়িয়ে দেবার নয়।"

এর পর চিত্রের দীর্ঘতা সম্পর্কে আমি শ্রীযুক্ত বাগড়েকে জিজ্ঞাসা করলাম: যুদ্ধোত্তর কালে চিত্রের দীর্ঘতা ১১ হাজার ফিটেই থাকার বিষয়ে আপনার মত কী?

উত্তর এলো: এগার হাজার কেন আমি ন' হাজারের পক্ষপাতি। নয়—দশ হাজারের ভিতর যদি চিত্র শেষ করতে হয়—অনেক অপ্রয়োজনীয় দৃশ্যাবলীতে যেমনি চিত্র ভারাক্রান্ত হ'তে দেখবো না তেমনি Short Films' এর প্রযোজনায় আমাদের প্রযোজকদের দৃষ্টি পড়বে। কারণ ৯।১০ হাজার ফিটের সংগে অন্ততঃ ২।৩ হাজারের Short Films দেখাতেই হবে। এবং এই সব Short Filmsএর মারফতে শিক্ষনীয় দেশীয় বিদেশীয় অনেক বস্তু ও সংবাদ পরিবেশন করা সহজ হবে।"

আমাদের আলোচনা বেশ স্বাভাবিক ভাবে চলছিল। বন্ধুবর শ্রীপঙ্কজও মাঝে মাঝে ফোড়ন কাটছিলেন। চা আর সিগারেটের ধূয়ায় আসরটা বেশ জমে উঠেছিল—এর মাঝে বাইরে কয়েকজন ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত বাগড়ের সংগে সাক্ষাৎ করতে এলেন। আমি তাদের কাছ থেকে আরও কয়েক মিনিটের অনুমতি নিয়ে এসে বললাম: আপনার ভাল লাগার সঙ্গে আমাদের শিল্পীদের যাচাই করেই আপনাকে মুক্তি দেব প্রথম পরিচালকদেরনিয়ে—এদের ভিতর কে কে আপনার প্রিয়?

: পুরোণ ও নূতন দুই দলে ভাগ করে আমি বলবো। পুরোনদের ভিতর দেবকী বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া, শান্তারাম—এঁদের যুগে এঁরা নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এদের দৃষ্টিশক্তি এত পিছনের দিকে—বিশেষ করে দেবকী বসু সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য যে নূতন কিছু পাবার আশা নেই তাঁর কাছ থেকে। 'প্রগ্রেসিব' কোন কিছু দেবার শক্তি এঁদের নেই। নূতন দলের ভিতর মেহবুব, শৈলজানন্দ ও নীরেন লাহিড়ীকে আমার ভাল লাগে। শৈলজানন্দ নিজে একজন নামকরা সাহিত্যিক। তাই চিত্রের গল্পই যে প্রাণ একথা তিনি প্রমাণ করতে পেরেছেন। 'টেকনিক' সম্পর্কে তার যদি বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতো ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্র-পরিচালকরূপে সহজেই তিনি তার স্থান করে নিতে পারতেন।"

: কোন্ সুরশিল্পীর সুর আপনাকে মাতাল করে?

: নিঃসন্দেহে বলতে পারি—কমল দাশগুপ্তের। তার সুরের নূতনত্ব আমায় মাতাল করে।

: অভিনেতাদের ভিতর কে আপনার প্রিয়?

: ছবিকে প্রথম প্রথম ভাল লেগেছিল—এখন এক-ঘেয়ে হয়ে উঠেছে। একই ধরণের চরিত্রের অভিনয়ে তারপর আমি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছি। হিন্দি চিত্রে প্রেমিকরূপে অশোক কুমার—'সিরিয়াস' চরিত্রে চন্দ্রমোহন আমার প্রি-

...এর

কিন্তু পৃথ্বিবল্লভ দেখে চন্দ্রমোহন থেকেও সোহ্‌রাব মোদী বেশী আকৃষ্ট করেছে।"

: অভিনেত্রীদের কার আপনি অনুরাগী ?

: পুরোণ দলের ভিতর দেবীকারাণীর কথা প্রথম বলতে হয়—তারপর কাননদেবী ও চন্দ্রাবতী। নূতন দলের ভিতর ভারতী, সন্ধ্যা ও সুনন্দা– এদের তিনজনের ভবিষ্যৎ উজ্জল মনে হলেও ভারতী আমার বেশী প্রিয়।—"

ভারতীয় প্রযোজকদের বর্তমানের কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা প্রসংগে শ্রীযুক্ত বাগড়ে বলেন : আজকাল চাকা ঘুরে গেছে। সকলেরই উৎসাহ দেখা যাচ্ছে প্রাচীন ও ঐতিহাসিক চিত্র গ্রহণে। কতকগুলি জাকজমকময় চিত্রের কৃতকার্যতায় ভারতীয় প্রযোজকরা ঐ শ্রেণীর চিত্রগ্রহণে যেন নতুন ভাবে প্রেরণা লাভ করেছেন।

সর্বশেষে রূপ-মঞ্চ পত্রিকার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে : মুচকি হেসে শ্রীযুক্ত বাগড়ে বলতে লাগলেন : রূপ-মঞ্চ সম্পর্কে শুধু এইটুকু বলতে পারি, কোন মাসের কাগজ যদি সময় মত হাতে না পাই উতলা হয়ে ষ্টলে যেয়ে বার বার অনুসন্ধান করি 'রূপ-মঞ্চ বেরিয়েছে কি না।' রূপ-মঞ্চ সম্পর্কে এর চেয়ে বেশী কিছু আমার বলার নেই।" বিদায় নেবার সময় নমস্কার করে আমিও ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রীযুক্ত বাগড়েকে বলে এলাম : রূপ-মঞ্চের পাঠক পাঠিকাদের কাছে রূপ-মঞ্চ সম্পর্কে আপনার এই অভিমত পৌঁছে দেবার জন্য নিজেকে আমি গর্বিত বলেই মনে করবো।"

সব বিষয়েই দু' পাঁচ কথা

(এই বিভাগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

—শ্রীপঞ্চক—

প্রস্তাবনা: উড়ে এসে অকস্মাৎ 'রূপমঞ্চ'র আসরে জুটে যাওয়ার জন্যে যদি কারুর কোন অসুবিধা ঘটিয়ে থাকি তার জন্যে অপরাধ নেবেন না। কাগজের দুর্মূল্যতা এবং তার চেয়ে বড় কথা দুষ্প্রাপ্যতা সত্ত্বেও সম্পাদক যখন কখানা পাতা ছেড়ে দিয়েছেন তখন সম্পাদক ও আমার একটা কোন উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই মিলে গিয়েছে ধরে নিতে হবে। সত্যি কিন্তু তাই নয়, তার প্রমাণ সম্পাদক আমার কোন কথারই দায়িত্ব নিতে রাজী নন ব'লে ঘোষণাই ক'রে দিয়েছেন। সুতরাং এ বিভাগে এখন থেকে যা বের হবে তা সম্পাদকীয় মত ধ'রলে ভুল করা হবে, তা একান্তই আমার নিজস্ব মত এবং সমস্ত দায়ীত্ব একমাত্র আমারই।

প্রথমেই ব'লে রাখি, আমার উদ্দেশ্য সাধু নয়। কারণ প্রধানতঃ অপ্রিয় ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটাই হবে আমার কাজ এবং সে-কারণ বহু জনের রোষ ও অভিশাপই হবে আমার পারিশ্রমিক। তবুও যদি কেউ এই বিভাগটিকে প্রকৃতপক্ষে শুভ-সূচনারই ইঙ্গিত ব'লে ধ'রে নেন, তাহ'লে তাঁর সে ধারণা ভুল কি ঠিক এক কাল ছাড়া সে বিচার ক্ষমতা আর কারুর নেই।

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বছর পনের এদেশের প্রমোদ-জগতের সংস্রবে থেকে অনেক কিছু দেখেছি ও শুনেছি এবং অনেক কিছু ভাল না লাগার সে সম্পর্কে বলবার অবকাশ খুঁজেছি। 'রূপমঞ্চর'-র সম্পাদক এ সুযোগটি আমাকে দিতে রাজী হ'য়েছেন। আমি বলি কি, আমার মত আপনাদের আরো পাঁচ জনেরও নিশ্চয়ই অনেক কিছু বলবার আছে, অনেকে অনেক তথ্যই জানেন, অনেক রহস্যেরই খবর রাখেন কিন্তু যে কোন কারণেই হোক সব সময়ে হয়তো সে সব করার সুযোগ থাকে না বা সুযোগ থাকলেও নানা কারণে বাধ্য হ'য়েই সব চেপে যেতে হয়, তা সে-সব ব্যাপার সপ্রমাণ আমার কাছে পৌঁছে দিলে বা তাই নিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ ক'রলে এ আসরটা তো আমাদের পাঁচজনেরই হ'য়ে উঠতে পারে, আর সেই তো সবচেয়ে ভাল। কি বলেন আপনারা? একটা কথা—কারুর ব্যক্তিগত কোন উদ্দেশ্যকে কিন্তু মোটেই আমল দেওয়া হবে না। আর ভণিতা করা নিষ্প্রয়োজন—দম নিয়ে এবারে কাজের কথায় নেমে আসা যাক।

এন্-টি'র কি গৌরব!

বাঙলার বাইরের প্রদেশসমূহকে দীর্ঘকাল হতাশ ক'রে রাখার পর নিউ থিয়েটার্স তাদের নবতম সৃষ্টি 'ওয়াপস্' ছবিখানি দিয়ে নাকি চিত্রপ্রিয়দের মনে আবার সাড়া জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হ'য়েছে। ছবিখানি মুক্তিলাভ করেছে বম্বেতে গত ওরা ডিসেম্বর এবং বম্বের পত্র-পত্রিকাদি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সেখানে ছবিখানি বিপুল অভ্যর্থনা লাভে সক্ষম হয়েছে। ছবিখানি দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি সুতরাং সে সম্পর্কে কোন মত প্রকাশ করা শোভন নয়। তবে বম্বের সমালোচকদের কথা ধ'রতে গেলে 'ওয়াপস' সম্পর্কে এই ধারণাই হয় যে 'ওয়াপস' হ'য়েছে—নিউ-থিয়েটার্সে'র ছাপমারা বম্বে টকীজ পর্যায়ের ছবি অর্থাৎ সোজা কথায় নিউ থিয়েটার্স এই ছবিখানিতে বম্বে টকীজের পদানুসরণ ক'রেছে। নিউ থিয়েটার্সে'র তথা সমগ্র বাঙলা-চলচ্চিত্রশিল্পের এর চেয়ে বড় গৌরব আর কি আছে! এতদিন যে প্রতিষ্ঠান ভারতীয় চিত্রজগতের পথ-প্রদর্শক ছিল জানতুম—সেই নিউ থিয়েটার্সে'র আদর্শে বম্বে টকীজএর রহস্য প্রকাশ পাওয়ায় আমরা তো নিতান্তই 'বেয়াকুব' বনে গিয়েছি। নিউ থিয়েটার্সে'র মত প্রতিষ্ঠানকেও শিষ্য হিসেবে লাভ করার জন্য আমরা বম্বে টকীজকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

নটীদের ছায়া

একদিন ছিল যখন চিত্র বা মঞ্চের নটীদের ছায়া নিয়ে কারুরই কোন প্রশ্ন ছিল না। এখন আর সে আবহাওয়া নেই—ভদ্রবংশোদ্ভুতা এবং শিক্ষিতাদের এই বিভাগে যোগদানে রুচি শালীনতা প্রভৃতি প্রশ্নও এসে জুটেছে। কিন্তু শিক্ষিতা নটীরাও যদি এসব অগ্রাহ্য ক'রে চলেন তাহ'লে আগেকার দিনের নটীদের প্রতি আমরা অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ ক'রে নিতান্তই অন্যায় ক'রে এসেছি ব'লতে হবে।

একথাটা উঠলো 'নমস্তে' নামক সম্প্রতি প্রদর্শিত একখানি হিন্দী ছবি দেখে। এ ছবিখানির নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় ক'রেছেন বাঙলার ভূতপূর্ব তারকা ভদ্রবংশীয়া এবং শিক্ষিতা অভিনয়শিল্পী প্রতিমা দাশগুপ্তা। অভিনেত্রী হিসাবে শ্রীমতী প্রতিমা এদেশের প্রথম শ্রেণীর শিল্পীদের সঙ্গে আসন পাবার যোগ্য ব'লে বিবেচিত—লোকে তাঁর মার্জিত রুচি, ফ্যাশানের অভিনবত্বের কথাও উল্লেখ করেন কিন্তু 'নমস্তে' দেখার পর একথা কেউই বিশ্বাস ক'রতে চাইবেন বলে মনে হয় না। নিজের অভিনয়-প্রতিভাকে দাবিয়ে সর্বক্ষণ 'Sex appeal'এর সাহায্যে দর্শককে সমানে আকর্ষণ করার ফ্যাশানটি অভিনব সন্দেহ নেই, বিশেষ এক শিক্ষিতা ভদ্রবংশীয়ার কাছ থেকে, কিন্তু শিল্পী হিসেবে তিনি নিজের যে জঘন্য পরিচয় উদ্ঘাটিত ক'রেছেন তা তাঁর এবং সমগ্র শিক্ষিতা অভিনেত্রী সম্প্রদায়ের পক্ষে নিতান্তই অগৌরবের বিষয়। চলমানকালের অনিবার্য অভিব্যক্তি ব'লে ধরে নিয়ে তার প্রথম প্রকাশের গৌরব পাবার জন্য যদি প্রতিমা ঝুঁকে থাকেন তাহলে আর বলার কি থাকতে পারে ?

দানের ঝঞ্ঝাট

বাংলার দুর্ভিক্ষে চিত্রব্যবসায়ীদের অনেকেরই অন্তর কেঁদে উঠেছিল কিন্তু দুর্গতদের সাহায্য করা ঈপ্সা কারুরই বড় একটা তেমন তীব্র হ'য়ে উঠতে দেখা যায় নি। নিতান্ত চক্ষুলজ্জার খাতিরেই যেন বঙ্গীয় চলচিত্র সংঘ মাত্র একদিনের বিক্রয়লব্ধ অর্থ সাহায্যভাণ্ডারে দান করার জন্য সহরের প্রদর্শকদের প্ররোচিত করে। শোনা গেল সব প্রদর্শক এ প্ররোচনায় ভোলেন নি। তা সত্বেও সেদিনের সংগ্রহ লক্ষাধিক টাকায় পৌঁছয় কিন্তু সে টাকাটা দুর্গতদের সেবায় কি ভাবে যে নিয়োজিত হ'ল তার কোন বিবরণই সাধারণে পেশ করা হয় নি। শুনেছি প্রদর্শকেরা টাকাটা বঙ্গীয় চলচিত্র সংঘতে (বি-এম-পি-এ) জমা দিয়েছেন। সেদিনের সাহায্যকারী দু'টি-চিত্রগৃহে পয়সা দিয়ে দর্শকরূপে নিজে হাজির ছিলুম সুতরাং একটা হিসেব দাবী করার অধিকার নিশ্চয়ই আছে। বি-এম-পি-এ'র কর্তারা এ দাবীকে আমলে আনলে বাঁচি !

আর এক কথা। সহরের বিখ্যাত পরিবেশক কাপূরচাঁদ লিমিটেড দুর্গতদের সাহায্য কল্পে তাঁদের চিত্রগৃহ রক্সী ও প্যারাডাইসের প্রায় মাস দুই যাবৎ প্রতি সপ্তাহের একদিনের সমুদয় বিক্রয়লব্ধ অর্থ দান ক'রবেন ব'লে ঘোষণা করেন। স্রেফ দানের অভিপ্রায়েই ঐ নির্দিষ্ট দিনে কয়েক সপ্তাহ আমি চিত্রগৃহ দু'টির কোন না কোনটিতে হাজির হ'য়েছি। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কাপূরচাঁদের এই তহবিলে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণই বা কত হ'লো আর সে টাকা কোন সাহায্য ভাণ্ডারে দান করা হ'লো তার কোন খবরই কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করেন নি। এই দানের সংকল্প ঘোষণা ক'রে কাপূরচাঁদ সর্বসাধারণের কাছ থেকে সমগ্র প্রশংসা যেমন আদায় ক'রে নিয়েছেন তা তেমনি তাঁরা জমিয়ে রাখতে পারতেন যদি আর একটা ঘোষণায় তাঁদের কার্যসূচীটা জানিয়ে দিতেন সবাইকে। কাপূরচাঁদের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এ কথাটি খেয়াল না ক'রলে কুলোকের মুখরোচক আলাপ জমাবার খোরাকই জোগাবেন তাঁরা। দানেরও কি ঝঞ্ঝাট বলুন !

টিকিট বেচাও ব্যবসা বৈকি

সরকারী নিষেধ যদি বাঁধাধরা না থাকে তাহ'লে কোন জিনিষ কিনে তারওপর কিছু লাভ চড়িয়ে বিক্রী করা কোনমতেই অপরাধজনক নয়। শুনেছি এই কারণেই নাকি সিনেমার বাইরে গুণ্ডাদের টিকিট বিক্রী ব্যবসা দমন হ'তে পারছে না। চিত্রগৃহের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে পুলিশ মাঝে মাঝে গুণ্ডাদের যে ধরপাকড় ক'রে থাকে তা নাকি টিকিট বেচা অপরাধের অজুহাতে নয়, তাদের ধ'রতে হয় সাধারণ স্থানে গোলমাল ও ভীড় জমা করার জন্যে। একথা কতদূর সত্যি জানি না, কিন্তু এ ব্যবস্থা যে গুণ্ডাদের এই উপদ্রবকে স্থায়ীভাবে বন্ধ ক'রার কোন প্রতিকারই নয় তাতো দেখাই যাচ্ছে। অথচ ব্যাপার দিনদিনই যে রকম হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে তাতে একটা কিছু না ক'রলে আর চলেও না। একটু নাম করা একখানা ছবি এলেই হ'লো—ব্যস. গুণ্ডারা অমনি জাঁকিয়ে ব্যবসা ফেঁদে বসে। শুধু কলকাতাতেই নয় একটু জনবহুল ভারতের যে কোন সহরেরই এই অবস্থা। গুণ্ডাদের কাছ থেকে টিকিট যাতে না কিনতে হয় তার জন্যে সময় মত টিকিট অফিস থেকে কিনতে গিয়েও ভীড়ে আর হট্টগোলে নাকালের অন্ত থাকে না। পয়সা উপায় ক'রতে একেত কষ্টের সীমা থাকে না এবং কষ্টোপার্জিত সেই অর্থের আনুকূল্যে প্রমোদ আহরণের যদি বা সুযোগ ঘটে তো অত নাকাল সহ্য করা কজনের পোষাতে পারে! টিকিট ঘরের ঐ দঙ্গলে যোগ দেওয়ার পক্ষে মর্জি ও রুচি মোটেই সায় দিতে চায় না—তখন গুণ্ডাদের পৃষ্ঠপোষক হ'তে আর দ্বিধা জাগে না। এখন উপায় কি?

একটা প্রস্তাব মনে জাগে—টিকিট ঘরের বাইরে টিকিট বেচাকে বেআইনি নির্ধারিত করাই হ'চ্ছে প্রধান কথা। না ক'রতে গেলে সিনেমার টিকিটঘরে টিকিট বেচাকে প্রথমে আইনের আশ্রয়ে নিয়ে আসতে হয়। সে ক্ষেত্রে তখন প্রতি সিনেমা কি অন্যান্য প্রমোদগৃহের টিকিটঘরের ওপরে আলাদা ক'রে লাইসেন্স বসাতে হয়। এ ব্যবস্থাটা নিশ্চিত ফলপ্রদ। কারণ তখন আবগারী জিনিষের মতই টিকিট বেচা পুলিসের আইনের অন্তর্ভূক্ত হ'য়ে পড়ে এবং সিনেমার বাইরে বিনা লাইসেন্সে বিক্রীও দণ্ডনীয় অপরাধে পরিগণিত হয়। অবশ্য প্রমোদগৃহের বাইরে কাউকে লাইসেন্স দেওয়া যেতে পারে না ব'লেই ধরে নিতে হবে।

প্রস্তাব তো হ'লো কিন্তু ঘণ্টা বাঁধতে এখন এগোয় কে? চিত্রগৃহের কর্তৃপক্ষ বোধ হয় ঐ লাইসেন্সের দরুণ সরকারী তহবিলে টাকা দেবার আশঙ্কায় প্রস্তাবটি ধামাচাপা পড়েছে দেখলেই খুসী হবেন; আমোদ প্রমোদের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আইন সভার কোন সভ্যেরই থাকতে পারে না, আর সরকারী মহল—তাদের কি এমন গরজ!

বাংলার নাট্যজগতে প্রতিক্রিয়াশীলতা

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার নাট্যশালাসমূহের কর্তারা যেন অকস্মাৎ দল বেঁধে "ফিরে চলো" শ্লোগান ধরেছেন। মনে হয়, তারা বুঝি প্রগতির স্রোতে এত দূরে চলে গিয়েছিলেন যে আর টাল সামলাতে না পেরে একেবারে ডিগবাজী খেয়ে পেছনের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। তাই কোন কোন নাট্যশালার পরিচালকবর্গ প্রাচীন কাহিনীকে নতুন আবরণের চটক লাগিয়ে দর্শকদের পয়সা ও বাহবা লুটবার ফিকিরে আছেন, আবার কেউ কেউ বা হুবহু পুরোণো জিনিষকেই ব্ল্যাক মার্কেটের স্থবিধে নিয়ে দাও মারবার চেষ্টা করছেন। Inflationএর জোরে অন্যান্য বস্তুর ন্যায় কোলকাতায় নাট্যশালাগুলোতে অচল নাটক সমূহও চলে যাচ্ছে সত্য কিন্তু বাংলার নাট্যধারা যে এর ফলে কোন্ অধোগতির দিকে চলেছে নাট্যজগতের গুণী ব্যক্তিরা তা কখনো ভেবে দেখেছেন কি? গত পূজোর সময় শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় নাট্যকার শ্রীযুক্ত শচীন সেন অবশ্য এক সুদীর্ঘ প্রশস্তিতে বাংলার নাট্যজগতে প্রগতির বন্যা ছুটিয়েছেন; কিন্তু বন্যা তো দূরের কথা, কোলকাতার নাট্যশালা সমূহে গত কয়েক বছরের মধ্যে প্রগতির ছিটেফোটাও খুঁজে পাওয়া একরূপ কঠিন বললেই চলে। প্রগতির কথা বললেই contemporary life অর্থাৎ সমসাময়িক জীবনের কথা আসে। সমসাময়িক সামাজিক জীবনের কথা ধরলে বলতে হয়, গত কয়েক বছরের মধ্যে একমাত্র শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কোন প্রগতিশীল লেখক বাংলার নাট্যজগতে আমল পাননি। তারাশঙ্কর বাবু বাদে বাংলার নাট্যজগতে নবাগত আর যে তিনজন নাট্যকারের নাম করা চলে তাঁরা হলেন শ্রীযুক্ত বিধায়ক ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত নিতাই ভট্টাচার্য। কিন্তু এঁদের কেউ প্রগতিশীল লেখক নন, অন্তত এপর্যন্ত তেমন পরিচয় এঁরা কোন নাটকে দিতে পারেননি। বিধায়ক বাবু modernismকে Satire ক'রে সস্তায় কিস্তি মাৎ করবার চেষ্টা করেছেন। তবে সংলাপের বাহাদুরীতে তিনি আর্টিষ্টের মতো সেই Satire করেছেন, আনাড়ীর মতো হাতুড়ীর ঘা মারেননি। তাঁর নাটকগুলোর মধ্যে negation দিকটাই প্রবল সমসাময়িক সমাজের কদর্য দিকটাই কেবল তাঁর নজরে পড়েছে, কিন্তু তার ভালো দিকটা তার নজরেই আসেনি। কাজেই কি হওয়া উচিত নয় এটাই তিনি বলবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু কি যে হওয়া উচিত এটা তিনি বলতে পারেননি। এজন্যেই তাঁর নাটকগুলোতে positive দিকটা একেবারে খালি। এই একদেশদর্শিতা প্রতিক্রিয়াশীল মনেরই পরিচায়ক, প্রগতিশীল মনের পরিচয় তাতে পাওয়া যায় না। সমাজ সম্বন্ধে তাঁর মন অচেতন বলেই তিনি সমাজ জীবনের অঙ্গবিশেষের পঙ্গুত্ব নিয়ে উপহাস করেছেন, কিন্তু সমগ্র সমাজজীবনের গতিশীলতার কোন সন্ধান তিনি দিতে পারেননি।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্ত তাঁর নাটকগুলোতে জাতীয়তার জারকরস দিয়ে শ্রীযুক্ত শচীন সেনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন। কাজেই নাটকের আঙ্গিক বা চরিত্র চিত্রণের ত্রুটি তাতে অনেকখানি চাপা পড়ে যায়। শ্রীযুক্ত শচীন সেনের মতে হয়তো এটাই প্রগতিবাদ, কিন্তু এই সব নাটকে যে ধরণের জাতীয়তাবাদ প্রচার করা হয় উনবিংশ শতাব্দের শেষভাগেই তার সা[illegible]রূপ লোপ পেয়েছে। বর্তমান জগতের প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে এর কোন যোগাযোগ নেই। এই ধরণের জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটকগুলোর একমাত্র এই বলে স্তুতি করা চলে—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান,
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥"

মহেন্দ্র বাবু তাঁর একমাত্র সামাজিক নাটক "কঙ্কাবতীর ঘাট"এ খানিকটা Contemporary life দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর মন প্রগতিবিরোধী হওয়ায় চরিত্রের এমন জগাখিচুড়ী তাতে হয়ে গেছে সে নাটক কোন যুগের সমাজজীবনকে ভিত্তি করে রচিত, তা বলা শক্ত। সেই নাটক আধুনিক সমাজকে ভিত্তি করে রচিত বললে দেখা যায়, কঙ্কাবতীর শাঁখা সিঁদুর ও সতীত্বের কীর্তণ করবার জন্যেই নাট্যকার যেন এক লাফে বর্তমান জগৎ ছেড়ে একশো বছর আগেকার বাঙ্গালী সমাজে চলে গেছেন। অথচ চরিত্রগুল্যোতে আবার স্থান বিশেষে অতি আধুনিকতার ছাপ দিতেও তিনি ছাড়েন নি। চারিত্রিক ও ঘটনা সংস্থানের অসঙ্গতিই তাঁর 'কঙ্কাবতীর ঘাট' নাটককে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছে। সামাজিক নাটক রচনায় ব্যর্থকাম হ'য়ে মহেন্দ্রবাবু Fuedalismএর বীরত্ব কাহিনী নিয়ে মেতে আছেন।

শ্রীযুক্ত নিতাই ভট্টাচার্যের মাত্র দুখানা নাটক আমরা এযাবৎ পাদপ্রদীপের সামনে উপহার পেয়েছি। তারমধ্যে মাইকেলের কথা এই প্রসঙ্গে না আনাই ভালো, কেন না সেটা জীবনীনাট্য এবং সেই নাটকের জন্যে শিশিরবাবু ও নিতাইবাবুর মধ্যে কে কতটা কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন বলা কঠিন। নিতাইবাবুর সামাজিক নাটক 'উড়ো চিঠিতে'ও কিন্তু আমরা কোন প্রগতিশীল মনের পরিচয়···পাই নি। প্রথম কথা Serious নাটক তাকে বলা চলে না। কিন্তু তার মধ্যেও আমরা বিহার ভূমিকম্পের যে স্বদেশী সেবকদলের রূপ দেখতে পাই তাতে Satire ও romanticism এরই ছড়াছড়ি। অথচ এমন Situationএ realismই বেশী দরকার। নাটকের নায়ককে একটা volcan of emotion বললেও চলে। সেখানে অপরের মুখ দিয়ে নায়কের চরিত্রের অনেক গুণ বর্ণনা করা হয়েছে সত্য, কিন্তু নায়কের কার্যকলাপে দেখা যায় একটি মাত্র নারীকে কেন্দ্র করেই যেন তার সমস্ত সেবাব্রতের প্রেরণা। নাটকের conflict সৃষ্টির জন্যে তার প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু সেখানে নাট্যকারের এমন কোন side character সৃষ্টি করা উচিত যার কর্মপ্রেরণা ব্যক্তি বিশেষের গণ্ডী পেরিয়ে বৃহত্তর গণজীবনে পরিব্যাপ্ত। সেখানে দর্শকদের মনে নাটকের total effect ভালো হয়। কিন্তু নিতাইবাবু তা দিতে পারেন নি।

মোট কথা Realismএর দিকে না গিয়ে বাংলার নাট্যশালাগুলো আজও romanticism ও Sentimentalism নিয়েই কারবার করছে এবং তারই জন্যে রঙ্গমঞ্চে Cheap stuntএর সমাদর বেশী। এ জন্যেই দেখতে পাচ্ছি আমাদের সামনে যখন অসংখ্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা বিদ্যমান তখন সেগুলোকে এড়িয়ে ধাত্রী পান্না, মোগল পাঠান, সীতারাম ও শরৎবাবুর প্রতিক্রিয়াশীল উপন্যাস বিপ্রদাসকে নিয়ে আসর জমাবার চেষ্টা।

'জাতির মুক্তির বাণী ধ্বনিত করে তুলুক জাতীয় নাট্যশালা'

বিপ্রদাসের উদ্বোধন রজনীতে নাট্যাচার্য শিশির কুমারের অভিভাষণ

২৫শে নভেম্বর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছয় ঘটিকা-শ্রীরঙ্গমে বিপ্রদাসের উদ্বোধন রজনী। নবযুগের নাট্যগুরু শিশির কুমার কয়েক মাসের জন্য নাট্যলোক থেকে বিদায় নিচ্ছেন—তাঁর বিদায়বাণী—শরৎচন্দ্রের বিপ্রদাসকে রূপ দিতে নাট্য-লোকের দ্রোণাচার্য তাঁর শিষ্যদের ভিতর কতটুকু বা নিজের কৃতিত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন—বস্তুতঃ এই সুযোগ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারলুম না।

পরিপূর্ণ প্রেক্ষগৃহ—তিলার্ধ স্থান নেই—দর্শক সমারোহে তার উচ্ছ্বাস যেন উপছে পড়ছে। আসন নির্দেশক থেকে- ফেরি-ওয়ালা বালকদের উত্তেজনাও কম নয়। ইংরথী দর্শকরা যারা এসেছেন মহা বিপাকে পড়ে গেছেন। কেউ বলছেন: A. B. C. D-র পরিবর্তে ক খ গ ঘ যে গোল পাকিয়ে ফেললে "হরিব্‌ল!" কখগঘ চিহ্নিত আসনগুলি তাদের যে এতটা বিব্রত করে তুলবে এতটা হীন ধারণা তাদের সম্পর্কে প্রথমে আমার ছিল না। বুঝলাম না তাদের এই ন্যাকামী ইচ্ছাকৃত না স্বভাবজাত? আবার অনেককেই বলতে শুনলাম: বাঃ বেশ করেছে ত শ্রীরঙ্গমের কর্তৃপক্ষ! প্রবেশপত্র তাও বাংলায়, আসনগুলি বাংলায় চিহ্নিত—ওতেও যেন ভাদুড়ীর বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।" পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলুম যাদের ভিতর এই সব আলোচনা চলছিল—তাবা আমরাই মত যৌবনের ধাপে পা বাড়িয়েছেন। মনটা খুশীতে ভরে উঠলো—তাঁদের ধন্যবাদ না জানিয়ে পারলুম না—কর্তৃপক্ষদের এই ব্যবস্থায় খুশী হয়েছেন বলে।—'স্যুট' পরিহিত পাইপটানা অপগণ্ডা বাঙ্গালী দর্শকদের মত নিজেদের পরিচয় দেননি বলে।

অন্ধকারাচ্ছন্ন মঞ্চ—আলোকিত হয়ে উঠলো। সাধারণ বেশে নাট্যাচার্য এসে দাড়ালেন মঞ্চের পর—পাদপ্রদীপের আলোক-মালা, নিমেষে যেন ঝিলিক দিয়ে উঠলো! প্রতিভার আলোক শিখা হয়ত বা প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। উপস্থিত দর্শকদের সমবেত করতালিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত হয়ে উঠলো। বয়স্কদের প্রণাম—সমবয়স্কদের নমস্কার এবং ছোটদের প্রীতি জানিয়ে নাট্যাচার্য তার অভিভাষণ আরম্ভ করলেন।

"বক্তৃতা দেবার অভ্যাস আমার নেই—কবিগুরুর মত ভাষা-চাতুর্য, মিষ্ট কণ্ঠস্বরেরও আমি অধিকারী নই, তারপর যে শিক্ষা আমরা পেয়েছি বা পেয়ে থাকি তাতে গদলও থেকে যায় অনেকটা। এ শিক্ষার দৌলতে দুটো বাংলার সাথে দশটা ইংরেজী কথা না মিশিয়ে বলতে পারি না। বাঙ্গালী হয়েও মনের ভাব প্রকাশ করতে সাহায্য নিতে হয় বিদেশীয় ভাষার। তাই কথায় কথায় যদি ইংরেজী বলে ফেলি—সেজন্য আমায় ক্ষমা করবেন।

"কিছুদিনের জন্য আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমি বড় ক্লান্ত, বড় পরিশ্রান্ত—তাই বিশ্রামের প্রয়োজন। পঞ্চাশ আর ষাঠের কোঠা বহুদিন পেরিয়ে উঠেছি--বয়সটা এখন সত্তরের কোঠায় ঝুলছে—তারপর এই শরীরের পর দিয়ে অত্যাচার অনিয়মও চলেছে অনেক। কিন্তু-আজ তবু আমার বিশ্রাম নিতে মন সড়ছে না—এই পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ, সামনে আমার অগণিত দর্শক। আপনাদের দেখে আনন্দও যেমনি হচ্ছে—তেমনি হিংসাটাও কম হচ্ছে না। মানুষের ভিতর ভাল মন্দ দুইই আছে আমার ভিতরও তার অভাব নেই! তাই আপনাদের দেখে ইচ্ছা করছে—আজ সারারাত ধরে অভিনয় করি। কিন্তু আমার পরিবর্তে যারা অভিনয় করবেন—তাঁরা আমারই হাতে গড়া। আমরই দীক্ষায় তাঁরা দীক্ষিত। দ্রোনাচার্যের গৌরব তিনি মহারথী।

ছিলেন বলে নয়। অর্জুনের মত শিষ্য ছিল বলে। আমিও সে গৌরব থেকে বঞ্চিত হবো না। আপনারা এদের অভিনন্দন জানাতে এসেছেন। চিরদিন যেন এমনি করে এরা আপনাদের কাছ থেকে অভিনন্দন পেয়ে থাকেন। আর অভিনয়—দেখবেন আমি জোড় করে বলতে পারি অভিনয় এরা ভালই করবেন।

এই প্রসংগে বলতে গেলে বলতে হয় বহুদিন আগেকার কথা। যেদিন দেশসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই পাদপীঠের বেদীমূলে এসে দাড়িয়েছিলাম। নানান বাধাবিঘ্নে হয়ত আমার সে আদর্শ সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। কিন্তু আপনারা জানেন এ পর্যন্ত একখানা উদ্দেশ্যহীন নাটকে আমি অভিনয় বা মঞ্চস্থ করিনি। আমার নাটকগুলির বৈশিষ্ট্য আছে। অবশ্য কেবল মিশরকুমারীতে আত্মপ্রকাশ করেছিলাম—তার ফলও পেয়েছি অনেক। অর্থের মোহ আমায় এদিকে আকৃষ্ট করেনি—তার অন্য পথ ছিল—অবশ্য এক বছরে একজন সিভিলিয়ান যা না উপার্জন করতে পারেন, এক মাসে আমি তা করেছি। (দর্শকদের উচ্চ হাসির রোল শুনতে পাওয়া গেল) আজ না হলেও—আমার বিশ্বাস আছে একদিন এই পাদপীঠ—জাতির এই নিজস্ব সম্পদ, তার সত্যিকারের আলোকমালায় সুসজ্জিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। একটী সামান্য - অনেকদিন আগেকার কথা মনে পড়ে গেল। তখন আমি আমেরিকায় অভিনয় করতে যাচ্ছি। জাহাজে ওদেশী এক ভদ্রলোকের সংগে আলাপ জমে ওঠে তিনি বল্লেন কথায় কথায়ঃ দেখ আমরা আশ্চর্য হ'য়ে যাই অনেক সময় তোমাদের কথা চিন্তা করে—সাড়ে তিন কোটী কী করে চল্লিশ কোটিকে পরাধীন করে রেখেছে।" মাথা আমার নুইয়ে পড়লো। কোন উত্তর দিতে পারলাম না। ফিরে এসে এই প্রতিজ্ঞা নিয়েই কাজে নামি—জাতির অন্তরের দেশাত্ববোধকে জাগিয়ে তোলাই হবে মঞ্চের প্রধানতম কর্তব্য। কিন্তু পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া এর যে কতকটা প্রতিকূলে বয় সে খবর আপনারা রাখেন। তবু যতটা পেরেছি সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করিনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে এই মঞ্চই হবে একদিন প্রধান অস্ত্র।

"আপনারা আসুন! এমনি ভাবে—চিরদিন এঁদের উৎসাহিত করে তুলুন। আজ আমার সত্যি আনন্দ হচ্ছে—'হৃদয় আমার নাচেরে, ময়ূরের মত নাচে' আমি আবার ফিরে আসবো। বয়স হয়েছে সত্যি—মন আমার রয়েছে শিল্পময় হয়ে, প্রাণের সজীবতা যখন হারাইনি—তখন এই কলা-পীঠের কাছ থেকে—ঐ 'সত্যম শীবম্ সুন্দরম' ছাড়া আর কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না।" উচ্চ করতালির ভিতর দর্শক সাধারণকে নতি জানিয়ে নাট্যাচার্য বিদায় নিলেন। পর্দা পড়লো।

পর্দা উঠলো।

নাটক আরম্ভ হলো। শরৎচন্দ্রের 'বিপ্রদাস' উপন্যাসের সংগে পাঠক পাঠিকাদের প্রত্যেকেরই পরিচয় আছে। এই বিপ্রদাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন নবীন নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য। শরৎচন্দ্রের কাহিনী ও ভাষার গতি যথা সম্ভব স্বাভাবিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে বিধায়ক বাবু শরৎচন্দ্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়েছেন বিপ্রদাস নাটকে একথা যেমনি প্রমাণিত হবে—সংগে সংগে বিধায়ক বাবুর নিজের দক্ষতার কথাও দর্শক সাধারণের মনে জাগবে।

তবে বিপ্রদাসের মায়ের (শেষাংশে) এবং পাঞ্জাবী ব্যারিস্টার দম্পতির চরিত্রাঙ্কনে মূল কাহিনীর মর্যাদা রাখতে পারেননি বলেই আমাদের বিশ্বাস। প্রথম কথা ধরুণ মায়ের চরিত্র। মা হচ্ছেন বিপ্রদাসের সৎ মা। দ্বিজদাসের নিজের মা। কিন্তু তাঁর স্নেহ - বিশ্বাস সবটুকু বিপ্রদাসকে ঘিরেই ছিল। তিনি মনে করতেন দ্বিজদাস

রঙ্গ-মঞ্চ

কোন দিন মানুষ হবে না। এই মায়ের চরিত্রটী এমনি ভাবে শরৎচন্দ্র ফুটিয়ে তুলেছেন যে তার তুলনা হয় না। যে মা কোনদিন ভুল করেন না – যাঁর ভিতর স্বার্থপরতার লেশমাত্রও নেই, সেই মাও একদিন ভুল করে ফেললেন। ব্রত উৎসবের সময়—কন্যা জামাতার সংগে বিপ্রদাসের মনোমালিন্য নিয়েই বিপ্রদাসকে তিনি ভুল বুঝলেন। বিপ্রদাসের চরিত্রকে শরৎবাবু সৌধ চূড়ায় তুলে দিয়ে মাকে নামিয়ে দিলেন অনেক নীচুতে, নাটকের এই চরম মুহূর্তের সকলেই প্রশংসা করবেন। কিন্তু এই মহীয়সী নারী সাময়িক ভুল করাতে শরৎচন্দ্র তাকে অর্গল বদ্ধ করেই রাখলেন হয়ত আত্মগ্লানিতে তার সারাটা জীবন কাটাতে হ'য়েছে। তাই পাঠকদের সামনে আর মাকে টেনে আনেননি। বিধায়ক বাবুও সেই পথই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু মেয়ে জামাইকে শরৎবাবু যেমনি পাঠকদের সংগে আগে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন-- বিধায়ক বাবু তা দেননি। বিধায়ক বাবু, মেয়ে জামাইর সংগে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়াটা একটু অকস্মাৎ ভাবে হয়েছে। মেয়ে-জামায়ের প্রতি দর্শকদের মন তখন অবধি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এই 'অজ্ঞাত' মেয়ে জামাইর জন্য হঠাৎ ওরূপ মহীয়সী নারীর এতটা নীচে নেমে আসাতে দর্শকমন একটু ক্ষুণ্ণ হবে।

আর ব্যারিষ্টার দম্পতির বিষয়ে আমাদের বক্তব্য—বিপ্রদাসে ব্যারিষ্টার দম্পতির ভিতর দিয়ে শরৎচন্দ্র ঐ সব শ্রেণীর ইংরেজ-ঘেসা ভারতীয়দের দুর্বলতা সংশোধনের নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের চরিত্রের স্বাভাবিক দুবলতা দেখিয়ে ব্যঙ্গের আঘাতে জর্জরিত করেছেন—অথচ সেখানে কোন অতিশয়োক্তি নেই। চরিত্রগুলি হুবহু এঁকে গেছেন সুনিপুণভাবে। কিন্তু নাটকে অভিনয়ের দোষেই হউক বা বিধায়কবাবুর দোষেই হউক ঐ চরিত্রগুলি 'ফার্সের' মত হ'য়েছে। এবং আতিশয্য দোষে দুষ্ট। তারপর বন্দনার মাসীর বাড়ীর দৃশ্যটাও ঐ একই দোষে দুষ্ট। এ ছাড়া নাটক সম্পর্কে আর কিছু আমাদের অভিযোগ নেই। তবে শরৎচন্দ্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে, একথা বললে আশা কবি ধৃষ্টতা হবে না যে, মূল উপন্যাসটাই প্রতিক্রিয়াশীল। দ্বিজদাস এবং বন্দনার বিপ্লবী মনকে শরৎচন্দ্র অঙ্কুরেই বলিদান দিয়েছেন! বিধায়ক বাবুও তার পদাঙ্কানুসরণ করেছেন। এ বিষয়ে তাকে দোষী করা যায় না।

অভিনয়ে, সর্বাগ্রে বলতে হয় 'বন্দনা'র ভূমিকায় শ্রীমতী মলিনার কথা। মঞ্চে শ্রীমতী মলিনার এই সর্বপ্রথম (বহুদিন পূর্বে অবশ্য মঞ্চে তাকে দেখেছি) আত্মপ্রকাশ। পর্দায় সংযত ও সাবলীল অভিনয়ে শ্রীমতী মলিনা যেমনি কোনদিন আমাদেব বিশ্বাস হারান নি তেমনি বিপ্রদাসে 'বন্দনার' ভূমিকায় আমাদের সে বিশ্বাসের ভিত্তি একটুও টলে নি। বরং আমরা আশ্চর্যই হ'য়েছি। অভিনয়-অভিব্যক্তি এবং বাচন ভংগিতে—বন্দনারূপে শ্রীমতী মলিনা আমাদের মুগ্ধ করেছেন। শরৎচন্দ্রের বড়দি যেমনি রূপ পেয়েছিল মলিনার ভিতর—তাঁর বন্দনার একটুও মর্যাদাহানি হয়নি।

বিপ্রদাসের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর শান্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ অভিনয় দেখে দর্শক সাধারণের মনে এক দ্বন্দ জাগতে পারে—বিপ্রদাসের ভূমিকায় যদি শিশিরকুমার আত্মপ্রকাশ করতেন, তবে কার অভিনয় ভাল হতো, শিশিরকুমারের না বিশ্বনাথের।

নাট্যভারতীর ভূতপূর্ব মিহির ভট্টাচার্য যেন দ্বিজদাসের ভূমিকায় অভিনেতারূপে নতুন জন্মলাভ করেছেন। মায়ের ভূমিকায় নিভাননী, সতীর ভূমিকায় ষ্টার-খ্যাত রাজলক্ষী এদেরও নবজন্মে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি! বন্দনার পিতার ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরীব অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য। বিপ্রদাসের ছোট্ট ছেলের ভূমিকায় মাষ্টার মিন্টু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। রঞ্জিৎ রায়ের বাড়াবাড়িটা একটু কমালেই ভাল হতো।

ওদিন দর্শকদের ভিতর দেখতে পাওয়া গেছে—শ্রীযুক্ত বিমল ঘোষ (মৌমাছি), ভবানী রায় (ছন্দের প্রচারকার্যে যিনি সুনাম অর্জন করেছেন)। অবিনাশদা (বাতায়ন সম্পাদক), নীরেন লাহিড়ী (দম্পতির পরিচালক), শ্যাম লাহা (ছন্দ), কালীপ্রসাদ ঘোষ (জজ সাহেবের নাতনীর পরিচালক) রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, আশু বোস, রবি রায়— মাষ্টার নিমাই নাগ চৌধুরী (ছন্দ ও সব শিশুদের দেশে খ্যাত) শিল্পী সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়, উপন্যাসিক প্রবোধকুমার সান্যাল—স্বয়ং শ্রীপার্থিব এবং আরো অনেককে এঁরা সকলেই যে বিপ্রদাস উপভোগ করেছেন, সেকথা জিজ্ঞাসা না করে ছাড়িনি। বিপ্রদাস সম্পর্কে এর চেয়ে বড় কথা আমার বলার নেই।

আগামী সংখ্যায় 'শহর থেকে দূরের' সমালোচনা যাবে। 'শহর থেকে দূরের সমালোচনা নিয়ে বিভিন্ন মহলে যে বিভিন্ন কথা উঠেছে—রূপ-মঞ্চের সমালোচনায় তারই উত্তর মিলবে।

ওয়ালট ডিসনের ষ্টুডিওর দুইটী দৃশ্য

পৃথ্বী-বল্লভ

ঐতিহাসিক চিত্রনির্মাণে বর্তমানে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে পরিচালক সোরাব মোদী প্রতিদ্বন্দ্বিহীন বললেও অত্যুক্তি হয় না। যাঁরা তাঁর 'পুকার' এবং 'সিকান্দার' দেখেছেন, তাঁরা একথা স্বীকার না করে পারবেন না। সম্প্রতি কলকাতায় মুক্তিপ্রাপ্ত সোরাব মোদীর নতুন চিত্র 'পৃথ্বী-বল্লভ' পুনর্বার এ উক্তির যথার্থ প্রমাণিত করেছে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের রাজা বাদশাহ্‌দের কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করতে হলে, ঐতিহাসিক নিখুঁৎ জ্ঞানও যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রাচীন যুগের ঐশ্বর্য মুখর সমারোহের দৃশ্যের যথাযথ রূপ দেবার জন্যে প্রচুর অর্থব্যয়ও প্রয়োজন। ঐতিহাসিক চিত্র নির্মাণে সোরাব মোদী এই দুটি দিক সম্বন্ধেই পুরোপুরি সজাগ থাকেন বলে, তাঁর নির্মিত চিত্র এত বেশী সাফল্য অর্জন করে।

'পৃথ্বী-বল্লভে'র কাহিনীকে ঠিক ঐতিহাসিক বলা চলে কিনা সন্দেহ। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লিখিত হলেও কাহিনীটি মূলত কাল্পনিক। বোম্বাইর ভূতপূর্ব কংগ্রেসী মন্ত্রী এবং অখণ্ড ভারত আন্দোলনের প্রবর্তক মিঃ কে, এস্, মুন্সী এই কাহিনীর রচয়িতা। বাংলা দেশে শ্রীযুক্ত মুন্সী প্রধানতঃ রাষ্ট্রনীতিবিদ্ হিসাবেই পরিচিত, কিন্তু বোম্বাই এবং গুজরাটে সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর প্রচুর খ্যাতি আছে। 'পৃথ্বি-বল্লভ' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। সোরাব মোদী এই জনপ্রিয় উপন্যাসটি চিত্রে রূপায়িত করে দেশবাসীদের ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন।

দুইটি মধ্যযুগীয় পরস্পর বিবাদমান রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কেন্দ্র করে চিত্রের কাহিনী গড়ে উঠেছে। একটি রাষ্ট্রের রাজা পৃথ্বি-বল্লভ বীর, সদাশয়, উদারচেতা। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা তৈলপ ছিলেন কূটকৌশলী, ভীরু এবং নীচাশয়। পনরবার পৃথ্বি-বল্লভের হাতে পরাজিত হয়ে তিনি ক্ষমা পেয়ে এসেছেন। তা সত্বেও তাঁর বিষয়ের আশা মেটেনি। অবশেষে তপশ্চারিণী ভগিনীর কূট পরামর্শে তিনি পৃথ্বি-বল্লভকে নিজ রাজ্যসীমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে পরাজিত এবং বন্দী করলেন। কারাগারে বীর পৃথ্বি-বল্লভের উদার হৃদয়ের সংস্পর্শে এসে কি করে দুশ্চর ব্রত-চারিণী নিষ্ঠুর প্রকৃতি তৈলপ-ভগিনীর মনে প্রেমের ফল্গু-ধারা সৃষ্টি হ'ল, পৃথ্বি-বল্লভে সেই মনস্তত্ত্ব-মূলক কাহিনীই রূপায়িত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত নীচাশয় রাজা তৈলপের নিষ্ঠুরতার জন্যে এই প্রেম কিন্তু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। বীর পৃথ্বি-বল্লভ হাসতে হাসতে মত্ত হস্তীর পায়ের নীচে প্রাণ বিসর্জন দিলেন, তবু নিজের সম্মানকে খর্ব-হ'তে দিলেন না। তৈলপ-ভগ্নী ব্রতচারিণী মৃণালবতী প্রিয়তমের মৃত্যু রোধ করতে পারলেন না। মূল কাহিনী এই; তবে মাঝে আরও ঘটনা বৈচিত্র্য আছে।

ছবির প্রথমাংশে গল্প জমাট নয়; পৃথ্বি-বল্লভ বন্দী হবার পর থেকে গল্প জমে' ওঠে। তবে দৃশ্যপটের জাঁক-জমক এবং সমারোহ দেখে দর্শকরা মুহূর্তের জন্যেও গল্পের অভাব অনুভব করতে পারেন না। এই রকম দৃশ্যপট-নির্মাণ করতে যে অনেক অর্থব্যয় এবং প্রচুর গবেষণা করতে হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গল্পের গতি এবং গাম্ভীর্য সমানভাবে রক্ষিত, বাইরে থেকে বাজে জিনিষ আমদানী করে রসসৃষ্টির প্রয়াস নেই দেখে সুখী হলাম। সব চেয়ে ভাল লাগলো পৃথ্বিবল্লভের 'ডায়ালোগ্'। হিন্দী ছবিতে ইতিপূর্বে এত সুন্দর তীক্ষ্ণ কথাবার্তা শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

অভিনয়ে প্রথমেই একসঙ্গে নাম করতে হয় পৃথ্বিবল্লভ-রূপী সোরাব মোদী এবং মৃণালবতী রূপিণী দুর্গা খোটের। সোরাব মোদী শুধু অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক নন, বীর্য-ব্যঞ্জক অভিনয়েও তিনি সুপটু। মৃণালবতী-চরিত্রের কঠোর এবং কোমল এই দুটি দিকই দুর্গা খোটে অপরিসীম নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। পার্শ্ববর্তী অন্যান্য চরিত্রে শঙ্করপ্রসাদ, মীনা, নবীন যাজ্ঞিক, জাহান্‌আরাকজ্জন, আল্ নাসির প্রভৃতি সুঅভিনয় করেছেন বলা চলে। 'সিকান্দারে'র মত উচ্চাঙ্গের না হলেও, সঙ্গীতাংশ ভাল বলা চলে। আলোক-চিত্র এবং শব্দগ্রহণ অতি উচ্চাঙ্গের হয়েছে।

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

অসিতবরণ ভারতী অভিনীত হেমচন্দ্র পরিচালিত ওয়াপস (ফিরে আসা) হিন্দি চিত্র বাংলার বাইরে মুক্তিলাভ করেছে। ওয়াপসের সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন রাইচাঁদ বড়াল। অনেক দিন বাদে রায় বাবুর ওয়াপসের সংগীত বাংলার বাইরে এক নতুন সাড়া এনেছে। আমাদের নিজস্ব সংবাদ দাতার মারফতে যতটা জানতে পেরেছি ওয়াপস বাংলার বাইরে অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বোম্বাইয়ের পত্রিকাগুলি (বাংলার চিত্র শিল্পের গলা টিপে মেরে ফেলতে যারা সব সময় সচেষ্ট) ইতিমধ্যেই ওয়াপসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরম্ভ করেছে। কারণ ওয়াপসে নিউ থিয়েটার্স এইটুকু প্রমাণ করতে নাকি সক্ষম হয়েছে শুধু Standard Picture নয় Entertainment Picture তৈরী করতেও বাংলার এই নিজস্ব প্রতিষ্ঠানটী প্রতিযোগিতায় অদ্বিতীয়। আমরা ওয়াপসের মুক্তির অপেক্ষায় আছি।

নিউ থিয়েটার্সের দু'খানি নির্মীয়মান বাংলা চিত্র উদয়ের পথে ও দুই পুরুষের কাজ শ্রীযুক্ত বিমল রায় ও সুবোধ মিত্রের পরিচালনায় দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। উদয়ের পথে ইতিপূর্বে উদয়াচল নামে প্রচারিত হয়েছিল। তাই চিত্রামোদীরা যেন ভুল করে উদয়ের পথে আর উদয়াচল দুইখানি চিত্র ব'লে মনে না করেন। উদয়ের পথে-এ আমরা আর একটী নতুন মুখ দেখতে পাবো। কর্তৃপক্ষ এবার যাকে আবিস্কার করেছেন তিনি সুকণ্ঠী শিক্ষিতা এবং ভদ্রঘরের। নাম শ্রীমতি বিনতা বসু। সম্প্রতি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সংগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। অন্যান্য ভূমিকায় বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, রেখা মিত্র, রাধারমণ ভট্টাচার্য, দেবী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিদের দেখা যাবে। শ্রীমতী রেখা অনেকদিন বাদে পুনরায় চিত্রে আত্মপ্রকাশ করছেন জেনে চিত্রমোদীরা হয়ত আনন্দিতই হবেন। উদয়ের পথের কাহিনী লিখেছেন শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময় রায় পরিচয় পত্রিকার সংগে তিনি সংশ্লিষ্ট। সংগীত পরিচালনা করবেন শ্রীযুক্ত রায়চাঁদ বড়াল।

সহযোগী বাতায়ন একটী সংবাদ দিয়েছেন নিউ থিয়েটার্স শরৎচন্দ্রের প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'বিরাজ বৌ'এর চিত্ররূপ দেবার জন্য নাকি তৈরী হচ্ছেন। সংবাদটী যে নানাদিক দিয়ে সুখবর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পরিচালনার ভার গ্রহণ করবেন—বড়দিদির পরিচালক শ্রীযুক্ত অমর মল্লিক বিরাজ-বৌ এর ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করবেন শ্রীমতী সুনন্দা।

ভ্যারাইটী পিকচার্স:

ভ্যারাইটী পিকচার্সের আগত প্রায় চিত্র পোষ্যপুত্র ২৪ শে ডিসেম্বর মিনার, বিজলী ছবিঘরএ একযোগে মুক্তিলাভ করবে বলে ঘোষিত হয়েছিল— কিন্তু আপাততঃ স্থগিত রয়ে গেল যতদূর খবর নিয়ে জানতে পেরেছি— অন্যতম নায়ক প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায় অসুস্থতাবশতঃ পরিচালক সতীশ দাশগুপ্ত পোষ্যপুত্রের মুক্তি ২৪শে দিয়ে উঠতে পারলেন না। প্রযোজক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন বসু, পরিচালক সতীশ্চন্দ্র দাশগুপ্ত, কর্মসচিব মোহিনী মোহন কুণ্ডু এবং প্রচার সচিব বিশ্ব রায়চৌধুরীর সংগে আলাপ করে যতটা জানতে পেরেছি এদের প্রত্যেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস পোষ্যপুত্র সর্বশ্রেণীর দর্শকদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হবে। উপন্যাসের চিত্রনাট্য পড়ে লেখিকা শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী খুব খুশী হয়েছেন। পর্দায় এর যথাযথ রূপ দেখতে পেলে আমরা দর্শকেরাও খুশী হবো।

জলধর চট্টোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় নাটক (P. W. D.)

পি, ডব্‌লু, ডি'র চিত্ররূপও শ্রীযুক্ত বসুর প্রযোজনায় গৃহীত হবে। পোষ্যপুত্র মুক্তিলাভ করবার পর সম্ভবতঃ পি, ডব্‌লু, ডি'র কাজ আরম্ভ হবে।

এম্‌, পি, প্রোডাকসন্স

কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে কয়েকদিন হলো এম, পি, প্রোডাকসন্সএর বিদেশিনীর কাজ নিয়ে পরিচালক প্রেমেন্দ্র মিত্র খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

প্রেমেনবাবুর বর্তমান চিত্রের নায়ক নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন ধীরাজ ভট্টাচার্য ও কানন দেবী।

ডি, লিউকস পিকচার্স—

অজয় ভট্টাচার্য পরিচালিত ছদ্মবেশী মুক্তির অপেক্ষায় আছে। সংগীত সাধক তানসেন ছদ্মবেশীর বেশ উদ্‌ঘাটনের পরিপন্থী হ'য়ে দাড়িয়েছে।

চিত্রবাণী লিঃ

বিজয়িনী, ফিবার মিকচার, গরমিল প্রভৃতি বাংলা চিত্রের ভূতপূর্ব পরিবেশক প্রতিষ্ঠানটি চিত্র জগতে আবার পূর্ণোদ্যমে কাজ আরম্ভ করেছেন দেখে খুশী হলুম। ম্যানেজিং ডাইরেকটর শ্রীযুক্ত দাস—এবং শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ বসুর তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠানটী নতুন করে চিত্র জগতে সাড়া আনবার চেষ্টায় আছেন। বম্বের কমলরায় প্রডাকসনের ঐতিহাসিক চিত্র শা'হেনশা আকবরের এদেরই পরিবেশনায় কলকাতায় প্রদর্শিত হবে। শা'হেনশা আকবর চিত্র দেখে বম্বের গভর্ণর খুব খুশী হয়েছেন। আশা করি দর্শকেরাও তৃপ্ত হবেন। তবে গভর্ণর সাহেবের দৃষ্টি-ভংগী আর আমাদের দৃষ্টি ভংগীর পার্থক্যের কথাটাও আবার ভুলে যেতে পারি না। শ্রীযুক্ত সত্য রায় চিত্র-বাণীর প্রচার সচিব নিযুক্ত হয়েছেন। বহুদিন বাংলার বাইরে থেকে শ্রীযুক্ত রায় একাধিক সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্রিকার সংশ্রয়ে এসেছেন। এবং ইতিমধ্যে হিন্দি পত্রিকা গুলিতে ও কয়েকখানা বই লিখেও সুনাম অর্জন করেছেন। আশাকরি চিত্রবাণীর প্রচার কার্য সুষ্ঠুভাবেই তিনি চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।

চিত্র ভারতী

রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' শেষ করে আনতে পরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায় আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। চিত্র-ভারতীর প্রযোজক শ্রীযুক্তা প্রতিভা শাসমল কয়েক দিন অসুস্থা ছিলেন। বর্তমানে তিনি সুস্থা হ'য়ে উঠেছেন। চিত্রের কাজও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। যতদূর সংবাদ পাচ্ছি পশুপতি বাবুর নবাগতা নায়িকা বিজয়াদাস বি, এ আশানুরূপ অভিনয় করে যাচ্ছেন। আগামী সংখ্যায় শেষ রক্ষার মুক্তি সংবাদ দিতে পারবো বলে আশা করি।

ম্যানসাটা ফিল্মস ডিসট্রিবিউটরস

দেবীকারাণী—জয়রাজ অভিনীত বম্বে টকীজের হামারীবাৎ এদের পরিবেশনায় নিউসিনেমায় মুক্তি লাভ করবে। হামারীবাৎ বম্বের ইম্পিরিয়াল সিনেমায় গত ২২ অক্টোবর মুক্তিলাভ করে। বম্বে টকীজের ধারা অর্থাৎ আনন্দ পরিবেশনের দিক থেকে হামারীবাৎ খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। চিত্রের সংগীত পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত অনিল বিশ্বাস। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন। দেবীকারাণী, জয়রাজ, সানাওয়াজ, মমতাজ আলি প্রভৃতি। এবং চিত্র পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী।

ম্যানসাটা ফিল্মের আওতায় গঠিত রজনী পিকচার্সের দ্বিতীয় বাংলা ছবির জন্য কর্তৃপক্ষ উঠে পড়ে লেগেছেন। শ্রীযুক্ত সুখেন্দু ঘোষ চিত্র নাট্য ও অন্যান্য প্রাথমিক কাজ-গুলি কার্য-ক্ষেত্রে নামবার পূর্বে গুছিয়ে শেষ করে রাখছেন বলে আমরা সংবাদ পেয়েছি। শ্রীযুক্ত ঘোষ ইতিপূর্বে অধুনালুপ্ত Filmland পত্রিকার সংগে জড়িত ছিলেন। এম্পায়ার টকী ডিসট্রিবিউটার্সের প্রচার সচিব রূপে তিনি যে সুনাম ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন—উক্ত

প্রতিষ্ঠানের কোন প্রচার সচিবই আজ পর্যন্তও তা পেরে ওঠেননি। জজ সাহেবের নাতনীর প্রযোজনার মূলেও তারই কর্মশক্তি এবং প্রচেষ্টা নিহিত ছিল বেশী। রজনী পিক-চার্সের পরবর্তী আকর্ষণে, প্রথম অবদানে যে গলদগুলি দর্শক সাধারণের চোখে ধরা পড়েছে আশা করি শ্রীযুক্ত ঘোষ সেগুলি শুধরে নিতে এবার সচেষ্ট থাকবেন।

মেট্রোপলিটান ডিসট্রিবিউটরস

এদের পরিবেশনায় জনক পিকচার্সের আংগুঠী বিজলী, ছবিঘর ও মিনার একযোগে মুক্তি লাভ করেছে। আংগুঠীর নায়ক নায়িকা রূপে অভিনয় করেছেন জনপ্রিয় অভিনেতা অশোককুমার ও সুন্দরী অভিনেত্রী চন্দ্রপ্রভা। শ্রীমতী চন্দ্রপ্রভা কিসমৎ—এ অভিনয় করে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এসোসিয়েট ডিসট্রিবিউটরস

অপূর্ব মিত্রের পরিচালনায় এদের দ্বোভাষী চিত্র 'সন্ধি'র কাজ সুষ্ঠুরূপে এগিয়ে চলেছে। সন্ধির গল্পাংশ লিখেছেন শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত দেবকী বসু চিত্রের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেছেন।

এম্পায়ার টকী ডিসট্রিবিউটর্স লিঃ

এম্পায়ার টকীর পরিবেশনায় মিনার্ভা মুভিটোনের সোহ্‌রাব মোদী পরিচালিত ও অভিনীত 'পৃথ্বী-বল্লভ' এক-যোগে সেণ্ট্রাল ও ছায়ায় প্রদর্শিত হচ্ছে। দলসুখ পাঞ্চোলী প্রযোজিত পুঁজি মিনার্ভায় চলছে। বেবী আখতার, রাগিনী, মনোরমা তিনটী চপল চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের আপ্যায়ন করবার চেষ্টা করেছেন যথেষ্ট। চিত্রের পরিচালনা করেছেন বিষ্ণু পাঞ্চোলী ও রবীন্দ্র দাভে। দু'জনেই বয়সে নবীন। নবীনের কাঁচা হাতের ছাপ পুঁজিতে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। তাছাড়া রস পরিবেশনের দিক থেকে পুঁজি প্রযোজকের পূর্ব যশ অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি বলেই আমাদের বিশ্বাস।

এম্পায়ার টকী ডিসট্রিবিউটর্সের পরিবেশনাধীনে নিউ সেঞ্চুরী প্রডাকসন্সের বাংলা ছবি 'ভেদাভেদে'র কাজ ছবি বিশ্বাসের পরিচালনায় ভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে আরম্ভ হয়েছে। পরিচালক জীবনের যাত্রাপথে আমরা শ্রীযুক্ত বিশ্বাসকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আশা করি অভিনয়ে যেমনি তিনি দর্শকদের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছেন পরিচালক রূপেও তা থেকে বঞ্চিত হবেন না।

কাপুরচাঁদ লিঃ

বম্বে টকীজের কিসমৎ ও রঞ্জিতের চিরাগ যথাক্রমে রক্সী ও প্যারাডাইসে প্রদর্শিত হচ্ছে।

ভি, শান্তারাম প্রযোজিত রাজকমল কলামন্দিরের শকুন্তলা সম্ভবত 'চিরাগে'র পর প্যারাডাইসে মুক্তিলাভ করবে। 'শকুন্তলা' বম্বেতে মুক্তিলাভ করে অজস্র প্রশংসা পেয়েছে। শকুন্তলার ভূমিকায় শ্রীমতী জয়শ্রী (ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীযুক্তা শান্তারাম) দর্শকদের মনহরণ করতে নাকি সক্ষম হয়েছেন। শকুন্তলার নায়ক-নায়িকার বৈশিষ্ট এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য। একদিকে শ্রীমতী জয়শ্রীর মৃগনয়ন অপরদিকে দুষ্মন্তরূপী চন্দ্রমোহনের মর্জারাখি। কে জয়ী হয় সে বিচার আমরা তখনই করবো—যখন রূপালী পর্দায় দুইই উঠবে ভেসে।

প্রযোজক অমিয় বসু পরিচালক হেমেন গুপ্তকে নিয়ে তার দ্বিতীয় ছবির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। আর্ট ফিল্মের বর্তমান চিত্রের কাহিনী লিখেছেন পরিচালক নিজে এবং সংলাপ লিখবার ভার ন্যাস্ত হয়েছে নাট্যকার মন্মথ রায়ের ওপর। বিশিষ্ট ভদ্রঘরের শিক্ষিতা তরুণী শ্রীমতী মঞ্জু দে সম্ভবতঃ চিত্রের নায়িকারূপে অভিনয় করবেন। আর্ট ফিল্মের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হউক এই কামনা করি। কিন্তু চিত্রগ্রহণ করবার পূর্বে আর্ট ফিল্মের সুহৃদ বলেই একটি কথা বলে রাখার প্রয়োজন

অনুভব করি। আমাদের মনে হয় প্রযোজক—পরিচালক এবং সংলাপ লেখক গোড়াতেই মস্ত ভুল করলেন। ভুল গল্পাংশকে কেন্দ্র করেই। প্রথম কথা—হেমেন বাবুর গল্প। 'উঠন্ত মূল পত্তনেই চেনা যায়' এই প্রবাদটী অমিয় বাবুর এবং পরিচালকের বোঝা উচিত ছিল। 'দ্বন্দ'র গল্পটিও হেমেন বাবুর নিজেরই ছিল। পরিচালনার ভিতর দিয়ে হেমেন বাবুর উন্নতির সম্ভাবনা থাকলেও গল্পাংশের ভিতর দিয়ে তার সে সম্ভাবনা খুবই কম। একথা তাঁর 'দ্বন্দ' সাক্ষ্য দেবে। 'দ্বন্দে'র বিষয়বস্তুর প্রশংসা করলেও কোন গল্পকে রূপ দেবার মত পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া সম্পর্কে শ্রীযুক্ত গুপ্তের যে অভিজ্ঞতা কম একথা স্পষ্টই ফুটে উঠেছে। দ্বন্দের ব্যর্থতার মূলে তাই তার গল্পাংশকেই বেশী দায়ী করবো। 'দ্বন্দ'র সময়ও সংলাপ লিখবার সময় বুদ্ধদেব বাবুর ওপর ভার অর্পিত হয়েছিল কিন্তু সে সংলাপের শতাংশের পনেরো ভাগের মর্যাদাও রক্ষিত হয়নি—এ বেলায় যে হবে তার কি বিশ্বাস আছে? তাই মন্মথ বাবুর দিক থেকেও সংলাপ রচনার ভার না গ্রহণ করলেই ভাল হতো। তারপর শ্রীযুক্ত রায় সম্পর্কে আর একটি কথাও আমরা উল্লেখ করতে চাই—তার ভাষার গতি এবং ছন্দ আমাদের মুগ্ধ করলেও—সে ভাষার উগ্রতা নেই। এ ভাষা ঘুম আনে আবেশ আনে কিন্তু ঘুম ভাংগায় না। চলচ্চিত্রের সংলাপ হবে ঘুম ভাংগানো সংলাপ। হবে উগ্র। ইংরেজীতে যাকে বলে spark—ঝিলিক—অন্ধকারের বুকে বিদ্যুৎ খেলার মত।

রূপ-মঞ্চের পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত নিতাইচরণ সেন মহাশয়ের বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের শারদোৎসব অভিনয়—

গত ১৯শে ডিসেম্বর রবিবার নন্দলাল বসু ষ্ট্রীট, বাগবাজারে শ্রীযুক্ত নিতাইচরণ সেন মহাশয়ের বাড়ীতে—রবীন্দ্রনাথের শারোৎসব অভিনীত হয়। উক্ত অভিনয়ে বাড়ীর ছেলে মেয়েরাই অংশ গ্রহণ করেছিল। অভিনয়ও বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। আমরা এরূপ শুভ প্রচেষ্টার প্রশংসা করি। এবং এর উদ্যোক্তা ও উৎসাহী কর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অভিনয় শেষে আত্মীয় পরিজন ও উপস্থিত দর্শকদের ভুরি ভোজে আপ্যায়িত করা হয়। নিতাইবাবু ও তার সহকর্মী বন্ধুবর ফটিকচন্দ্র দত্তের যত্ন ও আপ্যায়ণে আমরা যথার্থ মুগ্ধ হয়েছি।

উক্ত অনুষ্ঠানে যে সব যুব ও ছোট বন্ধুরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন—মাণিক সেন, মদনগোপাল ব্যানার্জি, সুনীল মিত্র, রবীন সেন, বিশ্বনাথ দাস, অজিত গাংগুলী, নির্মল ব্যানার্জি, শান্তি দাস, সবিতা সেন, ছায়া গাংগুলী, বলাই দত্ত, পার্বতী দত্ত প্রভৃতি।

নিউহান্স পিকচার্স লিঃ (বম্বে)

নগদ নারায়ণ খ্যাত প্রযোজক—অভিনেতা বাবুরাও পেনধরকর তার প্রযোজক প্রতিষ্ঠানটী একরকম নতুন করেই গড়ে তুলেছেন। বোম্বাইয়ের কয়েকজন ধনী তার প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেছেন। এই নবপরিকল্পিত প্রতিষ্ঠানটীর প্রথম চিত্র হবে দ্রৌপদী। বম্বের জনপ্রিয় মাসিক ফিল্ম ইণ্ডিয়ার সেক্রেটারী কুমারী সুশীলারাণী বি-এস-সি দ্রৌপদীর ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করবেন। দুঃশাসন, শকুনি, ভীম চরিত্রে যথাক্রমে চন্দ্রমোহন, বাবুরাও পেনধরকার ও মজহর খাঁ কে দেখা যাবে। বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে কর্তৃপক্ষ দ্রৌপদীর রূপ দিতে অগ্রসর হয়েছেন। এই পরিকল্পনানুযায়ী চিত্রের খরচা সাত লক্ষ টাকা অবধি নির্ধারিত হয়েছে। চিত্রখানি সেণ্ট্রাল ষ্টুডিওতে গৃহীত হচ্ছে।

কে, এন সিং, দীক্ষিত, ডেভিড, বদ্রীপ্রসাদ প্রভৃতিদেরও কয়েকটী বিশেষ অংশে দেখা যাবে বলে আমরা সংবাদ পেয়েছি।

বম্বে টকীজ (বম্বে)

বম্বে টকীজের দেবীকারাণী অভিনীত হামারীবাৎ

বোম্বের ইম্পিরিয়াল সিনেমায় মুক্তিলাভ করে অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। হামারী-বাৎ আমাদের এখানে ম্যানসাটা ফিল্ম ডিসট্রিবিউটর্সের পরিবেশনায় নিউ সিনেমায় প্রদর্শিত হবে।

শ্রীযুক্তা রায় বর্তমানে সুশীল মজুমদারের ইউনিট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

কমলরায় পিকচার্স (বম্বে)

কমলরায় পিকচার্স প্রযোজিত শাহেন শা আকবর বম্বের নভেলটী টকীজে মুক্তিলাভ করেছে। বম্বের গভর্ণর সাহেব চিত্রখানি দেখে খুব খুশী হয়েছেন। কলকাতায় শাহেন শা আকবর চিত্রবাণী লিঃএর পরিকল্পনায় মুক্তিলাভ করবে। কমলরায় পিকচার্সের 'মোকাদ্দর' নামে একখানি চিত্রের পরিচালনার ভার পড়েছে শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পালের ওপর। শ্রীযুক্ত পাল বর্তমানে বোম্বাইতে ভারত সরকারের প্রযোজনা বিভাগে কাজ করছেন।

ষ্টেজডোর ক্যানটিন চিত্রে চেরী ওয়ালকর ও উইলিয়াম টেরী।

লক্ষ্মী প্রোডাকসন্স (বম্বে)

নন্দলালএর পরিচালনায় এদের কাদম্বরীর কাজ শেষ হ'য়েছে। কাদম্বরীতে শান্তা আপ্তে, বনমালা ও পাগাড়ী সান্যাল বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

অরোরা প্রডাকসন্স

পি, আর ডেনীয়েল ও কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রযোজিত অরোরা প্রডাকসন্সের 'শুনো সুনেতা হুন' চিত্রে বনমালা, কে, সি, দে; কাঞ্চনমালা, উলহাস, মেঘমালা, আনসারী, হেমপ্রভা প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন রাজকুমার। যতদুর সংবাদ পাওয়া গেছে চিত্রখানি তার সংগীত মাধুর্যে দর্শকদের মুগ্ধ করতে সমর্থ হবে।

রবীন্দ্রনাথের "তাসের দেশ"

কলিকাতায় অভিনয়ের আয়োজন

শ্রীমতী পার্বতী দেবীর প্রযোজনায় এবং শান্তিদেব ঘোষের পরিচালনায় আগামী জানুয়ারী মাসে কলিকাতার কোন রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের কৌতুক-নাট্য "তাসের দেশ" অভিনীত হবে। "তাসের দেশ" প্রধানতঃ রূপক-নাট্য হলেও এর মধ্যে রূপক-সুলভ গাম্ভীর্য কিংবা রহস্যময়তা

নৃত্য গীত এবং কৌতুকরস এই নাটকটির প্রধান প্রাণ-সম্পদ।

সাহিত্য বাসরের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা

গত ২১শে ডিসেম্বর শ্রীরঙ্গমে সাহিত্য বাসরের উদ্যোগে দুস্থদের সাহায্যকল্পে রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার সভা ও ডাঃ বটকৃষ্ণ পালের পালটা পালটী নাটক অভিনীত হয়। অভিনয়াংশে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাহিত্যিকারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এবং অভিনয় খুব উপভোগ্য হয়েছিল। যাঁরা অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন: ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (ভারতবর্ষ) দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল, মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (ভারতবর্ষ) দেবনারায়ণ গুপ্ত (ভারতবর্ষ) প্রভাতকিরণ বসু (ভাই বোন) অখিল নিয়োগী (খেয়া ও নবযুগ) অমিতাভ দাশগুপ্ত ডাঃ বটকৃষ্ণ রায়, সত্য রায় (ইলাসট্রেটেড নিউজ) ডাঃ বিমল বসু (রূপ-মঞ্চ) কালীশ মুখোপাধ্যায় (রূপ-মঞ্চ) ডাঃ অজিত শঙ্কর দে (পরাগ প্রত্যগ) সুনীতি সেন, রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী, অনিল ভট্টাচার্য; প্রদ্যোত মিত্র, অধ্যাপিকা করুনা কনা গুপ্তা (বেথুন কলেজ), মৃদুলা গুপ্তা, কমলরাণী মিত্র, তপতী চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণী মুখার্জি এবং আরো অনেকে।

এই প্রসংগে আমরা একটী কথা বলতে চাই—এই অর্থ দুস্থ সাহিত্যিকদের জন্যই যেন ব্যয়িত হয়। এবং দুস্থ সাহিত্যিকদের সাহায্য কল্পে কর্তৃপক্ষ একটী কায়েমী তহবিল গড়ে তুলুন।

দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার

দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডারের সাহায্যকল্পে গত ৩রা জানুয়ারী সোমবার রংমহল নাট্যমঞ্চে বালীগঞ্জ কুমার সংঘ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার সভা অভিনীত হয়। নাটকের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছিলেন শ্রীযুক্ত সন্তোষ সিংহ। বিভিন্ন বিভাগের ভার গ্রহণ করেছিলেন নিখিল বন্দোপাধ্যায়, তপন বন্দোপাধ্যায়, দেবনারায়ণ গুপ্ত, রথীন্দ্রনাথ গুপ্ত, সুনীল করণ, ননী দাশগুপ্ত, পরিতোষ শীল, পরেশ ধর, কৃষ্ণা গাংগুলি, মাষ্টার রবীন বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি।

এলাহাবাদ সংগীত সম্মেলনের দশম অধিবেশন

কুমারী বাসনা চৌধুরী এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনীর দশম অধিবেশনে সেতার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে একটী স্বর্ণ পদক পুরস্কার পেয়েছেন। কুমারী বাসনা সাতরাগাছা নিবাসী শ্রীযুক্ত বি, এল, চৌধুরীর কন্যা। সম্মেলনের কর্তৃপক্ষরা কুমারী বাসনার বাজনা শুনে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে ভারতের উপস্থিত শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞদের গানের সংগে তাকে বাজাবার অনুমতি দেন। এবং ইহা বড়ই উপভোগ্য হয়েছিল। কুমারী বাসনা ওস্তাদ মোস্তাক আলীখার শিষ্যা—। গত বৎসর নিখিল বঙ্গ সংগীত প্রতি-

কুমারী বাসনা চৌধুরী

যোগিতায় শ্রীমতী বাসনা প্রথম স্থান অধিকার করেন। আমরা তার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি!

ছদ্মবেশী ও অজয় ভট্টাচার্য

অজয়বাবুর অকাল মৃত্যুতে রূপ মঞ্চের পাঠক পাঠিকা যারা শোক প্রকাশ করে চিঠি পাঠিয়েছেন তাদের আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং রূপ-মঞ্চের মারফতে অজয়বাবুর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা জানাচ্ছি যদিও জানি---আমাদের এই সান্ত্বনা বা শোক প্রকাশে যে ক্ষতি হলো তা পূরণ হবার কোন পন্থাই নেই।

পাঠক পাঠিকাদের কাছ থেকে ইতি মধ্যে যে অনুরোধ এসেছে এবং রূপ-মঞ্চের কর্তব্যের অনুরোধে আগামী সংখ্যা রূপ-মঞ্চ অজয়-স্মৃতি সংখ্যা-রূপে আত্ম-প্রকাশ করবে। এপ্রসংগে দর্শকদের কাছ থেকে অজয়বাবুর স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে কতকগুলি উপদেশ এসেছে। আপাততঃ তার ভিতর যেটী সম্ভবপর আমরা উল্লেখ করছি: অনেকেই অনুরোধ করেছেন: ছদ্মবেশী এখনও মুক্তি লাভ করেনি। ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষ কয়েক ফিট ফিল্ম খরচা করে চিত্রের প্রথমে যেন অজয়বাবুর প্রতিমূর্তি দেখিয়ে—প্রযোজক অথবা তার প্রতিনিধি হয়ে আর কেউ সংক্ষেপে অজয়বাবুর জীবনী Back ground থেকে বলে যান। পাঠক পাঠিকাদের এই উপদেশ সর্বোত্তভাবে সমীচীন মনে করে আমরা প্রযোজকদের কাছে এক পত্র লিখেছিলাম যাতে অনুরূপ কিছু করা হয়। এবং ছদ্মবেশীর কয়েক প্রদর্শনীর বিক্রয় লব্ধ অর্থ অজয়বাবু—এবং তার অন্যতম সহকারী পরিচালক উমা ভাদুরীর (ইতিপুর্বে বম্বের ট্রেণ সংঘর্ষণে মৃত্যু হয়েছে) পরিবারবর্গকে দেওয়া হয়। কর্তৃপক্ষ আমাদের এই প্রস্তাব মত কার্য করতে স্বীকৃত হয়েছেন।

সুধীরা সেনগুপ্তা স্মরণানুষ্ঠান

বিগত ২০শে নভেম্বর, শনিবার যশস্বিনী গায়িকা স্বর্গতা সুধীরা সেনগুপ্তার তৃতীয় বার্ষিক স্মরণানুষ্ঠান ঢাকুরিয়া লেকস্থ চক্রবৈঠক গৃহে উদ্‌যাপিত হয়েছে। এই উপলক্ষে চক্রবৈঠক গৃহ পত্রপুষ্পে সুশোভিত করা হয়। বহু বিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলা অনুষ্ঠানে যোদান করেছিলেন।

সভার প্রারম্ভে শ্রীযুত যতীন্দ্র মজুমদার সঙ্গীতে শ্রীমতী সুধীরার অসাধারণ কৃতিত্ব ও তাঁর নিরহংকার ব্যবহারের কথা ব্যক্ত করে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

শ্রীযুত এন-আর-দাশগুপ্ত বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীমতী সুধীরার বহুমুখী প্রতিভার উল্লেখ করেন।

তারপর গানের জলসা সুরু হয়। কুমারী অঞ্জলী দাশগুপ্তা, কুমারী রাণী সেনগুপ্তা, শ্রীমতী সাবিত্রী ঘোষ এবং শ্রীযুত পরিতোষ শীল, শ্রীযুত রাজেন সরকার, মিঃ হানিফ, রবিপদ আচার্য, রবীন্দ্র সেনগুপ্ত জলসায় অংশ গ্রহণ করেন।

রূপ পারফিমারী ওয়ার্কস

যুদ্ধের দরুণ বিদেশী দ্রব্যের আমদানী প্রায় বন্ধ হওয়ায় ভারতে প্রস্তুত দ্রব্যাদির চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলেছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে—প্রসাধন দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা কেহই অস্বীকার করতে পারেন না তাই বহুবিধ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করেও দেশীয় প্রসাধন দ্রব্যের দিন দিন আশাতীত উন্নতি হতে চলেছে। আমরা এই সকল জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতই শুভানুদ্ধ্যায়ী ও উন্নতি কামী। এইরূপ একটী সম্পূর্ণ বাঙ্গালী জাতীয় প্রতিষ্ঠান "রূপ পারফিউম ওয়ার্কস, ৭৩বি, আমহার্ষ্ট রো, কলিকাতা"—অতি উচ্চ-শ্রেণীর বিভিন্ন প্রকারের প্রসাধন দ্রব্য প্রস্তুত করছেন। ইহাদের প্রস্তুত রূপ কল্যাণ সুগন্ধি ও আয়ুর্বেদোক্ত কেশ তৈল, রূপ কোকো সুগন্ধি নারিকেল তৈল, রূপ পাউডার, রূপ স্নো প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রো-প্রাইটার—শ্রীযুক্ত সচ্চিৎ সরকার সম্ভ্রান্ত বনিয়াদী পরিবারের সন্তান, তাঁর স্বর্গত পিতৃদেব ভূতপূর্ব জিলা ও দায়রা জজ রায় বাহাদুর বিহারীলাল সরকার মহাশয় একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। সচ্চিৎবাবু নিজেও একজন কেমিষ্ট, এই প্রতিষ্ঠান ছাড়াও তিনি বহু দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট।

রেডিও টকি
কর্পোরেশন
সুদক্ষ মেকানিক,
আধুনিক যন্ত্রাদি, মূল্যবান
মেরামতের সরঞ্জাম এবং অল্পসময়ে
ও স্বল্পমূল্যে, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর মেরামতই
আমাদের বিশেষত্ব! রেডিও, সিনেমা ও এ্যাম্প্লিফায়ার
সংক্রান্ত যাবতীয়কার্য্য আমরা করিয়া থাকি।
১৪২-১ রাসবিহারী এভেনিউ
কলিকাতা
RAbin

—শ্রীমতী রেণুকা রায়—

নিউ টকীজের আগতপ্রা। চিত্র সমাজে' একে দেখতে পাবেন।

— সরস্বতী শাস্ত্রী —

াৰ্বতী দেবী প্রযোজিত তাসের দেশ' ও 'সীতাহরণে' ার নৃত্যছন্দ সকলের প্রশংসা অর্জন করবে।

রূপ-মঞ্চ

মঞ্চ, পর্দা ও সাহিত্যকলার সচিত্র মাসিক

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির মুখপত্র

কার্য্যালয় ৩০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৪-৫ম সংখ্যা : বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১ : চতুর্থ বর্ষ

আমাদের আজকের কথা

মাঘ মাসে রূপ-মঞ্চ চতুর্থ বৎসরে পা বাড়িয়েছে। নানা কারণে—মাঘ সংখ্যা বর্ষ সংখ্যারূপে প্রকাশ করতে আমরা পারিনি। বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা বর্ষ সংখ্যারূপে আত্মপ্রকাশ করলো। কাগজেব প্রাদুর্ভাবের জন্য রূপ-মঞ্চ যে সংকটের সম্মুখীন হয়েছে—আমাদের এই অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করে আশা করি প্রত্যেক পাঠক পাঠিকারাই বর্তমানের ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করবেন। পাঠকবর্গের শুভেচ্ছাই রূপ-মঞ্চের চলার পথের পাথেয়—পাঠকবর্গের সহানুভূতিই তাকে নানান বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই ক'বছর মঞ্চ ও চিত্র জগতের সেবায় রূপ-মঞ্চ কতটুকু কী করতে পেরেছে না পেরেছে গলাবাজি ক রে তা না বলে, বিচারের ভার একমাত্র পাঠকবর্গের হাতেই সপে দিতে চাই। যুদ্ধজনীন অবস্থায় নানান আইন কানুনে আমাদের বুকে পাষাণ চাপা দেওয়া—তাই ক্ষীণ কণ্ঠের আওয়াজ যদি কারো কাণে যেয়ে না পৌছায় এ জন্য অন্ততঃ নিজেদের বিচারে নিজেদের অপরাধী প্রতিপন্ন করতে বিরত থাকবো। অন্যান্য কাগজের মত রূপ-মঞ্চের ভবিষ্যতও আধারে ঢাকা। এই দুর্যোগের মাঝেও আমরা তবু আলোকের ক্ষীণ রেখায় আশান্বিত হ'য়ে উঠি—দেশবাসীর অভিনন্দন আশীষে বিপুল শক্তি সঞ্চয় করে পূর্ণোদ্দমে ছুটে চলতে প্রয়াস পাই। তাই আজ নিজেদের তরফ থেকে অনেক কিছু বলার থাকা সত্ত্বেও, বিরত থেকে রূপ-মঞ্চের নব যাত্রা পথে এঁদেরই শুভেচ্ছা স্মরণ করছি। রূপ-মঞ্চের ভবিষ্যৎ উজ্জল থেকে উজ্জলতর হয়ে উঠুক—আপনারা সবাই সেই কামনাই করুন।

চলার পথে দেশবাসীর অভিনন্দন আশীষ বহন করে রূপ-মঞ্চের অগ্রগতি

ভারতবর্ষ-সম্পাদক ও বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ফনীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ঃ মঞ্চ ও ছায়া জগতের সেবায় রূপ-মঞ্চের আত্মত্যাগ চিরদিন বাঙ্গালী মনে রাখবে। তাদেরই একজন হ'য়ে আমি আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।"

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত এস, এম, বাগেড়ঃ চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার উন্নতির মূলে রূপ-মঞ্চের একনিষ্ঠ সেবার জন্য আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি তার বর্ষোৎসবে।"

অধ্যাপক স্মরজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ (গোল্ড মেডালিষ্ট) চিত্র জগতের বিবর্তনের দূত রূপে রূপ-মঞ্চকে দেখতে পাই।"

সুকবি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব—রূপ মঞ্চের ভিতর দিয়ে চিত্র ও মঞ্চ জগতের অনেক গলদ দূর হবে বলেই আমি বিশ্বাস করি।"

নাট্যকার ও পরিচালক মহেন্দ্র গুপ্ত—যখনই দেখি নাট্য জগতের দুরপনীয় কলঙ্ক অপসারণে রূপ মঞ্চের প্রচেষ্টা—নাট্য জগতের দরদী ছাড়া আর কিছু তাকে মনে করতে পারি না।"

নট সূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী—রূপ মঞ্চের প্রতি আমার বিশ্বাস, আমার আশীর্বাদ চিরদিন সঞ্চিত থাকবে। ও যে আমারই সামনে মুখ উঁচু করে আমারই গলদের কথা বলবার স্পর্ধা রাখে—ওকে স্নেহ না করে পারি না।"

বেতারের সুপ্রসিদ্ধ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রঃ দর্শক সমাজকে সংঘবদ্ধ করতে রূপ-মঞ্চের প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হউক এই আমার কামনা। রূপ-মঞ্চের এই প্রচেষ্টায় চিরদিন আমার সহযোগীতা থাকবে।"

নাট্যকার মন্মথ রায় এম, এ, বলেন ঃ

সত্য কথা বলতে রূপ-মঞ্চ কোনদিন পিছু হ'টেনি। সত্যকে আকড়ে আছে বলেই তার জয় সুনিশ্চিত।"

স্কটিসচার্জ কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নির্মল ভট্টাচার্য এম, এ

রঙ্গমঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহকে বিদ্যাপীঠে পরিণত করতে রূপ-মঞ্চের প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হউক—রূপমঞ্চের জন্মতিথিতে এই আমার আন্তরিক কামনা।"

সুপ্রসিদ্ধ নট শ্রীযুক্ত শৈলেন চৌধুরীঃ রূপ মঞ্চের নববর্ষে আমি আমার সাদর সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা জানাই, দিন দিন এই পত্রিকাটি জনপ্রিয় হ'য়ে উঠুক এই কামনা করি।"

জনপ্রিয়া অভিনেত্রী মলিনা দেবী ঃ

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী—
ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ
যে করিতে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই॥"

কবি গুরুর এই বাণী স্মরণ করে রূপ মঞ্চের দীর্ঘ জীবন ও সাফল্য কামনা করি।"

দর্শক সাধারণের বিচারে নির্বাচিতা ১৯৪৩ সনের শ্রেষ্ঠা চিত্রাভিনেত্রী চন্দ্রাবতী বলেন ঃ রূপ মঞ্চ শুধু নিজে পড়েই তৃপ্তি পাই না—অপরকে পড়তে দেখলেও আনন্দ হয়। এরূপ একখানি পত্রিকার দিন দিন সাফল্য—চিত্র শিল্পের উন্নতিকামী প্রত্যেক ব্যক্তি মাত্রেরই কাম্য।"

সুপ্রসিদ্ধ নট ও নাট্য পরিচালক শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী—বাংলা ভাষায় নাট্য সাহিত্যের ও নাট্য কলার অনুশীলন করে যে তরুণ পত্রিকা তিন বৎসরের ভিতর সর্বজনপ্রিয় হ'তে উঠেছে, তার শুভ জন্ম তিথিকে আজীবন অভিনয় ব্রতী আমি, আমার প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা পাঠালুম—সে দীর্ঘ জীবন লাভ করুক, আমাদের সাহিত্যকে, শিল্পকে, আমাদের কৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করে তুলুক।"

দর্শক সাধারণের বিচারে নির্বাচিত ১৯৪২ ও ৪৩ সনের শ্রেষ্ঠ সুরশিল্পী কমল দাশগুপ্তের অভিমত : রূপ মঞ্চ প্রতি মাসে নিয়মমত না পড়তে পারলে মনটা উসখুস করে। চিত্র জগতের একজন সেবক রূপে আর একজন সেবকের একনিষ্ঠায় আমার শুভ কামনা চিরদিন থাকবে।"

জনপ্রিয় সংগীতজ্ঞ ও সুরশিল্পী শচীনদেব বর্মন বলেন : চিত্রশিল্পের একনিষ্ঠ সাধক স্বর্গত বন্ধুবর অজয়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে রূপ মঞ্চের আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ হয়েছি, নিজে একজন চিত্রশিল্পের সেবক হ'য়ে এর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।"

পরিণীতা ও শেষরক্ষা খ্যাত পরিচালক পশুপতি চট্টোপধ্যায় বলেন : প্রতি মাসে রূপ মঞ্চ পড়া আমার একটী নিয়মিত কর্তব্য হ'য়ে দাড়িয়েছে— রূপ মঞ্চকে যে কত ভালবাসি এর চেয়ে বেশী বলার প্রয়োজন হবে না বোধ হয়। রূপ মঞ্চের জন্ম বার্ষিকীতে আমি তাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।"

শোধবোধ ও প্রিয় বান্ধবী খ্যাত তরুণ পরিচালক সৌম্যেন মুখোপাধ্যায় : চিত্র জগতের জঞ্জাল অপসারনে রূপ মঞ্চের আবির্ভাব। এই জঞ্জালের ভিতরের একজন কর্মী আমি, তাই রূপ মঞ্চের অগ্রগতি বলতে শুভ যুগের সূচনাই মনে করি।"

অধ্যাপক প্রভাস ঘোষ এম, এ, পি, আর এস : ছাত্র হিসাবে কালীশ ছিল আমার গর্বের। তারই সম্পাদিত রূপ মঞ্চ দেখে সে গর্ব আমার বৃদ্ধিই পেয়েছে। রূপ মঞ্চের প্রতি আমার শুভেচ্ছা নাচাইলেও সব সময়ই থাকবে।"

জানেন কী এঁদের ?

[এই বিভাগটী এবার থেকে নূতন খোলা হলো। চিত্র ও মঞ্চ জগতের সংগে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের পরিচিতি যথা সম্ভব এই বিভাগে প্রকাশ করা হবে।]

শ্রীযুক্ত অনাদি বসু

বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে শ্রীযুক্ত অনাদি বসুর স্থান চিত্র ব্যবসায়ের সংগে সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তি চিরদিন পরম শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করবেন সন্দেহ নেই। ১৯০৬ খৃঃ তিনি প্রদর্শকরূপে চিত্র ব্যবসায়ে যোগদান করেন এবং ঐ বৎসর অরোরা সিনেমার প্রতিষ্ঠা করেন। দেবী ঘোষের সহযোগীতায় ১৯১৬ খৃঃ তিনি খণ্ড চিত্রের প্রযোজনায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২১ খৃঃ শ্রীযুক্ত বসু প্রযোজিত 'রত্নাকর' মুক্তিলাভ করে। ১৯২১ খৃঃ অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের প্রতিষ্ঠা করেন--চিত্র পরিবেশনায় এই প্রথম এঁর হস্তক্ষেপ। ১৯২৯ খৃঃ মিঃ আর, ঘোষকে working partner রূপে গ্রহণ করেন এবং বম্বের ইম্পিরিয়াল ফিল্ম ও বাঙ্গালোর সূর্য ফিল্মের ইষ্টার্ণ সারকিটের পরিবেশনা স্বত্ব লাভ করেন। ১৯৩০ খৃঃ বড়ুয়া ষ্টুডিও লীজ নিয়ে পৃথক ভাবে প্রযোজকদের কাছে ভাড়া দিতে থাকেন। ১৯৩২ খৃঃ মাদ্রাজে শাখা কার্যালয় খোলেন।

বাংলা চলচ্চিত্রে শ্রীযুক্ত অনাদি বসুর দান কেউই অস্বীকার করবেন না। বর্তমানে প্রযোজনা এবং পরিবেশনা কার্যে শ্রীযুক্ত বসু প্রতিষ্ঠিত অরোরা ফিল্ম করপোরেশন নিয়োজিত আছে। খণ্ড চিত্র প্রযোজনায় বিশেষ করে শিক্ষামূলক খণ্ড চিত্রে সম্ভবতঃ তিনিই অগ্রণী।

অরোরা ফিল্ম করপোরেশন বর্তমানে নিজস্ব ষ্টুডিওতে মনি ঘোষের পরিচালনায় বাংলা চিত্র সন্ধ্যার প্রযোজনায় ব্যস্ত। শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ শ্রীযুক্ত বসু বর্তমানে সাময়িক ভাবে অবসর গ্রহণ করলেও তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—এবং সক্রিয় উপদেশই অরোরা ফিল্ম করপোরেশনকে দিন দিন উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

শ্রীযুক্ত ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়

ডি, জি, নামেই ইনি চিত্রামোদীদের কাছে পরিচিত। চিত্র শিল্পের পূর্বে অংকন শিল্পেই ডি, জি'র আত্মনিয়োগ। কলিকাতার গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলেই তিনি শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৯২০ খৃঃ শ্রীযুক্ত নীতী· লাহিড়ীর সাহচর্যে ইণ্ডো ব্রিটীশ ফিল্ম কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করে 'ইংল্যাণ্ড রিটার্ণড' চিত্র প্রস্তুত করেন। ১৯২৬ খৃঃ কলিকাতা ত্যাগ করে হায়দ্রাবাদে যান সেখানে লোটাস কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২০ খৃঃ কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করে সবাক চিত্রের আবিষ্কারের সংগে সংগে নিউথিয়েটার্সে যোগদান করে 'Execuse me Sir' নামক প্রহসন চিত্রের পরিচালনা করেন। তার পর India Film Co.তে যোগদান করে অনেকগুলি চিত্র প্রস্তুত করেন। ডি, জি, পরিচালিত পূর্ণাঙ্গ চিত্রগুলির ভিতর আহুতি, পথভুলে, দাবী উল্লেখ যোগ্য। দাবীর কাহিনী ১৯৪৩ সালে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান লাভে সমর্থ হ'য়েছে। চিত্রখানিও পরিচালনা নৈপুন্যে দর্শক সমাজের প্রশংসা লাভে সমর্থ হয়েছে। অভিনেতা এবং পরিচালকরূপে ডি, জি আমাদের কাছে পরিচিত। কৌতুক অভিনেতা রূপেই তাঁর সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ। ডি, জির অভিনয় খুব উচ্চ শ্রেণীর। আভিজাত্যের ছাপ তাতে পরিষ্কার পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। বর্তমানে হেমন্ত গুপ্তের পরিচালনায় 'বন্দিতা' চিত্রে অভিনয় করছেন। এছাড়া শৈলজানন্দের একটী কাহিনী এঁরই পরিচালনায় চিত্রায়িত হয়ে শৃঙ্খল নামে আত্মপ্রকাশ করবে। চঞ্চলী কিশোরী অভিনেত্রী কুমারী মনিকা গঙ্গোপাধ্যায় এঁরই কন্যা।

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার

সারা ভারতবর্ষে আজ এমন কোন চিত্রামোদী নেই যিনি নিউথিয়েটার্সের নাম না জানেন। বস্তুতঃ নিউ

থিয়েটার্স শুধু বাংলারই নয়—চিত্রশিল্পে সমস্ত ভারতবাসীর গর্বের বস্তু। এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকারের নাম তাই প্রত্যেক চিত্রামোদীই যে পরম শ্রদ্ধার সংগে উচ্চারণ করবেন এ আর বেশী কথা কী? ভারত সরকারের আইনবিষয়ক ভূতপূর্ব পরামর্শদাতা স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার বীরেনবাবুর পিতা। ১৯০১ খৃঃ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার জন্মগ্রহণ করেন। ইংলণ্ডেই তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন এবং সেখানকারই কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে বি, এস সি ডিগ্রী লাভ করে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। কলিকাতায় এসে প্রথম কণ্ট্রাকটারী ব্যবসা আরম্ভ করেন। মুখর চিত্রের আবিষ্কারের সংগে সংগে চিত্রশিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৩০ খৃঃ নিউথিয়েটার্সের প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীযুক্ত সরকারের ব্যক্তিত্ব—কর্মদক্ষতায় নিউথিয়েটার্স আজ যশের উচ্চ শিখরে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিতে পেরেছে। ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীযুক্ত সরকার অমায়িক ও সদালাপী। তাঁর সংস্পর্শে যারাই এসেছেন—এই বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে থাকতে পারেননি।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষ

১৯২৩ খৃঃ কয়েকজন বন্ধুদের সহযোগীতায় 'Soul of the Slave চিত্র নির্মাণ করেন। তারপর মেসার্স গ্লোব থিয়েটারের দক্ষিণ ভারতের এজেন্টরূপে কাজ করেন। ১৯২৮ খৃঃ পরিচালকরূপে বম্বের কৃষ্ণা ফিল্ম কোংতে যোগদান করেন। ১৯৩১ খৃঃ সাগর ফিল্মে যোগ দেন। ১৯৩৩ খৃঃ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করে রাধা ফিল্ম কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করেন। ১৯৩৬ খৃঃ প্রফুল্ল পিকচার্সের প্রতিষ্ঠা করেন।

সর্বপ্রথম ভারতীয় ছায়াজগতে ধারাবাহিক চিত্র পরিচালনার সম্মান শ্রীযুক্ত ঘোষেরই প্রাপ্য। তিনিই কৃষ্ণা ফিল্মের ৩৬ রীলের (নির্বাক এবং সবাক) চিত্রের পরিচালনা করেন। পরিচালকরূপে শ্রীযুক্ত ঘোষ ততটা কৃতকার্য হতে পারেননি কিন্তু চিত্রশিল্প সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা এবং দীর্ঘ দিন সেবার কথা চিরদিন আমরা মনে রাখবো। নিউ টকীজের 'নারীর'র পরিচালনা করে তিনি বোম্বাই যান
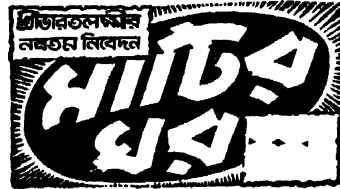
—মেরা গাঁও প্রভৃতি চিত্রের পরিচালনা করেন, বর্তমানে বোম্বাইতেই তিনি আছেন।

শ্রীযুক্ত দেবকীকুমার বসু

বর্ধমান জেলার আকাল পৌষ গ্রামে ১৮৯৪ খৃঃ জন্ম গ্রহণ করেন। গ্রাম্য স্কুলেই তার বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয়। কলিকাতা থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে উচ্চ শিক্ষা আরম্ভ হয় বিদ্যাসাগর কলেজে। জাতীয় আন্দোলনের সংগে সংগে তাতে যোগদান করেন—এবং 'শক্তি' নামে একটী বাংলা কাগজের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। সাহিত্য এবং সংবাদপত্র সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এ্যামেচার থিয়েটারে খুব উৎসাহ থাকায় এরই মারফতে শ্রীযুক্ত ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসেন। এই সময় ধীরেনবাবু Dominion Films এর গোড়া পত্তনে ব্যস্ত ছিলেন। ধীরেনবাবু এই প্রতিষ্টানের প্রথম চিত্র গ্রহণের জন্য দেবকীবাবুর Flames of Flesh গল্পটী নির্বাচন করেন। এই চিত্রে তিনি প্রধান ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন। পরে উক্ত প্রতিষ্টানের দ্বিতীয় চিত্র 'Blind God' এর পরিচালনা করেন। চিত্র পরিচালক রূপে তিনি বহু প্রতিষ্টানে কাজ করেন। তার ভিতর ইউনাইটেড পিকচার্স করপোরেশন (১৯৩০), বড়ুয়া পিকচার্স (১৯৩১), নিউথিয়েটার্স (১৯৩২-৩৩), ইষ্ট ইণ্ডিয়া (১৯৩৪), জয়ন্ত অব বম্বে (১৯৩৫), ইষ্ট ইণ্ডিয়া (১৯৩৬), নিউথিয়েটার্স ১৯৩৭) প্রভৃতি। নিউথিয়েটার্সের কয়েকখানি চিত্র পরিচালনার পরই শ্রীযুক্ত বসুর নাম ভারতবর্ষের চারিদিক ছড়িয়ে পড়ে। নিউথিয়েটার্স পরিত্যাগ করে বম্বে যান এবং 'আপনা ঘরের' পরিচালনা করে ভারতব্যাপী সুনাম অর্জন করেন। শ্রীফিল্মের হ'য়ে 'রামানুজ' পরিচালনা করেন, চিত্রখানি মুক্তি প্রতীক্ষায়। সম্প্রতি কলকাতায়ই আছেন এবং চিত্ররূপার সন্ধি চিত্রের তত্ত্বাবধান করছেন। ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওর প্রযোজিত 'মেঘদূত' চিত্রের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু মেঘদূতের কাজ আপাততঃ বন্ধ আছে।

—নিতাই চরণ সেন

—সুনন্দা দেবী

নিউ থিয়েটার্সের আগত
চিত্র 'তুই পুরুষে'র কল্যা
ভূমিকায় অভিনয় করেছে

শ্রীমতী সুবর্ণলতা —

র পিকচার্সের পরিচালনাধীনে
নিক' চিত্রে দেখা যাবে।

সোভিয়েটের শিল্প কলা ও নাট্য জগতের মাঝে লেনিনের অমরত্ব।

. সোভিয়েটের পরলোকগত রাষ্ট্রনায়ক লেনিনের নাম রংগমঞ্চে ও শিল্পে অমর হয়ে আছে। সোভিয়েটের লোকেরা আজও তাঁকে পিতার ন্যায় ভক্তি করে, ভালবাসে। লেনিন বুঝেছিলেন যে সাহিত্য, রংগমঞ্চ,' শিল্প, চিত্রকলা, মিউজিয়ম এগুলো জাতীয় সম্পদ এবং এই গুলোর সঙ্গে রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি একান্তভাবে জড়িত, তাই যাতে করে রংগমঞ্চ, শিল্প প্রভৃতি শিক্ষনীয় বিষয়কে মুষ্টিমেয় কতকগুলো ধনতন্ত্রবাদীর হাত থেকে উদ্ধার করে সর্বসাধারণের করা যায় তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন।

লেনিন ছিলেন রূপের ও সৌন্দর্যের পূজারী কাজেই যেখানে রূপের ও সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছেন তাঁর কাব্যময় মন সেখানে ছুটে গেছে। প্রাচীন রাশিয়ান থিয়েটারে (যেমন আর্ট থিয়েটার, বলশোই থিয়েটার, সেলি থিয়েটার) যাতে জাতীয় শিল্প, চিত্র প্রভৃতি সযত্নে রক্ষিত থাকে তার দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। রাশিয়ার ঘরওয়া যুদ্ধের ভয়াবহ আবহাওয়ায় যাতে সংগীতজ্ঞরা, অভিনেতারা, চিত্রকরেরা কষ্ট না পান তাদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্য অর্থব্যয় করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি।

লেনিনের পরামর্শে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট গোড়ার থেকেই রংগমঞ্চকে ধনতন্ত্রবাদীদের হাত থেকে উদ্ধার করে সর্বসাধারণের জন্য ব্যবস্থা করে দিলেন কারণ লেনিন বুঝেছিলেন দেশের ও দশের সঙ্গে শিল্প একান্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য।

পুরাতন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। বিখ্যাত বিখ্যাত থিয়েটার যেমন মস্কোর Vakhtangar এবং Mossoviet-theatres, লেনিনগ্রাদে বোলসই এবং ড্রামা থিয়েটার এবং আরও থিয়েটার চারিদিকে প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

যাতে দেশের সংস্কৃতি সাধারনের বোধগম্য করে তোলা যায় ব্যক্তিগত ভাবে সীমাবদ্ধ না থাকে লেনিন চিরদিন এই স্বপ্নই দেখেছেন এবং কার্যে তা পরিণত করে গেছেন। সুতরাং দেশসেবক উদার মনোভাবসম্পন্ন আদর্শের পূজারী লেনিনের দৌলতে ছোটবেলা থেকেই রাশিয়ার লোক জানতে পারল দেশের শিল্প, রংগমঞ্চ, চারুকলা কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় তাতে সকলের সমান অধিকার আছে। ১৯১৪ সালে রাশিয়াতে ১৫৩ থিয়েটার ছিল কিন্তু যুদ্ধের ঠিক পূর্বে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে থিয়েটারের সংখ্যা দাঁড়াল ৪৮৭৯। অসংখ্য লোক থিয়েটার, চিত্র প্রভৃতি দেখতে আসত।

সোভিয়েটে যত মিউজিয়ম আছে তার মধ্যে Moscow State Tretyakar Gallery, The Leningrad State Hermitage, The Pushkin Museum of Graphic Arts এবং Russian Museum, Museum of the Modern Western Art and Museum of Oriental Cultures জগতে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

যুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ও সোভিয়েটের নর নারী তার সংস্কৃতিকে ভোলেনি বরং সংস্কৃতি ও সভ্যতার পীঠস্থান রংগমঞ্চকে আঁকড়ে ধরেছে অন্ততঃ ১৯৪২ সালে যখন রাশিয়ার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয় তখন প্রায় ৭৩ কোটি লোক দর্শক হিসাবে নিয়মমত রংগমঞ্চে অভিনয় দেখেছে।

লেনিনের অনুপ্রেরণায় ও পরবর্তি যুগে স্ট্যালিনের পরামর্শে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলেন যে আমোদ প্রমোদের ভিতর দিয়েই গণজীবনে শিক্ষাবিস্তার করা সব চেয়ে সুবিধাজনক। শিক্ষাপ্রদ আমোদপ্রমোদ গণজীবনে জ্ঞানস্পৃহা জাগায় এবং নিজ জীবন সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে তোলে। এই আত্মচেতনার উদ্রেকই লোকশিক্ষার মূল লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে উপনীত, হওয়ার অন্যতম প্রধান বাহন নাট্যশালা ও রূপালী পর্দা। এদ্বারা

সুস্পষ্টই বোঝা যায় সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ কোন রাজনৈতিক সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আর্টকে আবদ্ধ রাখতে চান নি। পুঁজিতন্ত্রীদেশগুলিতে প্রধানত অভিজাত ও মধ্যবিত্তদের চিত্তবিনোদনের জন্যই রংগমঞ্চ, ছায়াচিত্রের প্রচলন দেখতে পাই কিন্তু লেনিনেব প্রচেষ্টায় সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ শ্রেণীবৈষম্য দূর করে রংগমঞ্চ ও শিল্পকলাকে সাধারণের উপোযোগী করে তুলেছেন। তাই সাধাবণ শ্রমিক এবং কৃষক ও আজ সংস্কৃতির আনন্দরসে যোগদান করতে পারে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের থিয়েটাবগুলিও কোন ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি নয়, গভর্ণমেণ্ট কিংবা গণপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেগুলি পরিচালিত হয়। বিপ্লবের আগে রুশ থিয়েটারই প্রাধান্য পেয়েছিল কিন্তু বিপ্লবের পরে প্রত্যেক জাতির নিজস্ব থিয়েটার স্থাপিত হয়েছে এবং সেখানে নিজ নিজ ভাষায় গান, বাজনা ও নাচের অভিনয় হয়। আর্টের আবেদন গণজীবনে পৌঁছেচে বলেই থিয়েটার গোটাকতক বড় বড় সহরে সীমাবদ্ধ নয়, গ্রামগুলিতে পর্যন্ত ছোট ছোট নাট্যসম্প্রদায় ঘুরে ঘুরে নাটক অভিনয় করে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সব চেয়ে বড় রংগশালা হ'ল মস্কোর গ্রেট থিয়েটার। বলশেভিক বিপ্লবের পূবে বক্সগুলি বড়-লোকেদের জন্য রিজার্ভ রাখা হ'ত কিন্তু বিপ্লবেব পর শ্রমিকরা গিয়ে সেই বক্সে থিয়েটার দেখে। এইসব প্রেক্ষাগৃহে সোভিয়েট নাট্যকারদের আধুনিক নাটকই কেবল অভিনীত হয় না, জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের নাটক সোভিয়েট নাট্যশালায় স্থান পায়।

যাদুঘরে, ছায়াচিত্রে, রংগমঞ্চে, তৈলচিত্রে এবং তুলির আঁচড়ে লেনিনের প্রতিমূর্তি সজীব রাখবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চলেছে।

বিখ্যাত রাশিয়ান অভিনেতা 'বোরিস স্থকিন' "Lenin in October" এবং "Lenin in 1918" নামক দুখানি চিত্রেই লেনিনের ভূমিকা খুব নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সঙ্গে অভিনয় করে জনসাধারণের সামনে লেনিনের বিরাট ব্যক্তিত্বকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। এই অভিনয়ে সাধারণেব নেতা রাজনীতিজ্ঞ লেনিনের জাতিকে উচ্চে তোলবার জন্য প্রচেষ্টা প্রভৃতিকে ভিত্তি করেই লেনিনের চরিত্রটি দেখান হয়েছে। এই দুখানি চিত্র রাশিয়ার জনসাধারণের নিকট অত্যন্ত সমাদর লাভ করেছে এবং পৃথিবীর সর্বত্রই এই দুখানি চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে।

রংগমঞ্চে সর্বপ্রথম "Vakhtangor Theatre'এ The man with Rifle নামক নাটকে লেনিনের জীবনী অভিনীত হয়েছে। এই নাটকে স্বনামধন্য অভিনেতা বোরিস স্থকিন লেনিনের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করে-ছিলেন। এ ছাড়া রাশিয়ার বহু অভিনেতার দ্বারা লেনিনের ভূমিকা বহু ভাবে অভিনীত হয়েছে। 'Kremlin Chimes' নামক নাটকে বিখ্যাত অভিনেতা 'Alexai Grybcor' লেনিনের ব্যক্তিগত চরিত্রের অত্যন্ত সুক্ষ্ম দিক দর্শকদের সামনে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। এই সুক্ষ্ম দিকের ভিতর লেনিনের রংগমঞ্চের আদর্শ, রংগালয়কে অভিনব শিল্পকলার শিক্ষাক্ষেত্ররূপে, সমাজ সংস্কারের প্রকৃষ্ট বাহনরূপে জাতীয়তা বোধের প্রধান উদ্বোধকরূপে সার্থক করে গড়ে তোলবার প্রচেষ্টাকে লোকের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি যে তাঁর প্রচেষ্টায় সাফল্যলাভ করেছিলেন আজ বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার ধৈর্য বীর্য সাহস সেই কথাই প্রমাণ করছে। রাশিয়ার বিরাট শক্তির পিছনে রয়েছে লেনিনের আদর্শে গঠিত রংগমঞ্চ। এই রংগমঞ্চই রাশিয়াকে অনুপ্রেরণা দিচ্ছে যুদ্ধে।

প্রতিভাশালী সোভিয়েট চিত্রশিল্পী 'Nikolai Andreyev লেনিনের জীবনের বিভিন্ন মুহূর্তের কৌতুহলোদ্দীপক ছবি এঁকেছেন। বিখ্যাত শিল্পী Pater Vassilier লেনিনের বিরাট ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলে রাশিয়ায় যাতে তাঁর স্মৃতি চিরদিনের সজীব থাকে তার জন্য সম্প্রতি

বিশেষ ব্যস্ত আছেন। এ ছাড়া Isak Brodsky এবং Alexandar Gerasimor প্রভৃতি অঙ্কিত চিত্র রাসিয়ার প্রতি ঘরে ঘরে সুদূর পল্লীতে পল্লীতে কুঁড়ে ঘরে পর্যন্ত সমাদরে রক্ষিত আছে এবং শ্রদ্ধাসহকারে পূজিত হয়ে থাকে।

লেনিনকে কেন্দ্র করে অসংখ্য গল্পগাথা এবং কাহিনী গড়ে উঠেছে। কত কবির কাব্যে কত লেখকের গল্পে ও উপন্যাসে লেনিনের চরিত্র খোরাক জুগিয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। বড় বড় উপন্যাসিকের উপন্যাসে লেনিন নায়ক হয়ে আজও বিরাজ করছেন।

উদার মন প্রশান্ত চিত্ত ও কোমলকান্ত হৃদয় নিয়ে লেনিন রংগমঞ্চকে সমাজ সংস্কারের বাহনরূপে তার আদর্শের পূজা করে গেছেন। রংগমঞ্চ শিল্প প্রভৃতির ভিতর দিয়ে রাশিয়ার জন্য যা রেখে গেছেন তা জাতির গৌরবের সামগ্রী। অভিনয় ও একটি শিল্প এবং জাতির সভ্যতার অংশ এ কথা তিনি বিশ্বাস করতেন এবং বিশ্বাস্ করতেন বলেই সোভিয়েট রংগমঞ্চে শিল্পে তাঁর নাম অমর হয়ে আছে এবং থাকবে। সোভিয়েট এই বিরাট মানবের উচ্চ আদর্শ ও মহৎ উদ্দেশ্যের কথা কোন দিন ভোলেনি এবং ভুলবেও না।

[U.S.S.R.এর Committee on Arts of the Council of Peoples Commissarsএর Vice-Chairman Alexander Socodonikov কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ 'Lenin immortalised in the Soviet artএর অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন শ্রীযুক্ত অজিত বন্দোপাধ্যায়]

বাংলায় গণনাট্য আন্দোলন

অনিলকুমার সিংহ

বাংলা দেশে বিশেষ করে কলকাতায় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের (Indian Peoples Theatre Association) জন্ম অতি অল্প দিনের। বিশেষ একটা রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটের মুখে এবং ঐতিহাসিক প্রয়োজনের তাগিদে আজ থেকে এক বছর আগে এই সংঘ বাংলার লোকসমাজে আত্মপ্রকাশ করে। কয়েকটা দিক দিয়ে সেদিনকার মানুষের অবস্থা আজ থেকে আরও বেশী শোচনীয় ও নৈরাশ্যজনক ছিল। তার প্রধান কারণ ১৯৪২ সালের গণবিক্ষোভের ব্যর্থতা ও প্রথম মহাদুর্ভিক্ষের ক্রমোবিকাশ। এই দুই প্লাবনের মুখে বাংলার সমাজের সমস্ত মনোবল ভেঙ্গে পড়ে ও শ্রেণী বিভক্ত সমাজের সাধারণ ঐক্য পর্যন্ত শতধাবিচ্ছিন্ন হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সমাজের এই সংকট মুহূর্তে ফ্যাসিষ্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রাদেশিক কেন্দ্র বোম্বাইয়ের ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বাংলা শাখা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে সাংস্কৃতিক বাহনের সাহায্যে এই ধ্বংসাত্মক হতাশা ও ঐক্যহীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর্তে অগ্রসর হয়। সেদিন এই বাংলা ব্যাপী আন্দোলনের উপদেষ্টা হিসেবে আমরা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (বাংলা ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সভাপতি), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন সেনগুপ্ত, শচীন দেব বর্মন, মনোজ বসু (পরে নরেশ মিত্র ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ দেন) কে পুরোভাগে পাই। বাংলার গণনাট্য আন্দোলনের ইতিহাসের বয়স মাত্র এক বছর বললে ভুল হবে কারণ তারও আগে ১৯৪০ সালে ইয়ুথ কালচারাল ইনষ্টিটিউটের ভেতর দিয়ে এই আন্দোলনের ভিত্তি রচিত হয়।

ইয়ুথ কালচারাল ইনষ্টিটিউটের মধ্যে কলকাতার তরুণ সাহিত্যিক ও সাহিত্য রসিকরা সমবেত হয়ে তখনকার বাংলার পাশ্চাত্য প্রয়াসী ও আধুনিক পোষাকে বিকৃতিপ্রাপ্ত সংস্কৃতি আন্দোলনের মোড় ফেরাবার জন্যে সচেষ্ট হন। এই সংগঠনের উদ্যোগে নতুন নতুন বিপ্লবাত্মক গান লেখা হয় ও সুর দেওয়া হয় এবং কবি রবীন্দ্রনাথের সমাজ-বিপ্লবাত্মক গানগুলি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাছাড়া নতুন সামাজিক নাটক লেখা ও অভিনয় করা হয় যেমন সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের 'কেরাণী' সুবোধ ঘোষের 'অঞ্জনগড়' (ফসিলের নাট্যরূপ), Politicians take to rowing the boy grows up, In the Heart of China, the Shopkeepers ইত্যাদি। শেষোক্ত নাটকটি জার্মাণীর ছোট ছোট দোকানদারদের বর্তমান অবস্থার ওপর লিখিত। শ্রীমতি সরোজিনী নাইডু নাটকটি দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইয়ুথ কলিচারাল ইনষ্টিটিউটের কর্মনিষ্ঠা ও অভিনয় কুশলতা অতি অল্প দিনের মধ্যে কলকাতাবাসীর ভেতর একটা অদ্ভুত সাড়া সৃষ্টি করতে পেরেছিল। তার প্রধান কারণ বাংলার রঙ্গমঞ্চ দর্শকদের মনের জিনিস তুলে ধরতে পারছিল না। সামাজিক অগ্রগতির পেছন দিকে মুখ করে সে ভগ্নপ্রায় অতীতের দিকে নৌকো বেয়ে চলেছিল। যার ফলে এই প্রগতিশীল ও সমাজ সচেতন অভিনয় প্রচেষ্টা দর্শকমনকে অভিভূত না করে পারে নি। কিন্তু এই সাফল্য অর্জন করা সত্বেও ইয়ুথ কালচারাল ইনষ্টিটিউট দীর্ঘ দিন স্থায়ী হতে পারে নি। তার কারণ এর নাট্য আন্দোলন একমাত্র স্থানীয় মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলার সহরে, মহকুমায়, গ্রামে তা ছড়িয়ে পড়তে পারে নি। কৃষক-মজুরের দেশব্যাপী জনসমুদ্র থেকে তা উৎসাহ-রস সংগ্রহ কর্তে পারে নি। অর্থাৎ সংক্ষেপে মাটির সংগে এই গাছের কোনো সম্পর্ক ছিল না তাই রসের অভাবে তা স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করে।

ইয়ুথ কালচারাল ইনষ্টিটিউট ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবার পর ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে লুপ্ত প্রগতি লেখক সংঘের অধিকাংশ সাহিত্যিক ফ্যাশিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী

সংঘের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং তখন থেকে ১৯৪৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত (অর্থাৎ বাংলায় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের শাখা গঠিত হবার আগে) এই সংঘই গান ও নাটক, বিশেষ করে গানের সাহায্যে সংস্কৃতি আন্দোলনের নিশান উঁচু রাখে। তখন স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা পূর্ব বাংলার সহরে ও গ্রামে গিয়ে ছোট ছোট গান ও নাটিকা অভিনয় করে বাংলার জনমতকে দেশপ্রেমের ভিত্তিতে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করে। যদিও তা আজকের মতন বাংলার জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়তে পারে নি।

প্রশ্ন উঠতে পারে এই গণনাট্য কী? এবং কেন? প্রথম প্রশ্নের উত্তর হ'ল দেশের জনগণের (এই জনগণের মধ্যে মধ্যবিত্ত সমাজ বাদ পড়ে না কিন্তু এর পুরোভাগে আছে কৃষক ও মজুরের অক্ষৌহিণী যারা দিনের পর দিন মুষ্টিমেয় সম্প্রদায়ের সম্ভোগের জন্যে রক্তপাত ও প্রাণপাতের মধ্যে নিজেদেরকে বলি দিচ্ছে।) আশা আকাংখা, সুখ দুঃখ, অত্যাচার ও সংগ্রাম যে নাটকের মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে সেইটাই হ'ল গণনাট্য। অর্থাৎ যে নাটকে মানুষ মানুষের ভাষায় কথা বলে—তার বেদনালিপ্ত সমাজের সংগে পরিচিত হতে শেখে সেই নাটকই হ'ল সত্যিকার গণনাটক। আর্টের খাতিরে আর্ট কী নাটকের খাতিরে নাটক এ যুক্তি বাস্তবে টেঁকে না। সমাজকে অস্বীকার করে যে জিনিস গড়ে ওঠে তা আপনা থেকে ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—গণনাট্য কেন? মানুষের দেশপ্রেম জাগাবার জন্যে; কৃষক-মজুরের মধ্যে তার শ্রেণী চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে; মানুষকে প্রগতি ও ক্রমোন্নতির পথে নিয়ে যাবার জন্যে; প্রগতিকামী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীনতার সংগ্রামে উৎসাহিত করবার জন্যে; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের করাল গ্রাস থেকে সংস্কৃতিকে বাঁচাবার জন্যে; বর্তমান ফ্যাসিস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠন করবার জন্যে; চলতি বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থার দুর্নীতি ও দৈন্যের ওপর আলোকপাত করে আগামী সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে।

গণনাট্য আন্দোলন একটা কিছু নতুন জিনিস নয়। ইংলণ্ড ও স্পেনের বহু জায়গায় Unity Theatre ও Little Theatre নামে এমনি অনেক প্রতিষ্ঠান ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সহরে ও গ্রামে অভিনয় দেখিয়ে বেড়ায়। সেখানেও এই গণনাট্য আন্দোলনের সাহায্যে দেশবাসীর মধ্যে একটা বিরাট জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে যা হয়ত দশটা রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনেও হ'ত না। আমাদের মতন সেখানেও নতুন নতুন নাটক লেখা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকারদের মধ্যে Clifford Odets, Ernst Toller, Sean O'casey, Eugene O'neill প্রভৃতি তাদের মধ্যে বিশেষ করে জনপ্রিয়। পৃথিবীর মধ্যে গণনাট্য আন্দোলন ব্যাপক রূপ নিয়েছে চীনে বিশেষ করে উত্তর পশ্চিম চীনে। সেখানে যুবক যুবতীরা এই আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়ে তাদের সংগ্রামের ইতিহাসে নতুন পরিচ্ছেদ সৃষ্টি করেছে। চীনের দেশপ্রেমিক নাট্যকার, সুরকার লেখক ও শিল্পী সংস্কৃতির সংগ্রামকে সমৃদ্ধ করবার জন্যে অগ্রসর হয়ে এসেছে। সেখানে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তাই ছত্রভঙ্গ। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার কথা ছেড়ে দিলাম কারণ সেখানে শুধু গণনাট্য নয় সমস্ত কিছুই জনগণের প্রয়োজন ও কল্যাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

সংস্কৃতি ও রাজনীতি প্রচারের বাহন হিসেবে গান ও নাটক প্রাচীন কাল থেকে অত্যন্ত পরিচিত। সেদিন পর্যন্ত গান ও নাটকের মধ্যে দিয়ে ধর্মপ্রচার হয়ে এসেছে। তখন ধর্মই ছিল রাজনীতি। ধর্মের নিগড়ে বাঁধা ছিল ভারতবর্ষের মানুষ যেমনি ভাবে আজকের দিনে, রাজনীতি তাদেরকে নাগপাশে জড়িয়ে রেখেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে গান ও নাটক আদর্শ প্রচারের অত্যন্ত পুরোনো

বাহন। স্বদেশী যুগে মুকুন্দ দাস ও অন্যান্য কবিওয়ালার যাত্রা, গান ও পাঁচালী প্রভৃতি বাংলা দেশের হাজার হাজার অত্যাচারিত কৃষকদের মনে দেশপ্রেমের আগুন জ্বালাতে পেরেছিল। আজও বাংলার ঘরে ঘরে যাত্রা, পাঁচালী, কবিগান হয় কিন্তু তাদের মধ্যে পৌরানিক ও ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুই বেশী। অর্থাৎ আজ লোকগুলা সমাজের প্রতি তার কর্তব্য পালন করছে না কারণ তার সাংস্কৃতিক বাহনেব মধ্যে কৃষকের দুর্দশা, জমিদারের অত্যাচার, বছরের পর বছর ধরে কৃষি সমাজের অমানুষিক আত্মবলিদানের কাহিনী রূপায়িত হয়ে উঠছে না। বাস্তব সমাজ থেকে তা আজ যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছে। তাদের জীবনের দুঃখ দুর্দশাকে ঢাকবার জন্যে লোক সংস্কৃতি বাইজির পোষাক পরে পথে নেমেছে মন ভোলাবার আশায়।

বাংলায় ভারতীয় গণনাট্য সংঘ গড়ে ওঠার সময় আমাদের তিনটে স্লোগান ছিল—প্রথম, ধ্বংসমুখী সংস্কৃতিকে নতুন রূপ দেওয়া, দ্বিতীয়, বাংলার জনসাধারণকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করা, তৃতীয়, জাতিতে জাতিতে ঐক্য গড়ে তোলা—সমস্ত রকম অত্যাচারের বিরুদ্ধে, তা সে সাম্রাজ্যবাদ বা ফ্যাশিষ্টবাদ যে পোষাক পরে আসুক না কেন। আজও উপরোক্ত দুটি স্লোগানের ওপর আমাদের সংস্কৃতি আন্দোলন এগিয়ে চলেছে। শুধু এগিয়ে চলেছে নয়, দিন দিন প্রসার লাভ করছে। আমাদের এক বছরের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেবার চেষ্টা করলাম তা' থেকে আশা করি আমাদের আন্দোলনের গতি বুঝতে পারা যাবে।

১৯৪৩ সালের মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আমরা 'নাট্যভারতী' রঙ্গমঞ্চে সর্বপ্রথম ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নামে জনসাধারণের সামনে আত্মপ্রকাশ করলাম। সে-দিন নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন', বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরি' এবং কয়েকটি গণনৃত্য ও গণসঙ্গীত অভিনীত হল। প্রেক্ষাগৃহে তিলধারণের স্থান ছিল না। সমস্ত টিকিট বিক্রী হয়ে গেছে। তিনতলা পর্যন্ত গিজ্ গিজ্ করছে মানুষের মাথা। সকলের চোখে বিচিত্র বিস্ময় ও কৌতূহল। প্রধান অতিথি হিসেবে এসেছেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শচীন সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু প্রভৃতি। 'আগুন' নাটক অভিনীত হবার পর মনোরঞ্জনবাবু ও শচীনবাবু মঞ্চে এলেন। বললেন—'তোমরা আজ যা দেখালে, পাবলিক স্টেজও তা পারেনি। তোমাদের প্রাণশক্তি ও দেশপ্রেম দুই-ই আছে। গণনাট্য আন্দোলন চালাতে তোমরাই পারবে।'

নাটক হিসেবে 'আগুন' ও 'ল্যাবরেটরি' কোনোটাই খুব উঁচু দরের হয়নি। সে দিক দিয়ে নৃত্যগীত শ্রেষ্ঠ আসন পাবার যোগ্য। কিন্তু অভিনয় ও নাটকদ্বয়ের অভিনবত্ব দর্শকদের মনকে স্পর্শ না করে পারেনি। বাংলার নাট্যজগতে এ রকম জিনিসের পরিবেশন এই প্রথম।

এই অনুষ্ঠানের কয়েক মাস আগে কবি হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনা এবং ফ্যাসিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ ও সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির যুগ্ম-চেষ্টায় শ্রীরঙ্গমে এই ধরণের নৃত্য গীত ও নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। সেদিনকার কথা দর্শকদের মনে এখনও জীবন্ত হয়ে আছে। প্রেক্ষাগৃহের আবহাওয়ায় সেদিন একটা নতুন পরিবর্তন এসেছিল। পরের দিন দৈনিক পত্রিকার সমালোচনায় তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। 'রূপ-মঞ্চের' সম্পাদকীয় প্রবন্ধের কথাও আশা করি পাঠকরা ভুলে জাননি। অভিনয় যখন শেষ হয় তখন ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে গেছে। একটি লোকও কিন্তু উঠে যায়নি। এখনও কাণে লেগে আছে সেদিনকার গণসঙ্গীতের রেশ

"আ গয়া দিন স্বাধীনতা কা, আগে চলো
আগে চলো ভাই"

"নভমে পতাকা নাচত্ হয়, নাচত্ জয়
বাহারে উসকা রং
হা রে গোলামী
আজাদী চিজ বহুৎ হায় দামী।
ওহ রক্ত্ বহাকে খরিদেঙে,
আজাদীকো হম জিতেঙে
(সব) গোলামীকে দিন বীতেঙে।"

মে মাসে 'নাট্যভারতীর' অনুষ্ঠানের কয়েকদিন পরেই সংঘের একটা স্কোয়াড বোম্বাইয়ে চলে গেল। সেখানে তখন নিখিল ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ ও ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে আমাদের স্কোয়াড গান ও অভিনয় করলো। সেখানে সারা ভারতের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তারা বাংলা ভাষা পুরোপুরি অনুধাবন কর্তে না পারলেও নাটকের মর্মার্থ বুঝতে পারলেন। তারা চোখের সামনে দেখতে পেলেন যে বুর্জোয়া সংস্কৃতি ভেঙ্গে যাচ্ছে ধীরে ধীরে এবং তারই জায়গায় গণসংস্কৃতি 'with new values and new meanings' মানুষের কাছে বিস্ফারিত হয়ে উঠছে।

দু' বছর আগে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বোম্বাই শাখাকে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সাফল্য কামনা করে এক বাণী পাঠান তাতে তিনি বলেছিলেন—'I am greatly interested in the development of a Peoples Theatre in India. I think there is a great room for it provided it is based on the people and their traditions; Otherwise it is likely to function in the air. I am glad to notice from year circular that you are laying stress on this People's approach......I wish your ; Association every success in this work.' গণনাট্য সংঘ সেই গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছে।

জুন থেকে অক্টোবর, এই পাঁচ মাস আমরা গান ও নাটক কলকাতার বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করি। হাওড়া ও নৈহাটিতে 'আগুন ও ল্যাবোরেটরি' নাটক অভিনয় করা হয়। সেখানে শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য স্বয়ং 'ল্যাবোরেটরির' প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। দর্শক সমাজ রীতিমত আলোড়িত হয়ে ওঠে। নাট্য জগতে যে এই রকম রূপান্তর আনাতে পারে তা কেউ স্বপ্নে ভাবতে পারেন নি। নতুন নতুন লোক আমাদের সংঘে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আন্দোলনে যোগ দিতে এগিয়ে আসেন। আমাদের আন্দোলন যে তাঁদের মনের সুপ্ত দেশপ্রেমকে জাগাতে পেরেছে এইখানেই তার প্রমাণ। তাছাড়া আমাদের স্কোয়ার্ড বিভিন্ন শ্রমিক অঞ্চলে যেতে আরম্ভ করে যেমন আলমবাজার, হাজিনগর, বেলেঘাটা, বজবজ, মেটেবুরুজ। আমাদের বৈপ্লবিক গানগুলি তাদের মধ্যে কী পরিমাণে সাড়া সৃষ্টি করেছে তা কথায় বোঝানো যাবে না। সে উন্মাদনা, সে উদ্দীপনা আমরা সৃষ্টি করি নি। সে দেশপ্রেম সুপ্ত ছিল তাদের মধ্যে। চাপা পড়েছিল জগদ্দল পাথরের নীচে। আমাদের গানগুলি খুলে দিয়েছে সেই অচলায়তনের আগল। শ্রমিক অঞ্চলে আমাদের স্কোয়াডের গানগুলির অধিকাংশই মজুরদের লেখা। ট্রামের মজুর কী চটকলের মজুর তারা নিজেরাই গান লিখেছে। অনেকগুলিতে সুর তারা নিজেরাই দিয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আমরা তাদের মধ্যে ওপর থেকে কোনো জিনিস চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করি নি। তাদের নিজেদের বৈপ্লবিক সত্বাই তাদের কাছে বহন করে নিয়ে গেছি।

নভেম্বর মাসে বাংলার দুর্ভিক্ষ প্রচণ্ড রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সেই সময় কবি হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও বিনয় রায়ের পরিচালনায় আমাদের একটা স্কোয়ার্ড পাঞ্জাবে যায়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল গান, নাচ ও নাটকের মধ্যে দিয়ে

বাংলার সত্যিকার রূপ পাঞ্জাববাসীর সামনে প্রকাশ করা এবং রিলিফের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করা। সেখানে দু'মাস থেকে তাঁরা বড় বড় সহরে অভিনয় দেখান। এমন কী গ্রামে গ্রামে খোলা মাঠে তারা open air show দেন। রাত একটা ছুটো সেদিকে খেয়াল নেই। গ্রামের হাজার হাজার আবাল বৃদ্ধ বনিতা দিনের পর দিন তাদের বাংলার ভাই বোনেদের অমানুষিক অবমাননার ইতিহাস অতন্দ্র চোখে দেখেছে। চোখের জল তারা সম্বরণ কর্তে পারে নি। পাঞ্জাবের দরিদ্র গ্রামবাসী তাদের নিজেদের যথাসাধ্য রিলিফের জন্যে দিয়েছে। এক পয়সা, দু'পয়সা, এক আনি, নোট—তাদের সাহায্যে ভরে উঠেছে রিলিফের ঝুলি। যারা পয়সা দিয়ে সাহায্য কর্তে পারে নি তারা এনে দিয়েছে চাল গম ইত্যাদি। গুজরানওয়ালা জেলায় কামোক এ চাষীদের দানে দেড় ঘণ্টার মধ্যে এক ওয়াগন (প্রায় নয় হাজার টাকার) চাল স্তূপীকৃত হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয় বহু গয়না পর্যন্ত সংগৃহীত হয়। জনৈক দরজীর বউ তার এয়োতির চিহ্ন হাতীর দাঁতের শাখা খুলে দেয়। বলে 'আমার আর এর বেশী কিছু নেই। আমার নিজস্ব বলতে এই শাখাটিই আছে। এইটে নিন। দেখুন, বিক্রী করে কী পান।' এমনি একটি নয়, দরিদ্রের বহু গয়না শাখা স্কোয়াডের কাছে জমা হয়েছিল। এক জায়গায় শো শেষ হয়ে যাবার পর একজন বৃদ্ধ চাষী স্কোয়াডের কাছে এসে বলে—বাবুজী, আমার সম্পত্তি বলতে এই একটি কম্বল আছে। এইটা নিন।' শীতে হি হি করছে সবাই। চাষী কিন্তু তার কম্বল দেবেই। পাঞ্জাবের দরিদ্র চাষীর এই দান বাংলার কৃষিসমাজের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। রিলিফের ক্ষেত্রে সারা ভারতবর্ষকে পাঞ্জাবই দেখিয়েছে নতুন পথ। তার প্রমাণ—আমাদের স্কোয়াড দেশ প্রেমিকদের সাহায্যে চাল, গম, গয়না ও নগদে মোট সওয়া লাখ টাকা সংগ্রহ কর্তে পেরেছিল।

ফেরার পথে দিল্লীতে এই স্কোয়াড নৃত্যশিল্পী উদয়-শঙ্করের সঙ্গে দেখা করে। বিনয় রায় তাঁকে বলেন - 'আপনি আমাদের মধ্যে আসুন। উদীয়মান শিল্পী আমাদের মধ্যে অনেক আছে। কেবল আমাদের অভাব হ'ল আপনার মত শ্রেষ্ঠ শিল্পীর, যিনি আমাদেরকে শিক্ষা দেবেন। আপনি সেই ভার নিন।'

উদয় শঙ্কর জবাব দেন—'একদিন আমিও আমার সমস্ত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান আপনাদের মতন এই কাজে নিয়োগ করবো। এখন পর্যন্ত কর্তে পারি নি। তবে চেষ্টা করছি। দেড়শো জনের একটা প্রতিষ্ঠান চালাবার অর্থ-সংগ্রহের সমস্যা আমাকে এখনও ব্যাকুল করে তোলে।'

একটু থেমে বলেন—'যাদের পয়সা আছে তারা অনায়াসে আমাদের প্রতিষ্ঠান চালাবার জন্যে সাহায্য কর্তে পারেন। কিন্তু তাদের আর্টের জন্যে দরদ নেই।'

বিদায় দেবার সময় বলেন—'আসুন, আপনার নতুন শিল্পীর দলকে নিয়ে একবার আলমোড়ায় কিছু দিনের জন্যে বেড়িয়ে যান। বাংলার সমস্ত জাতের দরদী শিল্পীদেরকেই সঙ্গে আনবেন। আমি যথাসম্ভব এই নতুন সংস্কৃতি আন্দোলনকে সাহায্য করবো।'

তাঁর কথামত তাঁর দলের দুই জন নৃত্যশিল্পী আমাদের স্কোয়াডের সঙ্গে ভ্রমণ করছেন ও নৃত্যাভিনয় দেখাচ্ছেন।

১৯৪৪ সালের ৩রা জানুয়ারী। 'ষ্টার' থিয়েটারে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'হোমিওপ্যাথি' ও বিজন ভট্টাচার্যের নতুন নাটক 'জবানবন্দী' অভিনীত হ'চ্ছে। কারো মুখে কথা নেই। সবাই মনোযোগ দিয়ে দেখছে। গণনাট্যের বৃহত্তর সম্ভাবনা তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে। পরাধীন ধ্বংসমুখী মানুষের জীবনে বিপ্লবের এই নবজাতককে তারা নতুন করে উপলব্ধি করলো। বিরাম হলে সাহিত্যিক শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি বললেন—'আমি যতই দেখছি ততই অভিভূত হয়ে যাচ্ছি।

—শ্রীমতী সুমিত্রা—

চিত্রজগতের সন্ধিতে এই
নবাগতা অভিনেত্রীটির নূতন
পরিচয়ে দর্শকেরা মুগ্ধ হবেন

Insist on
ROSCO'S
Scented
COCOANUT OIL
for the HAIR
PUREST & SCIENTIFICALLY REFINED.
PROMOTES THE GROWTH AND
ARRESTS FALLING HAIR.
FRANK ROSS & Co LTD

এতদিন ভাঙার লেখাই লিখেছি। আজ আবার নতুন করে গড়ার সাহিত্য লেখার অনুপ্রেরণা পাচ্ছি। আপনাদের গান, নাটক, অভিনয়কুশলতা কিসের প্রশংসা করবো ভেবে পাচ্ছি না। দাঁড়ান আমিও এমনি একটা নাটক লিখছি।'

ভেতর থেকে শুনলাম থিয়েটারের শিফটার, লাইটম্যান সবাই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেছে। লাইটের দিকে নজর নেই তাদের। তারা একদৃষ্টে অভিনয়ের দিকে চেয়ে আছে। তাদের জীবনে এ অভিজ্ঞতা অচিন্ত্যনীয়।

অভিনয় শেষ হলে দল বেঁধে গ্রীনরুম থেকে বেরিয়ে আসছি। পথে থিয়েটারের পানওয়ালার সঙ্গে দেখা। সে বললো—'বাবু আজ যা দেখিয়েছেন তা জীবনেও দেখি নি। এত বছর থেকে এইখানে বইছি কিন্তু কই আমাদের—ভিখিরিদের—ছোট লোকদের জীবন নিয়ে তো কাউকে লিখতে দেখলাম না। হয় রাজা উজির নয় বড়লোক কোটিপতি এই তো এত বছর থেকে দেখে আসছি।'

দেখলাম লোকটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আনন্দে। আমাদের দেশপ্রেমিক প্রচেষ্টা তার মনে দাগ কেটেছে এ কথা অস্বীকার করবো কী করে?

জানুয়ারী মাসের ১৫, ১৬, ১৭ তারিখে ফ্যাসিষ্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন। রবিবার ১৬ই তারিখে সকাল নয়টায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সংস্কৃতি অনুষ্ঠান। বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে যে সব স্কোয়াড এসেছে তারা নাচ ও গানের মধ্য দিয়ে গণসংস্কৃতির ক্রমোন্নতি প্রদর্শন করবেন। জনসাধারণ দলে দলে যোগদান করেছে। দর্শকের সংখ্যা আট থেকে দশ হাজারের মধ্যে। সবাই খোলা ময়দানে রোদের মধ্যে বসে আছে। অনুষ্ঠান যখন ভাঙলো তখন সাড়ে বারোটা।

দেখলাম, একজন বার্মা পলাতক ভদ্রলোক স্বগতোক্তি করছেন—'শালারা আজকাল মাঠে মাঠে সুরু করেছে। লজ্জা সরম বলে কিছু নেই।'

তারই কিছু দূরে একজন ভদ্রলোক দেখলাম তার বন্ধুকে বলছেন—'যাই বলুন মশাই, এদের মনের জোর আছে। তা না হলে এই খোলা মাঠে রাস্তার মধ্যে কোনো ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ে নাচগান কর্তে পারে? বাংলা দেশে তো দলের অভাব নেই কিন্তু কেউ কী এভাবে এগিয়ে এসেছে? এটা তো সোজা কথা মশাই যে দেশকে ভালো না বাসলে এরা রাস্তায় রাস্তায় এমনিভাবে নাটক দেখিয়ে বেড়াতো না।'

তারপর দিন সোমবার সাড়ে ছয়টার 'মিনার্ভা' থিয়েটারে গণনাট্য সংঘের বিশেষ সংস্কৃতি অনুষ্ঠান। আগের দিনই প্রায় সমস্ত টিকিট বিক্রী হয়ে গেছে। অভিনয়ের দিন তবু টিকিট ক্রেতার কম সমারোহ হয় নি। দাঁড়িয়ে দেখার জন্যে কিছু বিশেষ টিকিট ইস্যু করা হ'ল কিন্তু অধিকাংশ লোক ফিরে গেল হতাশ হয়ে। দর্শকদের সমবেত অনুরোধে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত অনুষ্ঠান চললো। ফেরার সময় ট্রাম বাস বন্ধ। বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল থেকে প্রায় দেড়শো শ্রমিক অভিনয় দেখতে এসেছিল। তারা হেঁটে বাড়ী ফিরলো। যারা অভিনয় করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই হেঁটে বাড়ী ফেরেন কিন্তু তখন সাফল্যের উন্মাদনায় তাদের মনে নতুন আত্মবিশ্বাসের বিকাশ।

ফেব্রুয়ারী মাসের ২৪শে তারিখে আমাদের একটা স্কোয়াড জামশেদপুরে যায়। সেখানে ২৫শে ও ২৬শে মিলনী ক্লাব ও গোলমুরি ইভনিং ক্লাবে যথাক্রমে বাংলার দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে অভিনয় হয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে বিরোধী পক্ষের বহু লোক দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা অশ্লীল মন্তব্য, শিষ দেয়া, হরিবোল রব তোলা কিছুই বাদ দেন নি। কিন্তু ক্রমে নাটক দেখে তাদের মনেও দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ হয়। কয়েকজন মহিলারা এগিয়ে এসে উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে রিলিফের জন্যে Collection করেন। অভিনয় শেষ হয়ে যাবার পর দর্শকদের মধ্যে থেকে অনেকে আমাদের স্কোয়াডের সঙ্গে দেখা

কর্তে আসেন এবং জামশেদপুরবাসীর পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানান। শুধু তাই নয় আমরা যেন আবার এখানে আসি, এ কথা তারা বার বার মনে করিয়ে দেন।

মার্চ মাসের প্রথম দিকে আমাদের স্কোয়াড গোবরডাঙ্গা ও ফুলবাড়ীতে কিষাণ সভার যথাক্রমে জেলা ও প্রাদেশিক সম্মেলনে যায়। যশোহরে সোভিয়েট সুহৃদ সংঘের সম্মেলনে অভিনয় দেখায় এবং মার্চ মাসের মাঝামাঝি একটি স্কোয়াড বেজওয়াড়ীর নিখিল ভারত কিষাণ সভার অধিবেশনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখায়। প্রায় দেড় লক্ষ কিষাণ সম্মেলনে উপস্থিত থেকে রাত দুটো অবধি অভিনয় ও গান শোনে। অধিকাংশ দর্শক হিন্দি ভাষা বুঝতে পারে নি কিন্তু তারা আপনা থেকে বাংলার কৃষকদের সাহায্যার্থে যথাসম্ভব দান কর্তে এগিয়ে আসে।

এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে আরেকটি সংস্কৃতি স্কোয়াড বোম্বাই ও গুজরাট ভ্রমণ কর্তে বেরিয়ে গিয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য নাচ, গান ও অভিনয় দেখিয়ে সেখান থেকে বাংলার মহামারী ক্লিষ্ট কৃষকদের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করা। এ পর্যন্ত যে রিপোর্ট এসে পৌঁচেছে তা থেকে জানা যায় যে তারা সেখানে জনসাধারণের মধ্যে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বোম্বাইয়ের সমস্ত জাতীয়তাবাদী পত্রিকা-গুলি তাদেরকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় অভিনন্দন জানিয়েছে। এমন কী শ্রীমতি সরোজিনী নাইডু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, ভুলাভাই দেশাই নাটক ও নৃত্য দেখে চোখের জল সম্বরণ-কর্তে পারেন নি। তাঁরা নিজেরা অর্থ সাহায্য করেন ও ভূয়সী প্রশংসা করেন। অভিনেতা মতিলাল ও ডাইরেক্টর শান্তারাম অভিনয় দেখে অভিভূত হন। প্রসিদ্ধ নট বাল গান্ধর্ব্য বলেন—'আমি চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতায় যা লাভ কর্তে পারি নি তাই আজ তোমরা দেখালে। স্কোয়াড বোম্বায়ে থাকা কালে বিখ্যাত নট পৃথ্বিরাজ ও কবি হারীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রতিদিন তাদের সঙ্গে যোগ দেন ও গান করেন এবং রিলিফের জন্যে দর্শকদের কাছ হতে অর্থ সংগ্রহ করেন। সুদূর প্রাচ্যের রাশিয়ান ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটর সাদিয়স্টে নাটক দেখে বলেন—'এই হ'ল সত্যিকার নাট্য কলা। অভিনয় দেখে আমার নিজের দেশ সোভিয়েট রাশিয়ার কথা মনে পড়ছে।' নাটক দেখে একজন মজুর খামে করে 'তিয়াত্তর টাকা ছয় আনা' রিলিফের জন্যে দান করে। তার চিঠিতে লেখা ছিল '—আমি আমার সমস্ত মাসের মাহিনে থেকে তিন টাকা ছয় আনা খরচ করেছি। বাকী টাকা বাংলার সাহায্যে দিলাম।'

উপরোল্লিখিত বিবরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। বহু হৃদয়গ্রাহী খবর তা থেকে বাদ গেছে। বাংলার জেলায় জেলায় আমাদের শাখাগুলি কী ভাবে কাজ করছে তার বিবরণ দেয়া হয় নি। তা বারান্তরে দেয়া যাবে। বাংলার গণনাট্য আন্দোলনে যে সব তরুণ শিল্পীরা পুরোভাগে আছেন তাঁদের মধ্যে বিনয় রায়, শম্ভু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও বিজন ভট্টাচার্যের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সঙ্গীত রচনা ও সুর দেয়ার ব্যাপারে বিনয় রায়, ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এবং নাটক রচনা ও পরিচালনা ক্ষেত্রে বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্র অতি অল্প সময়ের মধ্যেই খ্যাতি অর্জন করেছেন।

এখনও আমাদের মধ্যে অনেক গলদ আছে। বাংলার প্রত্যেক জেলায় ও মহকুমায় আমরা আমাদের শাখা গঠন কর্তে পারিনি। অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে অনু-শীলনের অত্যন্ত অভাব। তবু প্রাথমিক অবস্থা আমরা পেরিয়ে এসেছি। গণ-চেতনা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগতে নতুন পরিবর্তন আসছে। প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ আন্দোলন পরি-চালনায় নেমেছে। ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সমিতির সঙ্গে তার যোগাযোগ নিবিড়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত হিসেবে যে এই গণনাট্য আন্দোলন একদিন অগ্রসর হবে- একথা এখন থেকে অনুমান করা যায়।

কালো-ছায়া

শ্রীঅখিল নিয়োগী

[সময় সন্ধ্যা। সানাই বাজ্‌ছে। ঘরে তিনটি প্রাণী বসে]

সন্ধ্যা ॥ ঠাকুরপো, তুমি খোকাকে একটু ধরনা! আমি তাড়াতাড়ি সন্ধ্যাটা দিয়ে আসি—

সরল ॥ আজ খোকার মুখে ভাত, আজও তোমার আজে-বাজে কাজ শেষ হবে না?

সন্ধ্যা ॥ কি যে অলুক্ষণে কথা বল ঠাকুর পো! ঘরে সন্ধ্যা দেয়া বুঝি আজে-বাজে কাজ! আজ খোকার মুখে ভাত আজ আরও ভালো করে দীপ জ্বালাতে হবে…শাঁখ বাজাতে হবে……

সরল ॥ আর ওদিকে যে নিমন্ত্রিতদের আস্‌বার সময় হয়ে এলো!

সন্ধ্যা ॥ লক্ষিটি! সেই জন্তেই ত' আমিও তাড়াতাড়ি কচ্ছি। ধরনা ওকে একটু! আমি যাবো আর আস্‌বো।

সরল ॥ আমি যে ভাবছিলাম খোকনমণির জন্তে কতকগুলো ভালো ভালো খেল্‌না এক্ষুণি ছুটে গিয়ে নিয়ে আস্‌বো—

সন্ধ্যা ॥ (কপট কোপে) আচ্ছা, সে তোমার না আন্‌লেও চলবে। তুমি কি রোজগার করো যে খোকনের জন্তে খেলনা কিনে দিতে হবে? যখন নিজে উপায় করবে যতখুশী কিনে দিও আমি আপত্তি করবো না?

সরল ॥ ঐত' তোমার দোষ…সব তাতেই তোমার আপত্তি! কেন, দাদা কোথায় গেল। দাদাও ত' পাঁচ-মিনিটের জন্তে খোকনমণিকে একটু ধর্‌তে পাবে।

সন্ধ্যা ॥ পাগল ছেলে! আমি বলছি ঠাকুরপো…তুমি যে ওকে প্রাণের চাইতেও ভালো বাসো…সেই ত ওর আশীর্বাদ। লোক দেখানো কতকগুলো খেলনা না দিলেই বুঝি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল! আর তোমার দাদা! কখন নিমন্ত্রিতেরা আসবে সেই কথা ভেবে ব্যস্ত বাগিশের মতো বাইরে গিয়ে বসে আছেন। তাকে দিয়ে সংসারের এতটুকু কাজ হবার যো নেই! যা' করতে হবে তোমাকে আর আমাকে!

সরল ॥ [অভিমানের সুরে] আচ্ছা দাও! খোকন মণিকে কোলে নিয়ে রাখতে ত' আমার ভালোই লাগে। কিন্তু মুস্কিল কি জানো? সবাই ওর মুখে ভাতে কত কী খেল্‌না দেবে…শুধু ওর কাকামণির কাছ থেকেই ও কিছু পাবে না! সেটা কেমন দেখাবে বলত!

সন্ধ্যা ॥ ঠাকুরপো, কি যে আবোল-তাবোল বকো! সকলের সঙ্গে বুঝি তোমার সম্পর্ক! নাও এখন ওকে ধর দেখি……

সরল ॥ দাও—দাও—খোকনমণিও তোমার চাইতে আমার কোলে থাক্‌তেই ভালো বাসে।

সন্ধ্যা ॥ হুঁ! আমি ও তাই চাই…চল্লাম আমি—

[প্রস্থান]

সরল ॥ [খোকনকে আদর করে] খোকনমণি! আজ তোমার মুখে ভাত। কি খাবে আগে বল দেখি? বেগুন ভাজা না পায়েস?

খোকন ॥ অ—অ—অ—…

সরল ॥ অ—অ—অ! হুঁ! হুঁ! হুঁ! খাবার আগেই জিব দিয়ে লালা গড়াচ্ছে যে! এখনো ত' রসগোল্লা তোর মুখে তুলে দিইনি দুষ্টু খোকা!

[এমন সময় হঠাৎ একটা বেড়ালের ডাক শোনা গেল—ম্যাঁ-ও]

সরল ॥ সন্ধ্যাবেলা! এমন বিশ্রী ভাবে একটা বেড়াল ডেকে উঠ্‌ল কোত্থেকে?

কালো বেড়াল ॥ ম্যাঁ—ও-ম্যাঁ—ও…

সরল ॥ আঁা সেই কালো বেড়ালটা! আমি যে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পাচ্ছিনে! এদ্দিন পর—এ-ও কি সম্ভব!

কালো বেড়াল ॥ ম্যাঁ-ও—ফ্যাঁ—স্…)

সরল ॥ আরে! আবার দাঁত বের করে ফ্যাঁস্-ফ্যাঁস্

শব্দ করে যে! দূর-দূর! ভাগ্--পালা!

[কালো বেড়ালটা, ম্যাঁও ম্যাঁও করে ডাক্‌তে ডাক্‌তে দূরে চলে গেল]

[এমন সময় হঠাৎ সরলের দাদা দেবলের প্রবেশ]

দেবল ॥ সরল!—সরল! এই যে তুই একাই রয়েছিস! ভর সন্ধ্যে বেলায় এমন বিশ্রী ভাবে কে ডাকছিল রে?

সরল ॥ [ভয়ে ভয়ে] তাহলে তুমিও শুনেছ দাদা! সেই কালো বেড়ালটা! দেখেই ত' আমার গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে উঠেছে!

দেবল ॥ কি পাগলের মতো বকছিস সরল! সেই কালো বেড়ালটা কি করে আসবে? তুই নিশ্চয়ই দেখতে ভুল করেছিস্!

সরল ॥ না না দাদা! আমি একটু ও ভুল করিনি। সেই দশবছর আগেকার রাত্তিরে দেখা সেই মিশকালো বেড়াল। পিঠের ওপর শুধু একটা পাটকিলে রঙের দাগ আছে। কি বিশ্রী ভাবেই না ডেকে উঠল।

দেবল ॥ চুপ! আমি এখনো কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। তোর বৌদিকে সে সব কথা কিছু বল্‌বিনে! ও হয়ত শুনলে ভয় পাবে!

সরল ॥ কিন্তু দাদা! আজ খোকার মুখে ভাত! আজকের দিনে ও কেন এলো? আমার বড্ড ভয় কচ্ছে দাদা!

দেবল ॥ চুপ! চুপ! তোর বৌদি, এই দিকেই আসছে।

সরল ॥ চুপ না হয় করছি দাদা! কিন্তু আমার বুকটা কেবলি ঢিপ্ ঢিপ্ কচ্ছে! খোকার দিকে তাকিয়ে দেখ! খোকনমণি অমন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে কেন?

দেবল ॥ [ফিস্ ফিস্ করে] সরল চুপ কর! তোর বৌদি এসে পড়েছে।

সন্ধ্যা ॥ এই যে! সন্ধ্যাবেলা দুই ভায়ের কিসের ষড়যন্ত্র হচ্ছে? পরের বাড়ীর মেয়ের বিরুদ্ধে কিছু নয়ত!

সরল ॥ বৌদি, তুমি যে আবার ফিরে এলে? এরি মধ্যে তোমার সন্ধ্যে দেয়া হয়ে গেল? শাঁখ বাজানোর কোনো শব্দ ত' শুনলাম না!

সন্ধ্যা ॥ ভাবলাম, এই ঘরেই ত' খোকা রয়েছে। এই ঘরটা আগে ঝাঁট দিয়ে জল ছিটিয়ে যাই। তা' তোমার দাদা যে আবার অন্দর মহলে এসে জুটেছেন! নিমন্ত্রিতেরা এসে আবার ওঁকে স্ত্রৈণ বলে ঠাট্টা করে না বসে!

দেবল ॥ কি যা তা বকছ···সরলের সাম্‌নে! শোনো! খোকনকে আজ সন্ধ্যায় খুব সাবধানে রেখো। যার তার কোলে তুলে দিও না...

সন্ধ্যা ॥ এ আবার কি অলুক্ষণে কথা! বাড়ীতে দশজন লোক আসবে। সবাই আদর করে খোকনমণিকে কোলে তুলে নেবে...কত চুমু খাবে...হরের মা, গোবিন্দের শাশুড়ী···তোমাদের ওঁকো ইস্কুলের মাস্টার! আর আমি বুঝি ওকে আগলে নিয়ে বসে থাকবো। আজ ত' ও সবাইকার—

দেবল ॥ না-না ঠাট্টা নয় সন্ধ্যা! এই কথাটা বল্‌বার জন্যেই আমি ভেতরে এসেছি। তোমার সব কাজ পড়ে থাক···তুমি খোকনকে নিয়ে বোসো!

সন্ধ্যা ॥ কি যন্ত্রণা! আজ আমার এমন দিন...আর আমি সাত পুরুষের ভিটেয় সন্ধ্যাটা অবধি দেখাবো না? ঠাকুরপো,...অতি আনন্দে তোমার দাদার আজ মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তুমি ওকে নিয়ে আর একটু থাকো লক্ষ্মীটি। আমি যাবো আর আসবো···

দেবল ॥ সন্ধ্যা—সন্ধ্যা—শোনো···

সন্ধ্যা ॥ পিছু ডেকোনা বলছি...আমায় প্রদীপ জ্বালাতে হবে—শাঁখ বাজাতে হবে। ঠাকুর দেবতার কাজেও কি তোমার বাধা না দিলে নয়? [প্রস্থান]

দেবল ॥ বাধা! বাধা! বাধা কি আর সাধে দিচ্ছিলাম। দেখ সরল, আমার কেবল মনে হচ্ছে আজ কিছু একটা ঘটবে—

সরল ॥ তা হলে সব কথা খুলে বলি বৌদিকে?

দেবল ॥ না—না—ও ভয় পাবে! ভয় পেলে আমার খোকনমণিকে কে বাঁচাবে! তুই আর আমি পারবো না। ওর মায়ের কোল আজ যদি ওকে বেঁধে রাখতে পারে। আমি যাই—আমি এখানে থকতে পাচ্ছিনে...বাইরে গিয়ে বসি...তুই খোকাকে আগলে রাখিস সরল!

সরল ॥ [ছড়ার সুরে]

খোকন সোনা...খোকন সোনা
ছোট্ট, যে এই টুক্...
মায়ের বুকের রতন মানিক
ভরবে মায়ের বুক।

[হঠাৎ দরজার আড়ালে কালো বেড়ালটা ডেকে উঠল-ম্যা—ও]

সরল ॥ আবার সেই কালো বেড়াল..আবার সেই ম্যাও—ম্যাও ডাক! আমি কি করি...আমার বুক ঠেলে শুধু কান্না পাচ্ছে।

বেড়াল ॥ ম্যাও—ম্যাও—ম্যা-ও!

সরল ॥ যা—যা—দূর—পালা! অশুভ কোথাকার। এমন দিনে কেন তুই মরতে এলি আমাদের বাড়ীতে! দূর হয়ে যা বলছি!

[বেড়ালের ডাক দূরে চলে গেল]

সরল ॥ না না এত সহজে আমি ভয় পাবো না। আমি খোকাকে দু'হাতে আমার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে রাখবো। সে'রাত্তিরে আমি অনেক ছোট ছিলাম...তাই কিছু করতে পারিনি! কিন্তু আজ?...আজত আমি বড় হয়েছি। শুধু তাই নয়...আজ আমি খোকাবাবুর কাকামণি!

[হঠাৎ শো-শো বাতাসের গর্জন শোনা গেল...তারপরই বাজ ডেকে উঠল]

সরল ॥ তাইত' অসময়ে মেঘ করে এলো...হাওয়া এলো মেলো ছুটছে। সঙ্গে বাজও পড়ছে? সেই রাত্তিরের মতো সব মিলে যাচ্ছি...এখন আমি কি করি? দাদাকে ডাকবো? না—একাই আমি ওকে আগলে বসে থাকবো।

[হঠাৎ সন্ধ্যার প্রবেশ]

সন্ধ্যা ॥ তাইত! ঠাকুরপো, অসময়ে একেবারে মেঘ করে এলো! নিমন্ত্রিতেরা আসবে কি করে বলত? আমি সব রান্না ঠিক করে রেখেছি। শুধু লুচিগুলো বেলে ভেজে দেবো।

সরল ॥ [ভয়ে ভয়ে] বৌদি—

সন্ধ্যা ॥ [কৌতুক করে] কি ঠাকুরপো, ভয় পেলে নাকি? মেঘের গর্জনে বুঝি বুক দুর্ দুর্ করে উঠল! পাগল ছেলে! ওত দিব্যি তোমার কোলে রয়েছে। কথাটি পর্যন্ত কইছে না। আমি ময়দায় জল দিয়ে এসেছি। চুপ চাপ ভাইপোকে নিয়ে খেলা দাও। লক্ষ্মিটি!

সরল ॥ শোনো—বৌদি শুনে যাও!

সন্ধ্যা ॥ না—না—আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাইনা। এক্ষুনি হয়ত গনেশের মারা এসে হাজির হবে—

[প্রস্থান]

[বেড়ালের ডাক শোনা গেল—সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ বজ্র পাতের শব্দ। খোকা আঁৎকে কেঁদে উঠল]

সরল ॥ না না...কাঁদেনা লক্ষ্মীটি! আমার কোলে রয়েছ ভয় কি! ও—ও—ও! চুমুখাবে না লজেন্স খাবে!

ধন ধন ধন!
বাড়ীতে ফুলেরি বন...
এধন যার ঘরে নাই কিসের তার জীবন...

[খোকার কান্না কিন্তু থামেনা...কাকার আদরে খোকা আরও চীৎকার করে কেঁদে উঠল। এমন সময় আতঙ্ক-গ্রস্থ হয়ে দেবল সেই ঘরে এসে ঢুকল]

দেবল ॥ একি ! খোকা এমন করে আঁ্যাৎকে উঠল কেন সরল ? ওকি সত্যি ভয় পেয়েছে ?

সরল ॥ বুঝতে পাচ্ছিনা দাদা ! আমার বুকের সঙ্গেই ত' মিশে ছিল চুপচাপ ! মনে হচ্ছিল ওর যেন কোন বলবার ক্ষমতা নেই। ওযে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠেছে···তাতে বুঝলাম খোকন আমাদের বেঁচেই আছে তাতেই ত' মনে সাহস পেলাম দাদা !

দেবল ॥ হ্যাঁ, খুব বেশী চুপ চাপ ভালো নয়...তাতে দম বন্ধ হয়ে আসে। নিজে বেঁচে আছি কিনা চিমটি কেটে জানতে ইচ্ছে করে। একলাটি বসে ছিলাম বাইরেব ঘরে। অন্ধকারের ভেতর মিশেই গিয়েছিলাম হয়ত। খোকার কান্নায় আবার সম্বিৎ ফিরে এলো। তাইত আবার ছুটে এলাম তোর কাছে।

সরল ॥ দাদা ! তুমি বড্ড বেশী ভয় পাচ্ছ কিন্তু। অমন করে কথা বল্লে সাহস পাবো কি করে বলত, খোকাকে আমি বুকে চেপে রয়েছি। মনে হচ্ছে, আরো যদি ওকে চেপে রাখতে পারতাম !

[এমনি সময় হঠাৎ একটা কাল প্যাঁচা ডেকে উঠল ! সঙ্গে সঙ্গে সেই ম্যাঁও—ম্যাঁও ডাক যেন এ ঘর থেকে ও ঘরে চলে গেল]

দেবল ॥ বেড়ালটার সঙ্গে অমন করে কে কাঁদেরে সরল ?

সরল ॥ ওটা বোধ করি কাল প্যাঁচার ডাক। অন্ধকারে ডানা ঝাপটাচ্ছে বৃষ্টি নেমে এলো বুঝি !

দেবল ॥ সার্সিগুলো বন্ধ করে দে ভাই ! খোকার হয়ত ঠাণ্ডা লাগবে...

[হঠাৎ খনখনে গলায় কে যেন হেসে উঠল...তারপর সার্সি বন্ধ করবারর শব্দ শোনা গেল]

সরল ॥ দাদা ! দাদা ! দেখছ।

দেবল ॥ কিরে সরল ? কি বলছিস ?

সরল ॥ সার্সিগুলো আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

দেবল ॥ আর ওই হাড় কাঁপানো হাসি ? কে অমন করে হাসে ? আমি আমার বন্দুক নিয়ে আসছি—

সরল ॥ না—না—দাদা ! যারা অমন করে হাসে তারা বন্দুকে ভয় পায়না। সে রাত্তিরের কথা কি তোমার মনে নেই ?

দেবল ॥ সেই রাত্তিরের কথা ? জীবনে কখনো কি ভুলতে পারবো ? তোর মনে আছে ভাই ?

সরল ॥ মনে থাকবে না ? শুধু যে মনে আছে তাই নয় প্রতি রাত্রে ঘুমের ভেতর আমি স্বপ্ন দেখি···সেই কাল রাত্রিকে !

এত স্পষ্ট দেখতে পাই যে, যতই দিন যাচ্ছে ততই সেই রাত্তির আমার মনে উজ্জল হয়ে উঠছে।. সেই কালো বেড়াল···অন্ধকারে জ্বলছে তার চোখ···পিঠের ওপর পাটকিলে রঙের দাগ !

দেবল ॥ আজও দেখলি তুই সেই বেড়ালটাকে ?

সরল ॥ নিজের চোখের ওপর দেখলুম দাদা। কেমন করে অবিশ্বাস করে তাকে উড়িয়ে দেবো ?

দেবল ॥ কিন্তু কি করে তা সম্ভব হল সরল ? সে আজ দশ বছরের কথা। এই দশ বছর বাদে কি করে ফিরে এলো ঐ অশুভ কালো বেড়াল ? আর ফিরে এলো আজকের এই শুভ দিনে ? সেই রাত—

সবল ॥ হ্যাঁ দাদা, সেই রাত ! স্পষ্ট আমার চোখে আজও যেন সিনেমার মত ভাসছে। সাতদিন থেকে মার কঠিন অসুখ। গ্রামের কবিরাজ যখন জবাব দিয়ে বলে গেল...তুমি উন্মাদের মতো ছুটে গেলে সহরে। সন্ধ্যের আগেই ফিরে এলে এই বাড়ীতে...সঙ্গে এল পাশকরা ডাক্তার।

দেবল ॥ হ্যাঁ, ডাক্তার আমায় আশ্বাস দিয়ে বল্লে, কোন ভয় নেই। মাকে সে ভালো করে দেবে। সে

বিশ্রাম নিলে না। এসেই মাকে একটা ইন্‌জেক্‌সন দিলে।

সরল ॥ পরিষ্কার মনে আছে আমার। এতক্ষণ মায়ের জ্ঞান ছিল। সবাইকে কাছে ডেকে কথা বল্‌ছিল। কিছুক্ষণ আগেই মা আমার চোখ মুছিয়ে দিয়েই বলেছিল —ছিঃ কাঁদিস্‌নে! আমি ভাল হয়ে যাবো।

দেবল ॥ তারপর?

সরল ॥ ডাক্তার ইনজেক্‌সন দেবার পর থেকেই মায়ের কথা গেল বন্ধ হয়ে। মা পাগলের মতো এদিক ওদিক তাকাতে লাগ্‌ল।

দেবল ॥ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। একটা দারুণ অস্থিরতা। বালিশের এ পাশ ওপাশ মার মাথা দুল্‌ছিল—ঠিক ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো।

সরল ॥ ঠিক এমনি সময় অন্ধকার জানালার ভেতর দিয়ে মুখ গলিয়ে এই কালো বেড়ালটা ডেকে উঠ্‌ল ম্যাঁ-ও···।ঘর শুদ্ধু লোক ফিস্‌ ফিস্‌ করে বল্লে,' ওটা অশুভ। ওটাকে তাড়িয়ে দেত সরল! আমি লাঠি নিয়ে বেড়ালটাকে তাড়িয়ে দিতে গেলাম। বেড়ালটা ফ্যাঁ—স্‌ করে আমায় আঁচড়ে দিলে। আজও আমার পায়ে দাগ রয়েছে, এই ভাখো—

দেবল ॥ তা'ইত রে কোনো দিন ত' আমায় বলিস্‌ নি!

সরল ॥ বল্‌তামও না হয়ত! কিন্তু আজ···খোকার জন্মদিনে নতুন করে মনে পড়ে গেল।

দেবল ॥ তারপর থেকে সব ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। রাত গভীর হতে লাগ্‌ল...বেড়ালটা এঘর ওঘর ডেকে বেড়াতে লাগ্‌ল...আর সঙ্গে সঙ্গে মায়ের অস্থিরতা ক্রমশঃ বেড়ে যেতে লাগ্‌ল। আমার কেবলি মনে হতে লাগ্‌লো, ঐ বেড়ালটা বেঁচে থাক্‌লে কিছুতেই আমার মাকে বাঁচানো যাবে না! আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম—

সরল ॥ আমি দেখলাম,—তুমি আস্তে আস্তে বাইরে চলে গেলে ..আমি তোমার পেছনে পেছনে গেলাম। ক্ষীণ চাঁদের আলোতে স্পষ্ট দেখতে পেলাম—বাবার লাঠিটা তুমি বারান্দা থেকে তুলে নিলে। বেড়ালটা বোধ করি নিজের বিপদ বুঝতে পেরেছিল...তাড়াতাড়ি গিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করলে।

দেবল ॥ কিন্তু আমার মাথায় তখন খুন চেপে গিয়েছিল। অন্য সময় হলে কি করতাম জানিনা···সেদিন মরিয়া হয়ে ছুটলাম তার পেছু পেছু···

সরল ॥ আমি ও দাদা...আমিও। বয়স তখন কম, কিন্তু পায়ে যেন কেমন জোর গেলাম। মনে হল তোমার সঙ্গে না থাক্‌লে আমার চলবে না। আগে আগে চলেছে বেড়ালটা...অন্ধকারে তার চোখ দুটো জ্বলছে···পেছনে লাঠি নিয়ে তুমি··· আর তার পেছনে রয়েছি আমি। পা দুটো কাঁটা গাছে ছড়ে গেল তবু ছুটোছুটির বিশ্রাম নেই!

দেবল ॥ হ্যাঁ শেষ কালে লাঠিটা ছুড়ে মারলাম বিড়ালটা লক্ষ্য করে।

সরল ॥ সঙ্গে সঙ্গে—মানুষের মতো একটা তীব্র আর্তনাদ করে কালো বেড়ালটা সেই যে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল আর উঠল না।

দেবল ॥ তখন তুই এসে আমার পাশে দাঁড়ালি। এতক্ষণ কিন্তু তোকে আমি লক্ষ্যই করিনি।

সরল ॥ তুমি আমায় দেখে চম্‌কে উঠলে! তারপর বল্লে, বেড়ালটা কি সত্যি মরে গেছে সরল? আমি মাথা নেড়ে জবাব দিলাম, হুঁ!

দেবল॥ আমি তখন তোকে বল্লাম, শিগ্‌গীর কোদালটা নিয়ে...আয়। কেউ দেখার আগে বাগানে ওটাকে পুতে ফেল্‌তে হবে। আমার তখন কেবলি যেন মনে হচ্ছিল যে, বেড়ালটাকে মেরে ফেলাই যথেষ্ট নয়,—

ওকে চোখের আড়াল না করতে পারলে মাকে কিছুতেই বাঁচানো যাবে না।

সরল ॥ তক্ষুনি ভারী কোদালটাকে আমি গিয়ে নিয়ে এলাম। তুমি চাঁদের আলোয় খুড়লে এক গর্ত।

দেবল ॥ দু'জনে মরা বেড়ালটাকে মাটি চাপা দিয়ে ফিরে এলাম মার ঘরে।

সরল ॥ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সুরু হল—ঝড় আর মুষল ধারে বৃষ্টি।

দেবল ॥ আর সেই সাথে থেকে থেকে বাজ পড়ার শব্দ। মা একেবারে অসাড় হয়ে পড়ল · তারপর ভোর হবার কিছু আগে নিভে যাওয়া প্রদীপের মতোই আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল।

[দেবলের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাতাসের শো-শো আওয়াজ আর বজ্র পতনের শব্দ দু'জনকে সচকিত করে তুলে। সরলের কোলে খোকন মণি হয়ত ঘুমিয়েই পড়েছিল। হঠাৎ সে আবার আর্তনাদ করে কেঁদে উঠল]

দেবল ॥ তাইত! মায়ের শেষ রাত্তিরের কথা ভাবতে গিয়ে আমরা খোকনকে একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। মাকে আমরা তা নয় হারিয়েছি কিন্তু ওকে ত আমরা হারাতে পারবো না।

সরল ॥ কি যা-তা তুমি বলছ দাদা। খোকনকে আমরা হারাবো কেন? ওসব আজে-বাজে কথা মন থেকে তুলে মুছে ফেল। বৃষ্টি শুরু হয়েছে তাই বুঝি ওরা এখনো এসে পৌঁছুতে পারেনি—

[হঠাৎ ডানা মট মটের আওয়াজ শোনা গেল]

দেবল ॥ ওটা ওটা কি? দেয়ালের গায়ে কালো ছায়া ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সরল ॥ আমি বৌদিকে ডাকি, ডেকে সব কথা বলি—

দেবল ॥ না—না—ওকে নয়···ওকে নয়! ও জানে না···তাইত' হাসি খুশীতে মেতে আছে। ওকে ওর নিজের আনন্দ নিয়ে থাকতে দে ভাই! এবিষ আমরা দুটিতে আকণ্ঠ পান করেছি। আমরাই শেষ পর্যন্ত সেই বিষের জ্বালায় জ্বলবো···

সরল ॥ তুমিই বা বিষের কথা তুলছ কেন দাদা? আজ আমাদের মিষ্টি খাবার দিন···বিষ খেতে আমাদের বয়েই-গেছে। কি বলিস্ খোকনমণি? তোর মা ঐ ঘরে গরম লুচি ভাজছে···নাকে তার গন্ধ পাচ্ছিস্ নে বুঝি?

দেবল ॥ তোর বুঝি খুব খিদে পেয়েছে সরল? যা তোর বৌদির কাছ থেকে চেয়ে খান কতক খেয়ে আয়। লোক জন এসে পড়লে তখন ত আর খেতে পাবি নে! সব কিছু চুকতে রাত হয়ে যাবে অনেক···

সরল ॥ তুমি বেশ লোক দাদা! তাই বলে আমি লোভীর মতো আগে থেকেই খেয়ে বসে থাকবো? সেটি হচ্ছেনা! এমনিই ত' বৌদি আমায় খোকনের জন্যে খেল্না কিনতে দিলে না···

[হঠাৎ বেড়ালটা ডেকে উঠল ম্যাঁও···। দরজা জানালায় একটা ঝন্ঝনে বাতাসের শো-শো শব্দ এবং বজ্রপাত]

দেবল ॥ ওকী চায় আমাদের কাছে বলতে পারিস? দশ বছর আগে ওর মাথায় লাঠি ছুড়ে মেরেছিলাম আজ রাত্তিরে আমি ওকে কোলে তুলে নিচ্ছি। বিশ্রী আওয়াজ বন্ধ রেখে...ঐ অশুভের দেবতা আমার মানুষের ভাষায় বলুক কী ও চায়···। দরকার হলে আমি আমার বুক চিরে রক্ত দেবো···

[পাশের ঘরে কয়েক জনের পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল]

সরল ॥ দাদা! তুমি বড্ড বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েছ। তুমি পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছ না? বোধ করি এরই মধ্যে কেউ কেউ এসে বস্‌বার ঘরে হাজির হয়েছেন।

বিজয়া দাস, বি-এ —

রারা ফিল্ম কর্পোরেশনের
ীয়মান বাংলা চিত্র 'সন্ধ্যা'য়
ভিনয় করছেন——————।

[সন্ধ্যার প্রবেশ]

সন্ধ্যা ॥ যাক্! লুচিভাজা সব শেষ করে এলাম। বাইরের ঘরে কাদের যেন সাড়াও পাওয়া গেল। তোমরা এইবার গিয়ে ওদের বসাও।

সরল ॥ সেই ভালো বৌদি! তুমি খোকনকে নাও... আমরা দেখছি...

সন্ধ্যা ॥ আসল কথা বলনা কেন ঠাকুরপো যে, সেই সন্ধ্যে থেকে খোকাকে বয়ে বয়ে তোমার হাতে ব্যথা ধরে গেছে!

সরল ॥ বেশ, হয়েছে ত' হয়েছে। তুমি ওকে ভালো করে কোলে নিয়ে বোসো বৌদি। আজকের সন্ধ্যায় কিছুতেই খোকনমণিকে কোল ছাড়া কোরো না এই আমার বিশেষ অনুরোধ।

সন্ধ্যা ॥ [খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে] তুমিও তোমার দাদার মতো পাগল হয়ে উঠলে নাকি! আচ্ছা দু'ভাই জুটেছো যা' হোক!

দেবল ॥ না—না—ঠাট্টা নয় সন্ধ্যা! সরল তোমায় যা বল্লে আজ সন্ধ্যায় আমারও তাই অনুরোধ।

সন্ধ্যা ॥ আচ্ছা, তোমাদের দু'জনের অনুরোধই আমি মাথায় করে রাখলাম। ওদিকে যাঁরা এসেছেন তাঁরা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয়ত হাঁফিয়ে উঠেছেন।

দেবল ॥ অন্ধকারে! তুমি বলছ কি সন্ধ্যা! বাইরের ঘরে যে আমি আলো জেলে রেখে এলাম।

সন্ধ্যা ॥ কিন্তু রান্না ঘর থেকে আসবার সময় সে ঘর যে একেবারে অন্ধকার দেখলাম। [লোক জনের পায়ের শব্দ] ঐ যে! শুনতে পাচ্ছনা? তোমরা দুটি ভাই মিলে কি সবাইকে ফিরিয়ে দেবে নাকি? আমি সারা দিন ধরে এত এত রান্না করেছি।

সরল ॥ না—না আমরা গিয়ে ওদের বসাই—চল দাদা! মনকে পরিষ্কার করো—

দেবল ॥ চল ভাই চল। আমার মনে আর কোনো দ্বিধা নেই—

[উভয়ের প্রস্থান]

[সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের তাণ্ডব বেগ বেড়ে উঠল বজ্রপাতের শব্দ ও থেকে থেকে]

সন্ধ্যা ॥ তাইত! আবার ঝড়টা যে বেড়ে উঠল। সব খাবারই এ ঘরে নিয়ে আসা হয়েছে। বাকি রইল লুচির ঝুড়ি। বৃষ্টিটা নেমে আসবার আগে ওটা চটপট নিয়ে আসি—

[খোকা কেঁদে উঠল]

সন্ধ্যা ॥ কাঁদেনা খোকনমণি—আমি তোমায় দোল্‌নায় শুইয়ে দিয়ে যাচ্ছি। কেমন সুন্দর দোল খাবে তুমি—দোল্—দোল্—দোল। [হাততালি দিয়ে] বাঃ কি মজা! [খোকাও খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল] লক্ষ্মিটি! আমি এইবার একটা চুমো খেয়ে যাই। তারপর কত লোক আজ তোমায় চুমু খাবে।...চুপচাপ শুয়ে থাকো। আমি যাবো আর আসবো... [প্রস্থান]

[এমন সময় ম্যাঁ ও ম্যাঁও বিড়ালের ডাক শোনা গেল। হঠাৎ একটা বজ্র পতনের শব্দ তার পরই খোকা তীব্র চীৎকার করে দোল্‌না থেকে মেঝেতে পড়ে গেল]

দেবল ও সরল ॥ খোকনের গলার শব্দ! খোকনমণি, খোকন মণি!

সরল ॥ একি দাদা! ঘর যে একেবারে অন্ধকার!

দেবল ॥ তাইত! সন্ধ্যা গেল কোথায়? সন্ধ্যা সন্ধ্যা—

সন্ধ্যা ॥ এই যে আমি এসে পড়েছি। কিন্তু তোমরা ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়েছ কেন?

দেবল ॥ ঘরের আলো আমরা নেভাইনি—তুমি কোথায় আলো নিয়ে চলে গেছ তাই দেখ! শিগগির একটা আলো নিয়ে এসো! খোকা যে একবার চীৎকার করেই একেবারে চুপ করে গেল।

সন্ধ্যা ॥ অ্যাঁ! তুমি বলছ কি? আমি আলো নিয়ে আসছি—

সরল ॥ আলো!—কিন্তু [আর্তনাদ করে] বৌদি! আলো না নিয়ে এলেই তুমি ভালো করতে! এ আর আমাদের চোখে দেখতে হত না!

সন্ধ্যা ॥ একি! রক্ত! খোকা মেঝেতে লুটিয়ে! দোলনার দড়ি কে কেটে দিলে? খোকা—খোকা—

দেবল ॥ চুপ! চুপ! এখনো জ্ঞান আছে—তুমি ওকে বুকে তুলে নাও সন্ধ্যা—আমি দেখি যদি একটা ডাক্তার আনতে পারি—

সরল ॥ ডাক্তার! [পাগলের মতো অট্টহাস্য করে উঠল] সে রাত্রেও তুমি ডাক্তার এনে মাকে ধরে রাখতে পারোনি! আজও কি পারবে খোকনকে রাখতে?

সন্ধ্যা ॥ এ-কথা তুমি বলছ কেন ঠাকুরপো! তোমরা যেন কি আমার কাছ থেকে লুকোচ্ছ—! বল খুলে বল—কী তোমরা আমার কাছ থেকে গোপন করে রাখতে চাও—

দেবল ॥ সরল কিছুই গোপন করে রাখতে চায়নি—ও বারে বারেই তোমায় বলতে চেয়েছে—আমিই বারেবারে ওকে থামিয়ে দিয়েছি! কিন্তু একটা কথা ত' আমরা গোপন করিনি সন্ধ্যা! আমরা বলেছি—ওকে আজ রাত্তিরে কোনো মতেই কোল ছাড়া কোরোনা—তোমার বুকে কী এতটুকু ঠাঁই হল না সন্ধ্যা? বুকে ঠাঁই পেলে না—তাই বুঝি অসীম অন্ধকারে ও মিলিয়ে গেল—আমার অদৃষ্ট!—আমার অদৃষ্ট।

সন্ধ্যা ॥ খোকা—খোকা! আমার খোকামণি! তোর যে আজ মুখে ভাত খোকামণি—

[মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। একটা করুণ সুরের মূর্চ্ছনা কেঁপে কেঁপে দূরে মিলিয়ে গেল। সেই সঙ্গে বেড়ালের অশুভ চীৎকার—ম্যাঁও!]

শ্রীকমলকৃষ্ণ দে (চক্রবেড়িয়া রোড, সাউথ)

(১) সবাক যুগে বাংলার শ্রেষ্ঠতম চরিত্রাভিনেতা দুর্গাদাস ব্যানার্জির প্রথম ছবির নাম কি ? কে উহা পরিচালনা করেন ? কোন প্রতিষ্ঠান থেকে চিত্রখানি নির্মিত হয় ?

(২) অভিষেক নামে যে নাটকটী রঙমহলে অভিনীত হইয়াছিল উহার পরিচালক কে ?

(৩) ছদ্মবেশী চিত্রে ছবি বিশ্বাস যে চরিত্রটীর রূপ দিয়েছেন সেই চরিত্রটাকে P. W. D. নাটকে দুর্গাদাসকে স্মরণ করিয়ে দেয় না ?

: (১) নিউথিয়েটার্সের দেনা পাওনায় প্রথম তিনি অভিনয় করেন সবাক চিত্রে।

(২) শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র অভিষেক নাটক পরিচালনা করেন।

(৩) দুটী চরিত্রের মূলগত পার্থক্য যথেষ্ট।

শ্রীমদন মোহন লাহা (বাদুর বাগান লেন)

বাংলার চিত্রজগতে আপনার মতে সুন্দরী অভিনেত্রী কে ?

: ঠিক সুন্দরী বলতে যা বোঝায় বর্তমানে বাংলার চিত্রজগতে একজন অভিনেত্রীও এই বিশেষণ লাভের যোগ্য নন।

শ্রীহরিপদ পাল (চন্দননগর, চুঁচুড়া)

(১) কিছুকাল পূর্বে Cinema Times নামক পত্রিকায় দেখেছিলাম যে পলমুনি এবং বেটী ডেভিসকে যথাক্রমে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং অভিনেত্রী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমার বক্তব্য—এঁরা কি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং অভিনেত্রী বলে সর্বজন স্বীকৃত ? কেবলমাত্র ইংরাজী চিত্রে অভিনয় করা সত্বেও ভারতীয় চিত্রজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং অভিনেত্রীর তুলনায় এঁরা কি কি গুণে বা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা যায় কি ? আমি সম্পূর্ণভাবে ইহা অস্বীকার করি এবং প্রতিবাদ জানাই। অবশ্য এটা ঠিক যে আমার স্বীকার বা অস্বীকারে কিছু এসে যায় না কিন্তু বিনা প্রমাণে এবং তুলনায় উৎকর্ষতা না দেখিয়ে কাকেও কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা যায় কি ?

(২) ভারতীয় চিত্রজগতের অভিনেতাদের মধ্যে চন্দ্রমোহনকে অনেকে সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা মনে করেন কিন্তু আমার বক্তব্য ইনি মাত্র হিন্দি চিত্রেই অভিনয় করে থাকেন এবং যতদূর তাঁর অভিনয়ের সমালোচনা পড়েছি এবং অভিনয় দেখেছি তাতে তাঁকে ভারতীয় চিত্র জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলে অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করা যায় না। অপরপক্ষে বাঙলা ও বাঙালীর সর্বজন পরিচিত এবং প্রিয় অহীন্দ্র চৌধুরী ও ছবি বিশ্বাসকে তাঁদের প্রতি অভিনয়ে উৎকর্ষতা দেখান সত্বেও এদেরকে বিশেষতঃ অহীন্দ্রবাবুকে ভারতীয় চিত্রজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলে কেন স্বীকার করা হয় না তা আমার সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা কঠিন। এঁরা দুজনেই কলিকাতাস্থিত বিভিন্ন রংগমঞ্চে অভিনয় করে থাকেন নিয়মিত। অহীন্দ্রবাবু হিন্দি চিত্রেও অভিনয় করেন এবং প্রত্যেক অভিনয়ই অপূর্ব হয়। ছবিবাবু হিন্দি চিত্রে কখনও অভিনয় করেছেন কিনা ঠিক জানি না।

'সন্ধ্যা' চিত্রে অহীন্দ্র ও বিজয়া

সর্বসাকুল্যে এঁদের, চন্দ্রমোহনের অপেক্ষা অভিনয়ে অধিক পারদর্শিতা দেখান সত্বেও কেন শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের রূপে স্বীকার করা হয় না ?

(৩). প্রত্যেক বৎসরান্তে ভারতীয় ছায়াছবির গুণানুযায়ী পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। আমার বক্তব্য এবার হচ্ছে এর সংগে কলিকাতার সব রংগালয়গুলি কর্তৃক বৎসরের অভিনীত প্রত্যেক নাটকের মধ্যে কোন নাটকটা রচনায় এবং অভিনয়ের দিক হতে শ্রেষ্ঠ হয়েছে অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের মধ্যে কার অভিনয় শ্রেষ্ঠ হয়েছে প্রভৃতি নির্ণয় করে গুণানুযায়ী পদক বা প্রশংসা-পত্র এবং আগত বৎসরের জন্য উৎসাহ দেওয়া উচিত।

(১) আপনার অভিযোগ নেহাৎ অমূলক নয়। কিন্তু ভাষার বিভিন্নতাই অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রতিভা নির্ণয়ের পরিপন্থি হয়ে দাঁড়ায় না। যেমন ধরুন কোন অভিনেত্রী মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। প্রত্যেক দেশের মায়ের অনুভূতি যে এক তাতে ত কোন সন্দেহ নেই। এখন এই মাতৃত্ব কে কতটা ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হলেন সেই টাই বিবেচ্য।

(২) দুই নম্বর প্রশ্নে চন্দ্রমোহন অপেক্ষা অহীন্দ্র চৌধুরী এবং ছবি বিশ্বাসকেই আমি উচ্চে স্থান দেবো। চন্দ্রমোহনের অভিনয় এদের তুলনায় যে নিকৃষ্ট একথা আপনার আমার মত অনেকেই স্বীকার করবেন।

(৩) মঞ্চের নাটক ও শিল্পীদের গুণাগুণ বিচার করে পুরস্কার বিতরণ করবার উদ্যোগ চলছে। তবে বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংঘ তা করতে পারেন না। তাদের উদ্দেশ্য শুধু চলচ্চিত্রকে নিয়েই।

হরিদাস মুখার্জি (রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, কালীঘাট)

(১) যেমন গল্প তেমনি তার অভিনয়। দেখতে গিয়ে মনে হয় শেষ হলে বাঁচি। আমি বিদেশিনীর কথাই বলছি। যাকে আপনারা এই সনের একখানা অপ্রতিদ্বন্দ্বী বই বলে ঠিক করেছেন আবার বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছে পাঁচজনকে দেখাইবার মত ও দেখিবার মত ছবি। বলতে পারেন বিদেশিনীর এমন কি অভিনয় নৈপুণ্য আছে অথবা এমন কি বিশেষত্ব আছে যার জন্য আপনারা প্রশংসায় পঞ্চমুখ ? আমরাও ভাবতে পারিনি যে বিদেশিনী আমাদের এতখানি হতাশ করবে। আমার মনে হয় যারা এই বই খানা একবার দেখবেন তারা লোকে যাতে এই বই খানি না দেখেন তারই উপদেশ দেবেন। এই রকম বই তোলার কি দরকার। আর কি ভাল লেখা তারা পান না!— Photograhy ও খারাপ। কানন দেবীকে এক এক জায়গায় এমন ভাবে 'dialogue' করা হ'য়েছে যে সেখানে চোখ বন্ধ করতে হয়।

: বিদেশিনী সম্পর্কে আমাদের এই সংখ্যার সমালোচনার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিদেশিনী সম্পর্কে আমাদের মতামত ওয়ই ভিতব ফুটে উঠেছে। তবে আপনাদের মত দর্শকদেষ কোন চিত্র সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করবার ক্ষমতা আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করি। সত্যিকারের দর্শকের ক্ষমতা অর্জন করুন। পরে সমালোচনা বা মতামত প্রকাশ করবেন। চিত্র গ্রহনেব সমালোচনা কবতে যেয়ে আপনি বলেছেন কানন দেবীকে 'dialogue করা হয়েছে। Dialogue শব্দের অর্থও কি আপনার কাছে বোধগম্য নয়? Dialogue অর্থ সংলাপ। কতগুলো শব্দ শুনেছেন অথচ তার অর্থ শেখেননি, এরই দাবী নিয়ে এসেছেন অন্যকে সমালোচনা করতে, আশা করি নিজের এই দুর্বলতা শুধরে নিয়ে সত্যিকারের দর্শকের ক্ষমতা অর্জন করে অন্যকে সমালোচনা করবেন।
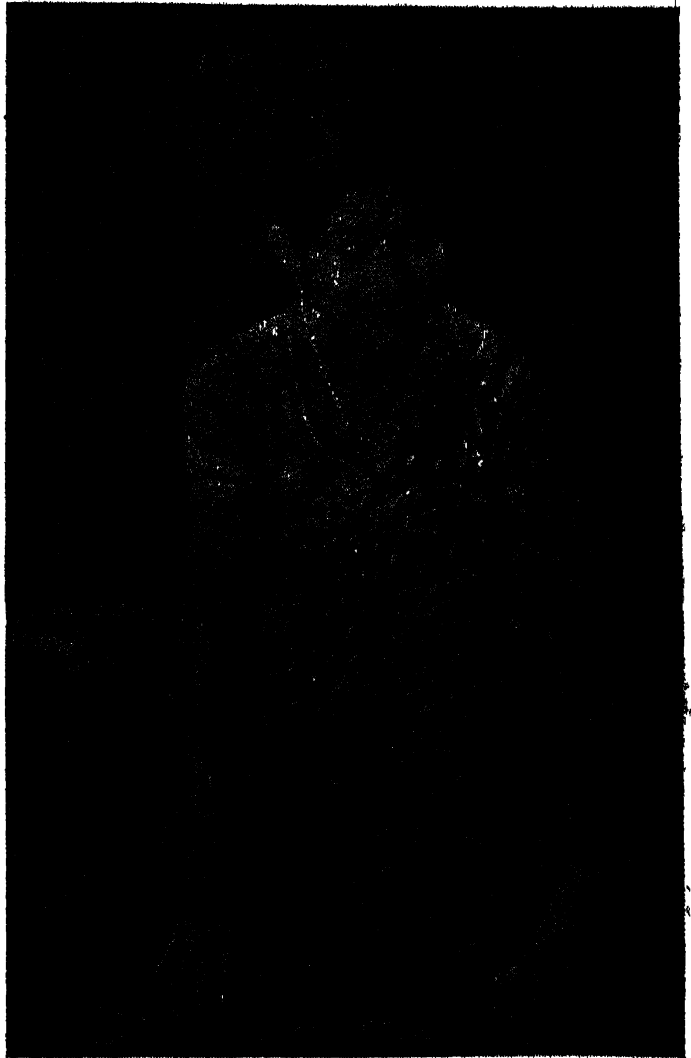
'প্রতিকারে' নবাগতা বরুণা

ধীরেন্দ্রনাথ হালদার (কালবৈশাখী, নদীয়া)

(১) ফিল্মে পদ্মাদেবী কি নিজেই গান গেয়ে থাকেন? (২) এ-সংবাদ কি সত্য যে পঙ্কজ বাবু তার স্ত্রী বিয়োগের সময় 'ও কেন গেল চলে' গানটি গান। তিনি কি আর ফিল্মে অভিনয় করবেন না। (৩) আপনাদের পত্রিকা সুবৃহৎ একটা প্রতিযোগিতা আহ্বান করতে চাই। আপনার মত কি?

নায়াকতে 'জগদীশ'
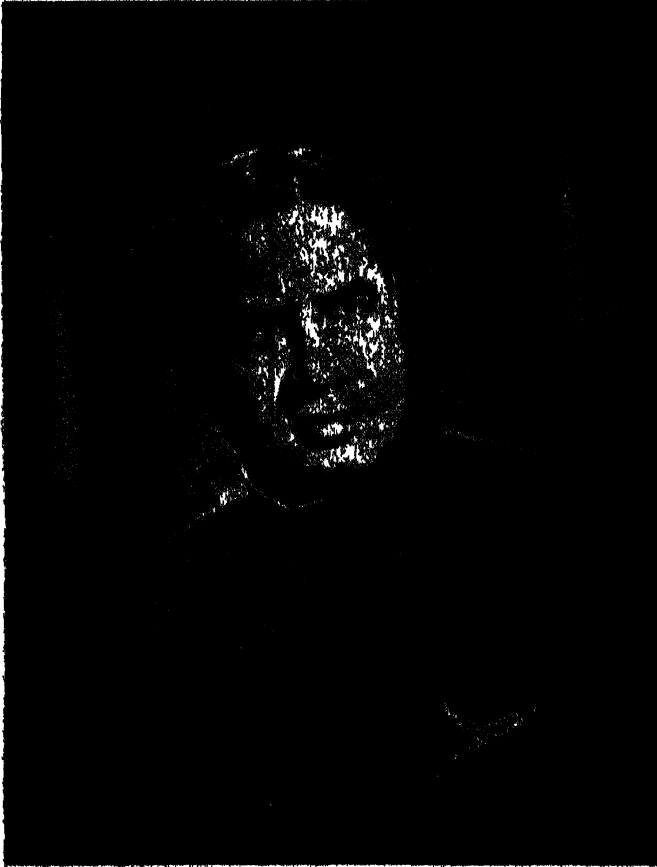
: হ্যাঁ। যদি কেউ বা না পেয়েও থাকেন সে বিষয়ে কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করা উচিত নয়। (২) বেচারাকে এরূপ ভাগ্যহীন মনে করবার আপনার কী কারণ থাকতে পারে? পর্দার অবতার পঙ্কজ বাবু স্ত্রী হারিয়েছেন তার আঘাত এখনও সামলে উঠতে পারেন নি। তাই বলে পর্দায় নামবেন না এমন কোন প্রতিজ্ঞা করে বসেন নি। (৩) কোন অমত নেই।

মিস এস, সরকার (W A C (1) NO. 2157 Azamgarh) শ্রীমতী কাননের সামাজিক মর্যাদা কী? পিতার নাম কী? তার কী কোন জীবনী প্রকাশিত হয়েছে?

: ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীযুক্ত অশোক মৈত্রের স্ত্রী। শিল্পী কানন আমাদের পরিচিতা তাই তার জনক জননী রূপে ভারতীয় চিত্রকলাই দাবী করতে পারে। না।

কৃষ্ণপদ বিশ্বাস (লক্ষ্মীপুর, ফরিদপুর)

ছবি, ধীরাজ, জহর সুনন্দা, ছায়াদেবী ও সন্ধ্যারাণী বিবাহিতা কিনা। সুনন্দা দেবী বর্ত্তমানে কোন ছবিতে নামিতেছেন?

: সন্ধ্যারাণী ব্যতীত সবাই বিবাহিতা। দুই পুরুষে সুনন্দাকে দেখতে পাবেন। কল্যাণীর ভূমিকার তিনি অভিনয় করছেন।

রাধাগোপাল দাস (বেলেঘাটা)

বহুদিন যাবৎ বিশিষ্ট গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে কে কোন ছবিতে দেখিনা কেন? তিনি কি ছায়া জগৎ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন?

: শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে বর্ত্তমানে বোম্বাইতে আছেন। অরোরা প্রোডাকসন্সের এসোসিয়েটেড প্রডিউসার হ'য়ে

চঞ্চলা কমলা চ্যাটার্জি

'Suno Sunata Hoon' নামে একখানি চিত্র প্রস্তুত করছেন। চিত্র খানি নাকি সংগীত মুখর হবে। এছাড়া বম্বেতে আরও ১১ খানা হিন্দি চিত্রে অভিনয়ও করছেন।

শ্রীমতী মলয় গুপ্তা (হরি ঘোষ ষ্ট্রীট)

আমি আপনাদের পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠিকা। তাই পাঠিকা হিসাবে আপনার নিকটে একটী প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইতেছি, অপ্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্রাভিনেতা স্বর্গীয় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনী প্রকাশিত হইবে বলিয়া আমাদের জানাইয়াছিলেন, কিন্তু অদ্যাবধি তাহা প্রকাশিত হয় নাই। হয়তো, কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার দরুণ অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ তার জীবনী প্রকাশিত করিতে পারেন নাই। এদিকে দেখিতে দেখিতে বৎসর ঘুরিয়া গেল, শিল্পীর তিরোভাব দিবস প্রায় সমাগত। আমার প্রস্তাব হইতেছে যে, দুর্গাদাসের মৃত্যু বার্ষিকীতে তাঁর জীবনী প্রকাশ করুন। বলা বাহুল্য মঞ্চও সিনেমার স্রষ্টা ও দ্রষ্টা মহল থেকে তাঁর প্রতিশ্রদ্ধা জানানো এবং তাঁর অবিশ্রান্ত দানকে স্মরণ করা কর্ত্তব্যের মধ্যে পড়ে, তাঁর প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর দান এই সামান্য কালের ব্যবধানে এখনও আমাদের সকলের নিকট অতীতের বিষয় হ'য়ে পড়েনি। তাই আমাদের কাছেই দিনটা স্মরণীয়। জীবনী প্রকাশ করে শিল্পীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে যেমন আপনাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি উৎসর্গীকৃত হবে, সেইরূপ তাঁর জীবনী পাঠের মধ্য দিয়ে আমাদেরও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে। আপনারা হয়তো বলবেন কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য ইহা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হবে না। আমি বলিকি 'রূপমঞ্চে'র নিয়মিত সংখ্যার যে কোন একটা সংখ্যাকে বরং 'দুর্গাদাস সংখ্যা' নাম দিয়া তাঁর জীবনী প্রকাশিত করুননা কেন? যেমন 'অজয় সংখ্যা' প্রকাশিত হয়েছিল; তাতে সবদিকই রক্ষা পাবে। আমরা আশা করি, তাঁর সুদীর্ঘকালের কলালক্ষীর সেবার কথা স্মরণ করে আপনারা তাঁর জীবনী আষাঢ় মাসে প্রকাশ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও চেষ্টা থাকলে ঐ সংখ্যা বাহির হতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। নমস্কার জানবেন।

: আগামী আষাঢ় মাসে জনপ্রিয় শিল্পীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা পুস্তকাকারে 'দুর্গাদাস' প্রকাশ করার আয়োজন করেছি।

ডি. কে. ভাওয়াল (ডাক হোষ্টেল)

আপনি উপযুক্ত ছেলেকে সিনেমাতে অভিনয় করতে সাহায্য করেন জানতে পেরে আমি এই পত্র খানা লিখছি।

পত্রিকায় অভিনেতা চায় বলে একটা বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন করেছিলাম। দেখা করবার জন্যে উত্তর এসেছিল। Production manager এর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা হবার পর আমাকে প্রশ্ন করেছিল আমি গান জানি কিনা। আমি গান জানিনা বললাম। এর পর তিনি আমাকে

বললেন তুমি এখন যাও কিছুদিন পর তোমাকে খবর দেওয়া হবে। খুব সম্ভবত তোমাকে side acting এর জন্য নেওয়া হবে। আজ পর্য্যন্ত তার কোন খবর নেই। গান জানিনে বলে এই অবস্থা। কোম্পানিটি হচ্ছে New Century Production.

আমি নিজের সম্বন্ধে গর্ব্ব করব না। কারণ ইহা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। তবে আপনার জানা প্রয়োজন বলে লিখছি। আমার চেহারা average এর চেয়ে ভাল তবে খুব সুন্দর নয়। গান জানিনা। থিয়েটার অনেক করেছি তবে দুবছরের মধ্যে আর করবার সৌভাগ্য হয় নি। লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানিনা। এবার Presidency College হতে I. sc. পরীক্ষা দিয়েছি। আমার উচ্চতা 5 ft 6 In এবং বয়স ১৭ বৎসর।

: Production-Manager কথাটা গালভরা শুনতে এবং অন্যান্য শ্রেণী এর সার্থকতাও যথেষ্ট রয়েছে—আমাদের এখানে যাঁরা এই পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত তাঁরা 'নেপি ছেপি' দলেরই তাই তাদের বুদ্ধি বিবেচনার কথা চিন্তা করে আমাদের কোন অভিযোগ থাকে না। এরূপ একজন লোকের কাছ থেকে যখন ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছেন—তাতে দুঃখ করবার কিছু নেই। চিত্রে অভিনয় করতে চান ভাল কথা—কিন্তু আমার মতে লেখা পড়া শেষ করে এদিকে আসাই ভাল। তবু আপনার চিঠি খানা অপরের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রকাশ করলাম।

(New Century'র Production Manager এর সংগে আলাপ করে আমি প্রীত হ'য়েছি, তিনি বল্লেন উপযুক্ততার বিচারে আপনি নির্বাচিত হননি—এ অবস্থায় আর কী বলবার আছে বলুন ?)

শঙ্কর কুমার দাস (বেলেঘাটা)

(১) অহীন্দ্র, শিশির তিনকড়ি এদের শ্রেষ্ঠ অভিনীত চিত্র কি কি ?

(২) সর্ব্ব প্রথম যে বাংলা ছবি গৃহীত হয় তার নাম কি ?

(৩) অসীত ও রবীন এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গায়ক কে ?

: (১) অহীন্দ্র—রূপলেখা, শিশির—দত্তর মত টকী, তিনকড়ি—বাংলার মেয়ে।

(২) একবার উত্তর দেওয়া হ'য়েছে।

(৩) দুজনেই সমপর্যায় তবে গলার দিক থেকে রবীন আমার বেশী প্রিয়।

মিস রমাদাস (বেলেঘাটা)

(১) বর্ত্তমানে বাংলা ছবিতে শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী নৃত্য-শিল্পী (মেয়ে) ও গায়িকা কে ?

(২) সন্ধ্যারাণীর প্রথম বাংলা ছবি কোনটি তাকে আমরা আর বাংলা ছবিতে কেন দেখি না ? তার নূতন বই কি ?

(৩) কানন দেবীর বয়স কত ?

: (১) অভিনেত্রী - চন্দ্রাবতী, নৃত্যশিল্পী—বাঙ্গালী হ'লে সাধনা বসু, তবে তিনি এখন বাংলার বাইরে তাই বাংলা চিত্রজগতে বর্ত্তমানে কোন সত্যকারের নৃত্যশিল্পী নেই। গায়িকা—কানন দেবী।

(২) বাংলার মেয়েতেই সন্ধ্যারাণী অভিনেত্রী হবার সুযোগ পান। এর পূর্বে ১।১ বার Side role এ অভিনয় করেছেন। কিছুদিন তিনি অসুস্থ ছিলেন। সম্ভবতঃ এস, ডি, প্রোডাকসন্সের আগামী চিত্রে অভিনয় করবেন। চিত্রখানি পরিচালনা করবেন—চিত্ত বসু সমাধানে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহকারী রূপে কাজ করেছিলেন।

(৩) যে পরিচালকের অধীনে তিনি কাজ করেন তিনিই বয়সের পরিমাপ করতে পারেন।

সুবোধচন্দ্র পাল (হুগলী)

(১) অহীন্দ্র চৌধুরী সর্ব্বপ্রথম কোন চিত্রে অভিন

…রেন। (২) বিপর্যয়ের পাঁচজন Main players এর নাম জানাইবেন। (৩) সন্ধ্যারাণী, পূর্ণিমা এবং পদ্মাদেবীর Standard কিরূপ।

: (১) পাঠকদের পর রইল এর ভার।

(২) বিপর্যয়ের নূতন নাম হ'য়েছে—"অভিনয় নয়।" এর বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন—মলিনা দেবী—জহর গঙ্গোপাধ্যায় ফণীরায়—পশুপতি,রেণুকা রায়।

(৩) শান্ত পল্লী বধুর চরিত্রে রূপাদান দিতে পদ্মার তুলনা হয় না। এবং পূর্ণিমার থেকে পদ্মা দেবীর অভিনয়ের Standard অনেক উচ্চে। পূর্ণিমা এবং সন্ধ্যাকে একই Standard এ বিচার করা চলে। সংযম এবং সুশিক্ষা পেলে উপযুক্ত পরিচালক এদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চয়ই আশাবাদী।

নির্ম্মলচন্দ্র গুঁই (কৈলাস কবিরাজ লেন)

ইরাদার পুষ্পরাণী
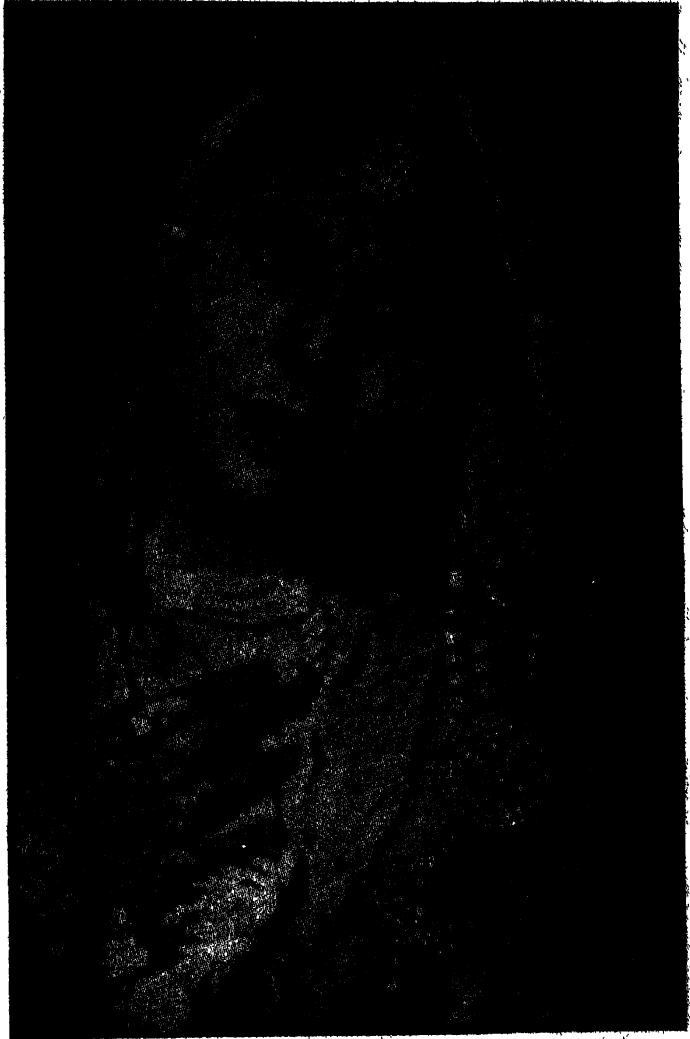
শ্রীলেখা কি অভিনয় ছেড়ে দিয়েছেন ?

: আপাততঃ...

রঞ্জন ঘোষ ও বিশ্বাস সেন (দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট)

গত ফাল্গুন সংখ্যায় ঢাকা থেকে কুমারী হেনা বন্দ্যোপাধ্যায় ২টি প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর আপনি পাঠক পাঠিকাদের কাছ থেকে চেয়েছেন। আমরা পাঠকের দাবী নিয়ে আপনার কাছে প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করছি। যদিও আমাদের ফটোগ্রাফী সম্বন্ধে তেমন জ্ঞান নেই। উত্তর* যদি ঠিক মনে করেন অনুগ্রহে আপনি দয়া করে তাঁকে জানিয়ে দেবেন।

এই সংখ্যায় দেখলাম আলোক চিত্র বিভাগে মন্দার মল্লিকের নাম, আচ্ছা ইনিই কি 'মন্দার ফিল্মস এর বাঙ্গলা কার্টুন চিত্র "অমর লিপি" ও "আকাশ পাতাল" পরিচালনা করেছিলেন? ইনি কি আর কোন বাঙ্গলা কার্টুন চিত্র তুলছেন।

ছায়া দেবী 'সমাজে'

Location—close up—make up বলতে কি বুঝায়?

Location (নকল ঘটনাস্থল) ষ্টুডিয়োর বহির্দৃশ্য হিসাবে প্রয়োগশালার মধ্যেই শিল্পদেব দিয়ে নকল ঘটনাস্থল তৈরী করে নিয়ে ছবি তোলা হয়। এই স্থানকেই location বলা হয়।

Close up—(সন্নিকৃষ্ট চিত্র) খুব কাছ থেকে নেওয়া ছবি। ধরুন, গল্পের নায়ক ঘরে বসে চা খেতে গিয়ে দেখতে পেলো চায়ের কাপের মধ্যে নায়িকার মুখখানি ভেসে উঠেছে। এরূপ তোলা হয় সন্নিকৃষ্ট চিত্রের সাহায্যে। প্রথমে নায়ক চায়ের কাপ হাতে সেই দিকে চেয়ে আছে এর একটা সন্নিকৃষ্ট চিত্র নেওয়া হয়। তারপর নায়িকার একটি ছোট ছবি চায়ের কাপের আকারে তার উপর তোলা হয়। একে বলা হয় দ্বিপাতন চিত্র বা Double Exposure. সোজা কথায় যার চিত্র গ্রহণ করা হয় সেই বস্তু বা মানুষ ক্যামেরার মুখ সম্পূর্ণভাবে অধিকার* করে থাকে।

Make up—(রূপসজ্জা)। রূপসজ্জা অভিনয়ের একটা প্রধান অঙ্গ, এর অভাবে অভিনয়ের অনেকখানি অঙ্গহানি হয়। রূপসজ্জা মানে যিনি যে ভূমিকায় অভিনয় করবেন সেই ভূমিকা অনুযায়ী নিজেকে সেজে নেওয়া। শিল্প ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান না থাকলে প্রকৃত রূপদক্ষ হওয়া যায় না। এর জন্য ও শিক্ষা ও সাধনার দরকার হয়।

এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা অন্য বইএর সাহায্য নিয়েছি জানবেন।

: হ্যাঁ। আকাশ পাতাল ও অমর লিপির মন্দার মল্লিক এবং লালমোহন বসু আলোক চিত্র বিভাগের ভার নিয়েছেন। আপনাদের উত্তরে খুশীই হ'য়েছি। ধন্যবাদ।

কার্টুন ছবি

লালমোহন বসু

কার্টুন চিত্র সম্বন্ধে আমার সামান্য যা জ্ঞান আছে তাই লিখছি। আজকের দিনে চিত্রামোদিগণের কাছে কার্টুন ছবি অবিদিত নাই, কিন্তু তবুও এর নির্মাণ পন্থা জানবার জন্ম বহু লোকের কৌতূহল আছে।

কার্টুন ছবি প্রথমে যিনি আবিষ্কার করেন, খুব কম লোকেই তাঁর নাম জানে। কিন্তু মিকি মাউস ও তার স্রষ্টা ওয়াল্ট ডিসনে সম্বন্ধে কারোর অজানা নাই। ওয়াল্ট এই শিল্পকে উন্নতির চরম শিখরে এনেছেন তিনি কার্যতঃ দেখাতে সমর্থ হয়েছেন যে চলচ্চিত্র শিল্পের এক অতি আধুনিক ও অতি আবশ্যকীয় অঙ্গ এই কার্টুন। কাজেই একে আর তুচ্ছ মনে করা বা অবহেলা করা চলে না। তিনি দেখাতে সমর্থ হয়েছেন সাধারণ ছবি থেকে কার্টুনছবি অনেক বেশী কার্যকরী ও চিত্তাকর্ষক। কার্টুন ছবির ভিতর দিয়ে শিক্ষা বিস্তার এক অতি অভিনব ও আধুনিক পন্থা। তাই আজ সুধী ও সভ্য সমাজে শিশুশিক্ষা, জন শিক্ষা, এমন কি যুদ্ধ শিক্ষা ব্যাপারেও কার্টুন ছবি প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করছে।

প্রথমে ওয়াল্ট নিজের খেয়াল বশেই কার্টুন আঁকতে সুরু করেন। অসীম অধ্যবসায় ও ধৈর্য সহকারে তিনি এই কাজে অগ্রসর হন। পরপর তিনি কয়েকবার অকৃতকার্য হয়েও ক্ষান্ত হন নি। তাঁর সাধনার ইতিহাস Robert Bruce এর উদাহরণের মতই রোমাঞ্চকর। এমন একদিন ছিল যে দিন একটি লোকও ওয়াল্টের পরিকল্পনা ও কার্য অনুমোদন করেনি। তাই সহস্র প্রকার বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে, বহু ধনী ব্যবসাদারের কাছে উপহাস্য হয়ে ও তিনি নিজের স্কন্ধে দায়িত্বের বোঝা বহন করে আজ যে সফলতা অর্জন করেছেন, তাতে তিনি শুধু বিশ্ববাসীর ধন্যবাদ ও দৃষ্টি আকর্ষণই করেন নাই, পরন্তু বিজ্ঞান জগতে এবং মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় লিখে রাখতে সমর্থ হয়েছেন।

ওয়াল্ট আজ সাধারণের জন্য শুধু প্রমোদ চিত্রই প্রস্তুত করেন না বরং জন সাধারণের জ্ঞান বিস্তার করার ভারও তিনি নিয়েছেন। এমন কি বর্তমান যুদ্ধ সৈনিকদের যুদ্ধ শিক্ষায় সহায়তাও তিনি ছবির ভিতর দিয়ে করছেন।

গুণীরা গুণের আদর জানে। তাই আমেরিকার তিনটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ড, ইয়েল ও সাদার্ণ ক্যালিফোর্নিয়া ওয়াল্টকে Master of Arts ডিগ্রি দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

আমাদের দেশে কার্টুন ছবির অভাব চিত্রামোদি মাত্রেই অনুভব করেন। বহুবার প্রশ্নও উঠেছে আমাদের দেশে কার্টুন ছবি হয়না কেন। হয় না তার প্রধান কারণ আমাদের দেশে উপযুক্ত শিল্পীর অভাব। কার্টুন নির্মাণে প্রধানতঃ অঙ্কন, আলোক চিত্র, সংগীত, রস সাহিত্য ও যান্ত্রিক জ্ঞান থাকা দরকার। একাধারে এই কয়টিগুণের প্রায়ই মিলন হয়না। যদিও বা কেউ চেষ্টা করে এপথে খানিকটা এগিয়েছেন, তাঁর প্রধান অভাব হয়েছে পৃষ্ঠপোষকতার ও কার্যকরী উৎসাহদাতার। আমাদের দেশে চিত্র-শিল্প সংশ্লিষ্ট লোকেরা সাধারনতঃ গুণগ্রাহি নয় বলেই অনেক কার্টুনিষ্ট আজও ঠিক আন্তরিক উৎসাহ পান নি। আর একটি অন্তরায় হচ্ছে, কার্টুন ছবি নির্মাণ অন্য ছবির চেয়ে ব্যয় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ। অসীম ধৈর্য না থাকলে কার্টুন ছবি করা সম্ভব নয়। যাঁরা ধৈর্য ও পরিশ্রম দিতে পারেন তাঁরা এ থেকে জীবিকা নির্বাহের মত উপযুক্ত পারিশ্রমিক পান না। কাজেই আমাদের দেশে কার্টুন শিল্পের যথার্থ প্রতিষ্ঠা আজও হয় নি।

কার্টুন ছবিতে জীবন্ত নট-নটীর প্রয়োজন হয়না। তুলির আঁকা অদ্ভূত নায়ক নায়িকারাই অভিনয় করে। তাই চলচ্চিত্রে কার্টুন একটা তাজ্জব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

কার্টুন চলচ্চিত্রের প্রত্যেক পাত্র-পাত্রীগণ এবং প্রত্যেক দৃশ্যই আঁকা ছবি। তাই একখানি দশ মিনিটের কার্টুন

ছবি (এক হাজার ফুট) নির্মাণ করতে অন্তত দশ হাজার ছবি আঁকতে হয়। এই দশ হাজার ছবি আঁকা বড় সহজ কাজ নয়। এক নায়কেরই হয়ত পাঁচ হাজার ছবি হয়। কিন্তু প্রত্যেক ছবিটার মধ্যে ঠিক এক রকম চেহারা বজায় রাখা চাই।

কার্টুন ছবি তোলার আগে একটি গল্পের চিত্রনাট্য প্রস্তুত করা হয়। তার পর তার পাত্র পাত্রীদের নানা প্রকার এবং নানা ভঙ্গীর মডেল তৈরী করা হয়। ঐ মডেলের বশে প্রত্যেক দৃশ্যটি পৃথক পৃথক ভাবে আঁকা হয়। এই গুলিকে মূল ছবি বলে। তারপর একখানি মূল ছবি বা দৃশ্য নিয়ে তার নায়ক ও বাঞ্ছিত অভিনয়ের মূল ভঙ্গিগুলি আঁকা হয়। এইগুলি প্রধান শিল্পীর কাজ। সহকারী শিল্পীরা মূল ভঙ্গিগুলির প্রয়োজনে ছবি এঁকে ঐ মূল ভঙ্গিগুলির ক্রম পরিবর্তনের সামঞ্জস্য রক্ষা করেন। দ্বিতীয় সহকারী দল ঐ ছবিগুলি সেলুলয়েডে কালি দিয়ে ট্রেস করেন। তৃতীয় সহকারী দল ঐ সেলুলয়েডের ছবি-গুলোর যেখানে যে রং দেওয়ার দরকার, সেখানে সেই রং দিয়ে ভর্তি করেন।

সেলুলয়েডে এই দৃশ্যের অভিনেতাকে এবং চলমান অংশগুলিকে আঁকা হয়। বাকী অংশগুলি যথা, দৃশ্য পট, আসবাব পত্র প্রভৃতি একটি পৃথক কাগজে আঁকা হয়। এই বার এই কাগজে আঁকা ছবি খানির উপর সেলুলয়েডে আঁকা ছবিখানি রাখলে সম্পূর্ণ দৃশ্যটি দেখা যাবে।

কার্টুন ক্যামেরা একটি টেবিলের উর্ধ্বে নীচের দিকে মুখ করে রাখা হয়। ক্যামেরার নীচে টেবিলের উপর দুইটি পিন থাকে। সেলুলয়েড গুলিতেও ঐ পিনের মাপে ছিদ্র থাকে। এখন কাগজে আঁকা দৃশ্যটি রেখে তার উপর সেলুলয়েডের ছবিগুলি একে একে পিনে লাগিয়ে উপরের ক্যামেরায় এক এক করে ছবি তোলা হয়। এই ভাবে সমস্ত ছবিগুলি তোলা হলে সেই দৃশ্যটির ছবি তোলা হল। তারপর পরবর্তি দৃশ্যও অনুরূপ ভাবে তোলা হবে। এই ভাবে সমস্ত দৃশ্যগুলি তোলা হলে রসায়নাগারে এই ফিল্মটি চিত্রে রূপান্তরিত হবে।

কার্টুন চিত্রের সঙ্গীত, আবহ সঙ্গীত, কথোপকথন প্রভৃতি শব্দ পৃথক ভাবে একটি ফিল্মে গ্রহণ করা হয়। এখন শব্দের ফিল্মখানি ছবির ফিল্মখানি পাসা পাসি রেখে চিত্র সম্পাদক ফিল্ম দুখানির যোগাযোগ ও সামঞ্জস্য বজায় রেখে তাঁর সম্পাদনা কার্য শেষ করেন। তারপর একটি তৃতীয় ফিল্মের উপর ঐ শব্দ ও ছবিগুলি ছাপা হয়। এখন এই ফিল্মখানি প্রেক্ষাগৃহের প্রদর্শন উপযোগী হল।

সাদা কালো এক রঙ্গা ছবির নির্মাণ পদ্ধতি মোটামুটি বর্ণনা করলাম। রঙ্গীন কার্টুন তৈরীর পদ্ধতি ও অনুরূপ। কেবল তার অঙ্কিত চিত্রগুলি রঙ্গীন করা হয় এবং ক্যামেরায় একসঙ্গে তিনখানি ফিল্মে ঐ রঙ্গীন ছবিগুলির ফটো নেওয়া হয়। পরে ঐ তিন খানি রসায়নাগারে যথাযথ ভাবে পরিপুষ্টি সাধনের পর সম্পাদনা করা হয়। সম্পাদনান্তে ঐ তিনখানি ছবির ফিল্ম পৃথক ভাবে ছাপা হয় এবং রং করা হয়। পরে ঐ তিন খানি ছবির রং এক এক করে একটি ফিল্মে ছাপা হয়। এইখানে প্রয়োজনীয় রসায়না কার্যের পর প্রেক্ষাগৃহে দেখান উপযোগী হল।

[কার্টুন চিত্র সম্পর্কে জানবার জন্য অনেক উৎসাহী পাঠক আমাদের পত্র লিখেছিলেন। কার্টুন চিত্র সম্পর্কে আমাদের সম্পাদকীয় বিভাগে যিনি অভিজ্ঞ তাঁর উপরেই এ ভার দেওয়া হ'য়েছে। শ্রীযুক্ত লালমোহন বাবুকে এই প্রবন্ধ লিখতে বন্ধুবর মন্মথ মল্লিক বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন। কার্টুন চিত্র সম্পর্কে আরও বিশদভাবে আলোচনার ভার এরা নিয়েছেন।]

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির সভ্য হ'য়ে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করুন। উপযুক্ত চিত্র প্রস্তুতে প্রযোজকদের কাছে দাবী জানান।

শিক্ষার বাধ্যতামূলক অংগরূপে সঙ্গীতের স্থান।

—শচীন দাস (মতিলাল)—

[শ্রীযুক্ত শচীন দাস মতিলালের নাম সংগীতানুরাগীদের কাছে অবিদিত নেই। এলাহাবাদ, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত বহু সংগীত সম্মেলনে যোগদান করে শচীন বাবু 'ক্লাসিক্যাল' সংগীতে নিজের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ইনি ওস্তাদ বাদল খাঁর ছাত্র। রূপ-মঞ্চের পাঠকগণের সংগে এর এই প্রথম পরিচয়—এখন থেকে সংগীত কলা নিয়ে রূপ-মঞ্চে তিনি আলোচনা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন]

বিদ্যা অর্থে আজ আমরা এইটুকু বুঝি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা—খুব বেশী দু'একটা ডিগ্রী যার জোরে চাকরী মিলবে। ক্রমাগত দৈনন্দিন অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করার ফলে দশমহাবিদ্যার শ্রেষ্ঠ বিদ্যার গণ্ডী আমাদের কাছে যে সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কোনমতে দু'কলম লেখাপড়া শিখে উদরান্নের সংস্থান করতে পারার নামই আমাদের শিক্ষা এবং জীবনের উদ্দেশ্য। আমরা যে আর কোন বিষয়ে চিন্তা করতে পারি না তার কারণ আমাদের জাতিগত দারিদ্র্য।

তবুও এ-কথা সত্য যে বিদ্যার আদর চিরস্থায়ী এবং বিদ্যার মধ্যে সঙ্গীত যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যা তাই নয়, এ-ছাড়াও এর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রও যে যথেষ্ট বিস্তৃত হ'তে পারে সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই।

কম বেশী ৪০।৫০ বছর আগে সঙ্গীত বিশেষ করে বাংলাদেশে লোপ পেতে বসেছিল। আমাদের তখনকার পূর্বপুরুষেরা তাঁদের বংশধরদের গোলামী গিরিতেই তালিম দিতেন। সঙ্গীতচর্চা ছিল তাঁদের চোখে অপরাধজনক এবং এর জের আজও চলেছে। এরই ফলে সঙ্গীতের মারফৎ আজ যে বিস্তীর্ণ অর্থোপার্জনের পথ গড়ে উঠতে পারত তা শুধু ব্যাহত হয়নি, কল্পনাতীত বলেই মনে হয়। কিন্তু এ-কথাটা মোটেই উপেক্ষনীয় নয়।

সেদিনকার চেয়ে আজ সঙ্গীতের প্রসার বেড়েছে সত্য কিন্তু পাঠ্যশিক্ষার অনুপাতে কিছুই নয়। আজও বহুলোক এমন আছেন যাঁরা সঙ্গীত শিক্ষাকে জীবনের একটা অকেজো জিনিষ বলে মনে করেন। তাঁরা প্রাচীনপন্থী। এক হিসাবে তাঁদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না কারণ যখন তারা অতীতের দিকে দেখেন, সঙ্গীতের মধ্যে নৈতিক বা অর্থনৈতিক কিছুই দেখেন না এবং আজও তাঁদের মত পরিবর্তন করাবার মত সঙ্গীতের কোন ক্ষেত্রই গড়ে ওঠেনি।

এই গড়ে না ওঠার মূলে রয়েছে প্রাচীন সঙ্গীতজ্ঞদের অতিমাত্রায় রক্ষণশীলতা। মুষ্টিমেয় জন কয়েক ছাড়া কাকেও তাঁরা শিক্ষাদান করতেন না ফলে আজ "ঘরোয়ানার" সৃষ্টি এবং এরই জন্যে আজ গায়কমহলেও রেশারেশি—সবাই স্ব স্ব প্রধান। আবহমান কাল থেকেই সঙ্গীতকে বিদ্যাশিক্ষার মাঝ দিয়ে বিস্তৃত করা হয়নি সেই জন্যে অনেকের কাছে সঙ্গীত যেন শিক্ষাবস্তুর বাইরে।

এটা অবশ্য স্বীকার্য যে পূর্বের সঙ্গীতজ্ঞেরা ছিলেন প্রায় নিরক্ষর এবং নৈতিক দিক দিয়ে বিশেষ উন্নত ছিলেন বলে মনে হয় না এবং এক হিসাবে তাঁরা সঙ্গীতের নিগ্রহ সাধন করেছেন, যেহেতু আজও সাধারণের এ-ধারণা কেন যে নৈতিক অধোগতি সঙ্গীত চর্চার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। কোন সঙ্গীতশিল্পী যদি নীতিভ্রষ্ট হ'ন লোকে সাধারণতঃ তার সঙ্গীত চর্চার উপর কটাক্ষ করেন কিন্তু কোন উচ্চ উপাধীধারীর বেলায় তার বিদ্যাকে বিদ্রূপ করেন না। এর কারণ পূর্বেই বলেছি যে সঙ্গীত প্রচলিত বিদ্যাশিক্ষার বাইরে।

পুরাতন রীতি কালক্রমে বদলাবে। সঙ্গীত আগের চেয়ে গ্রহনীয় হচ্ছে বটে কিন্তু ব্যাপকতা আসেনি। দু'পাঁচটা

'রৌনকে' উলহাস ও সুবর্ণলতা
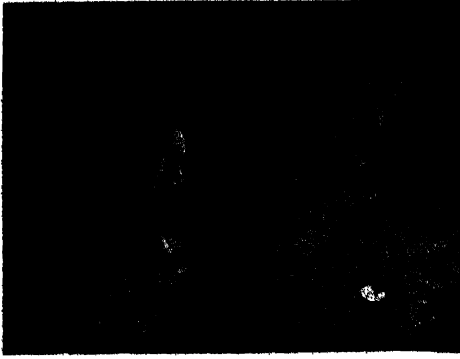
"ছয়োয়ানা"র গণ্ডীর মধ্যে বিরাট একটা জাতীয় সম্পদ আবদ্ধ থাকতে পারে না বা থাকা উচিত নয়—চাই ব্যাপক প্রসার। বিদ্যা কারোর একচেটে নিজস্ব সম্পত্তি নয় চাই এর সংস্কার এবং শিক্ষিত সমাজকেই এর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

বিপদে না পড়লে যেমন প্রকৃত বন্ধু চেনা যায় না তেমনি অভাবে না পড়লে মানুষ নিজের যোগ্যতার উপর আস্থাবান হ'তে পারে না। চিরকাল বাঙ্গালী জানত যে চাকুরী ছাড়া তার গত্যন্তর নেই কিন্তু ১০।১২ বছর আগেকার ব্যাপক বেকার সমস্যার ফলে বাঙ্গালী ব্যবসায়ে মন দিয়েছে, যা তারা চিরদিন সাধ্যাতীত বলেই মনে করে এসেছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় সঙ্গীতের সাহায্যে যে অর্থোপার্জনের যথেষ্ট পথ করা যেতে পারে তা একেবারেই উপেক্ষিত। একথা বললে অবশ্য ভুল হবে না যে পাঠ্যশিক্ষার দ্বারা যেমন লক্ষ লক্ষ লোক তাদের অন্নের সংস্থান করে তেমনি আরও লক্ষ লক্ষ লোক সঙ্গীতের দ্বারা তাদের জীবিকার্জন করতে পারে যদি সঙ্গীতকেও পাঠ্যশিক্ষার অনুযায়ী standardize করে পাঠ্য-শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে বিদ্যালয়ের মারফৎ শিক্ষাদান করা হয়, আজকের এই অর্থসঙ্কটের দিনে এর দাম বড় কম নয়। প্রত্যেক অভিভাবক, যত দরিদ্র হ'ন না কেন, ছেলেকে বিদ্যালয়ে পাঠান শিক্ষা দিতে এবং না হলে পীড়ন করতেও ত্রুটী করেন না কিন্তু ছাত্রের মধ্যে সঙ্গীত প্রতিভা থাকতে পারে কিনা সেটা তাঁদের মনেও জাগে না। তার কারণ সঙ্গীতের স্থান শিক্ষাকেন্দ্রের বাইরে এবং এখনও আমাদের দেশে সঙ্গীতের দ্বারা উপার্জনের পথও প্রশস্ত নয়। পাঠ্যশিক্ষায় যে যেমন শিক্ষিত সেই অনুপাতে সকলেরই উপার্জনের যেমন পথ আছে, সঙ্গীতের মধ্যেও অনুরূপ উপায় গড়তে না পারলে সঙ্গীতের সম্যক প্রসার হওয়া সম্ভব নয় এবং আমি মনে করি আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়েরই এ বিষয়ে হওয়া উচিত একমাত্র কর্ণধার। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগেই সঙ্গীতের Standardization হওয়া সম্ভব এবং সম্যকভাবে শিক্ষা প্রসার করা সম্ভব।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে সঙ্গীত পাঠ্যশিক্ষার অন্তর্গত এবং সব শিক্ষাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্বাধীনে। সুতরাং দেখা যায় যে সঙ্গীতকে বাদ দিয়ে সে সব দেশের জনসমাজ শিক্ষাকে সম্পূর্ণ বলে মনে করে না এবং প্রত্যেকেই সঙ্গীতের কিছু না কিছু জানে।

এ-সবই আমরা জানি কিন্তু তবুও অন্ধ। আজ অর্থসঙ্কটের কল্যাণে আমাদের দেশে দুস্থ ছেলেমেয়ের অভাব নেই এবং সঙ্গীতকে বিশেষ করে মেয়েদের অন্ন সংস্থানের অন্যতম প্রধান ও মহৎ পন্থা বলে মনে করি। যারা স্বাবলম্বী হ'তে চান বা যাদের কোন অবলম্বন নেই তাদের পক্ষে সৎপথে থেকে গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করা সঙ্গীতের মাধ্যমে দিয়ে সম্পূর্ণ সম্ভব। কিন্তু মনে হয় আমাদের জনসমাজ তাদের পরের ঘরে দাসীবৃত্তি করাও যেন বরদাস্ত করতে পারে তবুও সঙ্গীত শিক্ষা দিয়ে নিজের ভরণপোষণ করাটা অমার্জনীয় অপরাধ বলে মনে করে। এটাকে আমি ভ্রমাত্মক কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই মনে করি না এবং এইটুকু বলতে পারি যে সঙ্গীত যতদিন আমাদের প্রচলিত শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত না হবে—ব্যাপকভাবে সঙ্গীতপ্রিয়তা না আসবে, ততদিন আমাদের জনসমাজের এই মনোবৃত্তি

কম বেশী থাকবেই। এইসব অহেতুক বাধা বিপত্তির জন্ম বহু প্রতিভা নষ্ট হয়েছে এবং তার হিসাব বা প্রতিকারের চেষ্টা কেউই করেনি। আজ যারা সঙ্গীতে আত্মনিয়োগ করে জীবিকানির্বাহ করছে তাদের অনেকেরই অতীত জীবন খুঁজলে দেখা যাবে সমাজ ও অভিভাবকদের কাছে কত বাধাবিপত্তি ও লাঞ্ছনা পেয়ে তারা উঠেছে। তারা যদি উৎসাহের মধ্যে একনিষ্ঠ ভাবে শিক্ষার সুযোগ পেতো হয়ত সঙ্গীত শিল্পের উৎকর্ষতা তাদের দ্বারা বেশী করে সম্ভব হ'ত। কিন্তু নানা পারিপার্শ্বিক বাধা এড়িয়ে শিক্ষা করা বেশীর ভাগ লোকের পক্ষেই সম্ভব নয় অথবা অনিশ্চিত। উপার্জনের আশার সে দায়িত্ব নিতে অনেকেই সাহসী হয় না তার কারণ সঙ্গীতের দ্বারা উপার্জনের পথ আজও উন্মুক্ত নয় এবং অনিশ্চিত ও বটে।

'সমাজে' রেণুকা রায় ও জহর গঙ্গোপাধ্যায়

তাই আজ আমি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি এ-দিকে আকর্ষণ করি। ভারতীয় সঙ্গীত যা ভারতের প্রাচীন সভ্যতার প্রতীক তার ব্যাপক প্রসারের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বহস্তে গ্রহন করা উচিত বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের দ্বারা। আমরা আমাদের অনেক শিল্প হারিয়েছি এবং সঙ্গীতশিল্পও এ-অবস্থায় পড়ে থাকলে তারও ভবিষ্যৎ বিশেষ উজ্জ্বল বলে মনে হয় না। তাই আমার কামনা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, সুধীসমাজ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সঙ্গীতের শ্রীবৃদ্ধি ও বহুল প্রসারের প্রতি যত্নবান হোন যা দ্বারা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা বুঝতে পারে যে সঙ্গীত ছাড়া তাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ—সঙ্গীতই তাদের দুঃখের সান্ত্বনা, ক্ষুধার অন্ন।

রবীন্দ্রনাথ ও নৃত্যকলা

শ্রীরথীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত

বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের নিগূঢ় সম্বন্ধের কথা বহুদিন ধরে আমাদের অগোচরে ছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই সম্বন্ধকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। ঋতুর পরিবর্তনের সংগে প্রকৃতির রূপ রস-বর্ণ-গন্ধে যে বৈচিত্র প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গাথায় তা ধরা পড়েছে। ঋতু-উৎসব সেই অনুভূতিরই বহিঃ সৃষ্টি। নৃত্য কলায় রবীন্দ্রনাথের যে অবদান, বিশ্ব প্রকৃতির সংগে মানব মনের রসঘন সম্বন্ধের মধ্যেই তার উৎস।

শান্তি নিকেতনে কবি গুরু নৃত্য-চর্চার যে আয়োজন করলেন তার ইতিহাস আলোচনা করবার সময় প্রধানতঃ দুটি কথা মনে রাখা প্রাসংগিক হবে। প্রথমতঃ তিনি কোথাও প্রাচীন ভারতের নৃত্য-পদ্ধতিকে উপেক্ষা করবার প্রয়াস পাননি। দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন রীতি নীতি উপেক্ষা না করলেও তাঁর সৃষ্ট নৃত্য এমন সহজ সাবলিল গতিভংগী পেল, এত প্রাণবন্ত ও রসঘন হয়ে উঠল যে, তা এক সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি বলে মনে হবে।

এতদিন পর্যন্ত নৃত্য চর্চা আমাদের দেশের ভদ্র-সমাজে আদর পায়নি। আলস্যে, বিলাসে দেহ-ভংগী প্রকাশ করাই নৃত্য চর্চার উদ্দেশ্য,—এই বহুদিন সঞ্চিত মিথ্যা-ধারণা এখনও আমরা ত্যাগ করতে পারিনি। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম নৃত্যকে সংযতরূপে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করে এই মিথ্যা ধারণা খণ্ডন করবার প্রয়াস পেলেন। আধ্যাত্মিকতার উচ্চভাব নৃত্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করাই সহজ। দেহ-ভংগীমায় মনের ভাব ব্যক্ত করা তাই সুন্দর হয়ে উঠে। তাই ঋতুর গতায়াতের সংগে সংগে মনের মধ্যে যে আনন্দ অথবা বিরহ ব্যথার সৃষ্টি হয়, তাকে নৃত্যছন্দে প্রকাশ করবার জন্যেই শান্তিনিকেতনে ঋতু উৎসবের আয়োজন।" ভগবানের কাছে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেবার যে অপূর্বভাব "নটীর পূজা"র নটীর আত্মনিবেদনের নৃত্য-ছন্দে প্রকাশ পেল, জনসাধারণ তাতে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করল যে নৃত্য শুধু হালকা রস পরিবেশনের জন্য সৃষ্ট হয়নি—বহু উচ্চ স্তরের ভাবধারাও এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা চলে। নৃত্যে এই ভাবময়তার প্রকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথ মনিপুরী পদ্ধতি গ্রহণ করলেন। আবার যেখানে মুদ্রার ইংগিতের প্রয়োজন হয়েছে বেশী, বীর রস পরিবেশন করাটাই যেখানে প্রধান উদ্দেশ্য হয়েছে, সেখানে তিনি সিংহল, জাভা, বালি প্রভৃতি দক্ষিণ দেশের নৃত্য-ধারাকে আশ্রয় করেছেন। এই দুই নৃত্য পদ্ধতির সম্মিলনেই শান্তিনিকেতনের নৃত্যচর্চা অনেকটা সার্থকতা লাভ করেছে। খণ্ড খণ্ড ভাবধারাকে নৃত্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার রীতিই এতদিন ধরে আমাদের দেশে চলে আসছিল। রবীন্দ্রনাথ তাকে এক অখণ্ড পূর্ণরূপ দেবার চেষ্টা করলেন। নাটককে তিনি নৃত্যের ছন্দে বেঁধে দিলেন। সেই চেষ্টার প্রেরণাতেই "চিত্রাঙ্গদা", "শাপমোচন" প্রভৃতি নাটকের সৃষ্টি। ভাবোচিত নৃত্য সংযুক্ত করে নাটক সৃষ্টির প্রয়াস তখন সার্থক হল। এখানেও রবীন্দ্রনাথ মনিপুরী ও জাভা প্রভৃতি দক্ষিণ দেশের নৃত্য পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছিলেন।

গানের সঙ্গে যখন নৃত্য যুক্ত না হয় তখন সেটা অচল গতি পায় না তাই নৃত্যকে সঙ্গীতময় করে তুলবার চেষ্টার ফলে "ঋতুরঙ্গ"এর সৃষ্টি হয়। সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্যের অপূর্ব সমন্বয়ের ফলেই এই নাটকে পরিপূর্ণতার প্রকাশ দেখা যায়।

ভারতীয় নৃত্য-চর্চার গতি পথে রবীন্দ্রনাথের এই নৃত্য পদ্ধতি সহায়তা করবে তাতে সন্দেহ নেই, কারণ এতে বৈচিত্র আছে, বৈশিষ্ট আছে। এই নূতন নৃত্য সৃষ্টি বিদেশের নকল নয়, আবার স্বদেশের আক্ষরিক অনুকরণও নয়। তাল লয় ও অন্তরের রসানুভূতির সহজ সংযোগেই এর উৎপত্তি।

-শ্রীমতী বিনতা বসু-
'নিউ থিয়েটার্সের আগতপ্রায় চিত্র
উদয়ের পথে'র নায়িকা——

শ্রীমতী রেণুকা রায় —

ব বিশ্বাস পরিচালিত ও

ভিনীত 'প্রতিকারে' দেখা যাবে।

১৯৪৪ সালের বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও তার ভবিষ্যৎ

শ্রীতারাকুমার মুখোপাধ্যায়

দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে নবনব স্রষ্টা নবনব রূপ সৃষ্টি করলেও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য পৃথিবীর সাহিত্য ভাণ্ডারে অপূর্ব রত্ন। হাজার মিস্‌টিক কবি থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের 'তন্ময়' কাব্য বিশ্ব সাহিত্যে অনাস্বাদিত অপূর্ব সম্পদ। ঠিক তেমনি হাজার চিত্রশিল্পী সত্ত্বেও অবনীন্দ্র প্রমুখ বাংলার চিত্রকলার রূপদক্ষরা বিশ্বশিল্পের ভাণ্ডারে নতুনতর বিস্ময়। নৃত্য ও সঙ্গীতেও ভারতের দান পাশ্চাত্যকে বিমুগ্ধ করেছে। কিন্তু ভারতের থিয়েটার তথা নাটক এমন কিছুই দিতে পারে নি যা বিশ্বের বিস্ময়কর। বরং আমাদের থিয়েটার ওদেশের থিয়েটরের সঙ্গে বসতেই পারে না। অবশ্য অত্যন্ত প্রতিভা সম্পন্ন নট আমাদের আছে, এমন নট আছে যাঁদের প্রতিভা পাশ্চাত্য নট শ্রেষ্ঠদের অপেক্ষা কম নয় আদৌ। বাঙ্গালোরের রাঘবাচারী, মাদ্রাজের হারীন্দ্রনাথ এবং আমাদের শিশিরকুমার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের অন্যতম, কিন্তু স্বয়ং স্বতন্ত্র অভিনেতাই আমাদের আছে, থিয়েটর নেই। নেই অর্থাৎ এমন থিয়েটর নেই যা Gordon Craig চিন্‌তো। Moscow Art Theatre বা Little theatre movement অথবা Irving, Tree বা Elen Terry-র পরিগণিত কোনো থিয়েটর আমাদের নেই। আমরা কোনো রকমে যাত্রা—কথকতা হারিয়ে পশ্চিম থেকে থিয়েটরকে ধার ক'রে জিইয়ে রেখেছি মাত্র। দেখাবার মতো, বিশ্ববাসীকে দেখাবার মতো অভিনেতা আমাদের আছে কিন্তু থিয়েটর নেই। আমাদের থিয়েটর অবনত।

অথচ একদা আমাদের অত্যুজ্জ্বল নাটক ছিলো। অভিনয়-কুশল নানাবিধ প্রয়োগও করতেন নাট্যাধিনায়করা রাজামহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায়। Miracle ও Mystry play-র দিনে অথবা মহিমাময় সেক্সপীরীয় যুগে ইংলণ্ডের জাতীয় জীবন যেমন তার মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেছিলো, আমাদের জাতীয় জীবন সেভাবে আত্মপ্রকাশ করছে না বর্তমান মঞ্চে। পাশ্চত্য জগতে সেক্সপীরীয় যুগের পর ইব্‌সেনের যুগ এলো। সমস্যামূলক নাট্যকর মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য জাতির জীবন ধারা প্রকাশিত করলো নাট্যকার। মঞ্চও পরিবর্তিত ক'রে গেলো। হাজার কৌশলের সৃষ্টি করলো মঞ্চ নবতর নাটককে রূপায়িত করবার জন্য। তারপর পিরেণ্ডেলো, ওনীল তাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মন সমীক্ষা নিয়ে প্রতিভার নব প্রেরণা আনলো মঞ্চে। জাতির জীবন ধারা তার কাব্যে শিল্পে রাষ্ট্র কর্মে যেমন নিজেকে বিকশিত ক'রে চললো, তেমনি বিকশিত ক'রে চললো থিয়েটরের মধ্য দিয়ে, কিন্তু আমাদের থিয়েটর কোনোক্রমে তার জৈবিক সত্তা বাঁচিয়ে রাখলো, মানস সত্তাকে বিবর্তিত ক'রে চললো না। আমাদের থিয়েটর biologically জীবিত psychologically নয়। অথচ আমাদের জাতি মরেনি। জাতির অধ্যাত্মসাধনা, তার শিল্পকলা, তার কাব্য সাহিত্য, তার রাষ্ট্র প্রচেষ্টা, তার সমাজ সংস্কার সবই চলছে কিন্তু থিয়েটর হামাগুড়িই দিচ্ছে এখনো। সাবালক আর হলো না। বর্ত্তমান বাংলা থিয়েটরের কোনো শিল্পসত্তা নেই, কোনো লক্ষ্য নেই। গিরীশ বাবুর তৈরী মঞ্চকে কোনোক্রমে মরতে দেওয়া হয়নি মাত্র।

মামুলী থিয়েটরের বাইরে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ কিছু নাট্য সৃষ্টি ক'রেছিলেন। মাত্র নাটক লিখে নয়, নাটক অভিনয় করেও। তাঁর বাস্তব নাট্য (বিসর্জন প্রভৃতি), তাঁর 'তন্ময়' নাট্য (ফাল্গুনী প্রভৃতি), তাঁর নৃত্যনাট্য (শাপমোচন প্রভৃতি) সবই নতুন সৃষ্টি। কিন্তু থিয়েটর যা নিয়ে বাঁচে, থিয়েটরের উপজীব্য যে নাটক, যে প্রযোজনা, সে নাট্য সৃষ্টি করবার অবসর রবীন্দ্রনাথ পান নি। তিনি বাস্তব নাট্য (বিসর্জন প্রভৃতি) প্রযোজনা করেছিলেন এবং তপতী, যোগাযোগ প্রভৃতি নাটক শিশিরকুমারকে দিয়ে

'রৌনকে' সুবর্ণলতা ও মতিলাল

মঞ্চস্থ ও ক'রেছিলেন। যদি তিনি প্রতিভার অনেকখানি মঞ্চের দিকে দিতেন এবং শিশিরকুমারকে অধিনায়করূপে পেতেন তবে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে বিবর্তন ঘটতো। শিশিরকুমারের মুখে শুনেছি দৃশ্য যোজনা প্রভৃতি ব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথের মৌলিক মনীষা ছিলো এবং এ বিষয়ে শিশিরকুমারেরও বহু চিন্তা নিরবয়ব হয়েই আছে। উভয় রূপদক্ষের যোগাযোগ ফল প্রসূ হ'লে আমাদের থিয়েটর আরো উন্নত হ'তো। একবার শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথকে জাতীয় নাটক ও জাতীয় নাট্যশালার বিষয় প্রশ্ন ক'রেছিলেন। তাতে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্নটিকে তখনকার মতো এড়িয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু প্রাসঙ্গিক ভাবে বহু তত্ত্ব ও তথ্য তিনি শিশির কুমারের গোচর ক'রেছিলেন।

আমাদের মঞ্চকে যদি সত্যই উন্নত হ'তে হয় তবে নাট্যকার, অধিনায়ক, নটনটি সবই নতুনতর দৃষ্টির হওয়া চাই, পাশ্চাত্য মঞ্চকে তার নাটকেও মঞ্চ কৌশলে আয়ত্ত ক'রে থিয়েটরকে শিল্প-সত্তায় রূপান্তরিত করতে হবে। জাতীয় জীবনকে তার নানা দ্বন্দ্ব-সমস্যায় বিকশিত ক'রে তুলতে হবে নাটকের মধ্য দিয়ে। তাড়াতাড়ি মন্বন্তরের দুঃখ লিখে চলতি জীবনধারাকে ক্ষিপ্রকারীর চাঞ্চল্যে চিত্রিত মাত্র করলে চলবে না। তাড়াতাড়ি ১৩৫০ সালের দুঃখ ঝঞ্ঝাটকে হঠকারীর চাকচিকে কোলাহল মুখর ক'রে তুললে হবে না। জাতির জীবনের গভীরে প্রবেশ করতে হবে। বিশ্বব্যাপারের সঙ্গে জাতীয় জীবনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন জাতীয় নাটক হবে পাশ্চাত্য পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌-এরই শিক্ষানবিশী। ঘরে বাইরের সন্দীপের স্বদেশীয়ানার চেয়ে নিখিলেশের ঔদার্যকে বেশি জাতীয় চরিত্র ব'লে চিনতে হবে। রাশিয়ার সাম্যবাদের চেয়ে বিবেকানন্দের ডিমোক্রেসিকে জাতীয় নাড়ীর সত্যকার স্পন্দন ব'লে চিনতে হবে। সনাতন বাংলার মেয়ের করুণ দুঃখকে দেখিয়ে দুর্বল জাতির সুলভ ভাব বিহ্বলতাকে প্রশ্রয় দিলেও চলবে না, আবার কল্পনা-বাস্তবে জড়িত তথাকথিত আধুনিক শিক্ষিতাকে এঁকে জাতির ভীতিকে খাস্তির ক'রে চললেও চলবে না। শুধু বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসকে নাটকায়িত ক'রেই ক্ষান্ত থাকলে জাতির নাট্যশক্তির অক্ষমতারই পরিচয় দেওয়া হবে। যতোই আমরা মঞ্চর

গামী হইনা কেন, যতোই আমাদের শতকরা ৯৫জন অশিক্ষিত ও অবহেলিত হোক্ না কেন, দেশের নাড়ীতে দ্রুততর স্পন্দন এসেছে এবং সেই স্পন্দনকে সম্বল ক'রে জাতির সমাজ জীবনের স্রোতোধারাকে নির্দিষ্ট ক'রে তুলতে হ'বে রঙ্গমঞ্চে। তাই প্রথমেই চাই নব দৃষ্টি সম্পন্ন নাট্যকার। নাটকের সাহায্যে চিত্তে সুড়সুড়ি মাত্র না জাগিয়ে চিত্তের রসবোধকে জাগিয়ে তুলতে হবে। পৌরাণিক নাটকের মধ্য দিয়ে দেখাতে হবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। কর্ণের বিয়োগান্ত ব্যর্থ জীবনের চিত্র দিয়ে দেখাতে হবে সমাজ মনের মূঢ়তা। দেখাতে হবে কোন গভীর অজ্ঞানতার বশে, সমাজ মনের কোন্ দানবীয় পীড়নের ফলে কর্ণের অতোখানি প্রতিভা হীনতায় দগ্ধ হয়ে গেলো সহস্র বীরত্ব সত্বেও। নবদৃষ্টির পৌরাণিক নাটক সাবিত্রীর সতীপনার অন্তরালে স্বয়ং বরণের স্পর্ধাকে অত্যুজ্জ্বল ক'রে দেখাবে। দ্রৌপদীর দৃপ্ত তেজ ও শকুন্তলার দুষ্মন্তকে স্পর্ধিত তিরস্কার এবং সীতার পরুষ বাক্যকে চাপা দিয়ে সরিয়ে না রেখে নবদৃষ্টির পৌরাণিক নাটক দেখাবে শুধু নিষ্ক্রিয় সতীত্ব নয়। সক্রিয় সজীব স্বাতন্ত্র্যই ছিলো পুরাণের কালে ব্যক্তির জীবনে, পুরুষের এবং কতকাংশে নারীরও সমাজ মনের মূঢ়তাকে গুণ্ঠিত না রেখে বে-আবরু করতে হবে।

ঐতিহাসিক নাটকে দেখাতে হবে শুধু পেট্রিয়টিক বীরত্ব নয়, শুধু পরদেশী শত্রুর সঙ্গে সংঘর্ষ নয়। দেখাতে হবে জাতির মর্মপীড়া। দেখাতে হবে কোন নিগূঢ় দুর্বলতার কারণে শিখ মারাঠা রাজপুত জাগরণ প্রতিক্রিয়া সত্বেও অবশেষে ভেঙে পড়া ঢেউ মাত্র। বীরত্ব গাথার মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিকের সূক্ষ্ম মনস্তাত্বিক দৃষ্টিকে যেন আমরা দেখতে পাই। শাজাহানের চরিত্রে মাত্র প্রতারিত পিতার ব্যক্তিগত দুঃখ না দেখিয়ে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাকে দেখানো চাই। শিবাজীর বীরত্বের মধ্যে মাত্র আকাশ উদ্দীপ্ত যোদ্ধসত্তাকে অতিক্রম ক'রে গোষ্ঠী বীরের সংকীর্ণ অথচ অবশ্যম্ভাবী ঐতিহাসিকতাকে যেন আমরা দেখতে পাই।

তারপর সামাজিক নাটকে কান্নার হ্রাস ঘটুক। উস্‌খুসুনির কমতি হোক, জাতীয় সমস্যার দ্বন্দ্ব অনাবৃত হোক, ব্যক্তি ও সমাজের সংঘর্ষের আগুন জ্বলুক। পশ্চিম থেকে ধার ক'রে সমাজ সমস্যা না এনে আমাদেরই সমাজ জীবনের সহস্র দ্বন্দ্বকে নিরাবরণ করুক নব দৃষ্টির নাট্যকার।

তারপর আসুক নাট্যাধিনায়ক তার নাট্যানুভূতি নিয়ে তার শিল্পী সংঘের সমাবেশে। দৃশ্যপটে সত্যকার ছবি ফুটুক, গীতশিল্পে সত্যকার গান আসুক, মঞ্চের কলাকৌশলে তামাসা না দেখিয়ে নাটকের সত্যকে রূপায়িত ক'রে ধরা হোক্। নাটকের প্রয়োজনে মঞ্চে নব নব উদ্ভাবনার আমদানী হোক্।

এমনি তরো নব প্রেরণা না এলে বঙ্গ মঞ্চ নবরূপ নেবে না। পাকা চুলে কলপই ফেরাবে, নব যৌবন আর আসবে না।

পেশাদার রঙ্গমঞ্চে গৌরবান্বিত ভারতের একমাত্র মহানগরী কলিকাতার রঙ্গালয়গুলির ১৯৪৩ সনের কার্য তালিকা।

১৯৪৩ সাল বাংলা দেশের স্মরণীয় বৎসর। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা মহামারী খাদ্যাভাব প্রভৃতি অঘটনের ভিতর দিয়ে বাংলা দেশকে অগ্রসর হতে হয়েছে। চল্লিশ টাকা মনের চাল, বিমানহানার ভয়, কণ্ট্রোলের দোকানে সার বন্দী হয়ে দাঁড়ান, দুর্মূল্যের বাজারে মানুষ একদিনের জন্যও শান্তি পায় নি। কাজেই যে সব সংস্কৃতিগত জিনিষ আমাদের জাতি ও সমাজের সঙ্গে গড়ে উঠেছে তা কি একেবারেই মুছে যাবে এই ভয়টা হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু থিয়েটারের উৎসাহী দর্শক ও দর্শকাদের যথেষ্ট ভীড় দেখা গেছে এবং এই বৎসর এক সঙ্গে পাঁচ পাঁচটি রংগমঞ্চ সগৌরবে নিজেদের পতাকা বহন করে নিয়ে গেছেন; সুতরাং এর থেকেই বোঝা যায় জীবনের ক্লান্তিকর অবসাদগ্রস্ত একঘেয়েমী থেকে মুক্ত হবার জন্য রাত্রির অন্ধকারের ভিতরও দর্শকদের এই আগ্রহ—এই আগ্রহ থেকেই বোঝা যায় দেশের নাট্যকলার প্রতি, থিয়েটারের প্রতি তাঁদের আসক্তি ও সহানুভূতি কত গভীর। দেশের 'সংস্কৃতি'কে বাঁচিয়ে রাখার এই আগ্রহ সত্যই প্রশংসনীয়।

জাতীয় জীবনে সংস্কৃতি হিসেবে শিল্পকলার স্থান কত উচ্চে বাংগালী একান্ত ভাবেই ধরে রাখতে চেষ্টা করেছে। সংগীত, নৃত্য, নাটক, সাহিত্য, চিত্রকলা প্রভৃতি জাতীয় সম্পদ শতাব্দীর পর শতাব্দী বাংগালীকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে সেটা যদি আজ ক্ষয় হয় তো এর চেয়ে দুঃখ আর কিছু নেই। প্রত্যেক জাতির ইতিহাসেই অরাজকতা লুঠপাঠ যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি দেখা যায় এগুলো সাময়িক কিন্তু শিল্প, নাটক, সাহিত্য এগুলো শাশ্বত তাই ভারতকে বহুবার বহিঃশত্রুর আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছে কিন্তু তার জন্য শিল্পের কোন দিন ধ্বংস হয়নি। সুতরাং এই প্রচণ্ডতম আবহাওয়ার ভিতর রংগালয়কে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টার জন্য দর্শক ও দর্শকাদের মনোভাবের প্রশংসাই করতে হয়।

১৯৪৩ সালের অভিজ্ঞতা থেকে আবার প্রমাণ হয় যে ভাল নাটক যদি ভালভাবে অভিনীত হয় তো দর্শকগণ অকাতরে অর্থ ব্যয় করতে কুণ্ঠিত নন আবার সিনেমার যুগে থিয়েটার অচল এ যুক্তিও খাটে না কারণ তা হলে একসঙ্গে পাঁচ পাঁচটি থিয়েটার কখনই চলতে পারত না। অন্ততঃ নাট্যভারতীতে 'দুই পুরুষ' রংমহলে 'ভোলা মাষ্টার' 'রিজিয়া' শ্রীরঙ্গমে 'মাইকেল মধুসূদন' 'বিপ্রদাস' প্রভৃতি এ কথাই প্রমাণ করেছে।

১৯৭৩ সালের রংগালয়ের উল্লেখযোগ্য শোচনীয় ঘটনা হচ্ছে সুপ্রসিদ্ধ জনপ্রিয় নট দুর্গাদাসের মৃত্যু, হঠাৎ অসুস্থতার জন্য পূজার আসরে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর অনুপস্থিত এবং নাট্যাচার্য শিশির কুমারের শেষের দিকে রংগমঞ্চ থেকে সাময়িক ভাবে অবসর গ্রহন।

"শ্রীরঙ্গম"

এখানে ১৯৭৩ সালে জানুয়ারী মাসে সামাজিক নাটক "মায়া" এপ্রিল মাসে 'মাইকেল মধুসূদন', জুন মাসে আরব্য উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে "ভিখারীর মেয়ে" নভেম্বর মাসে শরৎচন্দ্রের 'বিপ্রদাস' ও ডিসেম্বর মাসে মধ্য সাপ্তাহিক আকর্ষণ হিসাবে 'তাইতো' প্রভৃতি পাঁচখানি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে।

"মায়া" একজন অখ্যাত নামা নাট্যকারের রচনা—মামুলী গল্পকে নবরূপ দিয়ে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা আছে সুতরাং এই নাটকে কিছু ভিন্ন সুরের আভাস পাওয়া যায়। শিশির কুমার প্রমুখ শ্রীরঙ্গমের সকলেই এই নাটকে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

"মাইকেল মধুসূদন"

যতগুলি নাটক এখানে অভিনীত হয়েছে রচনার দিক দিয়ে মাইকেল মধুসূদনই সব চেয়ে ভাল। কি রচনার দিক

নাট্যাচার্য শিশির কুমার—শ্রীরঙ্গমের সব প্রকার উন্নতির মূলে রয়েছে যার সবোতমুখী প্রতিভা। (মাইকেল নাটকে মাইকেলের রূপসজ্জায়)।

শ্রীযুক্ত শৈলেন চৌধুরী- যার অনিন্দনীয় অভিনয় চিত্র এবং নাট্যামোদীরা এক বাক্য মেনে নেবেন। শ্রীরঙ্গমের সংগে এঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ (মাইকেল নাটকে বিদ্যাসাগরের রূপসজ্জায়)।

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী সুদক্ষ নট বলেই এতদিন আমাদের কাছে পরিচিত ছিলেন বর্তমানে তাঁর নাট্য পরিচালন প্রতিভার ও আমরা সন্ধান পেয়েছি। (বিপ্রদাসে—বিপ্রদাসের রূপসজ্জায়)।

শ্রীমতী মলিনা দেবী চিত্র জগতের এই জনপ্রিয় অভিনেত্রী- বিপ্রদাস নাটকে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে স্বীয় প্রতিভায় বিস্ময়ের উদ্রেক করেছেন। (বিপ্রদাসে বন্দনায় রূপসজ্জায়)।

দিয়ে কি অভিনয়ের দিক থেকে কি দৃশ্য সজ্জা এ নাটক খানি শ্রীরঙ্গমের অপূর্ব নিবেদন। উপসংহারটুকু এই নাটকের আকর্ষনীয় ও উল্লেখযোগ্য কারণ রংগমঞ্চ ও প্রেক্ষা গৃহের সঙ্গে একটি শোভন এবং আকাংখিত যোগ রক্ষা সম্ভবপর হয়েছে।

"ভিখারীর মেয়ে"

মধ্য সাপ্তাহিক প্রোগ্রাম হিসাবে আরব্য উপন্যাসের গল্প অবলম্বনে পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "দরদী" নাটক 'ভিখারীর মেয়ে' তে রূপ পেয়েছে। এখানি হাল্কা নৃত্য গীত বহুল নাটক। রঞ্জিত রায়, শৈলেন চৌধুরী, কানু বন্দ্যো, জীবেন বসু, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। সংগীতে সুরস্রষ্টা রঞ্জিত রায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

"বিপ্রদাস"

শরৎ চন্দ্রের অনুপম উপন্যাস বিধায়ক কর্তৃক নাটকায়িত হয়ে নভেম্বর মাস থেকে মহাসমারোহে অভিনীত হচ্ছে। শ্রেষ্ঠাংশে বিশ্বনাথ ভাদুড়ী ও মলিনা অভিনয় করছেন। শিশির কুমারের শিক্ষাগুণে ও প্রযোজনায় এই নাটকটি দর্শকদের দিনের পর দিন তৃপ্তি দান করে আসছে।

রাজলক্ষ্মী—শ্রীরঙ্গম

সুরুচি দেবী—মাইকেলে

"তাইতো"

আধুনিক সমাজের ওপর ভিত্তি করে বিধায়কের এই হাস্যরসাত্মক নাটক দর্শকদের হাসির খোরাক জুগিয়ে আসছে। গত ডিসেম্বর মাসে এই নাটকটি প্রথম আত্ম-প্রকাশ করে সগৌরবে এখনও চলছে। বাঁচতে হলে মানুষের খানিকটা আমোদ প্রমোদের দরকার। প্রাণ খুলে হাসা আজকালকার দিনে সমস্যা তাই এই নাটকখানি নিছক অনাবিল আনন্দ পরিবেশনের উদ্দেশ্য নিয়েই লিখিত অথচ সমস্যার কথা বাদ যায়নি। শ্রীমতী মলিনা এই নাটকে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন।

"নট-নটী"

'মাইকেল মধুসূদনে' গৌর বসাকের ভূমিকায় জীবেন বসু, রেভারেণ্ড কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোর ভূমিকায় আদিত্য ঘোষ, মনমোহন ঘোষের ভূমিকায় বিপিন মুখোপাধ্যায় নিজ নিজ অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখিয়ে রংগমঞ্চে নিজেদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

অভিনেত্রীদের মধ্যে আশ্চর্য অভিনয় করেছেন বঙ্গনার ভূমিকায় মলিনা, আঁরিয়েত্তার ভূমিকায় নবাগতা অভিনেত্রী সুরুচি, এ ছাড়া রাজলক্ষ্মী, নিভাননী, রেবা প্রভৃতি সকলেই সুঅভিনয় করে দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হয়েছেন।

নাট্যকার

এখানে নুতন নাট্যকাররা বেশী সুযোগ পেয়েছেন। 'উড়োচিঠির' নিতাই ভট্টাচার্য মধুসূদনে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। ভিখারীর মেয়েব নাট্যকারও নবীন, মায়ার নাট্যকারও একজন অখ্যাতনামা।

নভেম্বর মাসে নাট্য ভারতী থেকে বিশ্বনাথ ভাদুড়ী ও প্রসিদ্ধ চিত্র তারকা শ্রীমতী মলিনা এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। শ্রীমিহির ভট্টাচার্যও এই সময়ে যোগদান করেন।

প্রসিদ্ধ চিত্রতারকা মলিনা রংগমঞ্চে এই প্রথম অবতীর্ণ হলেন। মলিনার 'বন্দনায়' মধ্যে আমরা শরৎ চন্দ্রের বন্দনা কে এত আপন করে পেয়েছি যে এক এক সময় মলিনাকে ভুলে গেছি। মনে হয়েছে আমাদের সামনে শরৎচন্দ্রের অতি আপন বন্দনা। এ ছাড়া 'তাইতো' তেও নায়িকারূপে চমৎকার অভিনয় করেছেন বিশেষতঃ নাটকের শেষ অংশের দিকে তাঁর অভিনয় সত্যই প্রশংসনীয়।

দ্বিজদাসের ভূমিকায় মিহির ভট্টাচার্যের অনবদ্য অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। সম্ভবতঃ এইটাই তাঁর নাট্যজীবনের সফলতম অভিনয়।

রায় সাহেবের ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরী অত্যন্ত চমৎকার অভিনয় করেছেন। গাম্ভীর্য মণ্ডিত বিপ্রদাসের ভূমিকায় বিশ্বনাথ ভাদুড়ী সত্যিকারের রূপটি এত নিষ্ঠার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন যাতে বিপ্রদাস শুধু উপভোগ্য নয়—বিশ্বনাথ বাবু উপযুক্ত নটের সম্মান লাভ করেছেন।

নট বিশ্বনাথ বাবুকে আমরা এই প্রথম পরিচালকরূপে পেলাম। বিপ্রদাস ও তাইতো তাঁর পরিচালনায় যে রকম ভাবে অভিনীত হচ্ছে তাতে আশা করা যায় আমরা ভবিষ্যতে তাঁকে প্রথম শ্রেণীর পরিচালক রূপেই পাব। এক কথায় বিপ্রদাস বহুদিন পরে রংগমঞ্চের একখানি অতি সর্বাঙ্গ সুন্দর নাটক।

রঞ্জিত রায়ের পরিচালনায় সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র বিভাগ খুব উন্নতি করেছে। 'ভিখারীর মেয়ে' তে নতুন ধরণের গানের সুর দিয়ে রঞ্জিত বাবু আমাদের মুগ্ধ করতে সমর্থ হয়েছেন। এইখানে গত নভেম্বর মাস থেকে 'পিয়ানো' যন্ত্র সংগীতের মধ্যে স্থান পেয়েছে। 'বিপ্রদাসের' সুরস্রষ্ঠা এবং সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রীগণ সিনেমা টেকনিকে যন্ত্রের তন্ত্রীতে আঘাত দিয়ে যে নতুন বৈজ্ঞানিক পন্থার সাহায্য নিয়েছেন তাতে দর্শকদের হৃদয় তন্ত্রীতেও আঘাত লেগেছে। এ নৈপুণ্য সময়োপযোগী।

শ্রীরঙ্গমের দৃশ্যসজ্জাও প্রশংসা করতে হয়। মাইকেল মধুসূদনের থেকেই দৃশ্যসজ্জাব উন্নতি আমরা লক্ষ করছি।

এ ছাড়া শ্রীরঙ্গমের পরিচালনার মধ্যে যাঁরা যবনিকাব অন্তরালে আছেন তাঁদের মধ্যে কর্ম সচীব সনৎ কুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ ঋষিকেশ ভাদুড়ী ও বুকিং অফিসের শ্রী সন্তোষ কুমার ভাদুড়ীর নাম উল্লেখযোগ্য।

ষ্টার থিয়েটার

এক শ্রেণীর দর্শক আছেন যাঁরা নৃত্যগীত বহুল নাটক দৃশ্য সজ্জার চটকে থিয়েটারে নিছক আনন্দ পাবার জন্য আসেন। ষ্টার থিয়েটার এত দিন পৌরাণিক নাটক, নৃত্যগীত বহুল নাটক মঞ্চস্থ করে এসেছেন এবং সে দিক দিয়ে যথেষ্ট সমাদার লাভও করেছে নাটকগুলি।

খ্যাতনামা নাট্যকার ও পরিচালক শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত এম, এ মহাশয় যোগদান করে থিয়েটারের standard অনেক উঁচুতে বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং নৃত্যগীত বহুল নাটক বাদ দিয়ে ঐতিহাসিক নাটকের ওপর ভিত্তি করেই নাটক মঞ্চস্থ করে আসছেন। তাঁর পরিচালনায় একাধিক ঐতিহাসিক নাটক খ্যাতনামা নটনটীর সাহায্যে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। মহেন্দ্র বাবু নিজে নাট্যকার শিক্ষিত তাই তাঁর পরিচালনায় সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

নাটক

এখানে বঙ্কিম বাবুর বিখ্যাত উপন্যাস দেবী চৌধুরানী ও দুর্গেশ নন্দিনী মহেন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক নাটকায়িত হয়ে মঞ্চস্থ হয়েছে। এ ছাড়া রানী ভবানী, রণজিৎ সিংহ সোনার বাংলা প্রভৃতি পুরাতন নাটক নতুন পরিকল্পনায় মহেন্দ্র বাবুর পরিচালনায় মধ্যে মধ্যে অভিনীত হয়েছে।

মহারাজা নন্দ কুমার

অষ্টাদশ শতাব্দীর তেজস্বী বাংগালী মহারাজা নন্দ কুমার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বেচ্ছাচারিতা হতে স্বদেশ ও বাংগালীকে মুক্তি দিতে যে সৌর্য ও তেজ দেখিয়েছিলেন তারই ওপর ভিত্তি করে ইস্ট ইণ্ডিয়ার সঙ্গে মহারাজা নন্দ কুমারের সংঘর্ষ-কাহিনী অবলম্বনে মহারাজা নন্দকুমার নাটকটি রচনা করেন।

দুর্গেশ নন্দিনী

মহেন্দ্র বাবু কর্তৃক নাটকায়িত হয়ে নব পরিকল্পনায় বছরের শেষের দিকে বেশ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছে।

নট-নটী

ভূমেন রায়, ভুপেন চক্রবর্তি, সিধু গাঙ্গুলী, সুনীল মুখার্জি, জয় নারায়ন মুখার্জি, জীবন গাঙ্গুলী, পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, বিপিন গুপ্ত, মিহির মুখার্জি, গোপাল মুখার্জি, উষা দেবী, অপর্ণা দেবী, বীনা দেবী, রেখা দত্ত, নিরুপমা প্রভৃতি চরিত্র রূপায়নে প্রত্যেক নাটককে সাফল্য মণ্ডিত করে তোলার চেষ্টা করেছেন।

স্টারের সুরশিল্পী অমর বোস ও গায়ক ধীরেন দাস প্রত্যেক নাটকে সুর সংযোজনা করেছেন।

বিখ্যাত অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে রানী ভবানী, রণজিৎ সিংহ ও সোনার বাংলাতে সুর সংযোজনা করেছেন এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন।

৺পরেশ বসু পরিকল্পিত চমকপ্রদ দৃশ্যপট স্টার থিয়েটারের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি মঞ্চশিল্পী হিসাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। বিগত ১৮ই জানুয়ারী তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁর পর থেকে নাট্যকার ও পরিচালক মহেন্দ্র গুপ্ত মঞ্চশিল্পের ভার নিয়েছেন। শ্রীমতী নীহার বালা এখানকার নৃত্যশিল্পী তাঁর শিক্ষকতায় হাস্যে লাস্যে নৃত্যে নাটকগুলি বিশেষ উপভোগ্য হয়ে ওঠে এবং বিপুল দর্শক আকর্ষণ করে। বিমল ঘোষ এখানকার গায়ক এবং বুকিং অফিসের কর্মকর্তা শ্রীঅবিনাশ ভট্টাচার্যও প্রতিষ্ঠানের উন্নতির মূলে জড়িত আছেন।

সর্বশেষে স্টারের নবীন সত্বাধিকারী বন্ধুবর সলিল মিত্রের নাম উল্লেখ না করলে সমস্ত আলোচনাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে স্টারের আজকের উন্নতির মূলে নাট্যকার পরিচালক মহেন্দ্র গুপ্ত এবং সত্বাধিকারী সলিল মিত্র উভয়েই সবচেয়ে বেশী কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন।

আর একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা পেশাদার রংগমঞ্চে সর্বপ্রথম শিশু নাট্যাভিনয়ে (সব শিশুদের দেশে) এদের সাহায্য এবং সহানুভূতি রূপমঞ্চ শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ রাখবে।

নাট্যভারতী

পুরাতন 'অ্যালফ্রেড থিয়েটার' ১৯৩৯ সালের ৫ই অগষ্ট 'নাট্যভারতী' নাম নিয়ে দর্শকদের সামনে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৪৪ সালের নববর্ষের সঙ্গে ২রা জানুয়ারী এই নাট্যগৃহের দ্বার বন্ধ হয়। এই তিন বৎসরের ওপর নাট্যভারতী রংগমঞ্চের বিশিষ্ট বিশিষ্ট অভিনেতা ও অভিনেত্রী-দের দিয়ে সাফল্যের সঙ্গে নাট্য রসপিপাসুদের খোরাক যুগিয়ে এসেছে। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গোড়ার দিকে স্বর্গীয় জনপ্রিয় নট দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জড়িত ছিলেন এবং এখানে পরিচালকরূপে কয়েকখানি নাটকেরও পরিচালনা করেন তারপর অহীন্দ্র চৌধুরী এখানে যোগদান করেন। অহীন্দ্র বাবু কিছুকাল থেকে আবার এখান থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

বিজয় কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যবস্থাপনায় ও শিশির মল্লিকের প্রচেষ্টায় নাট্যভারতী নাট্যজগতে কিছুকাল নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে নুতন নুতন নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে এসেছে।

১৯৪৩ সালের নাটক ও নাট্যকার

১৯৪২ সালের সাফল্য মণ্ডিত নাটক 'দুই পুরুষের' জনপ্রিয়তা দেখে ১৯৪৩ সালেও কর্তৃপক্ষ পুরোদমে এই নাটকটিকে মঞ্চস্থ করেছেন। নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাল মার্কসের থিয়োরী অবলম্বনে লেখা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই নাটক অভিনয়ের গুণে শত রজনী অতিক্রম করার সৌভাগ্য লাভ করে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই পুরুষের সাফল্য লাভে উৎসাহিত হয়ে কর্তৃপক্ষ এঁরই প্রণীত 'পথের ডাক' মঞ্চস্থ করেন। দর্শকদের ভিতর জাতীয়তা বোধ জাগানই এই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বেশ একটা নতুন পথ ধরে এই নাটক অগ্রসর হয়েছিল কিন্তু জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। নাটক হিসাবে পথের ডাক উচ্চ শ্রেণীর নাটক নাট্যকারের নিজের এই অভিমত।

শরৎচন্দ্রের অপূর্ব উপন্যাস 'দেবদাস' এখানে ৩রা জুলাই ১৯৪৩ সালে মঞ্চস্থ হয়। নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত এই উপন্যাসটির নাট্যরূপ দেন। নাট্যভারতীর বিশিষ্ট বিশিষ্ট নট্ নটী এই নাটকে অভিনয় করেছেন। প্রথম কয়েক রজনী অসংখ্য জনসমাগম হলেও নাটকটী নাট্যরূপের দোষেই হক বা অভিনয়ের দরুণই হক জনসাধারণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়নি।

১৮ই নভেম্বর ১৯৪৩ সালে শচীন সেনগুপ্ত বিরচিত নতুন ঐতিহাসিক নাটক ধাত্রী পান্না অভিনীত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের ধাত্রী পান্নাই শেষ নাটক। এব পরই নাট্য ভারতী অস্তমিত হয়।

এ ছাড়া মধ্যসাপ্তাহিকে কয়েকখানি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নাটক যেমন সিরাজদৌল্লা, সাজাহান, চরিত্রহীন, মন্ত্রশক্তি, পথের সাথী, কর্ণার্জুন প্রভৃতি নিয়মিত অভিনীত হয়েছে।

অভিনেতৃবর্গ

নির্ম্মলেন্দু, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, নরেশ মিত্র, রবি রায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, জহর গাঙ্গুলী, মিহির ভট্টাচার্য্য, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, কুমার মিত্র, জীতেন গাঙ্গুলী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, প্রভা, রাজলক্ষ্মী, (বড়) ঊষা, শেফালিকা (পুতুল), ছায়া, পূর্ণিমা, বেলা, চারুবালা, অঞ্জলি প্রভৃতি এই প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত অভিনয় করেছেন। ছবি বিশ্বাস ও স্বর্গত যোগেশ চন্দ্র চৌধুরীও এই প্রতিষ্ঠানে কিছুকাল ছিলেন।

দুই পুরুষে নুট বিহারীর ভূমিকায় বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, গুপী নাথের ভূমিকায় নরেশ মিত্র, শিব নারায়ণের ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, মহাভারতের ভূমিকায় রবি রায়, বিমলার ভূমিকায় প্রভা ও কল্যানীর ভূমিকায় অঞ্জলি রায়, প্রভৃতি নিজেদের অভিনয় মাধুর্যে অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন।

অভিনেতাদের মধ্যে আশ্চয অভিনয় করেছেন নুট বিহারীর ভূমিকায় বিশ্বনাথ ভাদুড়ী। এছাড়া নরেশ মিত্র জহর গাঙ্গুলী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, রবি রায়, নির্ম্মলেন্দু লাহিরী, কুমার মিত্র প্রভৃতিও বেশ ভাল অভিনয়ই করেছেন।

বিশ্বনাথ ভাদুড়ী নাট্য ভারতী পরিত্যাগ করবার পর ছবি বিশ্বাস নূট বিহারীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। অনেকেরই অভিমত ছবি বাবুর অভিনয়ে নাট্যকারের এই চরিত্রটী আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

দেবদাসে নাম ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী, বসন্তর ভূমিকায় নরেশ মিত্র, ভুবনের ভূমিকায় বিশ্বনাথ, চুনিলালের ভূমিকায় কৃষ্ণধন, চন্দ্রমুখীর ভূমিকায় ছায়া এবং পার্ব্বতীর ভূমিকায় শ্রীমতী সরযুবালা নিয়মিত অভিনয় করেছেন।

দেবদাসে পার্ব্বতীর ভূমিকায় শ্রীমতী সরযূবালা আশ্চর্য্য অভিনয় করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এরকম প্রাণবন্ত অভিনয় বহুকাল দেখা যায়নি।

'পথের ডাকে' রায় বাহাদুর নরেশ মিত্র, ডাঃ চ্যাটার্জ্জী বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, নিখিলেশ,—জহর গাঙ্গুলী,—কানাই-কুমার মিত্র,—কুড়োরাম, কৃষ্ণধন, অতুল, মিহির ভট্টাচার্য্য, ভক্তরাম—রবি রায়, জ্যোতির্ম্ময়ী,—প্রভা,—সুনন্দা,— ছায়া,—রমা,—চারুবালা প্রভৃতি অভিনয় করেছিলেন।

নাট্যভারতীর খ্যাতনামা নটনটী ছাড়াও মধ্য সাপ্তাহিকে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকে শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিরী নিয়মিত অভিনয় করেছেন। সাজাহানে ঔরংজীব কর্ণার্জ্জুনে—কর্ণ, সিরাজদ্দৌলায়—সিরাজ প্রভৃতি সুঅভিনয়ই করেছেন।

এছাড়া কুমার মিত্র, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, বেলা, উমারানী, রাজলক্ষ্মী (বড়), চারুবালা প্রভৃতিও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ধাত্রীপান্নায় সেনানী—কুমার মিত্র, বনবীর,—জহর গাঙ্গুলী বিক্রমজীৎ—কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, জগমল—রবি রায়, করম চাঁদ শিবকালী, চম্পা—ছায়া, শীতলসেনী—প্রভা, প্রান্না—সরযূবালা প্রভৃতি অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

পরিচালনা

সতুসেনের প্রযোজনায় ও নরেশ মিত্রের পরিচালনায় সমস্ত নাটকগুলি অভিনীত হয়েছে।

কুমার মিত্র অভিনয় ছাড়াও নৃত্য শিক্ষকরূপে শিক্ষাদান করেছেন। সঙ্গীত শিক্ষক হিসাবে ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন।

ব্যবস্থাপক ছাড়াও বিজয় কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় দৃশ্যসজ্জা ও মঞ্চশিল্পীরূপে নাট্যভারতীর জন্য শেষদিন পর্যন্ত আপ্রাণ পরিশ্রম করেছেন।

"মাইকেলে" শিশির কুমার

রবিবার ২রা জানুয়ারী ১৯৪৪ বেলা ২॥০ টায় প্রথম অভিনয় 'দেবদাস' ও দ্বিতীয় অভিনয় 'দুইপুরুষ' হয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৪৩ সালের উল্লেখ যোগ্য ঘটনা হচ্ছে নাট্য ভারতীর কর্ত্তৃপক্ষ বঙ্গের মহামান্য গভর্ণরের উপস্থিতিতে ভারতীয় রেড ক্রস সাহায্যের জন্য বৃহস্পতিবার ১৯শে আগষ্ট সন্ধ্যা ৬টায় নানা প্রতিষ্ঠানের অভাবনীয় অভিনেতৃ সহযোগে 'সাজাহান' অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন ভূমিকায় নাট্য ভারতীর কুশীলবগণ ছাড়াও ছবি বিশ্বাস, ভূমেন রায়, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী প্রভৃতি অবতীর্ণ হন।

'দেবদাস'—৫৭ অভিনয় রজনী অভিনীত হয়েছে।

রঙ্গমহল

১৯৪৩ সালে ভাগ্যলক্ষ্মী এই থিয়েটারের প্রতি সুপ্রসন্না। এখানে ১৯৪৩ সালের পুরো বছর বহু নূতন, পুরাতন, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক নাটক প্রভৃতি মহাসমারোহে অভিনীত হয়েছে এবং আশাতীত জনসমাগম হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান লোকের মনস্তত্ত্ব বুঝে বেশ একটা standard বেঁধে ফেলেছেন যার ফলে ব্যবসার দিক থেকে এঁদের ঠকতে হয়নি।

নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠানের পুরোভাগে থেকে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন এবং অভিনয়ের দিক থেকে নিজেদের গৌরব অক্ষুন্নই রেখেছেন। হঠাৎ অসুস্থতা বশতঃ পূজার কটা দিন অহীন্দ্র বাবু অভিনয়ে যোগদান করেন নি। বর্তমানেও তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন।

নাটক ও নাট্যকার

অয়স কান্ত বক্সী প্রণীত নাটক ভোলা মাষ্টার ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৪২ সালে মঞ্চস্থ হয় এবং গোটা ১৯৪৩ সাল ধরে মহাসমারোহে অভিনীত হয়। অয়সকান্তের ভোলা মাষ্টার বিষয় বস্তুর দিক দিয়ে বাংলা রঙ্গমঞ্চে সম্পূর্ণ নূতন। তাই এই নাটকখানি দর্শক মনে একটা অভূতপূর্ব সাড়া দিয়েছিল। কিন্তু আদর্শের দিক দিয়ে ভোলা মাস্টার ধর্মচ্যুত। অহীন্দ্র চৌধুরী ও রাণীবালা প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করে ভোলা মাষ্টারের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

মহেন্দ্র গুপ্ত রচিত নাটক 'মাইকেল' ৫ই জুন ১৯৪২ সালে মঞ্চস্থ হয়। মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের জীবনী নিয়ে এই নাটকটি লেখা হয়। নাটকটি ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে শ্রীরঙ্গমে 'মধুসূদন' অভিনীত হবার পর থেকে আবার অভিনীত হতে থাকে। অহীন্দ্র চৌধুরী নাম ভূমিকায়, রাণীবালা হেন্ রিয়েটার ভূমিকায় রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় আর্ডেনের ভূমিকায়, সন্তোষ সিংহ—গৌরদাসের ভূমিকায়, বেলা রাণী—জাহ্নবীর ভূমিকায় অভিনয় করেন।

মনোমোহনের প্রসিদ্ধ নাটক 'রিজিয়া' নতুন ভাবে নব পরিকল্পনায় অহীন্দ্র চৌধুরী, রাণীবালা প্রমুখ শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃ সম্মেলনে ১৯৪৩ সালের ২রা সেপ্টেম্বর আত্মপ্রকাশ করে।

প্রমথনাথ বিশি বিরচিত হাস্য কৌতুক নাটক 'সানিভিলা' ১৯৪৩ সালের ২৩শে ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হয়।

এছাড়া নতুন নাটকের মর্যাদা নিয়ে এবং এই প্রতিষ্ঠানের নটনটী নিয়ে শচীন সেনগুপ্তর তটিনীর বিচার, জলধর চট্টোপাধ্যায়ের পি, ডব্লু, ডি, বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের মাটির ঘর, রমেশ গোস্বামীর কেদার রায়, ৺রবীন্দ্র মৈত্রের মানময়ী গার্লস স্কুল, ৺অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের কর্ণার্জুন, মন্ত্রশক্তি এবং চরিত্রহীন, সরলা প্রভৃতি মধ্য সাপ্তাহিক আকর্ষণ হিসাবে অভিনীত হয়েছে।

নটনটী

১৯৭৩ সালে অহীন্দ্র চৌধুরী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ দাস, তারা কুমার ভট্টাচার্য্য, সুশীল ঘোষ, প্রফুল্ল দাস, বঙ্কিম দত্ত, ভানু চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, বিজয় কার্ত্তিক দাস, রাণীবালা, সুহাসিনী, বেলা, রাধা, পূর্ণিমা প্রভৃতি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও আছেন।

এখানে প্রত্যেক নাটকটির সুর দিয়েছেন তারা কুমার ভট্টাচার্য্য, পরিচালনা করেছেন অহীন্দ্র চৌধুরী এবং বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য (নান্টু বাবু) মঞ্চশিল্পী রূপে কাজ করেছেন। প্রচার বিভাগের ভার নিয়ে আছেন সন্তোষ মুখোপাধ্যায় বুকিং অফিস সকাল ৮ থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকে, অগ্রিম সিট রিজার্ভ হয় এবং কুলদা সেনগুপ্ত ও ক্ষিতীশ মুখোপাধ্যায় বুকিং অফিসের ভারপ্রাপ্ত সুযোগ্য কর্মচারী।

মিনার্ভা থিয়েটার

মিনার্ভা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষদের সংগে আমাদের প্রতিনিধি দেখা করলে- যেভাবে অভদ্রোচিত ব্যবহার করেন এবং মিনার্ভা সংক্রান্ত সংবাদ ও তথ্যাদি দ্বারা আমাদের সহযোগীতা করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন—তাতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। মিনার্ভার এই অভদ্রোচিত ব্যবহারের কোন তাৎপর্য উপলব্ধি করা আমাদের বুদ্ধির বাইরে। কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতার জন্যই আমরা মিনার্ভা সম্পর্কে কোন ধারাবাহিক সংবাদ দিতে পারলুম না বলে পাঠকবর্গের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। রূপ মঞ্চের এই সংখ্যার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে আশা করি কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে নিজেদের দুর্ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হয়ে আমাদের সহযোগিতা করবেন। —নাট্যদূত

সব বিষয়েই দু'পাঁচ কথা

— শ্রীপঞ্চক

পাশের জুলুম

কয়েক দিন পূর্বে সহরের কোন সিনেমা ম্যানেজারের ঘরে বসে থাকা কালে একটা ব্যাপার দেখা গেল। সেন্সার বোর্ডের সভ্য জনৈক এম, এল, এ শো আরম্ভ হবার সময় তাঁর পদাধিকার বলে প্রাপ্ত সিনেমা প্রবেশের ছাড়পত্রখানা ম্যানেজার সমীপে পেশ করে দাঁড়ালেন। উক্ত সিনেমাতে সেদিন থেকে হলো একখানি নতুন ছবি মুক্তিলাভ করেছে এবং প্রত্যেকটি শো-ই হাউস-ফুল যাচ্ছে। এম, এল, এ ভদ্রলোক এসে দাঁড়াবার আগে থেকে হাউস-ফুলই ছিল। ম্যানেজার তাই তাঁকে সবিনয়ে জানালেন যে—মাত্র গতকাল আপনি একবার দেখে গিয়েছেন; এখন হাউস-ফুল যাচ্ছে, তা আপনি না হয় আর কোনদিন আসুন না।" মাধ্যমিক শিক্ষাবিল আলোচনায় গরম পরিষদ কক্ষ থেকে সদ্য ফেরত এম, এল, এ রীতিমত চটে গেলেন; "আমার যখন খুসী আসবো, প্রত্যেক শো-তে আসবো, আপনি যায়গা দিতে বাধ্য!" একথার পর ম্যানেজার আর বলবে কি—পুলিশ কমিশনারের নিজের সই করা হুকুম-পত্র যখন সামনে রয়েছে! টিকিট ক্রেতাকে বঞ্চিত করে সেই মাননীয় ভদ্রলোককে আসন ক'রে দিতে হ'লো। কিন্তু মজা এমনি তিনি নিজে ছবি দেখলেন না, অপর দু'জনকে বসিয়ে চলে গেলেন।

ম্যানেজারের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে পরে জানা গেল যে উক্ত ছবিখানি আরম্ভ হবার পরদিনই সেন্সার বোর্ডের অপর একজন সভ্য এবং তিনিও পরিষদ সদস্য, নিজে ছবি দেখতে না এসে অপর তিনজনকে নিজের নামের কার্ডখানি দিয়ে পাঠিয়ে দেন—কার্ডে দুজনের প্রবেশাধিকার থাকলেও তাঁরা তিনটি আসন দাবী করেন, পরে অবশ্য একখানা টিকিট অনুগ্রহ করে কিনেছিলেন।

সেন্সার বোর্ডের সভ্যেরা কেন যে এই সুযোগটি পেয়ে আসছেন তার কোন কারণই আমাদের বোধগম্য হয় না। সেন্সার না হ'লে ছবি সাধারণ্যে মুক্তিলাভ করতে পারে না, আর সেন্সারই যদি হ'য়ে যায় তাহলেও সেন্সার বোর্ডের সভ্যদের সঙ্গে সম্পর্ক কিসের? ছবি মুক্তিলাভ করার পরে যদি আপত্তিকর কিছু আবিষ্কৃত হয় তো তার জন্য সেন্সার বোর্ডের সভ্যদের দেখাতে একটা বিশেষ প্রদর্শনী করিয়ে নেওয়া যায়, এমন হ'য়েওছে ইতিপূর্বে—তৎসত্ত্বেও আলাদা ক'রে সভ্যদের যখন খুসী ছবি দেখবার অধিকার কেন দেওয়া হ'য়েছে? সভ্য হওয়ার পারিশ্রমিক হিসেবে নয় নিশ্চয়ই! আর, মর্যদাসম্পন্ন বিশিষ্ট পৌরজন বলে সিনেমাতে তাঁদের অবাধ প্রবেশাধিকার থাকবে, এমন যুক্তিও হ'তে পারে না।—তবে?

এই পাশ প্রসঙ্গে ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করে আরও অনেক কথা জানা গেল। জানা গেল যে সরকারী এবং পৌরসভার পদস্থ ব্যক্তিরা তাঁদের পদাধিকারের জোরে কি ভাবে পাস নেন, শুধু নিজেরা বিনা পয়সায় দেখেই ক্ষান্ত হন না, কেউ কেউ যদেচ্ছা পাস লিখে অপরকেও পাঠিয়ে দেন। তাঁদের ক্ষমতার কথা মনে করে ম্যানেজারের পক্ষে সেই সব পাস অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয় না। এবিষয়ে পদস্থ লোকেদের যদি এতটুকু চক্ষুলজ্জা থাকে। তাঁরা দেখছেন শুনছেন যে হাউস এমনি ভর্তি যাচ্ছে যে কাতারে কাতারে দর্শক টিকিট না পেয়ে হতাশ হ'য়ে ফিরে যাচ্ছে, তা সত্ত্বেও তাঁদের বিনা মূল্যে আসন দিতেই হবে। আর ন—স্থান—তিল ধারণেৎ অবস্থাতেই বেশী তাঁদের চাহিদা।

সিনেমার পাস দেওয়া হয় খাতিরে, আর না হয় ব্যবসা সংশ্লিষ্টে (শ্লাইড, বোর্ড ইত্যাদির জন্য)। শেষোক্তরা পাসের জন্য তবু দাবী করতে পারে কিন্তু খাতিরে যারা পাস পায় তারা দাবী করবার অধিকার পায় কোত্থেকে? সেই জন্য জোর ক'রে আদায় করার ঔদ্ধত্য পদস্থ সরকারী কর্মচারী ছাড়া আর কার থাকবে বলুন?

গান্ধীজীর চিত্রদর্শন

অবশেষে গান্ধীজী চলচ্চিত্র দর্শন ক'রলেন! এটা বড়

সামাষ্য ঘটনা নয়। ইতিপূর্বে বহুবার অনুরুদ্ধ হ'য়েও গান্ধীজী চলচ্চিত্রের প্রতি এ অনুকম্পাটুকু প্রকাশ করতে রাজী হননি, বরঞ্চ চলচ্চিত্র যে দেশের নৈতিক পতনে সহায়তা করছে এই মতের দ্বারা ঘৃণাই প্রকাশ ক'রছেন। অদ্ভুত মানুষ কিন্তু গান্ধীজী! চলচ্চিত্র না দেখার গোঁ তিনি শেষ পর্যন্ত ভাঙলেন কিন্তু তাঁর মত একজনকে প্রথম দর্শক পাবার পরম সৌভাগ্য থেকে স্বদেশী ছবি বঞ্চিত হ'ল। কারণ যে ছবিখানি সে সম্মান পেল তা তাঁর স্বদেশে তোলা স্বদেশী ছবি নয়, 'মিশন টু মস্কো' নামক একখানা আমেরিকান ছবি। হয়তো এই বিসদৃশতাকে ঢাকা দেবার জন্যেই পরে তিনি একখানা দিশী ছবির প্রতি কৃপা দৃষ্টি ক'রেছেন —এ ছবিখানি হ'চ্ছে 'রাম রাজ্য'। গান্ধীজীর মত একজনকে দর্শক পাওয়া চলচ্চিত্রজগতের কাছে পরম গৌরবের বিষয় কিন্তু দুঃখ এই যে সে গৌরব দেশের কেউ না পেয়ে পেলো বিদেশী—অন্ততঃ গান্ধীজীর কাজ থেকে এ অপমান ভারতীয় চলচ্চিত্র জগত আশা করেনি। অথচ গান্ধীজীই হ'চ্ছেন একমাত্র নেতা যাঁর মত, পথ ও নীতি পাকেপ্রকারে ভারতীয় চিত্রের মধ্যে ব্যপকভাবে প্রচারিত হ'য়েছে —তাঁর হরিজন ও পল্লীউন্নয়ন সমস্যা যুক্ত নেই গত কবছরে বম্বের তোলা এমন কোন সামাজিক ছবি পাওয়া দুষ্কর। সাধারণতঃ ভারতীয় চলচ্চিত্র রাজনীতি থেকে দূরেই থাকে কিন্তু তার মধ্যেই যদি কোন নেতার বানীকে কার্যকরী ক'রে তুলতে সহায়তা ক'রে থাকে তো তিনি হ'চ্ছেন গান্ধীজী। সেই গান্ধীজির কাছ থেকে এমন ব্যবহার ভারতীয় চিত্রশিল্প আশা করেনি।

সাংবাদিকদের দায়িত্বহীনতা

চলচ্চিত্র সাংবাদিকরা ইদানিং যে দস্তরমত গাফিলতি ক'রছেন এনিয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। ফল কিছু হয়নি। বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংঘকে এব্যাপারটি বিষয়ে অবহিত হবার জন্য জানিয়েছিলাম, তাঁরা কি ক'রেছেন জানিনা কিন্তু অবস্থা যথাপূর্বং। চলচ্চিত্রশিল্পকে গড়ে তোলার কৃতিত্বে সাংবাদিকরা যেমন অংশীদার তেমনি তার পতনের দায়িত্বও তাঁদের কম নয়। সাংবাদিকদের কথায় কেউ কর্ণপাত করে না এটা ভুল ধারণা। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ করলে অনুমিত হয় তাঁরা এই Complexএই সেবক। সাংবাদিকদের অন্যতম কাজ উন্নতির উপায় নির্ধারণ করা আর সেই নির্ধারণ মত কাজ যাতে হয় তার জন্যে জনমত গড়ে তোলা—এবিষয়ে আমাদের সাংবাদিকরা একেবারেই অকর্মণ্য। ছবির সমালোচনা তো একরম উঠেই গেছে বললে হয়। এক 'রূপমঞ্চ' ছাড়া (বিজ্ঞাপন নয়) আর কোন দৈনিক কি, সাপ্তাহিক কি আর মাসিকই বা কি কোন 'ই-কেই ছবির যথার্থ সমালোচনা ব'লতে থাকেই না কিছু। সমালোচনার নামে যা বের হয় বড়জোর সেটাকে একটা 'Write-up' বলে ধরা যায়। এর আর উদাহরণ দেবার দরকার হবে না, কারণ পাঠকরাও নিশ্চয়ই এবিষয়টি লক্ষ্য ক'রে আসছেন। ছবির সমালোচনা ছাড়া আরও বহুবিধ সমস্যা আছে, অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি ন্যায় অন্যায় বিষয় আছে; আর সে সব যদি সাংবাদিকরা হাতে তুলে না নেয় তো সমস্যার সমাধান, অন্যায়ের প্রতিকার হয়ই বা কি ক'রে? কেবল মাত্র অর্থের লোভে প্রযোজকদের দল যা ইচ্ছে তাই ক'রে শিল্পটিকে নিয়ে খেলা ক'রে যাবে আর সে বিষয় নিয়ে কেউ কিছু বলবে না! এই ধরুণ না 'বিদেশিনী' ছবিতে কাননের মত অত বড় এক শিল্পীর প্রতিভাকে খুন করা হ'য়েছে—কেউ তো বললে না কোন কথা। বড়ুয়া যে নিজের ব্যক্তিত্ব ও খ্যাতির সুযোগ নিয়ে ছবি তোলার নামে বাঙলা চিত্রকে কলঙ্কিত ক'রছে—কেউ তো তাঁকে জানাচ্ছে না সে কথা। ছবির লাইসেন্স প্রাপ্তি ব্যাপারে বাঙলার ওপরে কেন্দ্রীয় সরকারী বিভাগ অন্যায় ক'রেছে—কে তাই নিয়ে লড়াই ক'রছে? হিন্দী ছবি এসে বাঙলা ছবিকে একেবারে কোণটাসা ক'রে দিচ্ছে—সাং-

বাদিকরা তা রোধ করার বিষয়ে আজো কোন আলোচনা করেছে কি? শুধু বছরের শেষে শ্রেষ্ঠত্বের বিচার ক'রলেই সব দায়িত্ব থেকে রেহাই পাওয়া যায় না, চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়েই নিজেদের সজাগ ও সক্রীয় রাখতে হবে। সাংবাদিকরা জনগণের মুখপাত্র -- তাদের নিস্পৃহতার জন্য জনগণ কৈফিয়ত দাবী করবেই।

প্রদর্শকদের নতুন রূপ

একটা দিন ছিল যখন ছবি পাবার জন্য প্রদর্শকরা পরিবেশক ও প্রযোজকদের কাছে ধর্না দিয়ে পড়ে থাকতো, খোসামোদ ক'রতো এবং অনেক ক্ষেত্রে ঘুসঘাসও দিতো। লড়াইয়ের গুণে আজ চাকা ঘুরছে উল্টো দিকে; আজ পরিবেশক আর প্রযোজকরা নিজেদের ছবিকে মুক্তি দেবার জন্য প্রদর্শকদের নানা ভাবে তোয়াজ ক'রতে বাধ্য হচ্ছে। কোন কোন প্রান্তে তোয়াজের মাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ারও খবর পাওয়া যাচ্ছে। বম্বে এবং উত্তর ভারতের অবস্থা এবিষয়ে বিশেষ শঙ্কাজনক। শোনা যায় বম্বে এবং দিল্লী ও লাহোর প্রভৃতি স্থানে ছবি মুক্তি দেবার জন্য কোন কোন পরিবেশক প্রদর্শকদের বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত সেলামী দিচ্ছেন। বম্বের কোন প্রদর্শকের দাবী হ'চ্ছে যে, কেউ তাঁর চিত্রগৃহে ছবির মুক্তিদান চাইলে তাঁকে সপ্তাহ পিছু ছহাজার টাকা সেলামী দিতে হবে এছাড়া ছবির আয়ের ওপর ভাগ তো আছেই। কলকাতার অবস্থা বর্তমানে ঠিক এতটা না হলেও অচিরে যে প্রদর্শকরা মহাজন পথ অনুসরণ করবে তাতে ভুল নেই।

এককালে যারা অবহেলিত হ'য়ে এসেছে তারা আজ পায়ের ওপর পা দিয়ে সেদিনের কর্তাদের ওপর কর্তৃত্ব ক'রছে—দেখতে শুনতে ব্যাপারটা পাকা সিনেম্যাটিক কিন্তু শিল্প-বাণিজ্যের নীতির দিক থেকে খুব শুভ অবস্থার সূচনা এ থেকে পাওয়া যায় না। ছবির প্রদর্শনকাল তাতে বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে ছবি জমে যাচ্ছে সব পরিবেশকের কাছেই। কলকাতায় একযোগে দুতিনটে চিত্রগৃহে মুক্তি দেবার ব্যবস্থা খুব চালু হওয়ায় খানিকটা তবু সুরাগ আছে। কিন্তু অন্যত্র তো তা হ'চ্ছে না। আর ছবি জমে যাওয়া মানে লাখ লাখ টাকা বেকার ফেলে রাখা—তা তো সম্ভব নয়; এদিকে নতুন চিত্রগৃহ নির্মাণের উপায় নেই, টাকা ঢাললেও মালমশলার অভাবে নতুন চিত্রগৃহ নির্মাণের পথ বন্ধ ক'রেছে। সুতরাং যে কটি চিত্রগৃহ আছে সেইগুলি নিয়েই পরিবেশকদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছে আর এই সুযোগের সুবিধে প্রদর্শকরা এখন পুরোমাত্রায় নিতে উদ্যত হ'য়েছে।

এ অবস্থার একমাত্র প্রতিকার হ'চ্ছে ছবির প্রদর্শনকাল সংক্ষিপ্ত ক'রে দেওয়া যাতে বেশী সংখ্যক ছবি মুক্তি পায়। তা ক'রতে গেলে সপ্তাহে চিত্রগৃহে যা বিক্রী হয় তার ন্যূনতম অঙ্ক বাড়িয়ে দেওয়া, যেমন—এমন যদি থাকে যে সপ্তাহে তিন হাজার টাকা বিক্রী হ'লেই ছবি চলতে থাকবে সেক্ষেত্রে ওই অঙ্ক বাড়িয়ে যদি পাঁচ হাজার টাকা করা যায়—তা হ'লেই যে ছবির তিন হাজারে পৌছতে আট সপ্তাহ লাগবে, পাঁচ হাজারে পৌছতে তার আরও দু'তিন সপ্তাহ প্রদর্শনকাল কমে যাবে। চুরি জোচ্চুরি আর অসাধুতার হাতে থেকে রেহাই পেতে এরকম একটা ব্যবস্থা করা দরকার হ'য়ে পড়েছে—কিন্তু ক'রবে কে?

এরাও নাকি বাঙালী!

দানধ্যান ব্যপারে বা সেবা কার্যে বাঙলার নাম আছে, তার আসন এবিষয়ে ভারতের মধ্যে সবার ওপরে বললে অত্যুক্তি হবে না। দুর্গতির খবর পেলে বাঙলাই যায় সকলের আগে—দুঃস্থের সেবায় বাঙলাই দেয় সবচেয়ে বেশী চাঁদা। সেই বাঙলার সন্তানরাই যদি সেবায় বিমুখ হয় আর তাও নিজের প্রদেশের দুর্গতিতে সাহায্য ক'তে এগিয়ে না যায় তার চেয়ে লজ্জার কি থাকতে পারে? এমনি কতকগুলি কুলাঙ্গার বাঙ্গালী সন্তানের সাহায্য-বিমুখতা সমগ্র বাঙলার মুখে চুণকালি মাখিয়ে দিয়েছে। বম্বের

পত্র পত্রিকাদিতে প্রকাশ, গত মাসে জননাট্য সমিতির উদ্যোগে বম্বেতে 'Voice of Bengal' নামে একটি চ্যারিটি শো অনুষ্ঠিত হয়। দলটি গিয়েছিল বাঙলা দেশ থেকেই; দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত বাঙালীদের সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু শুনে স্তম্ভিত হলুম যে চিত্রজগত সংশ্লিষ্ট সেখানকার অবাঙালী ব্যক্তিদের মধ্যে সাহায্য করার জন্য যে ক্ষেত্রে দস্তুরমত প্রতিযোগিতা লেগে যায় সেখানে যে সব ব্যক্তিদের নিয়ে আমরা গর্ব বোধ করি তাঁরাই ছিলেন দূরে সরে। বম্বে টকীজের সর্বময়ী কর্ত্রী শ্রীমতী দেবীকারাণী (মাসিক বেতন দুহাজার টাকা) উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বা সাহায্য পাঠাতে সময় পাননি; প্রযোজক অমিয় চক্রবর্তীরও (আয় দুহাজারের বেশী) একই ব্যাপার, নীতীন বসু মাসিক পাঁচ হাজার টাকা পেলেও এদের সাহায্য ক'রেন নি। আশোকুমার লাখ টাকারও ওপর আয় করেন বছরে, কিন্তু দুর্গত বাঙালীর সেবায় এদের হাতে কিছু ভিক্ষা দিতে পারলেন না। সাধনা বসুও (মাসিক দুহাজার) অনুষ্ঠানে যোগ দেন নি। শশধর মুখার্জী (মাসিক তিন হাজার) ষ্টেজ রিহার্শালে হাজির ছিলেন (বোধ হয় কোন নতুন প্রতিভা পাকড়াতে পারেন কিনা দেখবার জন্যে) কিন্তু না এসেছিলেন আসল অনুষ্ঠানে না দিয়েছিলেন কোন চাঁদা। ঠিক এই সঙ্গে যখন পড়ি মতিলাল, পৃথ্বিরাজ, শান্তারাম, স্নেহপ্রভারা তাদের উদারহস্ত বাড়িয়ে দিয়েছিলো তখন বাঙলার মুখে সত্যই চুণকালি পড়ে না-কি! বম্বের পত্রপত্রিকা এইতো বাঙালী বলে যে বিদ্রূপ ক'রছে তাতে আমাদের লজ্জার অবধি নেই। এদের সম্পর্কে এইমাত্র বলবো যে এরা বাঙ্গালী নন, বাঙলা ছেড়ে গিয়েছেন বলে নয়—বাঙ্গালীর স্বভাব ধর্ম এদের মধ্যে নেই। এরাও যেন নিজেদের বাঙালী ব'লে পরিচয় না দেন।

১৪ডি, বলদেওপাড়া রোড।

রূপ-মঞ্চ অজয় স্মৃতি সংখ্যা ও রূপ-মঞ্চ শারদীয়া সংখ্যা-মাত্র কয়েক কপি অবশিষ্ট আছে। যাঁহারা ঐ সংখ্যা পাইতে চান অনতিবিলম্বে পত্র লিখুন।

'ভারতীয় চিত্রজগতে বাংলা চিত্রের স্থান সব দিক দিয়েই উচ্চে' শ্রীপার্থিবের সংগে আলোচনায় নিউ থিয়েটার্সের কার্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ মিত্রের অভিমত

যুদ্ধজনীন অবস্থায় শ্রীপার্থিবের পরিক্রমা কিছুদিন বন্ধ ছিল। চারিদিকের controlএর চাপে ধীরে ধীরে নিজেও controled হ'য়ে আসছিলাম। সফর না করবার জন্য সফর বার্তা জানাতে পারিনি বলে আশা করি সহৃদয় পাঠকবর্গ ক্ষমা করবেন। কিছুদিন পূর্বে নিউথিয়েটার্সের অফিসে যেয়ে দিলুম হানা। বেলা দু'টোয় হানা দেবার খবর জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলুম—কার্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ মিত্র ওরফে ছোটাই বাবুকে। নিউথিয়েটার্সের কার্যাধ্যক্ষরূপে এঁর খ্যাতি শুধু trade মহলেই নয় তার বাইরেও প্রসার লাভ করেছে...এবং ছোটাইবাবু নামেই তিনি পরিচিত সবাইর কাছে।

চারতলা থেকে সামনের গির্জার ঘড়িটা দেখা যাচ্ছিল ২টা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকী তখনও—বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। সামনের ফিরিঙ্গিদের ফ্লাট থেকে তারের যন্ত্রের টুং টাং সুরের রেশ এসে উন্মনা করে তুলেছিল—বেয়ারা এসে খবর দিল: বাবু আসুন এই পাশের ঘরে। যেয়ে বসলাম। ছোটাই বাবু ঘরে ঢুকলেন—হাসতে হাসতে। এমনি সাদর মনেই তিনি গ্রহণ করেন সাংবাদিকদের। 'ঠিক কাটায় কাটায়' ঘড়ির কাটার দিক তাকিয়ে তিনি বল্লেন।

: হ্যাঁ মাত্র ২০ মিনিট নিয়েছি আপনার কাছ থেকে তার এক মিনিটও ছাড়তে পারি না। চা এলো—চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আমাদের আলোচনা চললো খুব স্বাভাবিক ভাবে।

: দর্শক মহল থেকে যে অভিযোগ গুঞ্জন শুনতে পাই সে সম্পর্কে আপনার অভিমত জিজ্ঞাসা করছি। বাংলা ছবি ১৯৪৩ সনে অধোগতির দিকে চলেছে এন্—টি কে জড়িয়েই এই অভিযোগ করা হয়, এই অভিযোগ কী আপনি অস্বীকার করবেন? কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ছোটাই বাবু বল্লেন: আমি সম্পূর্ণ-রূপে এই অভিযোগ অস্বীকার করি। বাংলা ছবির 'technical side' গুলির অনেকাংশে উন্নতি হ'য়েছে। শব্দনিয়ন্ত্রণ, চিত্র গ্রহণ এ গুলিতো বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। সংগীতেও আমরা কম উন্নতি লাভ করিনি।"

: একঘেয়ে কাহিনীতে বাংলা চিত্র বাঙ্গালী দর্শকমন বিষিয়ে তুলেছে এর আপনি কী জবাব দেবেন?

: এই কাহিনীর অভিযোগও আমি অস্বীকার করবো। কাহিনীর বিশেষত্বে আজও বাংলা চিত্র average হিন্দি চিত্রের অনেক ওপরে। কাহিনীর নূতনত্ব নেই এই অভিযোগ সম্পর্কে আমার কিছু বলবার আছে। বাংলা ছবি আজকাল সাধারণতঃ সামাজিক সমস্যা নিয়েই গড়ে উঠছে কারণ সামাজিক চিত্র ছাড়া—অন্য কোন শ্রেণীর চিত্র প্রয়োজনা বর্তমানে বাঙ্গালী প্রযোজকদের পক্ষে অসম্ভব—তাই বিভিন্ন ধরণের সামাজিক সমস্যা থাকলেও প্রযোজক অথবা পরিচালকেরা ব্যবসার দিক লক্ষ্য করে প্রেমের অংশটাকে বেশী ফেনিয়ে তোলেন অনেক ক্ষেত্রে। তারপর—পর পর এই সব কাহিনী নিয়ে গড়ে ওঠা চিত্রে সেই পুরোণ শিল্পীদের যখন দেখি তখন কাহিনীটাকে কিছুটা একঘেয়ে বলে মনে হওয়াত স্বাভাবিক। একই শিল্পী চারখানা ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করলেন—একই সংগে প্রায় একই ধরণের চরিত্রে অভিনয় করবার সময় বিভিন্ন অভিব্যাক্তিতে চরিত্রটীর রূপ দেবার মত অভিনেতা আমাদের নেই—থাকলেও তার অভিনয় কিছুটা একঘেয়ে লাগবেই। এই জন্য নূতন নূতন শিল্পীর দরকার—তাহ'লে এ সমস্যার কিছুটা সমাধান হ'তে পারে।

কিন্তু বিশেষভাবে আমাদের চিত্রে (N. T.) যেমনি এই নূতন মুখ আপনারা দেখতে পান তেমনি—কাহিনীর নূতনত্বও অস্বীকার করতে পারবেন না।
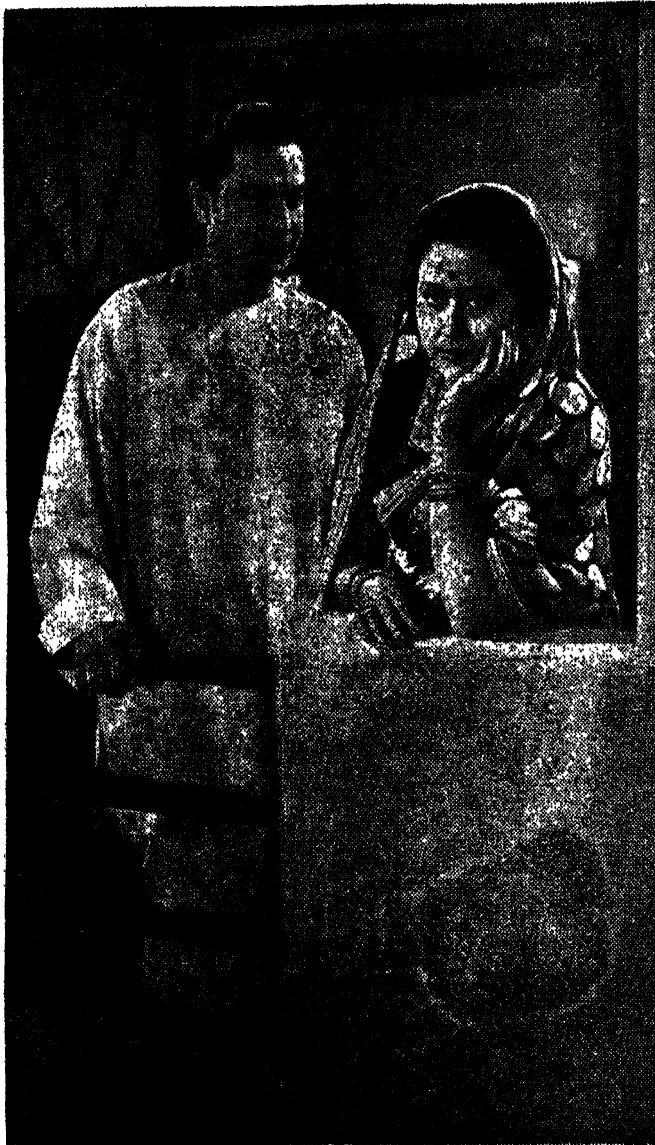
মাটির ঘর চিত্রে রতীন ও মলিনা

: বাংলায় মঞ্চ এবং চিত্রের উপযোগী করে তুলবার জন্ম অভিনয়, শব্দ নিয়ন্ত্রণ, চিত্র গ্রহণ, সংগীত প্রভৃতি আনুসঙ্গিক বিষয়গুলি শিক্ষা দেবার জন্ম কোন শিক্ষালয় গড়ে ওঠার ব্যাপারে আপনার অভিমত কী এবং যদি ওঠে এ বিষয়ে N. T. প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কোন সাহায্য করবে কিনা ?

: নিশ্চয়ই করবে। এবং ব্যক্তিগত ভাবে এ বিষয়ে আমার খুব উৎসাহ আছে। তবে ব্যক্তিগত ভাবে বা বিশেষ কোন স্টুডিও এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারবে না তাতে অনেক রেশারেশি দেখা দেবে। প্রত্যেক ষ্টুডিওর সহযোগীতা এবং পৃষ্ঠপোষকতায় এরূপ একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা নিতান্ত প্রয়োজন। এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন Bengal Motion Picture Producers' Association বাংলার প্রত্যেক প্রযোজক, পরিবেশক—প্রদর্শক যদি একটী করে প্রদর্শনীর অর্থ দেন বিরাট একটী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারি। এনিয়ে আপনারা আন্দোলন আরম্ভ করুন।

: আচ্ছা যতদিন কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে না ওঠে তার পূর্বে প্রত্যেক স্টুডিওতে আমি বিশেষ করে বলছি N. T.র কথা কোন শিক্ষানবীশ রাখতে পারেন কিনা—

: অপরের কথা বলতে পারি না তবে N. T. শিক্ষানবীশ রেখে থাকে। এই শিক্ষানবীশদের শিক্ষা দিয়ে N. T. উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ গড়ে তোলে। তার প্রমাণ N. T. অপর কোন স্টুডিও থেকে কর্মী ভাগিয়ে আনে না— N. T.র কর্মীরা—N. T.র বিশেষজ্ঞরাই ভারতের বিভিন্ন স্টুডিওতে ছড়িয়ে আছে।

: আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রযোজক—পরিবেশক—অভিনেতা, অভিনেত্রী ও বিশেষজ্ঞ শিল্পীদের কী সম্মানিত করা উচিত নয়?

: নিশ্চয়ই। তবে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে দোষারোপ করবো না। যতদিন সামাজিক মর্যাদা আমরা না পাই ততদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান পেতে পারি না। অভিনয় জীবনের পেশা বলে গ্রহণ করলে যে মেয়ে সমাজচ্যুত হ'য়ে গেল বলে যে সমাজনেতারা রায় দেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মূলে সেই সমাজ ধুরন্ধরেরাই রয়েছেন—তারা এদের সম্মানিত করবেন কী করে? আজকাল পেশা হিসাবে বাঙ্গালী মেয়েরা নানা কাজ করছে—এটা শুভ যুগের সুচনা বলতে হবে। এমন দিন আসবে সেদিন চলচ্চিত্র বা রঙ্গমঞ্চকে পেশা বলেই তারা গ্রহণ করতে পারবেন—সামাজিক কোন বাধা এসে তাদের পথ রোধ করবে না।

: কাহিনী—বর্তমানের ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যদি কোন কাহিনী গড়ে ওঠে—আপনি কী তাকে অনুমোদন করবেন? সাম্যবাদ সম্পর্কে আপনি কী আশাবাদী?

: সাম্যবাদ আমি বিশ্বাস করি। সাম্যবাদ আমি চাই। ভারতে আজকেই নয় বহু পূর্বে সাম্যবাদের আন্দোলন সুরু হয়েছে—বুদ্ধদেব, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীষীরা বহু পূর্বে সাম্যবাদ প্রচার করেছেন—তবে বিশেষ কোন ধর্মের পোষাক পরে এঁরা এসে ছিলেন বলে সাম্যবাদ ততটা আমাদের দেশে প্রসার লাভ করতে পারেনি।

: কোন্ নূতন পরিচালকের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনি আশাবাদী?

: সৌম্যেন মুখোপাধ্যায়।

: দর্শক মহল থেকে অনেকেই অনেক সময় বলেন, যে সব পরিচালক, শিল্পী প্রভৃতি N. T. পরিত্যাগ করে অন্যত্র গেছেন - তারা N. T.তে ফিরে এলে আবার পূর্ব সুনাম হয়ত অর্জন করতে পারেন। একথা কী আপনি বিশ্বাস করেন—এবং যদি করেন কেন?

: কথাটা নেহাৎ মিছে বলেননি এই জন্য, N. T.র প্রত্যেক বিভাগেই উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। ব্যক্তিগত ভাবে কোন বিশেষ শিল্পীর ব্যক্তিত্ব থেকে সমষ্টিগত ভাবে প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিত্বের মূল্য অনেক বেশী। যেমন কোন পরিচালক কোন গল্পের কথা বল্লেন তার চিত্রের জন্য—প্রযোজক অমনি সে গল্প নির্বাচন করে ফেলবেন না। তিনি নিজে একজন এ বিষয়ে ওস্তাদ লোক তবু আরো বিশেষজ্ঞদের অভিমত নিয়ে গল্পটী নির্বাচন করা না করা স্থির করবেন। সব বিষয়েই এই ব্যাপার। কোন বিশেষ বিশেষজ্ঞ বল্লেই যে বেদ বাক্যের মত সেটাকে গ্রহণ করা হবে তা নয়। এই জন্যই N. T.র ছবি অন্য ছবির চেয়ে ভাল। N, T.তে শিল্পীরা নিজেদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পান কিন্তু স্বেচ্ছচারিতায় পান বাধা।

: New findsদের ভিতর কার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনি আশাবাদী?

: সুমিত্রা— বিনতা লতিকা—আখতার জাহান এরা সবাই ভাল করবে। সুমিত্রা নাকি আশাতীত ভাল করছে—বিনতা সামাজিক চিত্রে কোন বিশেষ চরিত্রে

ভাল করতে পারবে। লতিকা একটু দুর্বল এদের ভিতর।

: বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংঘ ও বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতি সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

: এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন, যে কত তা এখনও আমরা হয়ত সম্যক উপলব্ধি করতে পারিনি।

চলচ্চিত্রকে সামাজিক মর্যাদা দিতে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান যতখানি পারবে—আর কেউই ততখানি সফলতা অর্জন করতে পারবে না।

'কানুনে' সাহু মোদক ও নির্মলা

সমালোচনার কথা জিজ্ঞাসা করলে শ্রীযুত মিত্র বলেন।

: সমালোচনা হবে সব সময়ই নিরপেক্ষ এবং গঠন মূলক। এতে আমাদের ঘাড়েও যে গালিগালাজটুকু বর্ষিত হবে হাসি মুখেই তা মাথা পেতে নেবো—ভবিষ্যতে প্রশংসা অর্জনের জন্য। সর্বশেষে রূপ মঞ্চের কথা জিজ্ঞাসা করতে তিনি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলেন—বাংলা চলচ্চিত্রের উন্নতির মূলে রূপ মঞ্চের সেবা চিরদিন উজ্জ্বল থাকবে। রূপ-মঞ্চের ভবিষ্যৎ কর্ম পন্থা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত মিত্র কয়েকটী উপদেশ দিলেন। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বললাম—দেখুন রূপ মঞ্চের পরিচালনার পুরো ভাগে থেকে এইটুকু বলতে পারি যেদিন আমাদের আন্তরিকতায় অভাব দেখা যাবে সেদিনই রূপ মঞ্চের ধ্বংস, তার পূর্বে নয়। অনেক প্রযোজক রূপ মঞ্চের নির্ভীক সমালোচনায় রুষ্ট হ'য়ে অনেক ভ্রুকুটি দেখিয়েছেন কিন্তু তাদেরও আমরা বলি রূপ মঞ্চ কোন প্রতিষ্ঠান পুষ্ট কাগজ নয়—রূপ মঞ্চ চিত্রশিল্পের শত্রুরূপে আত্মপ্রকাশ করেনি, চিত্র শিল্পের মিত্র রূপেই তার বিকাশ। এবং Before release we are for the Producers after release we are for the readers এই হ'লো সমালোচনা ও প্রকার কার্যে রূপ মঞ্চের আদর্শ। তার পর শ্রীযুক্ত মিত্রকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এলাম। আমাদের আলোচনা ১০ মিনিট থেকে এক ঘণ্টার ওপর হ'য়েছিল।

১৯৪৩ সালের বাংলার চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচিতি

নিউ থিয়েটার্স লিঃ যুদ্ধজনিত কারণে এ দেশের ফিল্ম শিল্প আজ নানা ভাবে বিপর্যস্ত। চিত্র-শিল্পের অগ্রগতির পথে আজ বহুবাধা। সরকারী কণ্ট্রোল এবং মালমশলা প্রাপ্তি সম্বন্ধে নানা বিধি-নিষেধ অতিক্রম করে আজও যে ছবি তোলা বন্ধ হয়ে যায় নি, এইটুকুই আশার কথা।

ভারতের গৌরব এবং বাঙলার সর্ববৃহৎ বাঙালী প্রতিষ্ঠান নিউ থিয়েটার্স এতাবৎকাল বহু উৎকৃষ্ট ছবির প্রযোজনা করে নিজস্ব সুনাম ও প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এঁদের 'প্রিয়বান্ধবী', 'দিকশূল' ও 'কাশীনাথ' ১৯৪৩ সালের উল্লেখযোগ্য ছবি। প্রথম ছবিখানি নবীন পরিচালক সৌমেন মুখোপাধ্যায়ের প্রয়োগ-নৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। বাঙলা দেশের সমালোচক ও দর্শকমহলে এই ছবিখানি বিশেষ খ্যাতি ও সমাদর লাভ কোরেছে। প্রধান দুটি চরিত্রে দুর্গাদাস ও চন্দ্রাবতীর অপূর্ব অভিনয় অবিস্মরণীয় মাধুর্যে অক্ষয় হয়ে থাকবে। দ্বিতীয় ছবিখানি দাম্পত্য জীবনের সমস্যামূলক অন্যতম সুখপাঠ্য কাহিনী। 'দিকশূল' চিত্রের পরিচালনায় প্রবীন প্রয়োগ-শিল্পী প্রেমাঙ্কুর বাবুও যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

আলোচ্য বর্ষে নিউ থিয়েটার্সের সব চেয়ে উল্লেখ যোগ্য ছবি—'কাশীনাথ'। শরৎচন্দ্রের এই কাহিনীটি মুখর চিত্রাকারে লক্ষ লক্ষ দর্শকের চিত্র বিনোদন করে ভারতের সর্বত্র বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। অভিনয়ে, প্রয়োগ নৈপুণ্যে ও সংগীতের আকর্ষণে, 'কাশীনাথ' ছবির শ্রেষ্ঠত্ব আজ সর্ববাদী সম্মত।

১৯৪৩ সালে গঠিত আর একখানি ছবি ভারতের সকল প্রদেশে প্রচুর অভিনন্দন লাভ কোরেছে। এখানি হিন্দিতে তোলা—'ওয়াপস্'। নৃত্য-গীত ও প্রচুর আনন্দরস বিতরণ করে এই ছবিখানি আজ সাফল্যের সংগে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে চলেছে, বোম্বাই, করাচী, হায়দ্রাবাদ, লাহোর ও ভারতের অন্যান্য শহরে।

'ওয়াপস্'-চিত্রের সার্থক পরিচালক হেমচন্দ্র চন্দ্র ইতি মধ্যেই আর একখানি হিন্দি ছবি তোলার কাজে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছেন। 'ওয়াপস্'-চিত্রে প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী শ্রীমতী ভারতী, সুকণ্ঠ শিল্পী অসিতবরণ ও স্বনামধন্য চরিত্রাভিনেতা নবাব—শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। এই
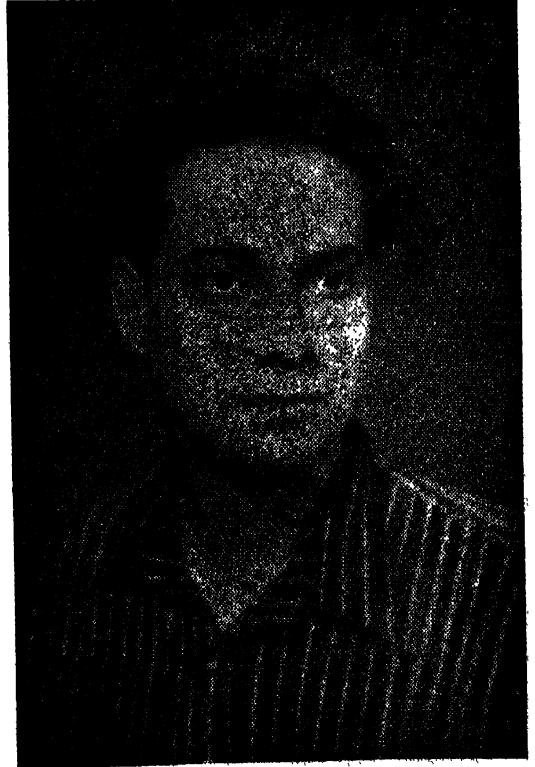
চিত্ররূপার 'সন্ধিতে' বিমান

পরম উপভোগ্য হিন্দি ছবিখানি চিত্রা ও নিউ সিনেমায় মুক্তিলাভ করে স্থানীয় দর্শকদের কাছ থেকেও অজস্র অভিনন্দন পেয়েছে।

পরিচালক হেমচন্দ্রের নির্মীয়মান হিন্দি ছবিখানির নাম—'মাই-সিস্টার'। অবশ্য এই নামটি যথাসময়ে পরিবর্তিত হয়ে দেশী নামে আত্মপ্রকাশ কোরবে। ছবিখানির কাহিনী লেখক বিনয় চট্টোপাধ্যায়, যিনি ইতিপূর্বে 'প্রতিশ্রুতি' ও 'ওয়াপস্'-এর কাহিনী লিখে প্রচুর খ্যাতি লাভ কোরেছেন। আধুনিক সমাজের তরুণ তরুণীর জীবনের সমস্যা ও দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র কোরে সম্পূর্ণ নতুন পথে এর কাহিনীটি নাটকাকারে শাখাপল্লবিত হয়েছে। এতে অভিনয় কোরেছেন সুধাকণ্ঠ সায়গল এবং আখতার জাহান নামে একটি নবাগতা সুন্দরী তরুণী। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে আত্মপ্রকাশ কোরেছেন—প্রতিভাময়ী শিল্পী চন্দ্রাবতী ও বিশিষ্ট চরিত্রাভিনেতা অমর মল্লিক।

১৯৪৩ সালে আর যে দুটি বাঙলা ছবির মহরৎ সুসম্পন্ন হয়ে সম্প্রতি সমাপ্তির দিকে এগিয়ে এসেছে, তার একখানি 'উদয়ের পথে' অপরখানি 'দুই পুরুষ'।

'উদয়ের পথে', নবযুগের সুখ্যাত কথা-শিল্পী জ্যোতির্ময় রায়ের একটি মৌলিক কাহিনী অবলম্বনে গণ-তান্ত্রিক মতবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত। অপরিমেয় সাহস ও শক্তি নিয়ে জীবন-যুদ্ধে অবতীর্ণ এক তরুণের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও আদর্শ সিদ্ধির মন্ত্রে সঞ্জিবীত একটি অপূর্ব কাহিনী। ছবিখানির পরিচালনা কোরেছেন নিউ থিয়েটার্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্যামেরাম্যান বিমল রায়। এই ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অবতীর্ণ, শ্রীমতী বিনতা বসু, রেখা মিত্র, রাধামোহন ভট্টাচার্য্য, দেবী মুখার্জী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, দেববালা প্রভৃতি।

তারাশংকরের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি, জাতীয় রঙ্গমঞ্চের বিপুল সাফল্যমণ্ডিত নাটক 'দুই পুরুষ' অবলম্বনে পরিচালক সুবোধ মিত্র যে ছবিখানি প্রায় শেষ করে এনেছেন, তার বিভিন্ন ভূমিকায় বহু শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সম্মেলন ঘটেছে। এর বিভিন্ন চরিত্রে চিত্রাবতরণ কোরেছেন—ছবি বিশ্বাস, চন্দ্রাবতী, সুনন্দা, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, লতিকা ব্যানার্জী, রেখা মিত্র প্রভৃতি।

ব্যর্থ প্রণয়ের অভিশাপক্লিষ্ট দুটি হৃদয়ের পটভূমিকায় প্রতিফলিত, আত্মপ্রতিষ্ঠার মহান আদর্শে সঞ্জীবিত এই রসবর্ণাঢ্য চিত্রখানি যে একটি বিশিষ্ট রূপ নিয়ে মুখরছবির পর্দায় আত্মপ্রকাশ কোরবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

নিউ থিয়েটার্সের সংগীত পরিচালকরূপে, রাইচাঁদ বড়াল ও পঙ্কজ মল্লিক, উভয়েই সারা ভারতে সমানভাবে সমাদৃত। নিত্য নতুন সুরের পরিকল্পনা ও কারুকার্যে এঁদের তুল্য সুর-শিল্পী ও শিক্ষক ভারতে বিরল।

নিউ থিয়েটার্সের টেক্‌নিকাল্ বিভাগ প্রয়োগ-নৈপুণ্যের উৎকর্ষে যে প্রতিষ্ঠা ও গৌরবের অধিকারী, সারা ভারতে তার সংগে সমকক্ষতা করবার যোগ্যতা খুব কম প্রতিষ্ঠানেরই আছে।

এঁদের শিল্প নির্দেশক সৌরেন সেন, চিত্র-শিল্পী বিমল রায়, ইউসুফ মুলজী, সুধীন মজুমদার, শব্দানুলেখন-শিল্পী অতুল চট্টোপাধ্যায়, লোকেন বোস, শ্যামসুন্দর ঘোষ প্রভৃতি—নিজ নিজ বিভাগে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যে প্রখ্যাত।

বাঙালার এই সর্বজনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান চিত্র-গঠনের শ্রেষ্ঠ আদর্শকেই সামনে রেখে অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার ও তাঁর সুযোগ্য কর্মসচীব শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ মিত্র দেশের ও দশের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। কারণ, তাঁরা নিছক কমার্শিয়াল্ মনোবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে চিত্র প্রযোজনা কার্যে আত্মনিয়োগ করেন নি। রসবেত্তার রসের সুধা মেটাতে, ছবির মধ্যে নানা বৃহত্তর ও মহত্তর চিন্তাধারার

চিত্র ভারতীর শেষ রক্ষার একটি দৃশ্যে জীবেন বসু ও বিজয়া দাস

সমাবেশ কোরে, নানা সামাজিক সমস্যার বিশ্লেষণ কোরে, এদের প্রযোজনায় গৃহীত প্রায় প্রত্যেকটি ছবি আর্ট ও সংস্কৃতির পরিচয় দিয়ে শিক্ষিত দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও সমাদর লাভ কোরেছে। চিত্রগঠনে বাঙালীর এই আদর্শই আজ ভারতের প্রগতিশীল প্রধান প্রাতিষ্ঠানগুলির দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রধান অবলম্বন। বারো বৎসর পূর্বে নিউ থিয়েটার্স যার সূচনা কোরেছিল কালক্রমে তাই ভারতীয় ছায়া চিত্রকলার আদর্শ হিসাবে স্বীকৃত হোল।

সাধারণ দর্শকের রুচিকে উন্নত কোরে, ভাল জিনিষের রসাস্বাদনে সহায়তা কোরে, ভারতীয় চিত্র শিল্পের ষ্ট্যাণ্ডার্ড বেঁধে দিয়ে নিউ থিয়েটার্স যে একটি স্থায়ী কীর্তির অধিকারী হয়েছেন, এ কথা নিন্দুকেও স্বীকার কোরবে।

নিউ থিয়েটার্সের কাছে ভারতবাসীর দাবী করবার অনেক কিছুই আছে। কারণ এত গুণী ও শিক্ষিত কর্মীদের সম্মেলন সচরাচর সর্বত্র দুর্লভ। এঁরা সাহিত্যিকের মর্যাদা দিতে কোনদিন কার্পণ্য করেন নি। গঠনমূলক সমালোচনা তীব্র হ'লেও তার সারবত্তা স্বীকার করেন। নানাভাবে এঁদের বিভিন্ন বিভাগের কর্মীদের সান্নিধ্যে এসে আমাদের এই ধারণাই হয়েচে যে এঁরা মনে প্রাণে শিল্পের পূজারী। বড় কিছু গঠন করবার দিকে এঁদের সর্বদাই দৃষ্টি আছে।

বর্তমান বৎসরেও এঁরা যে সব নতুন ছবি তোলবার আয়োজন করেছেন, এ দুর্দিনে একমাত্র সে আয়োজন নিউ থিয়েটার্সের দ্বারাই সম্ভব। স্বর্গত সাহিত্যরথী শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে একাধিক শ্রেষ্ঠ ছবি গঠন করে এরা ভারত জোড়া খ্যাতি ও প্রশস্তির অধিকারী। আমরা শুনে প্রীতিলাভ কোরেছি, এবছরেও এঁরা শরৎ-চন্দ্রের আর একটি কাহিনীকে বাণী-চিত্রাকারে রূপায়িত করে তুলবেন। সে কাহিনীটি হচ্চে 'বিরাজ-বৌ'। ছবিখানির পরিচালনা করবেন বড়দিদি-চিত্রের সার্থকনামা প্রয়োগ-শিল্পী অমর মল্লিক।

আজ যাঁরা শতাধিক ছবির প্রযোজনা করে, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানরূপে পরিচিত, বারো বৎসর পূর্বে মুষ্টিমেয় কর্মী ও যৎসামান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে তারা চিত্র গঠনের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তারপর ছবির পর ছবি তোলা চললো। প্রত্যেকটি ছবি গঠন-নৈপুণ্যে ও অভিনয়ে ভারতীয় ছায়া-চিত্রের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করলো। এই সর্বজনীন সাফল্যের মূলে কর্মীদের সমবেত শক্তি, যত্ন ও আন্তরিকতা বিফল হয়নি। অতি সহজেই তাঁরা পেলেন শ্রেষ্ঠত্বের বরমাল্য। বাঙালীর মুখ উজ্জল করে নিউ থিয়েটার্সের জয়পতাকা মাথা তুলে দাঁড়াল। সেই পতাকার সম্মান রাখতে এঁরা কলালক্ষ্মীর সেবায় পূর্ণশক্তিতে আত্মনিয়োগ করলেন। কর্মের পরিধি দ্রুত বিস্তারের সংগে সংগে বহু মূল যন্ত্রপাতির আমদানী হ'ল: Sound Floor-এর সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ল এবং অল্প দিনেই বহু কর্মীর আবির্ভাবে স্টুডিয়োটি মুখর হ'য়ে উঠলো। এমনি করেই একটি ক্ষুদ্র আয়োজন

বাঙালীর তথা ভারতের বৃহত্তম সাধনপীঠ—বাংলার তথা ভারতের এক বিরাট শিল্প-তীর্থে পরিণত হ'ল। কাজ করবার ক্ষেত্র বিস্তৃত হবার সংগে সংগে বহু অজ্ঞাত কর্মী নিজেকে নিজ নিজ কাজের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করবার অবকাশ পেলেন। সারা ভারতে তাঁদের নাম ও খ্যাতির কথা ছড়িয়ে পড়লো। বহু শিল্পী, অভিনয় কলার সাধনায়, এই প্রতিষ্ঠানের সংশ্রবে এসে অতি অল্পদিনেই ষ্টাররূপে পরিগণিত হলেন। বাঙালীর এই শিল্প-তীর্থে যাঁরা এলেন সাধকের বেশে, তাঁরা এই ভেবে গর্ববোধ করলেন যে আমাদের জীবন-সাধনা সিদ্ধির পথে আজ পেলাম প্রথম পথের দিশা। সেই পথ ধরেই আজ শত শত বাঙালী ও অবাঙালী কর্মীর দল এগিয়ে গেছেন। এই প্রতিষ্ঠান তাঁদের দিয়েছে প্রেরণা, তাঁদের দিয়েছে শক্তি, সাহস। বাঙালীর শিল্প-সাধনাকে ভারতের পুরোভাগে তুলে ধরতে নিউ থিয়েটার্সের এ আয়োজন আজ দেশের গর্ব।

এই প্রতিষ্ঠানের ছবির দ্রুত প্রসার ও চাহিদা বিস্তারের সংগে সংগে চিত্র পরিবেশ ও প্রদর্শক, উভয়েরই সম্পদ বৃদ্ধি হয়েছে। দর্শকের তুষ্টির উপরেই তাঁদের ব্যবসাগত সাফল্য নির্ভর করে। পরিবেশক ও প্রদর্শক রূপে তাঁদের যে সুনাম ও আভিজাত্যের দাবী—নিউ থিয়েটার্সের প্রত্যেকটি ছবি সে দাবী মেটাতে পারে বলেই আজ তাঁদের ছবিগুলি এঁদের কাছে এত সমাদর। ব্যবসায়ের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করে, চিত্র পরিবেশক ও প্রদর্শকের প্রশংসা ও বিশ্বাসভাজন হয়ে, এই প্রতিষ্ঠান আজও সকলের শীর্ষে আছে।

কাহিনীর বৈচিত্র্যে নিত্য নব গঠন-নৈপুণ্যের উৎকর্ষে বিভিন্ন কর্মীদের নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার সম্মেলনে, নিউ থিয়েটার্সের ছবির সুনাম ও আভিজাত্য আজ সর্ববাদী সম্মত। এদেশে চলচ্চিত্রের দ্রুত প্রসার ও প্রতিযোগিতার মাঝেও নিউ থিয়েটার্সের অগ্রগতিকে কেউ খর্ব করতে পারেনি। তাই শ্রেষ্ঠ চিত্রের প্রযোজক হিসাবে এঁদের শিল্প-সেবার আদর্শ ও কর্মধারাকে আমরা পরম শ্রদ্ধায় বরণ করেছি। সর্বসাধারণের মধ্যে আনন্দ বিতরণের উদ্দেশ্য নিয়ে যাঁরা সত্যিকারের রসবেত্তার রসের ক্ষুধা মেটাবার জন্যে সর্বদাই যত্নবান, আর্টের ক্ষেত্রে, সর্বকালে ও সর্বদেশে তাঁদের আসনই সবার আগে। ছবি তোলার সংগে সংগে কর্মী গঠনের দিকে এঁরা যে সর্বদাই অবহিত, তার পরিচয় আমরা নিত্য পাচ্ছি। সাধ্যমত নিত্য নতুন অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহ করে, তাঁদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ দিয়েও এই প্রতিষ্ঠান আমাদের কৃতজ্ঞতা আকর্ষন করেছেন।

[নিউ থিয়েটার্সের প্রচার বিভাগ থেকে প্রচার সচিব শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্র সান্যাল লিখিত]।

"চলচ্চিত্রে প্রথম বাঙ্গালী মহিলা-প্রযোজক"

বাঙলা দেশের চিত্র নির্মাণে আজ পর্যন্ত আমরা যে ক'জন প্রযোজকের পরিচয় পেয়েছি, তাঁদের অনেকেই হয়ত শিল্পোন্নতির পক্ষে নিজেদের কৃষ্টি ও শিক্ষার প্রমাণ দিয়েছেন—কিন্তু প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেখা গেছে—যে, যখন শিল্প হ'য়ে উঠেছে মুখ্য—তখন ব্যবসার দিকটায় পড়েছে মন্দা।—আবার যখন কেবলমাত্র পাটোয়ারী বুদ্ধির পরওয়ানা নিয়ে ব্যবসাদার প্রযোজক শুধু অর্থের দিকেই নজর দিয়েছেন তখন ঘটেছে কলালক্ষ্মীর অবমাননা—শিল্প প্রাণ হ'য়েছে হতশ্রী! আসল কথা, শিল্পের সঙ্গে ব্যবসার যোগসূত্র এঁদের বেশীর ভাগ মহাজনই খুঁজে পাননি! সেইজন্য অন্যান্য প্রদেশের চেয়েও সুন্দর ও শোভন চিত্র নির্মাণ করেও অনেক শ্রেষ্ঠ ও প্রতিষ্ঠিত বাঙালী চিত্র প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসার ক্ষেত্রে থেকে বিদায় নিতে হ'য়েছে!

বাঙলার চলচ্চিত্র জগতে মহিলা প্রযোজকের আবির্ভাব দেখে এ রাজ্যের অনেকেই হয়ত ভেবেছিলেন অনেক কিছু! ফিল্ম ষ্টুডিওর আবহাওয়ার মধ্যে মহিলা প্রযোজক !!

ব্যাপারটা তাঁদের অনেকের কাছেই রুচিকর ঠেকেনি হয়ত,—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে "শেষ রক্ষা" চিত্রের সুযোগ্যা প্রযোজক শ্রীমতী প্রতিভা শাসমল এমনই এক মহিলা যিনি শুধু যে তাঁর প্রয়োগ শক্তির নৈপুণ্য দেখিয়েই নিশ্চিন্ত হ'য়েছেন তাই নয়—তাঁর উচ্চ শিক্ষা, রুচি ও অভিজাত্যের প্রভাবে যাকে ফিল্ম ষ্টুডিয়োর কুরুচিপূর্ণ আবহাওয়া বলে—তার সম্পূর্ণ রূপটুকু পর্যন্ত বদল ক'রতে সমর্থ হয়েছেন আপন ব্যক্তিত্বের গৌরবে! আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের দিনে তাঁর এই দৃঢ় চিত্ততা ও ব্যক্তিত্বই আমাকে সব চেয়ে বেশী বিস্মিত করেছে!

পরবর্তী কালে তাঁর সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জানবার সৌভাগ্য লাভ করি—এবং শুনে আশ্চর্যও কম হইনি যে, ব্যবসা জগতে তিনি হাত পাকাতে আসেন নি—পরন্তু বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত আছেন। ভাগ্যহীন বাঙালীর জীবন বিশেষতঃ বাঙালী নারীর জীবনে এ শুভ যোগ বড় কম গৌরবের কথা নয়। সুতরাং চিত্র জগতে তাঁর আবির্ভাব যে কোনও আকস্মিক খেয়ালের বশে সূচিত হয়নি—তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি তাঁর ব্যবসা জগতের আত্মবিশ্বাস ও আন্তরিকতা থেকে। এই আত্মবিশ্বাসই তাঁকে তাঁর সাফল্যের পথে জীবন্ত প্রেরণা দিতে পেরেছে।

রবীন্দ্রনাথের নাট্য প্রতিভার যাঁরা সন্ধান রাখেন তাঁরা বোধ হয় জানেন যে রবীন্দ্রনাথের নাটক মূলতঃ রূপক! তাঁর "জীবন দেবতা"—র সুর আদ্যন্ত ধ্বনিত হ'য়েছে তাঁর নাটক নাটিকায়—সুতরাং শুধু বিশিষ্ট শ্রেণীর কাছেই তা পেয়েছে সমাদর—সাধারণের দরবারে প্রবেশের কোনও সম্পদই তার নেই—"শেষ রক্ষা" রবীন্দ্রনাথের নাট্য সাহিত্যের এক অভূতপূর্ব ব্যতিক্রম হ'লেও—তার মধ্যে আমরা যে কৃষ্টি ও চিন্তার খোরাক পাই—তাও সাধারণ দর্শকের ক্ষুধা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সুতরাং সেই নাটককে চিত্ররূপ দান ক'রে তিনি যে অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই।

এই নাটকের পরিচালনার জন্য তিনি এমনিই এক পরিচালককে নির্বাচন ক'রেছেন—এই শ্রেণীর নাট্য পরিচালনায় যার যোগ্যতা ও অধিকার সকলের চেয়ে বেশী।

পরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায় —শুধু সিনেমা শিল্পেরই সাধনা করেন নি—তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন—এবং বিশেষতঃ বহু পত্রিকার সম্পাদন বিভাগের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহুদিন জড়িত ছিলেন - সুতরাং তিনি শুধু সাহিত্য রসিকই নন্—স্বয়ং একজন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। রবীন্দ্রনাথের নাটক পরিচালনা করবার গুরুভার তাঁর হস্তে অর্পণ ক'রে শ্রীমতী প্রতিভা শাসমল তাঁর যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন তাতে আমাকে শুধু বিস্মিতই করেনি—প্রথম প্রযোজক হিসাবে তাঁর নির্ভুল নির্বাচন আমাকে তাঁর সম্বন্ধে অধিকতর শ্রদ্ধাবান ক'রে তুলেছে।

তার পর তাঁর সাহসিকতার আরও প্রমাণ পাই যখন দেখি কুমারী বিজয়া দাসের আবির্ভাব সর্বপ্রথম তাঁরই চিত্রে। কুমারী বিজয়া, শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়েরই মেধাবী ছাত্রী নন্—ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যে শিক্ষা ও কৃষ্টির মধ্যে গঠিত—তাতে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-প্রসূত শিক্ষিতা নায়িকার রূপদান করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। তাছাড়া রবীন্দ্র সঙ্গীতে তাঁর বিশিষ্ট পারদর্শিতা থাকায়—সঙ্গীতাংশকে রস মধুর ক'রে তুলতে প্রযোজক শ্রীমতী শাসমল ও পরিচালক পশুপতি বাবুকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

আমি ব্যক্তিগত ভাবে অনুসন্ধান করে জেনেছি যে—এই চিত্রের সাফল্য সম্বন্ধে কর্মকর্তারা সকলেই নিঃসন্দেহ এবং তাঁরা পরবর্তী চিত্রের "লাইসেন্সের" জন্য সকল প্রকার আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার অবলম্বন করে ইতিমধ্যেই

দ্বিতীয় চিত্রের নির্মাণ সম্বন্ধে সচেষ্ট হয়েছেন। এই বিশিষ্টা, শিক্ষিতা ও অভিজাত প্রযোজকের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা প্রত্যেক বাঙ্গালী চিত্রামোদীরই উচিত বলে মনে করি।[প্রচার সচিব শ্রীযুক্ত সৌমোন সান্যাল লিখিত।]

কলিকাতা ফিল্ম এক্সচেঞ্জ

বছর তিনেক আগে আমেরিকা প্রত্যাগত আমার এক বন্ধু ভারতে ফিরে এসে বললেন বম্বেতে থাকা কালীন ১০ দিনের মধ্যে তিনি দুইখানা হিন্দি ছবি দেখেছেন। কিন্তু ছবি দেখতে বসে তাকে কেবল ঘড়ির পানে দেখতে হ'য়েছে যে কতক্ষণে শেষ হবে। আমি তখন তাকে আমাদের বাংলা দেশের ও বাঙ্গালা প্রতিষ্ঠানের তৈরী একখানা ছবি 'জিন্দ্‌গী' দেখতে নিয়ে গেলাম। ছবিখানা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে বললেন, এমন ছবি এখানে হ'তে পারে আশা করিনি। বাংলা তথা ভারতের চলচ্চিত্র জগতের গৌরব শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকারের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়া আমাদের নিউথিয়েটার্স প্রমাণ করেছে যে বাঙ্গলা চিত্রশিল্পও অন্য যে কোন প্রদেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন পাবার যোগ্য। বাংলায় কয়েকটী চলচ্চিত্র নির্মাতা আছেন কিন্তু কেউ ভারতের বাজারের উপযোগী হিন্দি চিত্র তুলতে ইতিপূর্বে সাহসী হননি বা কোন সহায়তাও পাননি। বাংলার জাতীয় প্রতিষ্ঠান নিউথিয়েটার্সের ভারতের বাজারে সাফল্যের পিছনে যে সব প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের ভিতর ক্যালকাটা ফিল্ম এক্সচেঞ্জ অগ্রগণ্য। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৩৭ সালে সমগ্র ভারতে (যুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব ব্যতীত) নিউথিয়েটার্সের চিত্র পরিবেশনার কার্য আরম্ভ করেন। এবং এদের কর্মকুশলতার দ্বারা ভারতের প্রতি নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে চিত্র পরিবেশনা করে সুনাম অর্জন করেন। শুধু ভারতেই নয় এই প্রতিষ্ঠান দক্ষিণ আফ্রিকা, পারস্য, সিঙ্গাপুর, এডেন, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি ভারতের বাইরেও নিউথিয়েটার্সের চিত্র বিতরণে ভারতীয় চিত্র জগতে একটী বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই প্রতিষ্ঠানটীর কর্মবীর ও মালিক গোলাম হুসেন মামুজী ও ইব্রাহিম হুসেন মামুজী (ইনি বাবুশেট নামে পরিচিত) ভারতের চলচ্চিত্র শিল্পের মহারথীদের অন্যতম এরা দু'জনেই তীক্ষ্ণ ব্যবসায় বুদ্ধিসম্পন্ন এবং সহৃদয়। যাঁরাই এদের সংস্পর্শে এসেছেন সবাই একথা বিশ্বাস করবেন। বড় ভাই গোলাম হুসেন মামুজী কলকাতার অফিসে থাকতেন গত দু বৎসর যাবৎ সুরাটের অন্তর্গত কাটোরে নিজ গ্রামে বাস করছেন এবং মাত্র চার মাসের জন্য কলকাতায় এসে গত ৩০শে জুন তারিখে নিজ গ্রামে চলে গেছেন। ছোট ভাই ইব্রাহিম হুসেন মামুজী বেশীর ভাগ বোম্বাই অফিসে থাকেন এবং বৎসরে অন্ততঃ একবার কলকাতা ও মাদ্রাজ অফিসে এসে তত্ত্বাবধান করে যান। ইনি বাবুশেঠ নামে পরিচিত—আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকারের বিশিষ্ট বন্ধু।

ক্যালকাটা ফিল্ম এক্সচেঞ্জের বোম্বাই অফিসের কাজ জেনারেল ম্যানেজার মিঃ কাসেম মহম্মদ সিদাৎ (মামুজী ভ্রাতৃদ্বয়ের ভাগিনেয়) এবং ম্যানেজার শ্রীযুক্ত শান্তিলাল মেঠা উভয়ের কর্ম দক্ষতায় সুষ্ঠুরূপেই চলছে। এদের মাদ্রাজ অফিসের ম্যানেজার মিঃ এম সৈয়দ ১৯৩৫ সাল থেকে কাজ করছেন। লেখক নিজে ১৯৩৫ সাল থেকে কলকাতা অফিসের সংগে যুক্ত আছেন। মামুজী ভ্রাতৃদ্বয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র মিঃ ইউসুফ মহম্মদ ভাঙ্কর ১৯৩৬ সাল থেকে কলকাতা অফিসের জেনারেল এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট এর কাজ করে ১৯৪২ সাল থেকে গোলাম হুসেন নিজ গ্রামে চলে যাবার পর—কলকাতা অফিসের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন। ইনি সহৃদয় ও কর্মঠ।

নিউ থিয়েটার্সের ছাড়া এদের পরিবেশনায় কারদার প্রডাকসন্সের 'শারদা', 'নমস্তে' ফজলী ব্রাদার্সের 'ক্যালান'

প্রভৃতি চিত্র প্রদর্শিত হয়েচে ও হবে। এদের পরিবেশনায় নিউ থিয়েটার্সের হিন্দি চিত্র ওয়াপস বাংলা ও বাংলার বাইরে অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

[শিশির ভট্টাচার্য, প্রচার সচিব]

এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রিবিউটার্স

এদেশীয় চিত্র পরিবেষক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রিবিউটার্সের স্থান অনেকেরই উচ্চে। দেশে সুপরিচালিত চিত্রপরিবেষক প্রতিষ্ঠান আর হয়ত কয়েকটি আছে; কিন্তু চলচ্চিত্র শিল্পের বিভিন্ন দিক ও বহুমুখী কর্মকে একটি সুসংবদ্ধ পরিচালনার অধীনে এনে তাকে যথাবিহিতভাবে চালিত করার দাবী একমাত্র এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রিবিউটার্সই করতে পারে। এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রিবিউটার্স একাধারে চিত্রনির্মাতা, চিত্রপরিবেশক ও চিত্রপ্রদর্শক। শুধু ভারতীয় চিত্রের পরিবেশনাতেই এদের কর্মপ্রচেষ্টা নিবদ্ধ নয়; বহু প্রথম শ্রেণীর বিদেশী ছবিও এদের পরিবেশনা তালিকার অন্তর্ভুক্ত। আমেরিকার বিখ্যাত চিত্র নির্মাতা আর, কে, ও, রেডিও পিক্চার্স ভারতবর্ষে তাঁদের ছবি পরিবেশন করবার স্বত্ব সম্পূর্ণ এঁদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। এ ছাড়া, এম্পায়ার টকি ডিষ্ট্রিবিউটার্স আর, সি, এ, শব্দগ্রহণ ও চিত্র প্রক্ষেপণ যন্ত্রের ও একমাত্র বিতরণকারী এজেণ্ট। এই প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী কর্ম প্রচেষ্টার বিবরণ দেওয়ার আগে এর জন্মবৃত্তান্ত একটু বলে নেওয়া যাক্।

এম্পায়ার টকি ডিষ্ট্রিবিউটার্সের প্রতিষ্ঠাতা মিঃ রেওয়াশঙ্কর পাঞ্চোলী প্রথমে চিত্রপ্রদর্শকরূপে চলচ্চিত্র-শিল্পের কাজে যোগদান করেন। তার আগে তিনি ছিলেন করাচী Chartered Bank-এর একজন পদস্থ কর্মচারী। কিন্তু সিনেমার প্রতি তাঁর এমনই অন্তরের টান ছিলো যে তিনি ব্যাঙ্কের কাজের ফাঁকে যখনই সময় পেতেন এই শিল্প সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য, মালমসলা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে নিচ্ছিলেন। সতেরো বছর ব্যাঙ্কে কাজ করার পর ১৯১১ সনে তিনিষ্ট সেই কাজে ইস্তফা দিয়ে করাচীতে "Picture House" নামে একটি চিত্রগৃহের ব্যবস্থাপনার কাজে অংশগ্রহণ করেন। সেই কাজে তাঁর এমনই যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া গেলো যে কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই তাঁকে চিত্রগৃহটির অন্যতম অংশীদাররূপে গ্রহণ করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অংশীদারদের মধ্যে প্রায়ই পরিচালনা নীতি নিয়ে মতান্তর ঘট্‌তে লাগ্‌লো। ফলে একে একে সমস্ত অংশীদাররা চিত্রগৃহটির সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। বাকী রইলেন শুধু দু'জন। রেওয়াশঙ্কর পাঞ্চোলী ও মোরেদ। অপরিসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায় গুণে এই দু'জন চিত্রগৃহটিকে অনিবার্য বিনাশের হাত থেকে বাঁচালেন। এই সময় রেওয়াশঙ্কর বোম্বাই যান এবং সেখানকার চিত্রশিল্পপতিদের অনেকেরই সংস্পর্শে আসেন। আমেরিকার Universal Film Co. তাঁকে নানা ভাবে কার্যকরী সাহায্য করেন এবং ভবিষ্যতেও বিবিধ উপায়ে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হন। আশান্বিত হ'য়ে রেওয়াশঙ্কর করাচীতে ফিরে আসেন এবং ফেরবার সঙ্গে সঙ্গেই তার বোম্বাই পরিদর্শনের ফল ফলতে আরম্ভ করে। ১৯২৮ সনে তিনি আমেরিকার Monogram Co. থেকে কতক-গুলি ছবির পরিবেশন স্বত্ব ক্রয় করেন এবং Empire Film Co. নাম দিয়ে একটি পরিবেশনা প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলেন। ১৯২৯ সনে তিনি সবাক চিত্রের একটি ভ্রাম্যমান দল নিয়ে ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন এবং এতে বেশ মোটা টাকা উপার্জন করেন। ইতিমধ্যে তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো। একজন সুদক্ষ ব্যবসায়ী বলে চলচ্চিত্র শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের মুখে মুখে তখন তাঁর নাম। তার একটা শুভ ফল এই ফললো ১৯৩৩ সনে তিনি R K O Radio Pictureএর ভারতবর্ষে পরি-বেশনের সমস্ত স্বত্ব ও R C Aর এজেন্সি লাভ করতে সক্ষম

গলেন। এই সময় তিনি Empire Film Co.র নাম পরিবর্তন করে Empire Talkie Distributors রাখেন এবং সেই নামই অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। সেই থেকে Empire Talkie Distributirsoএর কার্য ক্রমেই প্রসারিত হ'তে থাকে এবং বিভিন্ন জায়গায় শাখা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। করাচীকে কেন্দ্র ক'রে বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান লাহোর, দিল্লী, কলিকাতায় অফিস স্থাপন করে দেশব্যাপী কাজ চালাচ্ছে। পাটনাতেও এদের একটি শাখা অফিস আছে। বোম্বাইএর কাজ হয় নিযুক্ত এজেণ্ট এর মারফৎ।

১৯৩৩ সন এ এদের কলিকাতা শাখা খোলা হয়। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সুপরিচিত মিঃ এস্, আর হেমাদ General Manager ও অংশীদাররূপে এই শাখার কার্যারম্ভ করেন। মি. হেমাদের সুযোগ্য পরিচালনার গুণে অল্প সময়ের মধ্যেই কলিকাতা শাখা একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানরূপে পরিণত হয় এবং উত্তরোত্তর তার শ্রীবৃদ্ধি হ'তে থাকে। মিঃ হেমাদ ব্যক্তিগত ভাবেও অনেক উল্লেখযোগ্য কার্যের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। উদয়শঙ্করের নৃত্যপ্রদর্শনীগুলো বর্তমানে তাঁরই প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়া আরও অনেক ছোটো বড়ো নৃত্যানুষ্ঠান, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান প্রভৃতির পেছনে এর সক্রিয় সহযোগিতা রয়েছে।

১৯৩৮ সনে চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে বিশেষ মন্দা দেখা দিলো। বোম্বাই-এর চিত্র নির্মাতারা এর দুর্গতির সমস্ত দায়িত্ব চিত্রপরিবেশকদের ওপর চাপালেন। রেওয়াশঙ্করের আত্মমর্যাদায় বিশেষ ঘা পড়লো তিনি তখন স্থির করে ফেললেন ছবির জন্যে চিত্রনির্মাতাদের দোরে দোরে আর ধর্ণা দেওয়া নয়, এবার থেকে নিজেরাই তাঁরা ছবি তুলবেন। প্রথমে স্থির হ'লো কয়েকটি নির্বাচিত চিত্র-নির্মান প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য দিয়ে ছবি তোলা হবে,

মিঃ এস্, আর, হেমাদ

কিন্তু সে ব্যবস্থা মনঃপূত না হওয়ায় নিজেরাই ছবি তোলবার সঙ্কল্প করলেন।

এই উদ্দেশ্য নিয়ে লাহোরে বিস্তৃত জায়গা নিয়ে বিরাট ষ্টুডিও গ'ড়ে তোলা হ'ল। করাচী অফিসের ভার পড়লো মিঃ মোরেদের ওপর, লাহোর কেন্দ্রের কার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন রেওয়াশঙ্কর পাঞ্চোলীর অনুজ দালসুখ পাঞ্চোলী আর রেওয়াশঙ্কর স্বয়ং ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন কেন্দ্রগুলির কার্য তদারক ক'রে বেড়াতে লাগলেন ইতি মধ্যে তিনি এক ফাঁকে আমেরিকা পরিভ্রমণ করে এসে ছিলেন। সেখানে তিনি আমেরিকার চিত্রব্যবসায়ীগণ কর্তৃক যে ভাবে সম্বর্ধিত হয়েছেন তা যে কোন বিশিষ্ট ভারতবাসীর পক্ষে গৌরবের বিষয়। Walt Disney প্রতিষ্ঠানের ডিস্‌নে ভ্রাতৃদ্বয়, আর, কে, ও, রেডিও পিকচার্সের কর্তৃপক্ষ ও আর, সি, এর প্রতিনিধিবৃন্দ

সকলেই তাঁকে সাদর অভিনন্দন দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন।

লাহোরে ছবি তোলার কাজ আরম্ভ হ'ল। পর পর কয়েকটি পাঞ্জাবী ছবি তোলার পর পাঞ্চোলী ভ্রাতৃদ্বয় হিন্দী ছবি তুলতে আরম্ভ করলেন। তৈরী হোল "খাজাঞ্চি"। ১৩৭০ সন পাঞ্চোলী আর্ট পিকচার্স ও এম্পায়ার টকি ডিষ্ট্রিবিউটার্স এর পক্ষে একটি বিশেষ স্মরণীয় বৎসর। কারণ সেই বৎসরই "খাজাঞ্চি" চিত্রগৃহে মুক্তি লাভ করে। খাজাঞ্চি একটি নূতন প্রতিষ্ঠানের প্রথম নির্মিত হিন্দী চিত্ররূপে যে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করে তা যে কোনো প্রথম শ্রেণীর চিত্রনির্মাতার ঈর্ষার বস্তু। পর পর তৈরী হোল "জমিদার", "খান দান", "পুঁজি"। প্রত্যেকটি এক একটি প্রথম শ্রেণীর চিত্ররূপে জনগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হোল। বর্তমানে পাঞ্চোলী আর্ট বিখ্যাত পারসিক রোমান্স "শিঁরী ফরহাদের" চিত্ররূপ দিতে ব্যস্ত আছেন। ছবিটি মুক্তিপ্রাপ্ত হ'য়ে দর্শক মহলে সাড়া জাগিয়ে তুলবে এই আশা অনায়াসে করা যায়। দালসুখ পাঞ্চোলীর সাক্ষাৎ প্রবর্তনায় স্থাপিত—প্রধান পিকচার্স এর প্রথম নিবেদন "দাসী" পূর্বতন রেকর্ড ভঙ্গ করার দুর্জয় প্রতিজ্ঞা নিয়ে আত্মপ্রকাশের প্রতীক্ষায় আছে। ছবিটি এম্পায়ার টকির পরিবেশনায় শীঘ্রই কলকাতায় মুক্তিলাভ করবে।

১৯৪৩ সনের ৩১শে মার্চ এম্পায়ার টকির ইতিহাসে একটি ঘোরতর দুর্দিনরূপে চিহ্নিত হ'য়ে থাকবে। কারণ এই তারিখে মিঃ রেওয়াশঙ্কর পাঞ্চোলী গতাসু হন। প্রতিষ্ঠানটি যখন গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করতে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় তার প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যু সত্যই অত্যন্ত শোকাবহ নই কি! তবে আশা এই যে, যার হাতে মৃত্যুকালে রেওয়াশঙ্কর তাঁর প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার ভার সঁপে দিয়ে গেলেন সেই দালসুখ পাঞ্চোলীও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতই একজন দক্ষ ও সুযোগ্য ব্যক্তি। তাঁর অভ্রান্ত নির্দেশ ও পরিচালনায় পাঞ্চোলী আর্ট পিকচার্স ও এম্পায়ার টকি ডিষ্ট্রিবিউটার্স ক্রমেই সেই ধাক্কা সামলে উঠতে পারবে ব'লে মনে হয়। এম্পায়ার টকির ক্রমবর্ধমান কার্যাবলীই তার প্রমাণ দিচ্ছে।

এম্পায়ার টকি পাঞ্চোলীর ছবি ছাড়াও ভারতের প্রধান প্রধান চিত্রনির্মাতাদের অনেকেরই ছবির পরিবেষক। এম্পায়ার টকির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিত্রনির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম দেওয়া গেলো :—পাঞ্চোলী আর্ট পিকচার্স আর, কে, ও রেডিও পিকচার্স (আমেরিকা), মিনার্ভা মুভিটোন (বোম্বাই), প্রভাত পিকচার্স (পুণা), ডলোয়ার প্রোডাকসন্স লিঃ (লাহোর), সেণ্ট্রাল ষ্টুডিও (বোম্বাই), শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স (কলিকাতা), নিউ সেঞ্চুরী প্রোডাকসন্স (কলিকাতা), প্রধান পিকচার্স (লাহোর)।

[প্রচার সচিব, নারায়ন চৌধুরী লিখিত]।

কাপুরচাঁদ লিঃ

১৯৩৩ হিন্দী চিত্রজগতের একটি স্মরণীয় বৎসর—এই বৎসর থেকেই কলিকাতা তথা সমগ্র বাঙলা দেশে হিন্দী চিত্র বাঙালীদের সমাদর লাভ করতে আরম্ভ করে। এই গৌরব নিয়ে আসে বম্বে টকীজের ছবি 'অছ্যুত কন্যা—' এই ছবিখানি সমগ্র হিন্দীচিত্র ব্যবসার মোড় ফিরিয়ে দেয় ছবিখানি একাদিক্রমে প্যারাডাইস সিনেমায় ৩৩শ সপ্তাহ প্রদর্শিত হ'য়ে চিত্রজগতে এক বিস্ময়ের উৎপাদন করে। তবুও তখন কেউ ধারণা ক'রতে পারেনি যে এই ছবিখানির পরিবেশক ও প্রদর্শক কাপুরচাঁদ লিমিটেড উত্তরোত্তর বহু অভাবনীয় রেকর্ড স্থাপন ক'রে বাঙলা দেশে হিন্দীচিত্রের ব্যবসায়কে স্থায়ীত্ব এনে দেবে।

সেই 'অচ্ছ্যৎ কন্যা'ই সমগ্র ভারতে হিন্দী চিত্রের মধ্যে সর্বপ্রথম রজত জয়ন্তী সপ্তাহ উদযাপিত করে। কাপুর চাঁদের নাম সেই থেকেই চিত্র পরিবেশন জগতে সকলকে ঠেলে সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো। কাপুরচাঁদের পরিচালনাধীনে প্যারাডাইস সিনেমাও শহরের মধ্যে অন্যতম

শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় চিত্রগৃহে পরিণত হ'ল। কাপুরচাঁদের প্রতিষ্ঠাই হিন্দী চিত্রের বাঙলা দেশে বিজয় অভিযানের সূচনা। 'অচ্ছ্যুৎ কন্যা'র পর উত্তরোত্তর 'ভাবী', 'দুনিয়া না মানে', 'কঙ্কন' প্রত্যেকখানিই রজত জয়ন্তী সপ্তাহ উদ্‌যাপন ক'রে ভারতময় সাড়া এনে দিলে—বম্বের হিন্দী চিত্র প্রযোজকরা সোণালী দিনের স্বপ্নকে কাজে পরিণত ক'রে তুলতে বদ্ধপরিকর হ'য়ে উঠলো। সোণালী দিন পত্তন হ'লো বম্বে টকীজের 'বন্ধন' চিত্র থেকে—একাদিক্রমে ছবিখানি প্যারাডাইসে ৫৭শ সপ্তাহ চলে এমন একটি রেকর্ড স্থাপন ক'রলে যা আজও ভারতের আর কোথাও আর কোন ছবির দ্বারা সম্ভব হ'ল না।

এখন থেকে বম্বের প্রযোজকরা কাপুরচাঁদের হাতে ছবি তুলে দেবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলো এবং পরিবেশন তালিকায় ছবির সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় একটা চিত্রগৃহে সব ছবি মুক্তিদান অসম্ভব দেখে এরা রক্সী সিনেমাটি কিনে নিলেন। প্রথম দিনই রক্সী শহরের অন্যতম জনপ্রিয় চিত্রগৃহ হ'য়ে আছে। এখানেই 'বসন্ত' ৫০শ সপ্তাহ চলে এবং 'কিসমৎ'ও সেই গৌরবপথে এগিয়ে চলেছে।

বাঙলা ছবিরও পরিবেশন ভার কিছুদিন এরা গ্রহণ করেছিলেন এবং তার মধ্যে নিউ থিয়েটার্সের 'জীবন মরণ' 'পরাজয়', 'সাথী', বড়দিদি প্রভৃতি ছবিগুলি মুক্তিদান ক'রে গৌরবকে বাড়িয়ে তোলেন।

আজ থেকে ভারতীয় চিত্র পরিবেশন ও প্রদর্শনক্ষেত্রের সর্ববিষয়েই শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব কাপুরচাঁদের। দীর্ঘ চলার কৃতিত্ব 'বন্ধন'এর; ১ম সপ্তাহে সর্বাধিক অর্থ আহরণের রেকর্ড 'শকুন্তলা'র (২৩ হাজারেরও বেশী)। ১৯৩২ সালে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে কাপুরচাঁদ বছরের পর বছর শ্রেষ্ঠ হিন্দী ছবিগুলি দেখিয়ে আজ যত রেকর্ডের কৃতিত্বে গৌরবান্বিত তা শুধু এখানেই নয় সমগ্র ভারতে আর কোন পরিবেশক দাবী ক'রতে পারে না। তাই আজ শ্রেষ্ঠ প্রযোজকদের প্রায় সবায়েরই ছবি কাপুরচাঁদের পরিবেশন তালিকাভুক্ত হ'তে পেরেছে। কাপুরচাঁদের আগামী আকর্ষণের মধ্যে রয়েছে: ফিল্মিস্তানের 'চল চল রে নওজোয়ান', শান্তারাম পরিচালিত 'পবত পে ডেরা হমারা' ও 'ভক্ত মালি', মেহবুব প্রডাকসন্সের 'হুমায়ূন', আচার্য আর্টের 'পরিস্তান', 'কারদার' প্রডাকসন্সের 'কানুন' ও 'সংযোগ' এবং আত্রে পিকচার্সের 'দিল কী বাত'। এর চেয়ে আকর্ষণীয় পরিবেশন তালিকা আর কারুর পক্ষেই আজ আর পেশ করা সম্ভব নয়।

কাপুরচাঁদের মালিকরা থাকেন বম্বেতে এ প্রান্তে কাপুরচাঁদের এই পরম গৌরবান্বিত প্রতিষ্ঠার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব জেনারল ম্যানেজার শ্রীছটুভাই দেশাইয়ের। তাঁরই কর্মদক্ষতা কাপুরচাঁদেরই নয় পরন্তু বাঙলা দেশে হিন্দী চিত্র ব্যবসাকে স্থায়ীত্বের পথে এনে দিয়েছে। কাপুরচাঁদকে এই অদ্বিতীয় গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত ক'রতে শ্রীছটুভাই দেশাইয়ের সঙ্গে যারা সহযোগিতা ক'রছেন, তারা হ'চ্ছেন রক্সীর ম্যানেজার শ্রী এস, এম, নাগড়ে, প্যারাডাইসের ম্যানেজার শ্রীবিজয়কুমার এবং কাপুরচাঁদের প্রচার-সচিব শ্রীপঙ্কজ দত্ত।

এম, পি, প্রোডাকসন্স

বাঙ্গালী চিত্রামোদীদের কাছে এম, পি, প্রোডাকসন্সের নাম অবিদিত নেই—এই প্রতিষ্ঠানটী চিত্রজগতের বিভিন্ন মুখীন ব্যবসায়ে লিপ্ত। এবং এদের আওতায় বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এর পুরোভাগে রয়েছেন শ্রীযুক্ত মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়—পরশমণ দীপচাঁদ ও শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়—চিত্রজগতে হারুদা নামে যিনি পরিচিত। নিউ থিয়েটার্সের পরই বাংলা চিত্র প্রযোজনায় এই প্রতিষ্ঠানটির কথা বলতে হয়। মায়ের প্রাণ, শেষ উত্তর, যোগাযোগ, বিদেশিনী প্রভৃতি এদেরই প্রযোজিত চিত্র। এদের প্রথম হিন্দী চিত্র "জবাব" বাংলা এবং বাংলার

বাইরে অসম্ভব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। শ্রীযুক্ত মুরলী চট্টোপাধ্যায়ের সংগে আমাদের পরিচয় সুপ্রসিদ্ধ চিত্র পরিবেশক প্রতিষ্ঠান রত্নীন এণ্ড কোঃ ভিতর দিয়ে। এই পরিবেশক প্রতিষ্ঠান বহু বাংলা চিত্র পরিবেশন করে বাঙ্গালী চিত্রামোদিদের অন্তর জয় করে বাংলা চিত্রজগতে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। এদেরই আওতায় ডি, লুক্স পিকচার্স নামে আরও দুইটী প্রযোজক ও পরিবেশক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। অভয়ের বিয়ে— ছদ্মবেশী প্রভৃতি চিত্র এদের পরিচয় দেবে। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় ডি, লুক্স পিকচার্সের ভার নিয়ে আছেন। প্রযোজনা ও পরিবেশনা ছাড়া চিত্র প্রদর্শন কার্যেও এরা লিপ্ত আছেন। উত্তরা—শ্রী পূরবী—এদেরই আওতায় গঠিত Exibitors Syndicate দ্বারা পরিচালিত। তাছাড়া শ্রীযুক্ত পরশমল দীপচাঁদ নব নির্মিত দীপক সিনেমার সত্ত্বাধিকারী। সুপ্রসিদ্ধ চিত্র তারকা কানন দেবী স্থায়ীভাবে এদের সংগে জড়িত রয়েছেন। সম্প্রতি কালী ফিল্মস স্টুডিও এরা ভাড়া নিয়ে ছবি তুলছেন। এদের কার্যালয় ৮। ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে আরও দুইটী প্রযোজক প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

এস, ডি, প্রডাকসন্স

সুধীর দাস ও সুজন দাস প্রযোজিত এস, ডি, প্রডাকসন্স রীতেন এণ্ড কোম্পানীর সংগে পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছে। এস, ডি, প্রডাকসন্সের 'পাষাণ দেবতা' 'সমাধান' উল্লেখযোগ্য। সমাধানের পরিচালনা করেছিলেন সুসাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র। পরিচালকরূপে এই চিত্রে সর্বপ্রথম তিনি আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেন। নূতন দৃষ্টিভংগি নিয়ে গৃহীত সমাধান চিরদিন প্রগতিশীল বাঙ্গালী দর্শকদের অন্তরে চিরজাগরূক থাকবে। এদের পরবর্তী চিত্রখানিও সম্ভবতঃ কোন নূতন পরিচালকের পরিচালনায় গৃহীত হবে।

সহধর্ম্মিনী খ্যাত রূপশ্রী লিমিটেড সম্প্রতি এসোসিয়েটেড ডিসট্রিবিউটর্স'এর আওতা থেকে ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে রীতেন এণ্ড কোং সংগে জড়িত হ'য়ে পড়েছে। এদের আগামী চিত্র 'নন্দিতা' শ্রীযুক্ত সুকুমার দাসগুপ্তের পরিচালনায় গৃহীত হচ্ছে। রূপশ্রী লিমিটেডের সংগে শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ খুব ঘনিষ্টভাবে জড়িত রয়েছেন। এই প্রত্যেকটী প্রতিষ্ঠানের প্রচার কার্যের ভার নিয়ে আছেন শ্রীযুক্ত হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়।

অরোরা ফিল্ম করপোরেশন

বাঙ্গালী চিত্রামোদীরা পরম শ্রদ্ধার সংগে এই প্রতিষ্ঠানটীর কথা চিরদিন স্মরণ রাখবে। ভারতীয় চিত্র জগতে যেমনি শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, বাংলার এই প্রতিষ্ঠার মূলে অরোরা ফিল্মের শ্রীযুক্ত অনাদি বসুর নাম প্রথমেই বলতে হয়। চিত্রজগতে প্রদর্শক, পরিবেশক, প্রযোজক এবং স্টুডিও মালিকরূপে অরোরা ফিল্মের সংগে আমাদের পরিচয়। বাংলা চিত্রজগতে খণ্ড চিত্র এবং শিক্ষামূলক চিত্র প্রযোজনায় অরোরার স্থান আজিও সর্বোচ্চে। বর্তমানে অরোরা পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রযোজনায় হস্তক্ষেপ করেছে। এদের 'পতিব্রতা'র পরিচালনা করেছিলেন শ্রীযুক্ত জগদীশ চক্রবর্তী বর্তমানে নিউথিয়েটার্সের স্টুডিও ম্যানেজাররূপে কাজ করছেন। অরোরার বর্তমান চিত্র 'সন্ধ্যা' প্রমথেশ বড়ুয়ার সুযোগ্য সহকারী শ্রীযুক্ত মণি ঘোষের পরিচালনায় গৃহীত হচ্ছে। নিউথিয়েটার্সের বাংলা ছবিগুলি পরিবেশনা করে অরোরা বাঙালী চিত্রামোদীদের অন্তর জয় করেছে। অনাদিবাবু বর্তমানে বৃদ্ধ হ'য়েছেন—তাই তার অবর্তমানে তার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বীরেন বসু অরোরার কার্য পরিচালনা করছেন। বীরেনবাবু যুবক—উচ্চ শিক্ষিত। তাঁর নূতন দৃষ্টি

মুক্তি-প্রতীক্ষায় !

আধুনিক সমাজের পটভূমিকায়
প্রতিফলিত ও নব-পরিকল্পনায়
রূপায়িত সমস্যামূলক কাহিনী

ভূমিকায় : ছায়া দেবী, রেণুকা, জহর, শ্যাম লাহা
ভূমেন রায়, নরেশ মিত্র প্রভৃতি।
পরিচালনা : হেমন্ত গুপ্ত
সুরশিল্পী : হিমাংশু দত্ত (সুর সাগর)
আবহ-সঙ্গীত : তিমিরবরণ

———একযোগে———

মিনার-ছবিঘর-বিজলী

আসিতেছে !!

চিত্ররূপা লিমিটেডের

সন্ধি

রচনা : শৈলজানন্দ
প্রযোজনা : দেবকী বসু
পরিচালক : অপূর্ব মিত্র
ভূমিকায় : সুমিত্রা, বিমান, অহীন্দ্র, দেববালা, ফণী রায়, মৃণালকান্তি প্রভৃতি

নিউ টকিজের

পরিচালনা : হেমন্ত গুপ্ত
সঙ্গীত : তিমিরবরণ
হিমাংশু দত্ত
সুবল দাশগুপ্ত
ভূমিকায় : অহীন্দ্র, ছবি বিশ্বাস, জহর, রবীন, ভি, জি, নরেশ মিত্র, ছায়া দেবী, মলিনা, সুপ্রভা প্রভৃতি।

এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স রিলিজ

ভংগি এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক বন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্ত ঘোষের কর্ম নিপুণতায় অরোরা দিন দিন উন্নতির পথে এগিয়ে চলুক বাঙালী চিত্রামোদীরা সেই আশাই করেন।

ইউরেকা পিকচার্স

শ্রীযুক্ত উমানাথ গাঙ্গুলী প্রযোজিত ইউরেকা পিকচার্স বাংলা চিত্র প্রযোজনার আদর্শ নিয়ে চিত্র জগতে আত্মপ্রকাশ করেছে। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র পরিচালিত এদের স্বামীর ঘর নানা কারণে দর্শকমন অধিকার করতে পারেনি। এদের বর্তমান চিত্র 'দোটানা' শ্রীযুক্ত অমূল্য মুখোপাধ্যায় ও প্রতুল ঘোষের যুগ্ম পরিচালনায় ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে গৃহীত হচ্ছে। চিত্রখানি পরিচালনা করবার কথা ছিল শ্রীযুক্ত মণি বর্মার। নানা কারণে—পরস্পরের ভিতর মতানৈক্য দেখা যায়—উমানাথ বাবু অমূল্যবাবু ও প্রতুলবাবুর পর পরিচালন-ভার ন্যস্ত করেন। এরা দুজনেই যুবক এবং পরিচালকরূপে এই প্রথম এদের অভিযান—যদিও ইতিপূর্বে সহকারীরূপে দক্ষতা অর্জন করেছেন—তবু নূতনের দাবীকে মেনে নিয়ে তাদের হাতে যে গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে—উমাবাবুর তার এই সৎসাহসের জন্য প্রশংসা না করে পারি না। অভিনয় এবং পরিচালনা সম্পর্কে অভিনেতাদের সাহায্য করবার জন্য শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র উপদেষ্টা রূপে ইউরেকার সংগে জড়িত আছেন। দোটানার চিত্র গ্রহণের কাজ করছেন শ্রীযুক্ত সুরেশ দাস। সুরেশ বাবু শুধু একজন দক্ষ চিত্রশিল্পীই নন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। চিত্রশিল্পে দক্ষতা অর্জনের জন্য তিনি বহুদিন বিদেশে ছিলেন। দোটানার চিত্রগ্রহণে তার নৈপুণ্য যে প্রকাশ পাবে এ কথা নিঃসন্দেহে আমরা আশা করতে পারি। দোটানার নায়িকা রূপে একটী উদীয়মানা কিশোরী অভিনেত্রীকে নির্বাচন করে প্রযোজক উমানাথ গাঙ্গুলী যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন—কুমারী লতিকা মল্লিক স্বীয় অভিনয় প্রতিভায় দর্শকমন আকৃষ্ট করে উমা বাবুর মর্যাদা রক্ষা করতে সক্ষম হবে—সে আশাও আমরা রাখি। কাশীনাথ এবং নীলাঙ্গুরীয়তে লতিকার অভিনয় প্রতিভার আমরা পরিচয় পেয়েছি। দোটানার কয়েকটী দৃশ্যপটে উপস্থিত থেকে আমরা নায়িকারূপে লতিকাকে দেখে সত্যই খুসী হয়েছি। অভিনয়ের পর লতিকা যখন তার মায়ের সংগে হাসতে হাসতে এসে আমাদের নমস্কার করলো প্রথমে চিনতেই পারিনি যে দোটানার নায়িকা ১৩ বছরের কিশোরী এই লতিকা। রূপ সজ্জার আবরণে তাকে পুরোদস্তুর যুবতী বলে মনে হচ্ছিল। নায়িকারূপে অভিনয় করে এসে—সাংবাদিকদের সংগে কথা বলতে লতিকা খুব গর্ব অনুভব কচ্ছিল। চঞ্চল লতিকা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলেই বসলো - দেখুন 'দোটানা'য় অভিনয় করে আমার মনে হচ্ছে আমি অনেক বড় হ'য়ে গেছি—আমার বয়স যদি

'দোটানা'র কুমারী লতিকা

চলচ্চিত্র শিল্পে বার্ম্মা সেলের দান

কোন সুবৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইহার উৎপাদন-দ্রব্য বাজারে কাট্‌তি করাই একমাত্র চরম লক্ষ্য নয়। তাই, এরূপ কোন প্রতিষ্ঠানকে অপরাপর দিকেও যথেষ্ট আগ্রহ সহকারে ইহার কার্য্যকারিতা প্রসারিত করিতে দেখা যায়। তখন স্বতঃই মনে আনন্দ জাগে। ক্রমোন্নতি-শীল প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বার্ম্মাশেল অন্যতম এবং ছায়াচিত্রে ইহার কার্যকারিতা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে শেল-ফিল্ম-ইউনিট গঠিত হয় এবং এপর্য্যন্ত শিক্ষা এবং দৃষ্টান্তমূলক বহু ছায়াচিত্র ইঁহারা তুলিয়াছেন। ছবিগুলিতে কোম্পানীর উৎপাদন-দ্রব্য বিক্রয় বা প্রচারের উদ্দেশ্য পরিদৃষ্ট হয় না; এমন কি, ছবিগুলির কোথাও কোম্পানীর বা ইহার উৎপাদন-দ্রব্যের কোন নাম পর্য্যন্ত দেখা যায় না। জনসাধারণকে আনন্দ দেওয়াই ছবিগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য।

পেট্রোল, ডাইসেল অয়েল ইঞ্জিন এবং নিঃসরণ-প্রণালীর মৌলিক তত্ত্ব সম্বন্ধে ইঁহাদের অনেকগুলি ছবি আছে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক গাড়ীর মালিকের নিকটেই এগুলি চিত্তাকর্ষক বলিয়া মনে হইবে। আধুনিক গাড়ীর সাজ-সরঞ্জাম সম্বন্ধেও শেল ফিল্ম ইউনিটের একখানি ছবি আছে। খনিজ তৈল সম্বন্ধে ইহাদের "অয়েল ফ্রম দি আর্থ" এবং "ডিষ্টিলেশন" ছবি দু'খানিও অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়াছে। শেষোক্ত ছবিখানির বিশেষত্ব এই যে, নিতান্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকটেও একটী দুর্ব্বোধ্য বিষয়কে অঙ্কন প্রণালী দ্বারা সরল এবং সহজ করিয়া দেখান হইয়াছে। চলচ্চিত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের কথা ছাড়িয়া দিলেও, সর্ব্ব-সাধারণের উপযোগী ছবিও ইঁহারা তুলিয়াছেন এবং তন্মধ্যে "ট্রান্সফার অব পাওয়ার"ই সম্ভবতঃ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই ছবিখানিতে দেখান হইয়াছে যে, আবহমানকাল হইতে "লেভারের" যে প্রাথমিক ব্যবহার আমাদের জানা আছে—আধুনিক সাইনক্রো-মেশগীয়ার বক্স ইত্যাদি জটীল কলকব্জাতেও উক্ত প্রণালী অনুসৃত হইয়া থাকে।

শেষ ফিল্মগুলি সাধারণতঃ এক রীলের, এবং বর্ত্তমানে শিক্ষা বা দৃষ্টান্ত মূলক ছবিগুলির মধ্যে জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে বলিয়াই মনে হয়। শেল কোম্পানীর পক্ষ হইতে কেবলমাত্র শিক্ষামূলক ছবি তুলিতেই ইঁহারা ব্যস্ত নহেন, পরন্ত সংবাদ সরবরাহের জন্যও ইঁহারা ছবি তুলিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর ছবি হিসাবে সম্প্রতি ভারতবর্ষে প্রদর্শিত ঐ "ট্রান্সফার অফ স্কিল" ছবিখানি অতি উচ্চশ্রেণীর ছবি বলিয়াই গণ্য হইয়াছে।

গত কয়েক বৎসর যাবত বার্ম্মা-শেল কোম্পানী এদেশের সহস্র সহস্র দর্শককে তাঁহাদের বিভিন্ন ছবি দেখাইতেছেন এবং প্রত্যেক ছবিখানিই উচ্চভাবে প্রশংশিত হইয়াছে। "এ কেরোসিন টিন" নামক যে ছবিখানি বার্ম্মাশেল কোম্পানী তুলিয়াছেন, তাহাতে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। নিউ থিয়েটার্সের শ্রীযুত বিমল রায়কে চিত্রশিল্পী হিসাবে উক্ত ছবিতে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বার্ম্মাশেলের ঐ বৎসরের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা—"দি গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড"। ছবিখানি ফিল্ম এডভাইসারী বোর্ডের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল এবং রাস্তা বা পথঘাটের উন্নতির প্রয়োজনীয়তা ইহা হইতে উপলব্ধি হইবে।

জিজ্ঞাসা করেন কেবল কথা ভুলে যয়ে একটু গম্ভীর হ'য়ে মাথা নেড়ে আমার বলতে ইচ্ছা করে -এই আঠার থেকে কুড়ি। উমাবাবুর কাছে আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবো। এই চিত্রে নায়িকারূপে নির্বাচন করে তিনি আমায় উৎসাহিত করে তুলেছেন বলে—আপনারা আশীর্বাদ করবেন—শুভেচ্ছা জানাবেন যেন তাঁর এই নির্বাচনের মর্যাদা আমি রাখতে পারি।" এ কথাগুলি লতিকা এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললো—সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায়ের প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব খুব আগহের সংগে লতিকা দিয়ে যাচ্ছিল। লতিকা একজন উপযুক্ত অভিনেত্রী হবার জন্য রীতিমত গান শিখছে—লেখাপড়া করছে তার ভবিষ্যতের জন্য তার মা তীব্রদৃষ্টি রাখছেন। নিজে মেয়ের সংগে সংগে স্টুডিওতে আসেন। লতিকা বলে—অভিনয়ের সময় মা বসে না থাকলে আমি গুলিয়ে যাই—আমার মা, আমার মায়ের আশীর্বাদে আমি একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী হবো।" লতিকাদের দেশ নদীয়া জেলায়। দেশের কথায় লতিকার ভারি আনন্দ হয়। তাই বলে, এই যে বিরাট বিরাট অট্টালিকা—প্রশস্ত প্রশস্ত রাজপথ এ থেকে আমার দেশের —আমার গায়ের কুড়ে ঘর গুলি অনেক ভাল, ওগুলি আমার কত আপনার—আমার ইচ্ছা করে গায়ে যেয়ে ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি করি—এখানে যেন কে আমার পা বেঁধে রাখে আমায় না দেয় পুকুরে সাতার কাটতে—না দেয় লাফিয়ে গাছে উঠতে।"

লতিকার সংগে অভিনয় করছেন সুপ্রসিদ্ধ জন-প্রিয় নট জহর গাঙ্গুলী। লতিকাকে নানা দিক দিয়ে তিনি সাহায্য করছেন। জহরবাবু বলেন -লতিকা বাংলার 'শার্লি টেম্পল।' লতিকা বলে: জহরদার নাম শুনে—প্রথম প্রথম ভয় করতো—অত বড় একজন অভিনেতা! এখন আর ভয় করে না, এখন জহরদা খুব আপনার হ'য়ে গেছে, এখন কেবল তাকে হিংসা করি। আমি জহরদার চেয়েও বেশী নাম কিনবো।' বাংলার এই শার্লি টেম্পলকে ক্যামেরার মারপ্যাচে এমনি ভাবে সুরেশ বাবু দেখাবেন—যে কাশীনাথ আর নীলাঙ্গুরীয়ের লতিকাকে আমরা চিনতে পারবো না। লতিকা নূতন করে জন্ম নেবে দোটানায়।

শ্রীযুক্ত উমানাথ গাঙ্গুলীর সব প্রচেষ্টা সার্থক হউক। এই প্রসংগে আর একটী কথা উল্লেখযোগ্য —৭জন দর্শক লতিকার স্যুটিং দেখবার জন্য আমাদের কাছে এসেছিলেন—আমরা তাদের কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিলে সাদর অভ্যর্থনার সংগে এদের গ্রহণ করেছিলেন। এরা সকলেই কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছেন এবং আমাদের একথা রূপ-মঞ্চে উল্লেখ করতে অনুরোধ করেছেন।

কোয়ালিটী ফিল্ম এক্সচেঞ্জ

চিত্র পরিবেশনা কার্যে অল্প দিন হলেও এঁদের অভিজ্ঞতাকে কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। পি, আর প্রডাকসন্সের বাংলা চিত্র 'পরিণীতা'র দায়িত্ব নিয়ে এরা চিত্রজগতে প্রবেশ করেন। এদের দ্বিতীয় চিত্র 'চিত্র ভারতী' প্রযোজিত 'শেষরক্ষা' রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি প্রতীক্ষায়। এদের 'পরিণীতা' এবং শেষরক্ষা দু'খানি চিত্রই পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। 'উকিল সাহেব' প্রভৃতি আরও কয়েকখানা হিন্দী চিত্র কোয়ালিটী ফিল্মের পরিবেশনাধীনে মুক্তি প্রতীক্ষায় আছে। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন লাহিড়ী ও মিঃ মল্লিকের পরিচালনায় কোয়ালিটী ফিল্মস উত্তরোত্তর উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে।

ভ্যারাইটী ফিল্মস এক্সচেঞ্জ ও ভ্যারাইটী পিকচার্স

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন বসু এই প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের স্বত্বাধিকারী। চিত্র পরিবেশনা ও প্রযোজনা কার্যে এরা লিপ্ত আছেন। এদের প্রথম ছবি কর্ণার্জুন—দ্বিতীয় ছবি

পোষ্যপুত্র। পরবর্তী চিত্রের সংবাদ এখনও আমরা জানতে পারিনি। তবে শ্রীযুক্ত বিমল ঘোষের (মৌমাছি) একটী গল্প এরা পর্দায় রূপ দেবার জন্য নির্বাচন করেছেন। একজন শিল্পীর জীবনী নিয়ে এঃ গল্পটী দানা বেধে উঠেছে। ভারত সরকার থেকে অনুমতি পেলেই এরা চিত্রের কাজ আরম্ভ করবেন।

এসোসিয়েটেড ডিসট্রিবিউটস লিঃ

চিত্র জগতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় বাঙালী প্রতিষ্ঠানগুলি শিখণ্ডীরূপে Front rank এ কাজ করছে অথচ তার পিছনে সব্যসাচীরূপে পরিচালনা করছে অবাঙালী 'ব্যবসায়ীরা' এদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প কতটা উন্নতিলাভ করতে পারে. আশা করি দর্শক সমাজ তা সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন। এসোসিয়েটেড ডিসট্রিবিউটর্সের মূলে- বাঙালীর পরিশ্রম এবং অর্থ দুইই নিহিত রয়েছে। এদের পরিবেশিত আলোছায়া, ফিবার মিকচার, গরমিল, বন্দী, সহধর্ম্মিনী, দম্পতি দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে প্রচুর। বর্তমানে নিউটকীজের সমাজ, বন্দিতা ও চিত্ররূপার বাংলা চিত্র সন্ধি এদের পরিবেশনাধীনে। এসোসিয়েটেডের গবর্ণিং ডাইরেক্টর রূপে শ্রীযুক্ত নরেশ ঘোষ খুব বিচক্ষণতার সংগে কার্য পরিচালনা করে এই প্রতিষ্ঠানকে দিন দিন উন্নতির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। যে প্রতিষ্ঠানের ষোল আনাই বাঙালী তার পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙালী দর্শক কোন দিনই পিছু হটবেন না। এর প্রচারকার্য করছেন শ্রীযুক্ত সুশীল সিংহ।

ইষ্টার্ণ টকীজ

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্ররঞ্জন সরকার প্রযোজিত ইষ্টার্ণ টকীজ বয়সে নবীন হলেও বাঙালী চিত্রামোদীদের কাছে অপরিচিত নয়। চিত্র প্রযোজনায় শ্রীযুক্ত সরকারকে প্রথম দেখতে পাই নীলাঙ্গুরীয়তে। চিত্রখানি নানা কারণে সাফল্যলাভ করতে না পারলেও একখানি প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসকে পর্দায়ে রূপায়িত করে সুরেনবাবু সুধীসমাজের কৃতজ্ঞতা ভাজন হ'য়েছেন। তাঁর দ্বিতীয় চিত্র শৈলজানন্দ পরিচালিত 'শহর থেকে দূরে'—সর্বশ্রেণীর দর্শক সমাজকে মুগ্ধ করেছে। সমালোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন সাংবাদিক বিভিন্ন মত প্রকাশ করলেও—এর জনপ্রিয়তার দিক কেউই অস্বীকার করেননি। হিন্দি চিত্রগুলির সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেই যেন শহর থেকে দূরের আত্মপ্রকাশ—দর্শকসমাজ তাকে শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়ে জয়মালা দিতে কার্পণ্য করেনি। এদিক থেকে ইষ্টার্ণ টকীজ গর্ব করতে পারে বৈকী? কালী ফিল্মস প্রযোজিত এদের পরবর্তী চিত্র কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে শৈলজানন্দের পরিচালনায় গৃহীত হচ্ছে। চিত্রখানির নামকরণ করা হ'য়েছে—'অভিনয় নয়'। ইষ্টার্ণ টকীজের এই চিত্রখানিও যে দর্শক সমাজের মনোরঞ্জনে সমর্থ হবে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। ইষ্টার্ণ টকীজের

পরিচালক, প্রযোজক এবং শিল্পীরা সবাই বাঙালী, বাংলা চিত্রের সেবায় এদের আত্মত্যাগ। প্রত্যেক বাঙালীই এদের পৃষ্ঠপোষকতা করবেন। এম্পায়ার টকীর ভূতপূর্ব কার্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কে, দত্ত, এদের সংগে সংশ্লিষ্ট আছেন। পরিবেশনার কার্য তিনি তদারক করেন। সাংবাদিক খগেন্দ্রনাথ রায়, শৈলজানন্দের সহকারীরূপে এই চিত্রেও কাজ করছেন।

মানসাটা ফিল্ম ডিসট্রিবিউটস

মানসাটা ফিল্ম ডিসট্রিবিউটস এতদিন হিন্দি চিত্র পরিবেশনায় বাংলার চিত্রামোদীদের কাছে পরিচিত ছিল। মানসাটা ভ্রাতৃদ্বয়ের কর্মতৎপরতায় এই প্রতিষ্ঠানটি খুব দ্রুতগতিতে উন্নতির কার্যে এগিয়ে চলেছে। শৈলজানন্দের সর্বপ্রথম চিত্র 'নন্দিনীর' এদের পরিবেশিত সর্বপ্রথম বাংলা চিত্র। কে বি পিকচার্সের জননী, রজনী পিকচার্সের জজ সাহেবের নাতনী এদেরই পরিবেশনায় প্রদর্শিত হ'য়েছে। বর্তমানে এরা যেমনি বাংলা চিত্রের পরিবেশনায় দৃষ্টি দিয়েছেন তেমনি বাংলা চিত্র প্রযোজনায়ও। রজনী পিকচার্স এদেরই অভত্তায় গঠিত প্রতিষ্ঠান। দ্বন্দ খ্যাত আর্ট ফিল্মের স্বত্ব ক্রয় করে এরা হিন্দি চিত্র প্রযোজনায় হস্তক্ষেপ করেছেন। এই চিত্রখানির নাম হয়েছে তাথ্‌রার। দ্বন্দ্বের পরিচালক হেমন্ত গুপ্তই চিত্রখানি পরিচালনা কর ছেন। সংগীতের ভার নিয়েছেন সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত শচীন দাস (মতিলাল)। শচীনবাবুকে সংগীত পরিচালকরূপে তাথরারএ দেখতে পেলেও, ইতিপূর্বে শ্রীযুক্ত রাইচাঁদ বড়ালের সহকারীরূপে তিনি দু'খানি নিউ-থিয়েটার্সের চিত্রের সুর দিয়েছিলেন—সৌজন্যের অভাব বশতঃ শ্রীযুক্ত বড়াল শচীনবাবুর নামও উল্লেখ করেননি অথচ চিত্র দু'খানির সুর অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করে ছিল। তাই শ্রীযুক্ত দাস যে দর্শকসমাজের চিত্ত বিনোদনে সমর্থ হবেন এ কথা জোর করে বলতে পারি। এমনকি চিত্রের সুর দেবার পূর্বে স্থানীয় সাংবাদিকদের নিয়ে সংগীত সম্পদে আলোচনা করে পরামর্শ গ্রহণ করবার পরিকল্পনাও এর আছে।

মানসাটার প্রযোজনা বিভাগের কৃতকার্যতার মূলে শ্রীযুক্ত সুখেন্দু ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য Film. Land পত্রিকার সংগে যুক্ত থেকে সাংবাদিকরূপে ইনি সুনাম অর্জন করেন। এম্পায়ার টকীর প্রচার সচিবের কার্য করেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। ম্যানসাটার প্রচারকার্যের ভার নিয়ে আছেন, এবং অগ্রজ শ্রীযুক্ত সুকুমার ঘোষ প্রসিদ্ধ ইংরাজী সাপ্তাহিক Cinema Times এর সংগে ইনি জড়িত।

প্রাইমা ফিল্মস লিঃ

প্রথম শ্রেণীর বাংলা চিত্র পরিবেশনা করে প্রাইমা ফিল্মস বাঙালী চিত্রামোদীদের অন্তর জয় করেছে। এই প্রতিষ্ঠানের মূলেও বাঙালীর অর্থ এবং পরিশ্রম দুইই নিয়োজিত রয়েছে। ১৯৪৩ সালে বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতি এবং বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংঘের নির্বাচনে এদেরই পরিবেশিত কাশীনাথ চিত্র শ্রেষ্ঠ চিত্র বলে নির্বাচিত হয়েছে। অপর চিত্র 'দাবী' শ্রেষ্ঠ কাহিনীর সম্মান লাভ করেছে। শুধু পরিবেশনা কার্যেই নয়—প্রদর্শন এবং প্রযোজনায়ও এদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রচেষ্টা বাংলা চিত্রজগতের উন্নতির মূলে নিহিত রয়েছে। রূপবাণী বাঙ্গালী দর্শকদের অতি প্রিয় প্রেক্ষাগৃহ। উত্তর কলিকাতার প্রায় সব প্রেক্ষাগৃহগুলিতেই এমন কি চিত্রাও হিন্দি চিত্র মুক্তিলাভ করেছে, কিন্তু এদিক দিয়ে রূপবাণী বাঙ্গালীর দর্শকদের কৃতজ্ঞতাভাজন। তারা প্রথম শ্রেণীর হিন্দি চিত্রের লোভও ত্যাগ করেছেন, সে খবর আমরা রাখি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ রূপবাণীর নামকরণ করেন—বাংলা চিত্রের দাবীকে সর্বাগ্রে রেখে রূপবাণী যেমনি অতীত ও বর্তমানে বাঙ্গালীর মর্যাদা রক্ষা করেছে ভবিষ্যতেও তারা এ কর্তব্য পালন করবেন সে বিশ্বাস আমাদের আছে।

মডার্ণ টকীজ এদেরই আওতায় গঠিত প্রযোজক প্রতিষ্ঠান—এদের সর্বপ্রথম চিত্র আশাকে—পরলোকগত কবি ও গীতিকার অজয় ভট্টাচার্যকে আমরা সর্বপ্রথম পরিচালক রূপে দেখতে পাই। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ শ্রীযুক্ত পিসিনানএর তত্ত্বাবধানে এই প্রতিষ্ঠান বাংলা ও চিত্রজগতে সত্যিকারের বাঙ্গালী চিত্র ব্যবসায়ী বলে গর্ব করবার স্পর্ধা রাখেন—বাঙ্গালী সাংবাদিকরূপে আমরা এদের তাই আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এদের প্রচার বিভাগের ভার নিয়ে আছেন শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল।

ভারতলক্ষ্মী পিকচার্স

বাবুলাল চোখানী প্রযোজিত ভারতলক্ষ্মী পিকচার্স চিত্র জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ভারত-লক্ষ্মীর নিজস্ব ষ্টুডিওতে প্রত্যেকটি ছবি তৈরী হয়। বাংলা চিত্র 'আলিবাবা'য় নৃত্যশিল্পী সাধনা বসু সর্বপ্রথম চিত্রে অভিনয় করেন। পরশমনিতে ল' কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপাল স্বর্গত সতীশ বাগচীর শিক্ষিতা কন্যা অরুণা বাগচী পর্দায় সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। এদিক দিয়ে দুইজন অভিজাত বংশীয়া অভিনেত্রীর আবিষ্কারে ভারতলক্ষ্মী কিছুটা গর্ব অনুভব করতে পারে বৈকী। সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গত নট দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ ভাবে এদের সংগে জড়িত ছিলেন। তাছাড়া ‹ক চিত্রে বহু শিল্পী সমন্বয়ের কৃতিত্ব এরা যতটা দাবী করতে পারেন—কোন প্রতিষ্ঠানই তা পারবেন না। আলিবাবা, পরশমণি ঠিকাদার—অবতার, জীবনসঙ্গিনী—মাটির ঘর প্রভৃতি এদের প্রযোজিত চিত্র। 'গৃহলক্ষ্মী' নামে বর্তমানে গুনময় বন্দ্যোপাধ্যায়এর পরিচালনায় আর একখানি বাংলা চিত্র সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। হিন্দি চিত্র প্রযোজনা ও ভারতলক্ষ্মী পিছু হটেনি। বাবু লালজী নিজে কর্মঠ এবং অভিজ্ঞ, ব্যবসার দিক থেকে তাই তার চিত্রগুলি আশাতীত সাফল্য অর্জন করে। এই সাফল্যের মূলে এদের প্রচার কার্য বহু অংশে সাহায্য করে। বর্তমানে প্রচারকার্যের ভার নিয়ে আছেন চিত্রপঞ্জী পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিউ টকীজ লিঃ

কে, তুলসান প্রযোজিত নিউ টকীজ লিঃ বাংলা চিত্র প্রযোজনায় লিপ্ত আছে। এদের প্রযোজিত নারী—অভিসার—দাবী প্রভৃতি চিত্রের ভিতর দাবী জনসমাদর লাভ করেছে। আগত প্রায় চিত্র 'সমাজ' এসোসিয়েটেড ডিসট্রিবিউটর্সের পরিবেশনায় মুক্তি প্রতীক্ষায়। আর একখানি চিত্র বন্দিতার কাজও এগিয়ে চলেছে। সমাজ এবং বন্দিতা উভয় চিত্রের পরিচালক হচ্ছেন শ্রীযুক্ত হেমন্ত গুপ্ত। বন্দিতায় যতদূর খবর শুনলুম—সংগীতের জন্য তিনজন সুর শিল্পীকে নিয়োগ করা হ'য়েছে। 'বন্দিতা'র বিভিন্ন চরিত্র চিত্রাঙ্কণে বাংলার খ্যাতনামা শিল্পীদেরই দেখা যাবে। এদের প্রচারকার্য নিয়ে আছেন শ্রীযুক্ত প্রবোধ সরকার, এরও একখানি উপন্যাস - হেমন্ত গুপ্তের পরিচালনায় চিত্রায়িত হবে বলে গুজব চলছে।

ইউনিটি ফিল্ম এক্সচেঞ্জ

ইউনিটি ফিল্ম এক্সচেঞ্জ বাংলা দেশে এই চিত্রপ্রতিষ্ঠানটি চিত্রপরিবেশনার কার্যে চিত্র শিল্পে অবতরণ করেছেন। এদের পরিবেশনায় 'চাঁদের কলঙ্ক' 'হুরাদা' প্রভৃতি মুক্তিলাভ করেছে। চিত্রের ভিতর দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের সমস্যা সমাধানে এরা সচেষ্ট আছেন—এদেরই আর একখানি চিত্র ভাই-চারা, তারই সাক্ষ্য দেবে। মিঃ পরাশর, মিঃ শর্মা, মিঃ সাইগল পরিচালনার পুরো ভাগে আছেন। এভারগ্রীণ পিকচার্সের ভূতপূর্ব মিঃ আগ্নার এখানে যোগদান করেছেন। [এভারগ্রীণ পিকচার্স, বম্বে পিকচার্স লালজী হেমরাজ হরিদাস; গুডলাক পিকচার্স, সিলেক্ট পিকাচার্স. আর্ট ফিল্মস, মুনলাইট পিকচার্স, দোষানী

স্বর্গত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম :—১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩০০ ।   মৃত্যু :—৫ই আষাঢ়, ১৩৫০ ।

দুর্গাদাসের এই প্রতিকৃতি 'দুর্গাদাসের' জীবনীতে
আর্ট পেপারে মুদ্রণ করা হয়েছে।

ভারতবর্ষের সৌজন্যে

চিত্রভারতীর 'শেষ-রক্ষা' চিত্রে
ইন্দুমতির ভূমিকায়
শ্রীমতী বিজয়া দাস

রূপ-মঞ্চ

মঞ্চ, পর্দা ও সাহিত্য-কলার সচিত্র মাসিক

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির মুখপত্র

কার্য্যালয় ৩০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৫ম সংখ্যা : আষাঢ় ১৩৫১ : চতুর্থ বর্ষ

গ্রাহক-মূল্য বার্ষিক সডাক আট টাকা।

আমাদের আজকের কথা

কিছুদিন পূর্বে ৭২।১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির এক সভা হয়। বেতারের শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র উক্ত সভায় প্রধান অতিথি এবং বক্তা-রূপে আহূত হন। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন সমিতির মূল সভাপতি ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বাংলা ছবির উন্নতির পথে যে সব বাধা-বিঘ্ন রয়েছে— এবং সেই বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে কী ভাবে বাংলা ছবি দর্শক-মন অধিকার করতে পারে, মূলতঃ ওদিনের সভায় তাই ছিল আলোচনার বিষয়। বাংলা চিত্রজগতের যে-সব গলদের কথা বীরেনবাবু উল্লেখ করেন, নানাদিক দিয়ে তা' প্রণিধানযোগ্য। বীরেনবাবু বলেন : বাংলার চিত্র জগৎ অবাঙ্গালী রাহু-গ্রাসে ধীরে ধীরে কিরূপ কবলিত হ'য়ে আসছে সন্ধান যারা রাখেন—বাংলা চিত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁদের সংশ'য়ের অবধি থাকবে না। বাংলা চিত্র-জগতকে পূর্ণ কবলিত হবার হাত থেকে একমাত্র রক্ষা করতে পারেন বাংলার ধনিক সম্প্রদায়, যাঁরা আজ পর্যন্তও চিত্র ব্যবসায়কে সুনজরে দেখে উঠতে পারেননি—যাদের স্নেহ থেকে আজ পর্যন্তও বাংলা চিত্র জগত বঞ্চিত। অথচ চিত্র ব্যবসা যে-কোন ব্যবসা থেকে বেশী লাভজনক হতে পারে—যদি এর মূলে বিচক্ষণ ব্যবসায়ীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং পৃষ্ঠপোষকতা থাকে। অবাঙ্গালী সুচতুর ব্যবসায়ীরা তাই এদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। শিখণ্ডীর মত বাঙ্গালীকে দাঁড় করিয়ে গাণ্ডীবের টঙ্কার ধ্বনিতে চিত্র জগতে একাধিপত্য স্থাপনে তারা আজ বদ্ধপরিকর। এক নিউথিয়েটার্স ছাড়া খুব কম প্রতিষ্ঠানই আছে— যার মূলে অবাঙ্গালীর অর্থ নিয়োজিত হয়নি। তাই বাঙ্গালী ধনিক সম্প্রদায়কে চিত্র ব্যবসায়ের দিকে দৃষ্টি দিতে একান্ত ভাবে অনুরোধ করি।

পশুপতি চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত 'শেষরক্ষা'য় পদ্মা দেবী।

"বাংলা ছবি বাংলার বাইরে প্রদর্শিত হয় না। যেখানে হয়—সপ্তাহে একদিন, তাও হয়ত সকাল বেলা। বাংলার বাইরে প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ করে বাংলা ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করায় যদি অসুবিধা থাকে—বাংলায় যে-সব অবাঙ্গালী চিত্র প্রতিষ্ঠানের সংগে বাঙ্গালী জড়িত রয়েছেন—তাদের উচিত ব্যবসায় গত বাধ্য-বাধকতায়—অবাঙ্গালী চিত্র পরিবেশক প্রতিষ্ঠানদের দ্বারা—বাংলার বাইরেও বাংলা ছবির প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা। বাংলা ছবির পরিধি তাহ'লে বিস্তৃতি লাভ করতে পারবে।

"বাঙ্গালী প্রযোজক প্রতিষ্ঠান কেন সামাজিক চিত্র ছাড়া অন্য কোন জাঁকজমকময় চিত্র গ্রহণে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না তার মূলে রয়েছে সংকীর্ণ পরিধি। বাংলায় যেমনি হিন্দি চিত্রগুলি ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে—তেমনি বাংলার বাইরে যদি বাংলা ছবি অবাঙ্গালী দর্শকদের চিত্ত জয় করবার সুযোগ পায়—বাঙ্গালী প্রযোজক বিভিন্ন ধরণের ঝক্কী বহন করবার শক্তি অর্জন করতে পারবেন।"

বাংলা ছবি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হবার মূলে যে করুণ দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় তার রূপ বর্ণনা দিতে যেয়ে শ্রীযুক্ত ভদ্র বলেন: বেশীর ভাগ প্রযোজক-প্রতিষ্ঠান-গুলির নিজস্ব কোন ষ্টুডিও নেই—অন্যের ষ্টুডিও ভাড়া নিয়ে তাদের ছবি তুলতে হয়—অপর ষ্টুডিওতে ছবি তুলতে নানান অসুবিধা দেখা যায়। সে-সবের ভিতর দিয়ে ছবি তুলতে খুব কম

পরিচালকই কৃতকার্য হন। যেমন ধরুণ, আমি একটী ষ্টুডিও ভাড়া নিলুম—আমার মত আরো ৬ জন প্রযোজক রয়েছেন। ষ্টুডিওর কার্যকরী মেজে রয়েছে (working floor) ৩টী। এই সাতটী প্রতিষ্ঠানকে ৩টী floor এ কাজ করতে হবে। মাসে চারদিন এক এক জনে Shooting date পেলেন। ১, ৭, ১৪, ২১ এই চারটে তারিখ পড়লো আমার। অন্য কোন সুযোগ যখন নেই—এই ভাবেই আমাকে কাজ করে যেতে হবে। চিত্রের কাজ আরম্ভ হলো। প্রথম Shooting নির্বিঘ্নে গ্রহণ করা হলো। দ্বিতীয় দিনে দেখা গেল, আমার নায়ক-নায়িকা অপর আর একটী প্রতিষ্ঠানের সংগে ৩ দিনের জন্য আটকে পড়েছেন। এই প্রসংগে মনে রাখা উচিত—অভিনেতা এবং অভিনেত্রীরাও স্টুডিওর মতই মুষ্টিমেয়—আমাদের প্রত্যেক প্রযোজককেই তাই ঐ একই অভিনেতা অভিনেত্রীদের সংগে চুক্তি করতে হয়েছে। এ অবস্থায় অন্য প্রতিষ্ঠান হয়ত তাড়াতাড়ি

'বরীযাতে' অপূর্ব রূপ-সজ্জায় মজহব খাঁ।

হেমন্ত গুপ্ত পরিচালিত 'সমাজে' ভূমেন রায় ও ছায়া দেবী।

কাজ করতে হবে সাত দিন। বিরাট একটা জাঁকজমকপূর্ণ দৃশ্য। একজন ধনীর বাড়ী। ঘরে সাজানো সাজানো বই রয়েছে স্তূপীকৃত—মর্মর মূর্তি—ফোয়ারা থেকে জল পড়ছে। এই দৃশ্যটি গ্রহণ করবার জন্য চিত্রখানি আর শেষ হচ্ছে না। কারণ ঐ এক সংগে সাত দিন আর ষ্টুডিও মালিক আমায় দিতে পাচ্ছেন না। তিনদিন হয়ত পাওয়া গেল। কয়েকটা দৃশ্য গ্রহণ করা হলো। আবার সে সেট সরিয়ে রাখতে হলো, কারণ ঐ ধনীর প্রাসাদের স্থানে ঐ floor-এ অন্য প্রতিষ্ঠানের একখানি কুঁড়ে ঘর গজিয়ে উঠলো। আবার ২০ দিন পরে হয়ত আমি তারিখ পেলাম। সেট তৈরী হলো। চিত্রের কাজ শেষ করা হলো। এই চিত্র যখন মুক্তিলাভ করলো দেখা গেলো, কোন স্থানে মর্মর মূর্তি রয়েছে দুটো কোন স্থানে তিনটে—তাড়াতাড়িতে ফোয়ারাটা দিতে ভুলেই যাওয়া হ'য়েছে। এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে ছবি আত্মপ্রকাশ করলো। বাক্যবাণ বর্ষিত হ'লো বেচারা পরিচালকের পর! এ বিষয়ে কোন হাত ছিল না তাঁর। বাংলা চিত্রকে নিখুঁত করে তুলতে হ'লে প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হবে এদিকে। তারপর উপযুক্ত যন্ত্রপাতি না হলে বিশেষজ্ঞদেরই বা কী করবার আছে?

আমার নায়ক বা নায়িকার কাজটুকু সেরে নিয়ে ছুটি দিলেন—তিনি তাড়াতাড়ি এসে Make up নিয়েই বললেন: হ্যাঁ Ready—কী আমায় বলতে হবে? পরিচালক বুঝিয়ে দিতে গেলেন, "এই আপনার চরিত্র—এই বলার পর এই আপনার—": নিন, নিন অত বলতে হবে না। আমার আবার থিয়েটারে যেতে হবে তাড়াতাড়ি সেরে নিন। কী আছে—" নিরুপায় পরিচালক! তিনি বলে যেতে লাগলেন—শত শত লোকের পাঁজর দিয়ে তুমি তোমার এই বিলাস ব্যসন গড়ে তুলেছো," নায়ক মুখস্ত করে যেতে লাগলেন: শত শত লোকের পাঁজর দিয়ে—পাঁজর দিয়ে—তুমি তোমার—" তারপর ছবি take করা হলো। দেখা গেলো ঐ একটা দৃশ্য গ্রহণ করতে একটা দিন চলে গেল। তারপর মনে করুন, একই দৃশ্যে আমার

"এই সব অসুবিধার ভিতর দিয়েও বাংলা চিত্র যে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে সে বিষয়ে কারো দ্বিমত থাকতে

পারে না। N. T.র ছবি যে-কোন ভারতীয় চিত্রের তুলনায় শ্রেষ্ঠ আসন পাবার যোগ্য—তার মূলে—N. T.র বিশেষজ্ঞদের কৃতিত্ব থাকলেও N. T র নিজস্ব স্টুডিও ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি অনেকাংশে সাহায্য করে।

"বাংলা ছবির উন্নতিতে বাঙ্গালী দর্শকদের পৃষ্ঠপোষকতা নিতান্ত প্রয়োজন। বৈদেশিক চিত্রের সংগে প্রতিযোগিতায় যদি বাংলা চিত্রের স্থান হীন স্তরেও নির্ধারিত হয় তবু বাঙ্গালী দর্শকেরা তার যেন পৃষ্ঠপোষকতা করেন। আপনারা দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক-এর ভিতর দিয়ে যেমনি প্রতিবাদ জানাবেন ছবির বিরুদ্ধে, তেমনি হিন্দি বা ইংরেজী ছবি না দেখে বাংলা ছবি দেখতেই অপরকে প্ররোচিত করবেন। বাঙ্গালী দর্শকদের সংঘবদ্ধ করবার জন্যই বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির জন্ম—সমগ্র ভারতবর্ষে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান আমাদের বাংলা দেশেই সর্বপ্রথম গড়ে উঠেছে—প্রত্যেক বাঙ্গালী দর্শকেরই এর সংগে সহযোগিতা করা কর্তব্য। কারণ সমগ্র দর্শক সাধারণের পৃষ্ঠপোষকতায় যদি এই প্রতিষ্ঠান একটি সত্যিকারের শক্তিশালী জনপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়—চিত্রজগতের যে-কোন সমস্যা সমাধানে এরা সমর্থ হবেন। তাই জেলায় জেলায়—পাড়ায় পাড়ায়—মূল সমিতির সংগে সংযোগ রেখে এক একটী শাখা সমিতি গড়ে ওঠা দরকার। রূপ-মঞ্চ পত্রিকা এর দায়িত্ব গ্রহণ করলেও সকলের সহানুভূতি না পেলে সমিতির মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। তাই আমি আপনাদের সবাইর কাছে আবেদন জানাচ্ছি, রূপ-মঞ্চের এই শুভ প্রচেষ্টায় আপনারা সমবেত ভাবে যোগদান করে একে জয়যুক্ত করে তুলুন। ব্যক্তিগত ভাবে আমি সব সময়ই আপনাদের হাতে হাত মেলাবো।"

সভায় আরো নানান গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। উপস্থিত সভ্যদের ভিতর অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক স্মরজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, অখিল নিয়োগী, শচীনদাস (মতিলাল), রূপ-মঞ্চের কর্তৃপক্ষ এবং আরো বিশিষ্ট দর্শকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আশা করি, বাঙ্গালী দর্শকেরা বীরেনবাবুর মতই উদ্যোক্তাদের হাতে হাত মিলিয়ে এরূপ একটি জনপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সহায়তা করবেন। রূপ-মঞ্চ আজীবন এই জন শক্তিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যাবে। —শ্রীকাঃ

স্বদেশপ্রেমিক প্রফুল্লচন্দ্র

প্রীতিদেবী মুখোপাধ্যায়

জগতে মাঝে মাঝে এমন কতকগুলি লোকের আবির্ভাব ঘটে, যারা আমাদের চিরচলমান একটানা জীবনস্রোতে আলোড়ন তুলে দিয়ে, নিদ্রিত জাতিকে জাগিয়ে দিয়ে বলেন—দেখ, ভাল করে দেখ, নিজেকে দেখ, দুনিয়াকে দেখ, বিচার করে দেখ তোমাদের। চলার গতি কি উর্ধ্বগামী? এই আলোড়ন হচ্ছে বিবর্তনের ধাপ। প্রত্যেক জাতির জীবনে এর প্রয়োজন আছে, নইলে গতানুগতিক ভাবে চল্‌তে থাকতো আমাদের জীবন, যার পরিণতি ধ্বংস। এ জন্যই জীবনপথে যখনই কোন জাতি তাদের কর্তব্য, তাদের সত্বা ভুলে গিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে, তখনই কোন্ অদৃশ্য দেবতার নির্দেশে এমনি কারো জন্ম হয় আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে জাতিকে বাঁচিয়ে তুলতে, তাদের উৎসাহ দিয়ে প্রেরণা দিয়ে তাদের গন্তব্য পথে এগিয়ে নিতে। এই সত্য আমরা প্রত্যেক জাতির ইতিহাসেই দেখ্‌তে পাই। গীতায়ও আমরা এই আভাষই পাই—"পরিত্রাণায় চ। সম্ভবামি যুগে যুগে।"

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলামায়ের শস্য-শ্যামল কোলে এমনি কয়েকজন মহামানব জন্ম নিয়েছিলেন—যারা সারা বাংলায় প্রতিভা ও মনীষার দীপালী জ্বালিয়ে নিদ্রিত বাঙ্গালীর প্রাণে চেতনা সঞ্চার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, শরৎচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি কক্ষচ্যুত নক্ষত্র ছিলেন—ছিলেন তাঁরা এই দীপালী উৎসবের দীপাবলী। রাজনীতিতে, সাহিত্যে, শিক্ষায়, ধর্মে, কর্মপ্রেরণায় বাঙ্গালীর অভাবনীয় খ্যাতির আলোক সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়ে একে একে বিদায় নিয়েছেন। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র এই দীপাবলীর শেষ দীপশিখা ছিলেন, তাঁর নির্বানের সাথে সাথে দীপালীর আলোকমালা হয়তো চির অন্ধকারে লুপ্ত হয়ে গেল, জানি না, আবার কবে, কোন্ শুভক্ষণে এমনিভাবে দীপালীর উৎসব সুরু হবে! বাঙ্গালীর চলার পথের গতি তাদের আলোকে আলোকিত হবে কিনা কে জানে?

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বিশ্ববিশ্রুত রাসায়নিক ছিলেন, কিন্তু তিনি কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়েই মত্ত ছিলেন না। নিরলস কর্মশক্তি দিয়ে ব্যবসা, সাহিত্য, দেশসেবা, রাজনীতি, ইতিহাস, সমাজসেবা প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। একাধারে এরকম বহুমুখী কর্মশক্তি খুব কমই দেখা যায়।

তাঁর বিজ্ঞান সাধনার মূল উৎস ছিল স্বদেশপ্রেম, তিনি জানতেন বর্তমান সভ্যতায় বিজ্ঞানই জাতির শক্তি ও সম্পদের প্রধান উপাদান। যে ভারতভূমি অতীতে একদিন, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সমগ্র পৃথিবীর পুরোভাগে ছিল, আজ সে তার অতীতের ঐশ্বর্য, অতীতের গৌরব হারিয়ে পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে। তাই তিনি স্বদেশপ্রেমের প্রেরণায় বিজ্ঞানসাধনা ও বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন নিঃস্ব করে। বিজ্ঞান সাধনার পুরস্কারস্বরূপ যে অর্থ যখনই তিনি পেয়েছেন, দান করে দিয়েছেন বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর দানের জন্য অশেষভাবে ঋণী। এ ছাড়া পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, নাগপুর প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁর দানে পরিপুষ্ট। এই-যে দান—এ তাঁর যশোলাভের জন্য নয়, দেশবাসী যাতে বিজ্ঞানসাধনায় অধিকতর আগ্রহ ও যত্নশীল হয় এবং দেশকে উন্নতির পথে নিয়ে যায় এই দান তার সামান্য পাথেয়।

বাংলার শিল্পক্ষেত্রেও তাঁর দান সামান্য নয়। পরমুখাপেক্ষী বাঙ্গালী যাতে নিজের দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে নিজেদের অর্থ স্বদেশের কাজে লাগাতে পারে তার জন্য তিনি ব্যবসায়ের দিকে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছেন। তাদের প্রেরণা দিয়ে উৎসাহ দিয়ে বাংলাদেশে

কাপড়ের মিল প্রতিষ্ঠা করেছেন, যান্ত্রিক-শিল্প প্রসারে যথাসাধ্য দান করেছেন এবং প্রতিষ্ঠাও করেছেন। আত্ম-বিশ্বাস ও কর্মশক্তি সমন্বয়ে যে উন্নতির পথের সমস্ত বাধা বিঘ্ন দূর করা যায়, আজিকার বিরাট বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানা তারই জলন্ত উদাহরণ, প্রফুল্লচন্দ্রের স্বোপার্জিত সামান্য মূলধন নিয়ে বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে আজ বাঙ্গালীর এই নিজস্ব শিল্পপ্রতিষ্ঠান এক জাতীয় সম্পদে পরিণত হয়েছে।

তিনি যে শুধু যান্ত্রিক শিল্পে উৎসাহদাতা ছিলেন তা নয়, দরিদ্রজাতির দুঃখ লাঘবের জন্য কুটীর শিল্পের প্রসারের প্রয়োজনীয়তা তিনি সম্যক উপলব্ধি করতেন এবং এজন্য নানাভাবে সাহায্য করেছেন। কুটীর-শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁর দান সামান্য নয় এবং খাদি-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ার পর তাঁর জীবনের সমস্ত অর্থ এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি বিধানে দান করেন। বাংলায় জাতীয় শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান খুব কমই আছে, যা আচার্যের দানে পুষ্ট নয়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মহত্ত্বের সবচেয়ে বড় পরিচয় হল—দেশের দুর্দিনে আর্তের সেবা। বাংলার দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, পীড়িত নরনারীর আকুল আর্তনাদ এই লোকহিতব্রতীর হৃদয়ে সহানুভূতির ফল্গুধারা সৃষ্টি করেছিল। যখনই কোনস্থানে প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেশবাসী নিদারুণ দুঃখে পীড়িত হতো, তিনি সেখানে ভগবানের মঙ্গলদূত রূপে উপস্থিত হতেন তাঁর ভিক্ষালব্ধ সাহায্য নিয়ে। তাঁর আপ্রাণ চেষ্টায় দুর্দশাগ্রস্ত দেশবাসীর অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের অনেকখানি লাঘব হতো। তাঁর সেবার কথা, দেশবাসীর প্রতি তাঁর অপরিসীম মমতা, তাদের জন্য তাঁর অমানুষিক পরিশ্রম ও ক্লেশের কথা সমগ্র দেশবাসীর হৃদয়ে উজ্জল হয়ে আছে। ১৯২১ সালে খুলনার দুর্ভিক্ষে তিনি সর্বপ্রথম জনসেবকরূপে উপস্থিত হন এবং এই আর্তজনের সেবার ভিতর দিয়েই জনগণের হৃদয়ে স্থান গ্রহণ করেন।

স্বর্গত আচার্য দেব

এছাড়া অনেক হাসপাতাল বা অনাথ আশ্রম, স্কুল বা কলেজের সাহায্যে তিনি নিজের সঞ্চিত অর্থ দান করেছেন, প্রয়োজন হলে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়ে যেতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি।

স্বাধীনতা ব্যতীত ভারতের সর্বগ্রাসী দুঃখ ও দারিদ্র্যের অপসারণ অসম্ভব—এই সত্য তথ্যটী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অবিদিত ছিল না এবং তিনি বিশ্বাসও করতেন, তাই ভারতের সর্বপ্রকার স্বাধীনতা প্রচেষ্টায় তিনি সাহায্য-

কারী ছিলেন। রাজনীতিক না হলেও স্বদেশের রাজনৈতিক সঙ্কটে জনস্বার্থ রক্ষাকল্পে নির্ভীকচিত্তে তিনি অগ্রণী হয়ে দাঁড়াতেন।

তাঁর সমগ্র কর্মজীবন আলোচনা করলে এই সত্যই আমরা দেখতে পাই যে, স্বদেশপ্রেমের উৎস থেকেই তাঁর কর্মশক্তি-চির-প্রবাহিত ছিল। বহুমুখী কর্মপ্রেরণা তাঁর জীবনকে ব্যক্তিগত সীমা ছাড়িয়ে জাতীয় সাধনার প্রতীকরূপে পরিণত করেছে। এই বৃহত্তর জীবনের অনুপ্রেরণায় তিনি সংকীর্ণ সাংসারিক মায়া চিরদিনের জন্য ত্যাগ করেছেন অতি সহজে। দেশের ও দশের জন্য এরকম স্বার্থলেশহীন ত্যাগ ও কর্মশক্তির তুলনা হয় না। কুরু-পিতামহ ভীষ্মদেবের মত স্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গল কামনায় ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত সুখ আশা আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষে বলি দিয়ে নিজের জীবন ব্যয়িত করেছেন। ভারতের সমগ্র নরনারী আজিও যেমন দ্বাপরের সেই মহাপ্রাণ ভীষ্মদেবকে শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে অঞ্জলি দিয়ে থাকে, তেমনি চিরদিন শ্রদ্ধাঞ্জলী দান করবে কলির ভীষ্মদেব সংসার-ত্যাগী চিরকুমার প্রফুল্লচন্দ্রকে। ভাগ্যহত বাঙ্গালীর দুঃখের দিনে, বিপদের দিনে যে লোকটী সকলের পুরোভাগে এসে দাঁড়াতেন, সেই বিপদের বন্ধু, দুর্দিনের আশ্রয় প্রফুল্লচন্দ্রকে বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা চিরদিন শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ে স্মরণ করবে।

স্বদেশপ্রেমিক, পথপ্রদর্শক ঋষি প্রফুল্লচন্দ্রের পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধাপ্লুতহৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করতে যেয়ে এই মনে হচ্ছে—যে আদর্শ, যে বাণী তিনি আমাদের সামনে রেখে গিয়েছেন তার প্রয়োজন বহু যুগের। যতদিন না দেশবাসী তাঁর ব্রত গ্রহণ করে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদি জননী ভারতভূমিকে বিশ্বের আসরে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে পারে, ততদিন পর্যন্ত তাঁর বাণী, তাঁর আদর্শ, তাঁর প্রেরণার প্রয়োজন। তাঁকে ভুলে থাক্‌লে চল্‌বে না, বরঞ্চ সুপ্ত জাতির মঙ্গলার্থে তাকে আরও উজ্জল করে এঁকে রাখ্‌তে হবে সকলের হৃদয়ে। তাঁর অসমাপ্ত কাজের ভার সমগ্র দেশবাসীর উপর পড়েছে। একে সমাপ্তির পথে নিয়ে যেতে হবে, তবেই হবে তার সার্থক স্মৃতিপূজা,—দেশ-সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণের প্রতি আন্তরিক প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলী।

বাঙ্গালীর ভাগ্যাকাশে কবে সেই সুদিনের অরুণোদয় হবে কে জানে?

—শ্রীমতী চন্দ্রাবতী—

তারাশঙ্করের দুই পুরুষের 'বিমলা' পর্দায়-এঁর মাঝে সার্থক রূপ পাবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি——।

—নবাগতা বরুণা—

নিউ সেঞ্চুরীর মুক্তিপ্রতীক্ষিত চিত্র 'প্রতিকার'-এ এঁকে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাবে।

ছায়াছবির গান

নারায়ণ চৌধুরী

চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকেরই, এবং বাইরেরও কারু কারু ধারণা, সিনেমার গান হাল্কা ও চটুল না হ'লে তা কখনই জনগণকর্তৃক গ্রাহ্য হয় না। জনসাধারণের পছন্দানুযায়ী গান বলতে এঁরা বোঝেন হাল্কা চালের ঐক্যতানবাদ্যসম্বলিত চটুল সুরের গান। সুরের ভেতর যতো মিশাল থাকবে ততোই নাকি সাধারণ শ্রোতা তা লুফে নেবে। সুর একটু ভারী হ'লেই নাকি তা আর সাধারণের পাতে দেওয়া চলে না ইত্যাদি।

কিন্তু এ ধারণা ভ্রমাত্মক। এককালে হাল্কা গানের চাহিদা থাকলেও ক্রমেই যে শ্রোতার রুচি অপেক্ষাকৃত ভারী জিনিষের অভিমুখী হচ্ছে প্রমাণ দিয়ে সেটা বোঝানো যায়। নিছক ফুরফুরে সুরের গান দিয়ে বাজী মাৎ করবার চেষ্টা কার্যকরী হওয়ার আশা আজকাল খুবই কম। সাধারণের রুচির দোহাই দিয়ে যা কিছু পরিবেষণ করা হবে নির্বিচারে তাকেই মেনে নিতে হবে এ রীতি আর গ্রহণযোগ্য নয়। প্রযোজক, পরিচালক এবং সঙ্গীত-নির্দেশক এখনও কতকগুলো ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে ব'সে আছেন। জনসাধারণের তথা চলচ্চিত্রশিল্পের স্বার্থে তাঁদের ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হওয়া উচিত।

বাংলা ছবিতে যাঁরা সঙ্গীত পরিচালনা করেন তাঁদের ভেতর কয়জনার সত্যিকার যোগ্যতা আছে জানি না। পদের ওপর যাহোক-তাহোক একটা সুরের প্রলেপ দিলেই সেটা গান হয় না এবং সেই সুবাদে সঙ্গীত পরিচালক এই আখ্যাও কারও প্রাপ্য হয় না। বাণীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, যে যে দৃশ্যে গান যোজিত হবে সে সে দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি, সর্বোপরি সাধারণের রুচি উন্নীতকরণের দিকে প্রয়াস—এই সব বিভিন্ন লক্ষণ ও উদ্দেশ্যকে যিনি গানের ভেতর রূপ দিতে পারেন তিনিই সত্যিকার সঙ্গীত পরিচালক, যথার্থ সুরস্রষ্টা। আর তা না ক'রে 'ঠুন ঠুন পেয়ালা' গোছের সস্তা কতকগুলো সুর ততোধিক সস্তা আবহ সঙ্গীতের সহযোগে ছবির যেখানে-সেখানে ছিটিয়ে দিয়ে যিনি সহজে আসর মাৎ করতে চান ও সেই সূত্রে সঙ্গীতনির্দেশকরূপে শ্রোতার চিত্তে স্থায়ী আসন লাভ করতে চান তাঁর আকাঙ্ক্ষা সর্বথা ধিক্কৃত হওয়া উচিত।

বোম্বাই-এর ছবিগুলোতে আবার ঠিক এর উল্টো জিনিষ দেখতে পাই। এ দু'য়ের কোনোটাই শ্রদ্ধেয় নয়। এক কালে বোম্বাইএর ছবিতে এতো বেশি ভারী চালের গান যোজনা করা হ'ত যে ছবি দেখতে গিয়ে মনে হ'ত যে আসরে ব'সে কোনো উচ্চাঙ্গের গান শুনছি। এই অতিরিক্ত ভারী জিনিষ ছায়াছবির বিশিষ্ট টেক্‌নিক্ ও আবহাওয়ার পরিপন্থী সে কথা বলাই বাহুল্য। ছবির গান ভারী হবে সেটা ঠিক কিন্তু সেটা এমন ভারী হবে না যাতে মনে হ'তে পারে ছবির গানের সঙ্গে বৈঠকী গানের কোনো তফাৎই নেই। ছবির গান যতো ভারীই হোক্ তার বিশিষ্ট রঙ ও রস বর্জন করলে চলবে না। অর্থাৎ ছায়াছবির নিজস্ব রঙ ও রস বজায় রেখে তার ওপর কতটা গম্ভীর সুরের ভার সয় সেটা দেখতে হবে। এ যদি না হোল তো তাকে ছায়াছবির গান পদবাচ্য করাই অসঙ্গত।

আশার কথা. বোম্বাই-এর ছবির গানে এই আত্যন্তিক ওস্তাদির ভাবটি আর নেই। সম্ভবত, বাংলার দৃষ্টান্ত ওঁদের উদ্বুদ্ধ ক'রে থাকবে। বাঙালী প্রযোজক ও সঙ্গীত পরিচালকরাও ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারছেন যে নিছক হাল্কা সুর দিয়ে দর্শকের মন ভোলানোর চেষ্টা বৃথা, সুরের কাঠামোকে আরও একটু দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। সুখের বিষয় এই দিকে কিছু কিছু প্রচেষ্টা আজ কাল দেখা যাচ্ছে। বাংলার চলচ্চিত্র জগতে সম্প্রতি

এমন কয়েকজন সুরকারকে সঙ্গীত পরিচালকরূপে নেওয়া হয়েছে যাঁদের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু আশা করতে পারি। তাঁদের হাতে সুরের হাল্কা ভাব দূর হ'য়ে অপেক্ষাকৃত ভারী সুরের কদর হবে, অথচ ছায়াছবির নিজস্ব রঙ রূপ রসকে তাঁরা বিসর্জন দেবেন না এই ভরসা আমাদের আছে।

আমি কী ধরণের সুরকে ছায়াছবির আদর্শ সুর বলতে চাই দু'একটা দৃষ্টান্ত সাহায্যে সেটা বোঝাতে চাই। হিন্দী ছবির গানের সুরকে গৌরবের উচ্চাসন দিতে প্রায়ই আমাদের দেখা যায় কিন্তু সুরের দিকে কোন ছবিগুলো আপনাদের আদর্শ? কেউ বলবেন বোম্বে টকীজের "বসন্ত", কেউ বল্‌বেন পাঞ্চোলী আর্টের "খানদান", কেউ অন্য কিছু। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, গেলো বৎসর কলকাতায় যতগুলো হিন্দী ছবি এসেছে তাদের ভেতর একমাত্র মিনার্ভা মুভিটোনের "পৃথ্বিবল্লভ" ছাড়া আর কোনো ছবির সুরই খুব বেশি উল্লেখযোগ্য পর্যায়ের নয়। একথা শুনে অনেকেই হয়ত আশ্চর্য হবেন; কেউ কেউ আমার রুচির "বিকৃতি" দেখে খানিকটা নাসিকাও কুঞ্চন করতে পারেন। কিন্তু এ কথা বলতে আমার দ্বিধা নেই, ছায়াছবির গান বলতে আমি "পৃথ্বিবল্লভ"-র গানের মতো গানকেই বুঝি। "পৃথ্বিবল্লভ"-এর গানের কষ্টিপাথরেই সমস্ত ছবির গানের বিচার হওয়া উচিত। হয়ত আলাদা আলাদা ভাবে খতিয়ে দেখলে "পৃথ্বিবল্লভ"-এর গানের চাইতে ভালো গান অনেক ছবিতেই শুনতে পাওয়া যাবে। কিন্তু আমি একটি ছবির গানের সামগ্রিক আবেদনের (total-effect) কথাই এখানে বলছি, কোনো একটি বিশেষ গানের কথা বলছি না।

"পৃথ্বিবল্লভ"-এর প্রত্যেকটি গানই একটু ভারী চালের। তাই ব'লে তাদের রঙ রস নেই এ কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। গানে হাল্কা ভাব না ঢুকিয়েও যে সুরের লালিত্য ও সৌকুমার্য পূর্ণমাত্রায় অব্যাহত রাখা যায় আলোচ্য ছবির গানগুলোই তার প্রমাণ। এ জন্যে ছবির সঙ্গীত পরিচালক রফিক গজ্‌নভী ও সরস্বতী দেবী সত্যই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। রফিক্ গজ্‌নভী মেহবুব প্রোডাকসন্সের "তকদীর" চিত্রে যে ধরণের সুর প্রয়োগ করেছেন তা ছবির আবহাওয়ার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হ'লেও তাতে হাল্কা ভাবটি একটু বেশি। সুরগুলো আরেকটু পরিমার্জিত ও ভারী হ'তো তো কথা ছিলো না। গোলাম হায়দার কৃত সুর খুবই মনোরম ও রঙদার, কিন্তু একটু চটুল। তাঁর গানের সুরের ভিত্তিটি আরেকটু পাকা হ'লে তাঁকে অনায়াসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরকার আখ্যা দেওয়া যেতে পারতো। মনে হয় ছবিতে উচ্চাঙ্গের সুরপ্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি খুব বেশি অবহিত নন। লাহোরের চিত্রের সুরে একটু নতুনত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু তাও বড়ো চটুল। পাঞ্জাবীরা কখনই কি ছবিতে ভারী চাল আমদানী করতে পারবে না?

বাঙ্‌লা দেশে যে কয়জন সুরকার চিত্রজগতে সঙ্গীত পরিচালকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁদের ভেতর হিমাংশু দত্ত (সুরসাগর), কমল দাশ গুপ্ত, পঙ্কজ মল্লিক ও সুবল দাশগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। আর বোম্বাইতে যে সব বাঙালী সুরকার সঙ্গীতপরিচালকরূপে কাজ করছেন তাঁদের মধ্যে অনিল বিশ্বাসের নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। সুরসাগরের নাম প্রথমে করলুম এই জন্যে যে সুরসাগরের সুরে এমন একটা পরিমার্জিত মনের ছাপ পাওয়া যায় যা অন্য কারু সুরে অনুপস্থিত। হয়ত জনপ্রিয়তা ও "বক্স-অফিস" সাফল্যের দিক থেকে সুরসাগর আশানুরূপ নির্ভরযোগ্য নন; কিন্তু এটা ভুললে চল্‌বে না যে তাঁর গানে রাগরাগিনীর একটা নিখুঁত রূপ পরিবেষণের (অবশ্য সিনেমার ক্ষেত্রে যতোটা সম্ভব) প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়, দো-আঁসলা সুর বড়ো একটা তাঁর হাত থেকে বেরোয়

না। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-নির্দিষ্ট রীতিনীতিগুলো মেনেও যে সিনেমার সুরকে নমনীয় ও লোভনীয় করা যায় তাঁর গান গুলোই তার প্রমাণ। যে কয়জন সম্প্রতি বাংলা ছায়া-ছবিতে সুর দিয়ে বিখ্যাত হয়েছেন তাঁদের ভেতর একমাত্র সুরসাগরের সুবকেই আমাদের আদর্শের কতকটা অনুসারী বলা যায়।

কমল দাশগুপ্তও একজন উৎকৃষ্ট সুরদাতা' এবং জনমনের ওপর তাঁর সুরের প্রভাবও অপরিসীম। কিন্তু সুরকে অতিরিক্ত লোভনীয়, জনমনোহারী করতে গিয়ে মাঝে মাঝে তিনি সস্তা সুরের কাছ ঘেঁসে যান। সেই দুর্লক্ষণ। যদি তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সুরকারের মর্যাদা পেতে চান তো তাঁকে এই দুর্লক্ষণ বাঁচিয়ে চলতে হবে। সুরকে আরও একটু মার্জিত ও গভীরতর স্তরে উন্নীত করাই তাঁর প্রাথমিক এবং প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

নিউ টকীজের 'সমাজে'র একটী দৃশ্য।

পঙ্কজ মল্লিকের গানে মার্জিত ভাবটুকু আছে, কিন্তু উচ্চাঙ্গের রাগরাগিনীর সুরের আমেজ তাতে একেবারেই নেই। তাঁর সুর রবীন্দ্রগীতির অনুসারী, সেই জন্যেই হয়ত কিছুটা পরিশীলিত ভাব তাঁর সুরে অজ্ঞাতসারে এসে থাকবে, কিন্তু হিন্দুস্থানী পদ্ধতির সুর ও গান এতো বৎসরের সাঙ্গীতিক জীবন যাপন সত্বেও তাঁকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারে নি ব'লে মনে হয়। পঙ্কজবাবুর এই অখ্যাতি অপনোদনের চেষ্টা করা উচিত। তাঁর সঙ্গীতজীবনকে কলঙ্কিত করছে এমন একটী ত্রুটিকে দুর-পনেয় হ'তে দেওয়া তাঁর কিছুতেই সঙ্গত নয়।

বোম্বাইএর বাঙালী সুরকারকদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অনিল বিশ্বাস শ্রেষ্ঠ। কিন্তু গানে মদিরতা আনতে পারে এমন সুর আজও তিনি দিতে পারলেন না এই যা দুঃখ। পান্না ঘোষ অনিল বিশ্বাসের ছিঁটেফোঁটা নিয়ে বেশ পসার জমিয়ে নিয়েছেন যা হোক্। জ্ঞান দত্ত ও অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে এককথায় অচল।

ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক-এর ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় তিমিরবরণের। এই ক্ষেত্রে সারা ভারতবর্ষে তাঁর জুড়ি আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু পরিতাপের বিষয় চিত্রপ্রযোজকরা আজও তাঁর মর্যাদা সম্যক্ বুঝে উঠতে পারেন নি। সুযোগ ও স্বাধীনতা দিলে যে তিনি এই ক্ষেত্রে কতোদুর দুর্ধর্ষ হ'য়ে উঠতে পারেন তা আমরা শুধু অনুমানই করতে পারি, বাস্তব ক্ষেত্রে তাকে রূপান্তরিত হ'তে দেখলুম না। তিমিরবরণের ইউরোপীয় ধরণের ঐক্যতানবাদনপদ্ধতি ভারতীয় চিত্রজগতের সঙ্গীতক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করতে পারতো; কিন্তু তিমিরবরণের প্রতি

প্রযোজকদের অসঙ্গত বৈরী মনোভাবের ফলে আজও আমরা সেই অপূর্ব সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত আছি। আমার নিজের সুনিশ্চিত অভিমত তিমিরবরণকে পুনরায় চিত্র-জগতে আহ্বান ক'রে এখুনি সেই সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করা উচিত।

তারপরেই নাম করতে হয় রাইচাদ বড়াল ও সরস্বতী দেবীর। ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকএর ক্ষেত্রে এঁদের দানও কম নয়। এঁদের দু'জনেরই অর্কেষ্ট্রার সুরে জমজমাট ভাবটি খুব বেশি। সেটা ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকএর একটা অপরিহার্য অঙ্গ। হিমাংশু দত্ত সম্প্রতি ইউরোপীয় harmonisationএর ধরণে ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক দেবার চেষ্টা করছেন। তবে এই ক্ষেত্রে পথিকৃৎ (Pioneer) হ'লেন তিমিরবরণ। সুরসমৃদ্ধি ও সুরের বৈচিত্র্যসাধনে এই পদ্ধতির অমোঘ কার্যকারিতা বিবেচনায় আমাদের প্রত্যেকেরই একে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা উচিত; অভারতীয় পদ্ধতি ব'লে তার দিকে পিঠ দিয়ে থাকা উচিত নয়।

বাংলার বাইরে বাঙ্গালী পরিচালকের সাফল্য অর্জন !

সবে মাত্র প্রেসে এসে বসেছি—দাদা ভাই দিচ্ছেন তাগিদ : শ্রীপার্থিব—যা যা কপি বাকী আছে দিয়ে দাও—কোন কাজ pending রেখো না—ordinanceএর কথা ভুলে গেলে চলবে কেন—কমপোজিটার staff চারগুণ শক্তি বেশী সংগ্রহ করে কাজ করছে সব শেষ করতে।" Composing Room থেকে ঘুরে এসে বুঝলাম—দাদাভাই একটুকুও বাড়িয়ে বলেননি—অক্ষর সন্নিবেশে হাত ওদের চলছে—বৈদ্যুতিক শক্তির মত দ্রুত গতিতে। বহুদিনের অর্ধমসী কলঙ্কিত পরিত্যাক্ত কাগজগুলিকে সংগ্রহ করে—পরিপূর্ণ কালিমা আচরে আমিও আমার কলমের গতি বাড়িয়ে দিলুম—ওদের থেকেও দ্রুততর গতিতে। সিগারের ছাইগুলি ঘরের মেজের সর্বাঙ্গ জুড়ে বসেছে। টনটন করে ওঠা হাত এবং ঘাড়টাকে একটু আরাম দেবার জন্য—ঘরের মাঝেই পাইচারী করছি—ঠিক এমনি সময় হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলেন এক ভদ্রলোক। চুলগুলি পিছনের দিকে উল্টে দেওয়া—চিরুণীর ঘা-খেয়ে খেয়ে বেশ বশ্যতা স্বীকার করে আছে। চোখের তীব্র দৃষ্টি চশমার ভিতর দিয়েও আমায় আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হ'লো না—যে দৃষ্টি নিরর্থক নয় বরং আমার কাছে প্রকাশ পেলো এই অর্থ নিয়ে : Any time I may begin my career."—জীবন সংগ্রামে আমি ক্লান্ত নই—ক্লান্ত নই—যে কোন মুহূর্তে আমি আমার career আরম্ভ করতে পারি।" অনুযোগের স্বরে আগন্তুক বল্লেন : বেশ লোকত আপনি ! আমার বাড়ীতে আজ সোমবার সকালে আসবার কথা—আমি বসে বসে আপনার অপেক্ষায় কাটালুম—অথচ আপনারই নেই পাত্তা। বাধ্য হ'য়ে এখানে ধাওয়া করতে হ'লো।" নিতান্ত অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করে বল্লাম—

: কাজের চাপে ভুলেই গিয়েছিলাম, ক্ষমা করবেন চলুন ওঘরে এ ঘরের অবস্থা দেখছেনত।"

পাশের ঘরে যেয়ে বসতে বসতে আগন্তুক বল্লেন : বহুদিন ছিলাম বাংলার বাইরে—সেখান থেকেই যে পত্রিকার প্রশংসা গুঞ্জন শুনেছি এত অল্প সময়ের ভিতর যে পত্রিকা বাঙ্গালী দর্শক-মন অধিকার করতে পেরেছে তার উদ্যোক্তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে এলাম।" দাদা ভাই এসে ঘরে ঢুকলেন—রূপ-মঞ্চের প্রশংসা গুঞ্জনে যার কান খাড়া হ'য়ে ওঠে—আমি আগন্তুকের সংগে তার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বল্লাম : দাদাভাই যার উপদেশ এবং তীব্র দৃষ্টি রয়েছে রূপ-মঞ্চের রূপ-সজ্জার প্রতি।" উভয়েই উভয়কে নমস্কার করলেন। আগন্তুকের পরিচয় দিতে যেয়ে বল্লাম : হীরেন বসু, পাঞ্জাবে দাসীর পরিচালনা করে—সম্প্রতি কলকাতায় ফিরেছেন—মহুয়া, জয়দেব, অমরগীতি আমাদের কাছে এঁকে অমর করে রেখেছে।' দাদাভাই বল্লেন—বাংলা ছেড়ে যাওয়াতে আপনাকে যে ভুলতেই বসেছিলুম এতদিন।' : হ্যাঁ ভুলবারই কথা। আমরা হচ্ছি সিগারেটের প্যাকেট—যতক্ষন দশটী সিগারের অন্ততঃ একটীও থাকে আদর আছে—যেই ফুরিয়ে গেল প্যাকেটটাকে ছুড়ে ফেলে দিলাম। ছবি যখন বাজারে প্রদর্শিত হচ্ছে আমরা দর্শক মন অধিকার করে—যেই শেষ হয়ে গেল—আমাদের স্থান হলো বিস্মৃতির পাতায়।"—দাদাভাই বল্লেন—ভুলে যাতে আমরা না যাই—এই দায়িত্ব নিয়েছে রূপ-মঞ্চ রূপ-মঞ্চের দুর্গাদাস ও অজয় স্মৃতি সংখ্যা সেই কথাই বলে।" দাদাভাই চলে গেলেন অন্য কাজে। আমাদের আলোচনা চলতে লাগলো পুরোদমে। বাংলা ছবির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল—। চিত্র জগতের পংকিল পরিস্থিতি—এবং 'ঘরোয়ানা' ভাবের আমূল উচ্ছেদে হীরেন বাবু নিজের সামর্থানুযায়ী চেষ্টা করবেন—এই প্রতিশ্রুতিই দিলেন। নিরপেক্ষ সমালোচনার কথা জিজ্ঞাসা করাতে হীরেন বাবু বলেন—নিরপেক্ষ সমালোচনা

'সমাজে'র একটী দৃশ্যে জহর, রেণুকা ও ছয়া

পদ্ধতি।" হীরেন বাবুকে সংগীতের এই অভিনব পদ্ধতি নিয়ে লিখতে অনু-রোধ করলে স্বীকৃত হলেন—এবং আমরাও তাকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করতে পারবো বলেই কথা দিলাম। নমস্কার জানিয়ে হীরেন বাবু উঠে গেলেন—যাবার সময় বলে গেলেন আজ আমার পরিচালিত 'দাসী' দর্শক মন অধিকার করেছে—আপনাদের প্রশংসা পেয়েছে, দাসী পরিচালনায় যদি আমি অকৃতকার্যও হতাম একটুও দমে পড়তাম

সব সময়ই আমি চাই—আমার সফলাভের পক্ষে যে পত্রিকা দোষ গুন বাতলে ঠিক পথে চলবার নির্দেশ দেবে তাকে পরম হিতৈষী ছাড়া অন্য কিছু মনে করতে পারি না।" হীরেন বাবুর ভবিষ্যত কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় বল্লেন : আমি একটী Mugical Institute খুলবার পরিকল্পনায় আছি—বহু গবেষণা করে সুর সংযোজনা সম্পর্কে আমি একটী নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছি - এই পদ্ধতির সাহায্যে পরিচালকের খুশী মত চিত্রে যে কোন দেশীয় সুর সংযোজনা করা যাবে। এই বৈজ্ঞানিক সংগীত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। যতদিন অর্থ সংগৃহীত না হ'য় আমার পরিকল্পনার কোন বাস্তব রূপ দিতে পারবো না অথচ এ আমার স্বপ্ন-বিলাসী মনের কোন খেয়াল নয়—বহুদিনের গবেষণালব্ধ

না—Any time I may begin my Career",এই দৃঢ়তা ব্যঞ্জক কথাগুলি কানের পরদায় বেশ একটু অন্য সুরেই আঘাত করলো—এতই অভিভূত হ'য়ে পড়লাম যে তাঁকে বিদায় দেবার সময় প্রতি নমস্কার করতেও ভুলে গেলাম।

কাগজ কলম টেনে নিয়ে তখনই বসলাম অন্য বিষয় নিয়ে লিখতে। হাত আবার কন কন করে উঠলো। কলম রেখে—সহযোগী বন্ধুকে ডাকলাম : ভাই কলম ধরো, আমি বলে যাচ্ছি। এখন থেকে চল্লিশ বছর আগে—১৯০৩ খৃঃ ২৬শে সেপ্টেম্বর কলিকাতার বিশেষ একটী বনেদী পরিবারে হীরেন বসুর জন্ম হয়। স্বর্গত ডাঃ জগবন্ধু বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম এম, ডি, হীরেন বসুর জ্যাঠা-মশায়ই ছিলেন। ৪০ নম্বর বাদুরবাগান ষ্ট্রীটে হীরেন বসুর পৈতৃক বাড়ী। ছোটবেলা থেকেই দুষ্টুমিতে হীরেন একজন

ওস্তাদ ছেলে হ'য়ে উঠেছিলেন—পড়াশুনার দিক থেকে রাগ-রাগিনীর প্রতিই তার অনুরাগ বেশী দেখা যায়। ম্যাট্রিক পাশ করবার পর City College-এ ভর্তি হলেন। মন পড়ে রইল কলেজের বাইরে—তাই কলেজের ধাপ বড় বেশী অতিক্রম করবার দিকে তাকে দেখা গেল না। চার ভাইয়ের ভিতর হীরেন বাবু সর্বকনিষ্ঠ হ'লেও সংসারে অন্য সকলের চেয়ে বড় হবেন এই চিন্তা পেয়ে বসলো তাকে।

'হিজ মাস্টারস ভয়েস' কম্পানীতে trainer এবং গায়করূপে যোগদান করলেন। দ্বৈত ভজন সংগীত প্রবর্তনে সর্বপ্রথম হীরেনের পরিচয় আমরা পাই। সুধা-কণ্ঠি হরিমতীর সংগে হীরেনের 'সংসারো মায়া ছাড়িয়ে' দ্বৈত ভজন সংগীতখানি তারই সাক্ষ দেয় এবং সংগীতখানি তখন অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এর পর এইচ, এম, ভি'র আরো কতগুলি গানের ভিতর হীরেনের প্রতিভা বিকাশ পায়—"শেফালী তোমার আঁচলখানি", "আঁখিতে রহগো নন্দদুলাল"

প্রভৃতি গানগুলি আজিও বাঙ্গালী সংগীত প্রিয়জনেরা ভুলে যাননি নিশ্চয়ই। H M. V-র Children's corner এর মূলে হীরেন বসুর উৎসাহ চিরদিন স্বীকৃত হবে। H. M V. পরিত্যাগ করে হীরেনবাবু কলম্বিয়াতে যোগদান করেন। এর পর আসেন বেতারে। বেতারের যে 'Combination play' আজ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তার মূলে হীরেন বাবুরই প্রচেষ্টা নিহিত রয়েছে। বহু দিন নাট্য বিভাগের ভার নিয়ে তিনি বেতারকেন্দ্রের সংগে যুক্ত ছিলেন।

চলচ্চিত্র জগতে হীরেনবাবুর আগমন খুবই আকস্মিক—এ বিষয়ে প্রাইমা ফিল্মস-এর শ্রীযুক্ত সুধীননান কৃতজ্ঞতাভাজন। তিনিই হীরেন বাবুকে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করবার জন্য প্ররোচিত করেন। ১৯৩০ খৃঃ হীরেন বসুর পরিচালনায় সর্বপ্রথম "Hush" (চুপ) এই নির্বাক চিত্রখানি গৃহীত হয়। জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'জোড় বরাতে' হীরেনবাবু কানন দেবীর সংগে অভিনয় করেন। সম্ভবতঃ এই 'জোড় বরাতে'ই কানন দেবীর সর্বপ্রথম চিত্রাবতরণ। এই চিত্রে অভিনয় ছাড়া সংগীতের ভারও নিয়েছিলেন হীরেন বাবু। 'ঋষির প্রেম' হীরেন বাবু পরিচালিত দ্বিতীয় চিত্র। 'ঋষির প্রেমে' নায়ক এবং নায়িকারূপে হীরেন বাবু ও কানন দেবী অভিনয় করেন। ঋষির প্রেমের কৃতকার্যতায় নিউ থিয়েটার্সে গল্প লেখকরূপে হীরেন বাবু যোগদান করেন। 'মীরাবাই' চিত্রের কাহিনীকার রূপে দীপালী সম্পাদক শ্রদ্ধেয় বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নামের সংগে হীরেন বাবুর নামও জড়িয়ে আছে। হীরেন বাবুর পরিচালনায় নিউ থিয়েটার্সের 'মহুয়া' গৃহীত হয়। 'মহুয়া' চিত্রে প্রধানাংশে অভিনয় করেন—স্বর্গত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মলিনা দেবী। 'মহুয়া' পরিচালনার পর নিউথিয়েটার্স পরিত্যাগ করে হীরেন বাবু বম্বেতে যান, সেখানে 'খুনী আঁখি,' 'পিয়াকী যোগন,' 'ধরমকা দেবী' প্রভৃতি চিত্রের পরিচালনা করেন। 'অমরগীতির' হিন্দি সংস্করণ এই সময় গৃহীত হয়। এই চিত্রে (মহাগীত) জনপ্রিয়া চিত্রনটী মায়া ব্যানার্জী সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৩৮ খৃঃ মাদ্রাজে গমন করে হীরেন বাবু জয়দেব চিত্রের (মহারাষ্ট্র) পরিচালনা করেন।

১৯৩৯ খৃঃ আদর্শ চিত্র লিঃ এ যোগদান করে 'India in Africa' চিত্রের পরিচালনা করেন। হীরেন বাবুই একমাত্র বাঙ্গালী পরিচালক চিত্র পরিচালনার জন্য যাকে আফ্রিকার কেনিয়া, উগণ্ডা, ট্যাঙ্গানাইকা প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করতে হয়েছিলো।

বাংলায় ফিরে এসে ফিল্ম করপোরেশন অব ইণ্ডিয়ার হয়ে 'অমর গীতি' চিত্রের পরিচালনা করেন।

'অমর গীতি' চিত্র সম্পর্কে বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নেই। 'শব্দ' অমর অক্ষয় এই কথা প্রমাণ করতেই অমর-গীতির আত্মপ্রকাশ। এরূপ গবেষণাপূর্ণ চিত্র ভারতীয় ছায়াজগতে আর নেই। অমরগীতিতে প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায় সর্বপ্রথম চিত্রাবতরণ করেন। ফিল্ম করপোরেশন প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করে হীরেন বাবু মুভি টেকনিক কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করে "কবি জয়দেবের" পরিচালনা করেন। নাম ভূমিকায় হীরেন বাবুকেই দেখতে পাই। কবি জয়দেবে জনপ্রিয় সংগীত পরিচালক সুবল দাশগুপ্তের সংগে সর্বপ্রথম আমাদের পরিচয় হয়। যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে—কলিকাতায় শত্রু পক্ষের বোমা বর্ষিত হয়—চিত্র জগতে নিরাশার ভাব দেখা যায় হীরেন বাবু কোন সুযোগ না পেয়ে নিরুপায় হয়ে বাংলা পরিত্যাগ করে পাঞ্জাব যাত্রা করেন। পাথেয়র সংস্থান অবধি তখন তাঁর ছিল না। এ বিষয়ে রূপবাণীর কর্তৃপক্ষদের কাছ থেকে তিনি যে সাহায্য পেয়েছিলেন অপকট চিত্তে আমাদের কাছে তা প্রকাশ করতে একটুকুও দ্বিধা বোধ করেননি। লাহোরে সুপ্রসিদ্ধ 'পাঞ্চোলী আর্ট-এ চিত্রনাট্য লেখকরূপে যোগদান করেন। পাঞ্চোলী আর্টের সাক্ষাৎ প্রযোজনায় গঠিত প্রধান পিকচার্সের প্রথম চিত্র 'দাসীর' পরিচালকরূপে হীরেন বাবু নির্বাচিত হন। 'দাসী' কলিকাতায় মিনার্ভা ও সিটি সিনেমায় এম্পায়ার টকী ডিসট্রিবিউটর্সের পরিবেশনায় মুক্তি লাভ করেছে। 'দাসীতে' নায়ক নায়িকা রূপে অভিনয় করেছেন নাজাম উল হুসেন ও রাগিনী। চিত্রখানি আমরা দেখে এসেছি। বাংলার বাইরে যে সব পরিচালক গেছেন—তাদের পরিচালিত চিত্রগুলির ভিতর 'দাসী' যদি শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে সে দাবীকে কোন দর্শকই অগ্রাহ্য করবেন না—দাসীর কৃতকার্যতা সম্পর্কে এটুকু কথা আমরা বলতে পারি। ত্রুটি বিচ্যুতি চিত্রে যে না আছে তা নয়—কিন্তু এরূপ ঝরঝরে একখানি চিত্র উপহার দিয়ে ভারতীয় চিত্রজগতে সম্প্রতি কোন বাঙ্গালী পরিচালকই (যারা বাংলা পরিত্যাগ করে গেছেন) বাংলার মুখ উজ্জল করতে পারেননি। দাসীর কাহিনীতে সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজী চিত্র 'Random Harvest'এর ছাপ থাকলেও চিত্রখানির শব্দগ্রহণ, সংগীত, চিত্র গ্রহণ—অভিনয়, পরিচালন নৈপুণ্যে দাসী বাঙ্গালী দর্শকদের চিত্ত অধিকার করতে পারবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

বাংলার বাইরে বাঙ্গালী পরিচালক (সম্প্রতি বাংলা ত্যাগ করে যারা গেছেন তাদের ভিতর) হীরেন বাবুই সর্বপ্রথম ভারতীয় চিত্র জগতে বাঙ্গালীর মুখ উজ্জল করেছেন বলে—আমরা তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

—বিনতা বসু—

নিউথিয়েটার্সের 'উদয়ের পথে' এই উদীয়মানা অভিনেত্রী— নিজের প্রতিভা বিকাশের পথ খুঁজে পেয়েছেন।

নিউথিয়েটার্সের মুক্তি প্রতিক্ষীত
চিত্র 'দুই পুরুষে' ....
**নবাগতা লতিকা ব্যানার্জি
ও দেবকুমার ————।**

জানেন কী এঁদের

(২)

গত সংখ্যায় স্বর্গত প্রফুল্ল ঘোষের পরিচিতি দিতে যেয়ে আমরা একটু ভুল করে ফেলেছি। প্রফুল্ল ঘোষ সম্প্রতি কয়েক বছর মারা গেছেন। এবং তাঁর পরিচিতির শেষাংশে—নিউ টকীজের 'নারী' পরিচালনা করে তিনি বোম্বাই যান—মেরা গাঁও প্রভৃতি চিত্রের পরিচালনা করেন, বর্তমানে বোম্বাই আছেন" এই পরিচিতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায় সম্পর্কে ৺প্রফুল্ল ঘোষ সম্পর্কে নয়। ৩৬ রীলের ছবির পরিচালক স্বর্গত প্রফুল্ল ঘোষ আর নারী, মেরা গাঁও পাপের পথে চিত্রের পরিচালক হচ্ছেন শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায় তিনি বর্তমানে বোম্বাইতে আছেন। আশা করি পাঠকবর্গ এই ভুলের জন্য ক্ষমা করবেন। পাঠকবর্গের যদি কোন শিল্পীর পরিচিতি জানা থাকে আমাদের জানালে উপযুক্ততার বিবেচনায় এই বিভাগে প্রকাশ করা যেতে পারে।

: সম্পাদক : রূপমঞ্চ

গত সংখ্যায় আরোরা ফিল্ম করপোরেশন ও শ্রীযুক্ত অনাদি বসু সম্পর্কে দুইটী ভুল খবর প্রকাশিত হয়েছে—আমাদের এই ভুল সংশোধন করে অরোরার প্রচার সচিব শ্রীযুক্ত চিত্ত ঘোষ যে উপকার করেছেন এজন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। **শ্রীযুক্ত অনাদি বসু :** (বর্ষ সংখ্যা ৮৬৫) আর, ঘোষ নামে শ্রীযুক্ত বসুর কোন ওয়ার্কিং পার্টনারছিলেন না, যিনি ছিলেন তার নাম হচ্ছে গণপতি রামস্তেসান (Gonapati Rams hesan)। **অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন :** অরোরা ফিল্মের বীরেন বসুর সংগে স্বত্বাধিকারী অনাদি বসুর কোন সম্পর্ক নেই। অনাদি বাবুর ছেলের নাম অজিত বসু। বীরেন বসুর স্থানে অজিত বসু হবে। অনাদি বাবু অরোরার পরিচালনা কার্য পর্যবেক্ষন করেন এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্রদের সাহায্য করেন।

শ্রীমতী সাধনা বসু

১৯১৩ খৃঃ ২০শে এপ্রিল কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। স্বর্গত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এঁর দাদামশায়। ছোট বেলা থেকেই নৃত্যে শ্রীমতী সাধনার অনুরাগ দেখা যায়। সুপ্রসিদ্ধ রাশিয়াস নৃত্য শিল্পী ম্যাডাম প্যাবলোভা ও উদয়শঙ্করের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। পরবর্তী কালে তাঁর নৃত্য-প্রতিভার খ্যাতি চারিদিক ছড়িয়ে পড়ে। বহু নৃত্যানুষ্ঠানে সাধনার প্রতিভার আমরা পরিচয় পাই। সুপ্রসিদ্ধ চিত্র পরিচালক শ্রীযুক্ত মধু বসুর সংগে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধা হন। ১৯৩৬ খৃঃ সর্বপ্রথম আলিবাবা চিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। চিত্রখানি শ্রীযুক্ত মধু বসুর পরিচালনায় ও শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের প্রযোজনায় গৃহীত হয়ে রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি লাভ করে। এর পর সি, এ, পি, সম্প্রদায় গঠন করে মন্মথরায়ের বিদ্যুৎপর্ণা প্রভৃতি কতগুলি নৃত্য নাট্য অভিনয় করেন। মন্মথ রায় লিখিত মধু বসু পরিচালিত অভিনয়, কুম কুম, রাজনর্তকী—(হিন্দি, বাংলা ও ইংরাজী) চিত্রে অভিনয় করেন। নিউ থিয়েটার্সে যোগদান করতঃ মধু বসু পরিচালিত মীনাক্ষী চিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। এর পর বম্বেতে অমর পিকচার্সের পৈগম—শঙ্কর পার্বতী প্রভৃতি চিত্রে অভিনয় করেন। সাধনা বসু অভিনীত কুমকুম—অভিনয়, রাজনর্তকী—শঙ্কর পার্বতী ও আলিবাবা দর্শকদের প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হ'য়েছে। সাধনার অভিনয়ে অভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট ফুটে ওঠে। বর্তমানে

রঞ্জিৎ মুভিটোনের 'বিষকন্যায়' অভিনয় করছেন। চিত্রখানি কলকাতায় সম্ভবতঃ দীপক প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করবে।

কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া

ভারতীয় শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের অন্যতম বলে কুমার প্রমথেশ বড়ুয়ার দাবী সকলেই মেনে নেবেন। ১৯০৩ খৃঃ অক্টোবর মাসে আসামের গোরীপুরে কুমার প্রমথেশের জন্ম হয়। তাঁর পিতা গোরীপুরের রাজা বাহাদুর সম্প্রতি বছর খানেক হলো মারা গেছেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে কুমার প্রমথেশের উচ্চ শিক্ষা আরম্ভ হয়—। ১৯২৪ খৃঃ প্রমথেশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি, এস, সি, ডিগ্রী লাভ করেন এবং সিনেটের সভ্য নির্বাচিত হন। ১৯২৬ খৃঃ ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। স্বদেশে ফিরে এসে British Dominion Filmsএ—যোগদান করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সংগে সম্পর্ক ছেদ করেন এবং আসামের Legislative Councilএর সভ্য নির্বাচিত হন। ১৯২৮-২৯ খৃঃ পুনরায় ইউরোপ যাত্রা করেন। প্যারীসে আর্ট সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে বহু ষ্টুডিওতে শিক্ষানবীশরূপে কাজ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ইউরোপ থেকে ফিরে এসে ১৯৩২ খৃঃ বড়ুয়া ষ্টুডিওর স্থাপনা করেন। ১৯৩৩-৩৪ খৃঃ নিউ থিয়েটার্সে যোগদান করেন। নিউ থিয়েটার্সে যোগদান করার পর অভিনেতা, চিত্র-শিল্পী ও পরিচালকরূপে শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বড়ুয়ার মুক্তি, দেবদাস, গৃহদাহ, অধিকার, জিন্দগী প্রভৃতি চিত্র আজও ভারতীয় ছায়াজগতে শ্রেষ্ঠ চিত্রের সম্মান পেয়ে আসছে। এই প্রত্যেকটী চিত্রে বড়ুয়ার অভিনয় প্রতিভা ও পরিচালন নৈপুণ্য দর্শকদের অভিভূত করেছে। চিত্র-শিল্পীরূপে বড়ুয়ার স্থানও অনেক বিশেষজ্ঞের উপরে। নিউথিয়েটার্সে বড়ুয়ার রূপলেখা, মায়া ও হাস্য-রসচিত্র রজত-জয়ন্তীও বাংলা ছায়াচিত্র জগতের উল্লেখযোগ্য চিত্র। বড়ুয়ার 'অধিকার' ১৯৩৮ খৃঃ শ্রেষ্ঠ চিত্রের সম্মান লাভ করে। চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনায়ও বড়ুয়া আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হয়েছেন। নিউথিয়েটার্স পরিত্যাগ করে বড়ুয়া শাপমুক্তির পরিচালনা করেন পরে এম, পি, প্রডাকসন্সে যোগদান করেন এবং উত্তরায়ণ, মায়ের প্রাণ, শেষ-উত্তর, জবাব (হিন্দি) প্রভৃতি চিত্রের পরিচালনা করেন। প্রত্যেকটী চিত্রেই আমরা বড়ুয়ার পরিচালন নৈপুণ্যের পরিচয় পাই। জনপ্রিয়তার দিক থেকে শেষ-উত্তর এবং জবাব প্রশংসা অর্জন করে। এম, পি, প্রডাকসন্সের সংগে সম্পর্ক ছেদ করে বড়ুয়া 'ইন্দ্রপুরী' ষ্টুডিওতে যোগদান করে 'রাণী' (হিন্দি) চিত্রের পরিচালনা করেন। 'রাণী' চিত্র পরিচালনায় বড়ুয়া দর্শকের কাছে অনেকটা হীন হয়ে পড়েন। অনেক দিন চুপচাপ থাকবার পর, 'Art for Art's Sake-এর এক বিবৃতি দেন। এই বিবৃতিতে অর্থের প্রয়োজন থেকে চিত্র গ্রহণে শিল্পের প্রয়োজনকেই তিনি সর্বাগ্রে স্থান দেন তাই তার সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত চিত্র "চাঁদের কলঙ্ক" নানাদিক দিয়ে দর্শকদের আশান্বিত করে তুলেছিল, কিন্তু সেদিক থেকে তিনি সম্পূর্ণভাবে আমাদের নিরাশ করেছেন। 'চাঁদের কলঙ্ক"র হিন্দি সংস্করণ 'সুভে শ্যাম' নামে আত্মপ্রকাশ করবে।

বড়ুয়া পুরোপুরি বাঙালী। বাংলার বাইরে থেকে বহু প্রলোভন আসা সত্বেও তিনি সহজেই সে প্রলোভন থেকে নিজেকে দূরে রেখে বাংলার মাটি কামড়েই পড়ে আছেন। বাংলার এই দরদী পরিচালক বাঙ্গালী দর্শকদের শ্রদ্ধা চিরদিনই তাই পেয়ে আসবেন।

নীতীন বসু—

পরিচালক নীতীন বসুর ভারতব্যাপী খ্যাতির কথা সকলেই মেনে নেবেন। ১৯০১ খৃঃ নীতীন বসু কলিকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। কলিকাতাতেই তাঁর শিক্ষারম্ভ হয়।

নীতীন বাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন আণ্ডার গ্রাজুয়েট। সর্বপ্রথম নীতীন বাবু 'The International News Reels of America' কোম্পানীতে কাজ করেন। এবং ক্যামেরাকেই তাঁর কর্ম-জীবনের প্রধান অবলম্বন রূপে গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে ১৯২৫ খৃঃ নীতীন বাবু চিত্র জগতে প্রবেশ করেন। International. Eastern Films, Aryan, Aurora প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির সংগে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নীতীন বাবুকে জড়িত থাকতে দেখতে পাই। আলোকচিত্রগ্রহণই তিনি জীবনের পেশারূপে গ্রহণ করেন এবং ক্যামেরার মারফতে তিনি দর্শক সমাজের কাছে নিজেকে পরিচিত করে তুলতে সমর্থ হন। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ সরকারের সংস্পর্শে এসে নিউথিয়েটার্সে যোগদান করেন। পরিচালকরূপে হিন্দি চণ্ডীদাসেই নীতীন বসুর সংগে প্রথম আমাদের পরিচয় হয়। হিন্দি চণ্ডীদাস থেকে নীতীন বসুর নাম ভারতব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। নিউথিয়েটার্সের পর পর কতকগুলি চিত্রের পরিচালনা করে নীতীন বাবু পরিচালকরূপে চিত্রজগতে স্থায়ী ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নীতীন বাবুর 'দিদি'তে সুপ্রসিদ্ধা চিত্র তারকা লীলাদেশাই সর্ব প্রথম চিত্রাবতরণ করেন। নীতীন বাবুর দেশের মাটি, জীবন মরণ, দিদি, কাশীনাথ প্রভৃতি চিত্র উল্লেখযোগ্য। কাশীনাথ চিত্র—নিউথিয়েটার্সের নীতীন বাবুর সর্বশেষ চিত্র। বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতি ও বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংঘের বিচারে 'কাশীনাথ' ১৯৪৩ সালের শ্রেষ্ঠ চিত্রের সম্মানলাভ করে। 'কাশীনাথে' নীতীন বসুই সব প্রথম ভারতীয় চিত্রে এ, পি, টি টেকনিক-এর প্রবর্তন করেন। কাশীনাথে জনপ্রিয়া অভিনেত্রী সুনন্দা দেবী এবং বালক অভিনেতা বুদ্ধদেব মিশ্রের সংগে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়। নীতীন বসুর চিত্রে যেমনি আমরা পাই অভিনব প্রকাশভংগি তেমনি আলোকচিত্র নিয়ন্ত্রনের-নৈপুন্যের প্রশংসাও না করে পারি না। তাই আজ সারা ভারতে নীতীন বাবু দর্শকদের মন আকৃষ্ট করতে পেরেছেন। সুপ্রসিদ্ধ শব্দযন্ত্রী মুকুল বসু নীতীন বাবুর সহোদর। কাশীনাথ পরিচালনা করে নীতীন বাবু বাংলা চলচ্চিত্র জগত পরিত্যাগ করে বম্বেতে যান—সেখানে শ্রীফিল্মের সংগে চুক্তি বদ্ধ হয়ে বিচার—(বাংলা) পরেয়া ধন—(হিন্দি) চিত্রের পরিচালনা করেন। বস্তুত নীতীন বাবুর বম্বেতে গৃহীত এই চিত্র দু'খানি তাঁর পূর্ব যশ অনেকাংশে ম্লান করেছে। বর্তমানে শ্রীফিল্মের হয়েই 'মুজরিম' নামে নীতীন বাবু আর একখানি হিন্দি চিত্রের পরিচালনা করছেন।

নীতীন বসুর মত একজন সুযোগ্য পরিচালক বাংলা থেকে চলে যাওয়াতে বাংলা চিত্রজগত যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। নীতীন বাবুও কম ক্ষতিগ্রস্ত হননি। এক অর্থের দিক ছাড়া—যশের অংশ তাঁকে অনেকখানি হারাতে হয়েছে। বাংলার এই সুযোগ্য পরিচালক বাংলাতে আবার ফিরে এলে আমাদের মত প্রত্যেক বাঙ্গালী দর্শকই খুশী হবেন।

—নিতাই চরণ সেন।

প্রমথেশ

(সংক্ষিপ্ত আলোচনা)

হিরণ্ময় দাশগুপ্ত

(দর্শক হিসাবে লেখকের ব্যক্তিগত অভিমতই এই প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে—। লেখকের সংগে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা ভিন্ন মত পোষণ করি ।—সম্পাদক।

বাংলা সবাক ছবিতে অভিনয়ের যেটুকু বৈশিষ্ট্য,—চরিত্রানুগত সুসঙ্গত ও সূক্ষ্মরূপ নিয়ে সৃষ্টি হয়েচে তার জন্যে প্রমথেশের প্রতিভাকে নমস্কার জানাতে হয়। তাঁর প্রতিভা সৃষ্টি ও শিল্পীর অভিনব রূপকে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেচে। অভিনয় শিল্পের ব্যাপকতায় প্রমথেশের প্রতিভা যেন মনের অনেক গভীরে নেমে যায়—নিগূঢ় অন্তস্থল থেকে প্রমথেশ খুঁজে এনেচে অন্তরভঙ্গী— তাই তাঁর অভিনয় এত আন্তরিক। প্রমথেশের কথাগুলো আমাদের অন্তরের অতি সান্নিধ্যে এসে চুপি চুপি সাড়া তোলে—মনস্তত্বের বীণার বহুতর তার আবহ সঙ্গীতের মতো বিচিত্র সুরে বেজে উঠে। তাঁর অভিব্যক্তি যেমন সূক্ষ্ম, তেমনি সুষ্ঠু, সাবলীল ও প্রাণময়—'নিছক অভিনয়' তিনি কোন চিত্রে করেন নি। অভিনয়ে প্রমথেশের সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি এবং প্রকাশভঙ্গীর সংযম অভিনব বল্লে অত্যুক্তি হয় না। বাংলা সবাক ছবিতে অভিনয়ের ধারা পরিবর্তনের দাবী একমাত্র প্রমথেশই কোরতে পারেন।

প্রমথেশের পূর্বে অভিনয়ে 'সংযম' কথাটি আমাদের বিদিত ছিল না। প্রমথেশের অভিনয় সংযম অসাধারণ। লোভী অভিনেতাদের মতো তিনি অভিনয়ে নিজের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে অভিনয় রসকে ব্যাহত করেন নি। 'দেবদাস' 'মুক্তি' 'গৃহদাহ' 'অধিকার' তার উদাহরণ। লোভী অভিনেতাদের হাতে পড়লে 'দেবদাসে'র দেবত্ব কি অক্ষুন্ন থাকতো? 'দেবদাসে' প্রমথেশের প্রতিভা সব দিকে সমভাবে সুপরিস্ফুট।

প্রমথেশের বাচন ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য অভিনব। ওতে কারুর ছায়া নেই। অবান্তর শব্দ বিন্যাস, বিশেষণ অথবা প্রগলভতা তাঁর কথায় নেই। যতটুকু দরকার ততটুকু তিনি ছোট ছোট ডায়লগের মধ্য দিয়ে সুষ্ঠভাবে বোলেচেন—তাঁর কথায় চাঞ্চল্য নেই, আড়ম্বর নেই, উত্তেজনা নেই—সবটুকু সুনির্দিষ্ট ও শক্ত—স্থির ও দৃঢ়। মনকে মুহূর্তে ভেঙ্গে চুরমার কোরে দেয় আবার মুহূর্তে জোড়া লাগিয়ে তোলে। এখানেই কথার বাহাদুরী—নাটকীয়ত্ব। অভিনয়ের কথা, চিত্র কথা, উপন্যাসের কথা, গল্পের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কিন্তু এই স্বতন্ত্র ভঙ্গীর পরিবেশন আমরা সবক্ষেত্রে দেখতে পাইনা। নাটকের ও চিত্রকথার কথোপকথন হবে সুস্পষ্ট, সুদৃঢ় প্রমথেশ পরিচালিত ছবির কথায় সে সবগুলি আমাদের মুগ্ধ করে।

প্রমথেশ আদর্শবাদী পরিচালক কিন্তু প্রচার তার শিল্প সম্পদকে ছাপিয়ে ওঠেনি। পরিচালনায় ও গল্প-নির্বাচনে তিনি 'Art for Art's sake' মতবাদের পোষক। এই ব্যাপারে নীতিনবাবুর প্রচার ধর্মী ['দেশের মাটি' 'জীবন মরণ'] ছবিগুলির সঙ্গে তাঁর ছবির পার্থক্য উল্লেখ যোগ্য। যদিও প্রযোজকের হুকুমে দর্শকদের খুসী কোরতে গিয়ে তাঁকে মাঝে মাঝে দৃষ্টি দিতে হয়েচে সস্তা ভাবালুতা ও রসিকতার দিকে—ছবির ষ্টাণ্ডার্ড নামাতে হয়েছে তবুও ছায়াশিল্পে তিনিই প্রধান এবং প্রথম, যাঁর দৃষ্টিতে বলিষ্ঠতা রয়েচে, দর্শকের রুচিকে মার্জিত ও উন্নত করবার প্রচেষ্টা রয়েচে—অবদান রয়েচে। রুচির আভিজাত্যই প্রমথেশের স্মরণীয় গৌরব।

প্রমথেশের চিত্রে আমরা পেয়েছি হৃদয়ের যথাযথ কাহিনী ও রূপ—পাই আমাদের অন্তর রঙ্গমঞ্চের বিচিত্র খেলা—পাই আত্মা ও অন্তরের সুখ দুঃখের ছবি। এ ব্যাপারে অন্যান্য প্রায় ছবিগুলোতে অভাব থেকে যায়।

বেশীর ভাগ ছবিই প্রবৃত্তির স্থূল প্রকাশভঙ্গী সমৃদ্ধ—মদের গ্লাস, খুনোখুনী, লোককে হাসাবার জন্য একটি কিম্ভূত-কিমাকার চেহারার অভিনেতা, বিষের কৌটা, কতকগুলো বিরহাত্মক করুণ গান ও আদিরসাত্মক ভঙ্গীবাচন—এগুলো এত বেশীভাবে চিত্র জগতকে আচ্ছন্ন করে আছে যে ছবি দেখতে গিয়ে মাঝে মাঝে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠি। বড়ুয়া পরিচালিত চিত্রে এগুলো নেই আমি বোলছিনা—কিন্তু আর একটি সুন্দর চিত্র তার প্রত্যেক ছবিতে আমরা খুঁজে পাই—যেটি গভীরতর অন্তরের তত্বচিত্র। শরীরগত উচ্ছ্বলতা ও ইন্দ্রিয়গত উন্মত্ততায় তাঁর চিত্রের নায়ক-নায়িকা বিভোর নয়—তারা মত্ত থাকে তাদের অন্তরের দ্বন্দ্বে—। তাঁর পরিচালিত চিত্রে খুঁজে পাই নিছক চরিত্র, নিছক মনস্তত্ব, Expressionism.

কিন্তু অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় প্রমথেশের সাম্প্রতিক ছবিগুলি ('উত্তরায়ণ' 'মায়ের প্রাণ' 'রাণী') তার পূর্ব গৌরবকে ক্ষুণ্ন করে চলেছে। অত্যন্ত স্থূল ও সস্তা বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি তথাকথিত পরিচালকদের সম-পর্যায়ে নেমে এসেছেন। সাম্প্রতিক বিক্ষুব্ধ জীবনের দ্বন্দ্ব প্রমথেশের মনকে নাড়া দেয়নি—চিত্র-জগতে এ অভাবটির দিকে প্রত্যেকের দৃষ্টি আজ পড়েচে। জীবনের রূপ আজ পূর্ণভাবে বদলে যাচ্ছে—মানুষের মন বহুতর সমস্যার সম্মুখীন—আজকের মনের তরঙ্গ, গভীর বেদনার চিত্র-রূপটি অন্তর বিদগ্ধ করুণ কথাটি কোন ছবিতে শুনতে পেলাম? অনেক দিনের পুরোণো জীবনে পড়ে রয়েচে আজকের চিত্র-কথা চিত্র রূপ।

'শাপমুক্তি' 'রজত-জয়ন্তী'কেও [বিলেতী বই থেকে ধার করা] তৃতীয় স্তরের গল্প বলা চলে। গল্প নির্বাচনে দেবদাসের পরই 'অধিকারে'র স্থান সর্বোচ্চে।

প্রমথেশের ছবিতে যেমনি পাই প্রয়োগ কৌশলের সূক্ষ্মতা তেমনি পাইনে কল্পনার ঐশ্বর্য। কল্পনা ঐশ্বর্যে

অপরাজেয় প্রয়োগ শিল্পী প্রমথেশ

প্রমথেশ বন্ধ্যা। সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখি কিন্তু কল্পনার লীলা বৈচিত্র্য খুঁজে পাই না ছবির অঙ্গ-সজ্জায়, প্রাণস্পন্দনে—এ বিষয়ে মধু বোস ছাড়া আর কোন কৃতী পরিচালকের নাম মনে পড়ে না।

চিত্র-নাট্য লেখক এবং পরিচালকরূপে প্রমথেশের প্রতিভা প্রথম শ্রেণীর। ঘটনা সংস্থাপনের নৈপুণ্য, দৃশ্যাভিনয়ের ভিতর একটি বিশিষ্ট ভঙ্গীমা প্রদর্শন করা তাঁর চিত্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। আল্গা বাঁধুনীর পরিচয় বড় একটা চোখে পড়ে না। চিত্রে শব্দ প্রয়োগের ভিতর দিয়ে "সন্তর-সঙ্কেত" প্রকাশ করায় প্রমথেশ নতুনত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অভিনয়ের সঙ্গে শব্দযন্ত্রও যে নানা-ভাবে, নানা-ছন্দে দৃশ্যাভিনয় করতে পারে, 'দেবদাসে'র পরিচালক তা প্রমাণ করেচেন।

প্রয়োগ-শিল্পী প্রমথেশ যে ক্যামেরার হাতল ঘুরাতেও ওস্তাদ, তা'র প্রমাণ পেয়েচি জিন্দগীতে। এই হিসেবে

নীতীন বসুর পরেই তাঁর স্থান। কোমল আলোক-সম্পাতে তাঁর জুড়ী নেই।

দেবকী বসু বা নীতীন বসুর চেয়ে তিনি দক্ষ পরিচালক। একমাত্র মধু বোসকে তাঁর সমকক্ষ পরিচালক-শ্রেণীতে ফেলা যায়। প্রমথেশ ও মধু বোস পরিচালিত ছবিতে যেটুকু আভিজাত্য আমরা পেয়েচি অন্য কোন ছবিতে তা আজও পাইনি—অবশ্য শান্তারামকে এ শ্রেণী-ভুক্ত না কোরলে অন্যায় করা হয়।

উদীয়মান চিত্র-পরিচালকদের মধ্যে নীরেন লাহিড়ী এবং ৺অজয় ভট্টাচার্য বৈশিষ্ট অর্জন করেচেন। নীরেন লাহিড়ী টেক্‌নিকের চমক দেখিয়ে দর্শকদের অভিভূত কোরতে চাননি। গল্পটিকে অতি সহজ ও অনাড়ম্বরভাবে দর্শকদের কাছে রস-উজ্জ্বল করে তোলাই তাঁর সর্বপ্রধান কৃতিত্ব। 'গরমিল' এবং 'সহ-ধর্মিনী' দর্শকদের শুধু এই কারণে খুসী কোরতে পেরেচে। ঐতিহাসিক চিত্র-প্রযোজনায় গীতিকার স্বর্গত অজয় ভট্টাচার্যের শুধু হাতে-খড়ি, তবু 'অশোক' আমাদের ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিল। ছদ্মবেশীতে তার সম্ভাব্য পুরোপুরি প্রকাশ পেয়েছিল।

নীতীন বসু কৃতী আলোকশিল্পী—সিনেমার টেকনিক তাঁর চেয়ে আর কেউ বেশী বোঝেন না এবং এই অতিরিক্ত টেকনিক-প্রীতি তার আর্টকে ক্ষুন্ন করেচে। তাঁর গল্প নির্বাচন এত দুর্বল যে আঙ্গিকের অসাধারণ কৃতিত্ব সত্ত্বেও তা দর্শক মনে কোন ছাপ রাখে না। তাই নীতীন বসু তৃতীয় শ্রেণীর জনপ্রিয় ছবিগুলোর প্রথম শ্রেণীর পরিচালকরূপেই স্মরনীয় হয়ে রইলেন।

দেবকী বসুর স্থান চিত্র পরিচালকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। কল্পনার ঐশ্বর্য ও বিস্তার তাঁর ছবিতেই প্রথম স্ফূর্তি পেয়েছে। 'চণ্ডীদাস' 'মীরাবাঈ' 'বিদ্যাপতি' 'নর্তকী' তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবি। এই প্রসঙ্গে মধু বসুর নাম কোরতেই হয়। মধুবোসের কলা জ্ঞান আরও সূক্ষ্ম ও মার্জিত। সমারোহের সঙ্গে সূক্ষ্মতার অপূর্ব সমাবেশ তাঁর ছবিতে—'অভিনয়' ভুলবার মতো ছবি নয়।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দের আগমন নতুন পর্যায়কে চিহ্নিত করলো। সাহিত্যিকরা যে চিত্র পরিচালনায় অযোগ্য নন তার প্রমাণ রইলো হাতে-কলমে। সুখের বিষয় সাহিত্যিকদের আগমনে সবাক-চিত্রের কাহিনী-দৈন্য এবারে ঘুচবে। 'দাবী' 'সমাধান' 'বন্দী' তারই প্রথম স্বাক্ষ্য। ছবির সার্থকতা কাহিনীতে—টেকনিকে নয়, আলোক নৈপুণ্যে নয়, আড়ম্বড়ে নয়। 'দাবী' 'বন্দী' 'সমাধান' দেখে তা নতুন করে অনুভব করা গেল।

এ প্রসঙ্গে ডি-জির কথা ভুললে চোলবে না—তিনি এ দেশে সবাক চিত্রের জনক। কমিক চিত্র প্রযোজনায় তাঁর জুড়ী নেই। 'পথ ভুলে' তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবি।

শ্রীরঙ্গম্ রঙ্গমঞ্চে বিপ্রদাস নাটকের অভিনয় সম্পর্কে ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অভিমত !

"গভীর অনুভূতি যেখানে পাঠকের মনে জাগিয়া উঠে, সেইখানে রসসৃষ্টি হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। * * * রস সাহিত্যের কারবার হৃদয়ের দিক হইতে, অনুভবের গভীরতার দিক হইতে, শুষ্ক তর্ক বিচারের দিক হইতে নহে।" রসসাহিত্য সম্বন্ধে কোন এক প্রবন্ধে এই কথা বলিয়াছিলাম। সেদিন শ্রীরঙ্গমে শরৎচন্দ্রের বিপ্রদাসের অভিনয় দেখিতে দেখিতে কথাগুলি মনে পড়িল। সাহিত্যের সঙ্গে অভিনয়ের যে একটা যোগসূত্র আছে, সুতীব্র ইঙ্গিতে এক অভিনব মাধুর্য ও বিস্ময়ের মধ্য দিয়া সে কথা ধরা পড়িল মনের মধ্যে। সাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য আনন্দসৃষ্টি, আনন্দ পরিবেশন ও আনন্দ উপভোগ। অভিনয়ের উৎপত্তিও ঠিক এই উদ্দেশ্য লইয়াই। অন্য কোন বৃহৎ উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে, কিন্তু সে সম্বন্ধে আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ।

বিপ্রদাস শরৎচন্দ্রের পরিণত বয়সের সৃষ্টি। এর ভিতরকার রসানুভূতি, আনন্দোপলব্ধি পাঠক মনের এক বিশেষ সম্পদ। অভিনয়ে যে কোথাও সে সম্পদের হানি হয় নাই, বরং বৃদ্ধিলাভ হইয়াছে—একথা বলিতে দ্বিধা বা সঙ্কোচ নাই। আমি নাট্যকার নই, নট নই, নাট্য সমালোচকও নই। কিসে ভাল নাটক হয়, কিরূপ অভিনয়কে ভাল অভিনয় বলা চলে, সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞের দাবী রাখি না। নাট্যরসিকদের তর্কে ও আলোচনায় speed, action, tempo প্রভৃতি অনেক দুর্বোধ্য কথা প্রায়ই শুনি, সে সব দিক দিয়া বিচারের যোগ্যতা আমার নাই। সু-অভিনয় বলিতে যদি এই বুঝি যে, তাহা মোটামুটি শিক্ষিত ভদ্রহৃদয়কে স্পর্শ করে, বেদনায় বিহ্বল করে, আনন্দে অধীর করে, তবে সেই বুঝার মাপ কাঠিতে বিপ্রদাসের অভিনয় শুধু সুন্দর নয়, মধুর।

নামভূমিকায় রূপ দিয়াছেন শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী। শান্ত সমাহিত চরিত্রের বিপ্রদাস মানুষটি যে বিশ্বনাথ বাবুর মধ্যে লুকানো ছিল এ কথা অভিনয় দেখিবার পূর্বে কল্পনাও করিতে পারি নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "সৌন্দর্য সৃষ্টি করা অসংযত কল্পনাবৃত্তির কর্ম নহে।" যে সৌন্দর্যসৃষ্টি বিশ্বনাথ বাবু করিয়াছেন তাঁহার অভিনয়ের মধ্য দিয়া, তাহাতে তাঁহার সুসংযত কল্পনাবৃত্তির পরিচয় পরিস্ফুট।

বিপ্রদাসকে ঘিরিয়া যে কয়টি চরিত্র অভিনয়ে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে দ্বিজদাস ও বন্দনার নাম উল্লেখযোগ্য। দ্বিজদাসের ভূমিকায় শ্রীযুত মিহির ভট্টাচার্য শরৎবাবুর সৃষ্টিকে কোথাও ব্যাহত করেন নাই। তাঁহার অভিনয় নৈপুণ্যে বিপ্রদাসের বেদনা বড় হইয়া দর্শকের প্রাণ স্পর্শ করে। শ্রীমতী মলিনা বন্দনা চরিত্রের জটিলতার গ্রন্থি অতি সহজ ভাবেই খুলিয়াছেন তাঁহার হাস্যে, লাস্যে ও প্রাণের প্রাচুর্যে। অন্নদা দিদির ভূমিকায় যিনি রূপ দিয়াছেন, শরৎ বাবু যেন তাঁহাকে দেখিয়াই চরিত্রটি কল্পনা করিয়াছেন, এরূপ মনে করিবার কারণ হয় অভিনেত্রীটির অনাড়ম্বর রূপসজ্জায় ও স্নেহপ্রবণ উক্তিতে। তিনি যে দাসী, একথা নিজেও ভোলেন নাই, আমাদেরও ভুলিতে দেন নাই।

সমগ্রভাবে নাটকটির যে বৈশিষ্ট্য আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে তাহা এই যে, দেখিতে দেখিতে কোথাও ভ্রান্তি আসে না। একটি ব্যাগ্র কৌতূহল বরাবরই জাগ্রত থাকে পরের দৃশ্যের ঘটনার জন্য। এটি বোধ হয় সম্ভব হইয়াছে, সুপরিচালনার গুণে। এইরূপ অভিনয়ই জাতির জীবনে সম্পদের স্থান অধিকার করে, রসের যেখানে অভাব নাই, বুঝিতে হইবে জীবও সেখানে সার্থক ও সুন্দর।

সম্পাদকের দপ্তর

গত সংখ্যায় সুবোধ চন্দ্র পাল হুগলী থেকে যে প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর দিয়েছেন। **কুমারী রেণুকা সামন্ত :-**

অহীন্দ্র চৌধুরী সর্ব প্রথম 'Soul of the slave' চিত্রে অভিনয় করেন। চিত্রখানি স্বর্গত প্রফুল্ল ঘোষের পরিচালনায় গৃহীত হয়। গত সংখ্যায় প্রফুল্ল ঘোষের পরিচিতি প্রকাশিত হয়েছে। ঢাকা থেকে কুমারী হেনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের Picturisationএর উত্তর দিয়েছেন কলিকাতা থেকে শ্রীমতী ইলা দেবী : Picturisation বলতে বোঝায় হুবহু রূপ দান। নিখুঁত রূপ। যেমন কোন চিত্রের নায়ক মনে করুন মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের ছেলে। শুধু মুখে বললেই হবে না যে নায়ক মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। তার চালচলন—পারিপার্শ্বিক সব কিছুর ভিতরই মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলের উপযোগী করে ফুটিয়ে তুলতে হবে চিত্রে। তাহ'লেই বুঝবো—Picturisation হ'য়েছে খুব প্রশংসনীয়।

কুমারী রেণুকা সিংহরায় (ক্রীকরো কলিকাতা)

কুমারী রেণুকা সামন্তের উত্তরেই আপনার প্রশ্নের জবাব পাবেন।

বিজন কুমার রায় (রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট কলিকাতা)

অহীন্দ্র চৌধুরী,রাণীবালা, প্রমথেশ বড়ুয়া ও যমুনা দেবী বর্তমানে কোন চিত্রে অভিনয় করিতেছেন। অহীন্দ্র বাবু বর্তমানে রঙমহলের সংগে সম্পর্ক ছেদ করিয়াছেন কি? অহীন্দ্রবাবুর ঠিকানা কী?

: অসুস্থতা বশতঃ অহীন্দ্রবাবু মঞ্চ থেকে সম্প্রতি বিদায় গ্রহণ করেছেন—রঙমহলের সংগে তাঁর সম্পর্ক ছেদ হয়নি মোটেই। যে সব চিত্র প্রতিষ্ঠান গুলির সংগে অহীন্দ্রবাবু চুক্তি বদ্ধ আছেন সে চুক্তি শেষ করতেই তার প্রায় ৩।৪ মাস সময় লাগবে—তাই বলতে গেলে বলতে হয় প্রায় সব বাংলা চিত্রগুলিতেই অহীনবাবু অভিনয় করছেন—তার ভিতর নিউ টকীজের বন্দিতা, অরোরার 'সন্ধ্যা', নিউ-থিয়েটার্সের 'দুই পুরুষ', চিত্ররূপার 'সন্ধি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রাণীবালা মিনার্ভা মঞ্চে অভিনয় করছেন। যমুনা দেবী এবং প্রমথেশ বড়ুয়া ইন্দ্রপুরীর 'সুভে শ্যাম' চিত্রে।

আত্তার আলি (চতুর্থবার্ষিক শ্রেণী, রিপন কলেজ কলিঃ)

১। Still Photography বলতে কী বোঝাই?

২। অতি সহজে ও নিশ্চিত ভাবে কার্যকরী জনমত সাধনে বাণী-চিত্রই সবচেয়ে বড় বাহন। হিন্দু মুসলিম মৈত্রীর সেতু রচনায় চিত্র শিল্পের দান বড় কম নয়। বোম্বাইয়ে প্রযোজিত 'পড়শী' ও এই শ্রেণীর আরো অনেক ছবি ভারতের সকল প্রদেশে মুক্তিলাভ করে যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করে সাম্য মৈত্রীর সন্ধান দিতে প্রয়াস পেয়েছে। বড়ই দুঃখের সংগে স্মরণ করতে হয় ভারতীয় চিত্রজগতে বাংলার স্থান সব দিক দিয়ে উচ্চে হ'লেও এ প্রকারের দরদী ছবি আজ পর্যন্তও নির্মিত হয় নি। আশা করি ভবিষ্যতে যাতে এই ধরণের বাংলা ছবি রূপালী পর্দায় প্রতিফলিত হয়—তার জন্য আন্দোলন করতে রূপ-মঞ্চ কোন দিন বিরত হবে না।

: ১। Still Photography বলতে নিশ্চল ছবি বোঝায়। যেমন মনে করুন - কোন একটী চিত্রে আগ্রার

তাজমহল দেখাতে হবে। তাজমহলের বাইরের রূপেরই **প্রয়োজন**—সে সব ক্ষেত্রে - আগ্রার একটী Still photo **গ্রহণ করলেই** হ'য়ে যাবে—চিত্রসম্পাদক প্রয়োজনীয় স্থানে **ওটা সংযোগ করে দিলেই** চলে যাবে।

(২) হিন্দু মুসলিম মিলনে চলচ্চিত্রের যে **ক্ষমতা রয়েছে—আপনার** মত আমাদের প্রযোজকেরা যদি তা **উপলব্ধি করতেন**—বাংলা চলচ্চিত্র জগত এতটা নিঃস্ব হতো না। **শুধু পড়শীই নয়—ইউনিটি** ফিল্মস-এর ভাইচারা, **ভক্ত কবীর** প্রভৃতি চিত্রেও এই একতার সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। এবিষয়ে বাংলা চিত্রের দৈন্যতা স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। রূপ-মঞ্চ এবিষয়ে যথাসম্ভব **আন্দোলন** প্রথম থেকেই করে আসছে—**ভবিষ্যতেও** করবে।

অজিতকুমার নন্দী—(কলিকাতা)

'দল মাদল' বলিয়া কোন ফিল্ম উঠিতেছে কিনা। যদি উঠে তাহা কোন পরিচালকের পরিচালিত এবং কোন পিক্‌চার্সের? (২) সব্যসাচী বলিয়া কোন পরিচালক এবং **স্বর্ণময়ী** নামে কোন চিত্র প্রতিষ্ঠান বাংলায় আছে কি?

: 'সব্যসাচী'র পরিচালনায় দলমাদল চিত্র গৃহীত হবার কথা ছিল—চিত্র সম্পর্কে একটা বিজ্ঞপ্তি ছাড়া আর **কিছুই আমরা** জানতে পারিনি। স্বর্ণময়ী পিকচার্সের সংগে **আমরা** পরিচিত নই।

কুমারী রানু মিত্র—(রাজাপাড়া লেন, বাগবাজার)

কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া ও কাননদেবীর পরবর্তী চিত্র কি? নিউথিয়েটার্সের মত বাংলায় বাঙ্গালীর নিজস্ব **প্রতিষ্ঠান আর কী কী আছে?** :

কানন দেবী এম্ পি, প্রডাকসন্সের একখানি চিত্রে **আত্মপ্রকাশ করবেন।** চিত্রখানি পরিচালনা করবেন **শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র।** বাজারে গুজব পি, এন, রায় প্রযোজিত **একখানি চিত্রে** কানন দেবীর বিপরীত ভূমিকায় অভিনয় করবেন **জনপ্রিয়** নট অশোককুমার। **প্রমথেশ** বড়ুয়ার পরবর্তী চিত্র 'সুভেশ্যাম' (হিন্দি)। নিউ থিয়েটার্সের পর **এম,** পি প্রডাকসন্সের **নাম করতে হয়—কর্ম**-তৎপরতার দিক দিয়ে। **কিন্তু** এই প্রতিষ্ঠানকে পুরোপুরী বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান **আমরা** বলতে পারি না। তারপর অরোরা ফিল্মস **করপোরেশন,** চিত্ররূপা, ভ্যারাইটী পিকচার্স, ইষ্টার্ণ টকীজ—রূপশ্রী **লিঃ**—এস, ডি প্রডাকসন্স—চিত্র ভারতী এরা পুরোপুরি বাঙ্গালী **প্রতিষ্ঠানই।**

নির্মাল্য বন্দ্যোপাধ্যায়—(হাটখোলা, কলিকাতা)

'সন্ধি' চিত্রের নায়িকা **সুমিত্রা** দেবীর পূর্ব নাম—**লিলি** ব্যানার্জি—এর পিতার নাম **মুরলী চট্টোপাধ্যায়।** এর **স্বামী খুব** বনেদী ঘরের ছেলে। স্বামীর **অত্যাচারের** প্রতিবাদের **জন্যই** নাকি ইনি চিত্রাবতরণ—**করেছেন**—এবিষয়ে **আপনারা কিছু জানেন কী?**

: **জানলেও** আমাদের আর কিছুর প্রয়োজন নেই। **চিত্রে** যে নামে তিনি আত্মপ্রকাশ **করবেন** সেই নামেই **আমাদের কাছে** পরিচিত থাকবেন। কার মেয়ে বা কার স্ত্রী সে কৌতূহলও আমাদের বড় নেই—অভিনয়ে কিরূপ নৈপুণ্য প্রকাশ পাবে না পাবে—ক্যামেরার চোখে **কিরূপ** দেখাবে না দেখাবে—**শুধু** এই বিষয়েই আমাদের কৌতূহল আছে। **স্বামীর অত্যাচারের** হাত থেকে রেহাই পাবার **জন্য—স্বাধীনভাবে** জীবিকার্জনের পথ বলে যদি **সুমিত্রা দেবী** চিত্রজগতে প্রবেশ করে থাকেন আমি তাকে **আন্তরিক ধন্যবাদ** জানাবো। বাংলার বহু নিরপরাধ **স্ত্রীকেই** **স্বামী** দেবতার এরূপ অন্যায় অত্যাচার সহ্য করতে **হয়।** **তার** ভিতর যদি দেখতে পাই প্রতিবাদ স্বরূপ **একটী** **নারীও** মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন তাকে দূর থেকে **শুধু** **শ্রদ্ধাই** নিবেদন করবো না—আন্তরিক **অভিনন্দন জ্ঞাপনে** তার যাত্রা পথকে **জয়যুক্ত** করে তুলতে সহায়তা **করবো।**

নিশিকান্ত মজুমদার (কলিকাতা)

বম্বেতে কয়েকজন বাঙ্গালী প্রডিউসারদের নাম বলুন—

: (১) ফণী মজুমদার, কৃষ্ণচন্দ্র দে, প্রতিমা দাশগুপ্তা, দেবীকারাণী—এরা বাঙ্গালী প্রযোজক।

রমেশ মুখোপাধ্যায় (কাশীপুর)

ভারতের মহিলা প্রযোজক ও গ্রাজুয়েট মহিলা অভিনেত্রীর নাম বলুন।

মহিলা প্রযোজক : বাংলা—প্রতিভা শাসমল। কানন দেবী ও চন্দ্রাবতীকেও চিত্র প্রযোজনা কার্যে দেখা যেতে পারে। বাংলার বাইরে—দেবীকা রাণী দেবী, প্রতিমা দাশগুপ্তা, রতন বাই বেগ, মিসেস কমলা বাই মাঙগ্রেকার। মহিলা গ্রাজুয়েট অভিনেত্রী :—বিজয়া দাস, লীলা চিটনীস, বনমালা, এনাক্ষী রমা রাও, সুশীলা রাণী, প্রভৃতি।

কুমারী রেণুকা সামন্ত (বেলেঘাটা)

১। জহর গাঙ্গুলী, ছবি বিশ্বাস ও রাণী বালা সর্বপ্রথম কোন চিত্রে অভিনয় করেন? (২) ভারতের সর্বপ্রথম অরণ্য চিত্র কী?

: এর উত্তর দেবার ভার রইল পাঠক পাঠিকাদের ওপর—এবং সম্পাদকের তরফ থেকে রইল—স্থানীয় প্রেক্ষাগৃহগুলির কোনটী আপনার প্রিয় এবং কেন—অপরগুলিতে কী কী অসুবিধা বিদ্যমান?

কুড়ানো মাণিক

(গল্প)

অসিতাভ বন্দোপাধ্যায়

আলগী। জেলা সহর থেকে ২০ মাইল দূরে এর অবস্থিতি। গ্রামে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারবর্গের বাস। পোস্ট অফিস, হাইস্কুল, বাজার—প্রয়োজনীয় সব কিছুই বিদ্যমান। স্কুল থেকে এঁকেবেঁকে রাস্তা গ্রামের ভিতর প্রবেশ করেছে। বর্ষার ধর্ষণ থেকে রাস্তাকে রক্ষা করবার জন্য দু'ধারে সার বরাদ্দে হিজল গাছ—আম গাছ বেশ গায় গায় মিশে আছে। ১৩৫০। ভাদ্র মাস। চারিদিকে জলে জলাকীর্ণ। মাঠেব ধান গাছগুলিকে কচুরীপানা রাহুর মত গ্রাস করে ফেলেছে। সম্বৎসরের সংস্থানও ফুরিয়ে এসেছে অনেকেব। চাকরী বাকরীর পর যে সব পরিবারের নির্ভর করতে হয়, বহুদিন তারা গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছে। যারা গায়ে আছে—গা ছেড়ে অন্যত্র যাবার তাদের উপায় নেই বলেই। ক্ষেত চাষ করে যাদের খেতে হয়—মাছ ধরে যারা জীবিকার্জন করে—গায়ের স্কুলে মাস্টারী করে যারা উদরান্নের ব্যবস্থা করেন—জমিদারের সেরেস্তায় কলম পিশে—পোষ্ট অফিসের চিঠি বিলি করে যারা বেচে আছেন, এই গায়েব বাসিন্দাদের ভিতর বলতে গেলে তারাই হোমরা চোমরা । গড়ে মাথা পিছু পনের টাকায় এদের প্রায় সকলকেই একটি করে বিরাট পরিবারের ভরণ-পোষণের গুরু ব্যয় ভার বহন করতে হয়। জমি জমা যে না আছে তা নয়। দু'পাঁচ বিঘে জমিতে ৬ মাস—সাত মাস কোন রকমে চলে যায়—সেই মায়াতেই অনেকে গায়ের মাটি আকড়ে পড়ে আছে। গত বছরের' অজন্মার জন্যও বটে, যুদ্ধের জন্যও বটে—চা'লের দর চড়ে চড়ে চল্লিশ টাকায় উঠেছে। দু' একখানা কাঁসার থালা—পিতলের ঘটি এসব বিক্রী করে যতদিন সম্ভব চালিয়ে নেবার অনেকেই চালিয়ে এসেছে কিন্তু ভরা ভাদ্রের জলে যেমনি কচুরি পানা আটকে অচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই আলগী এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে তেমনি অচল হয়ে উঠেছে গ্রামবাসীদের প্রত্যাহিক জীবন চলাচল। একবেলা ভাত খেয়ে —ফ্যান খেয়ে যতদিন চালিয়ে নেওরা যেতে পারে নেওয়া গেছে—কিন্তু যখন এমন অবস্থা হলো—নিজেদের মুখে দেওয়া দূরে থাক, ছোট ছেলে মেয়েদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য ঝিনুকে করে কয়েক ঝলক ফ্যানও তাদের মুখে দেবার সংস্থান নেই তখন এরা এই দুর্ভিক্ষের সংগে কোন্ সম্পদ নিয়ে লড়াই করবে? পাশের গায়ে অমুকে গলায় দড়ি দিল, না খেয়ে নিজের ঘরে খিদের জ্বালায় ধুঁকতে ধুঁকতে শিয়াল কুকুরে অর্ধোন্মৃত মানুষের দেহ খুঁড়ে খুঁড়ে খাচ্ছে এ খবর আর গাঁয়ে কারো কাছে নূতন নয়। এই গ্রামে যারা একটু সচ্ছল অবস্থায় দিনাতিপাত করছে, তারা কয়েক ঘর বনেদী মুসলমান কৃষি, আর কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ এবং মুসললমান পাড়া দুটী পাশাপাশি বিদ্যমান। মাঝখানে ছোট একটী কাটাখাল দুইকে পৃথক করে রেখেছে। বাইরের এই ব্যবধান আজকের এই সাম্প্রাদায়িকতা বিষে বিষাক্ত আবহাওয়ায় মাঝেও এদের মনে কোন ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারেনি তাই এই দুর্ভিক্ষের গ্রাস থেকে আজও এরা নিজেদের বাচিয়ে রাখতে পেরেছে। তাই বোধ হয় গাঁয়ের স্কুল মাষ্টারের গিন্নির কোন সন্তানাদি হয়নি বলে গগন মিঞার বিবি বলেন: তুমি দিদি সব এমানতর বিলায় দাও ক্যানে? সময়ত গত হয় নাই। এখনও ছাইলা পুলা হইতে পারে।"

মাষ্টারগিন্নি আবার পাল্টা জবাব দিয়ে উত্তর দেন: তুই আবার কারে কও? এইত সেদিন ওনি বলছিলেন গগন ভাই লঙ্গর খানার জন্য পাঁচ মণ চাউল আছে, তোরোত সময় আছে। ভগবান দিলেত এখনও

দিতে পারে।" গগন গিন্নি লজ্জায় মুখ নামায় তার কিছু প্রতিবাদ করবার নেই বলে। সত্যই এই দুটী পরিবারের আর কোন দুঃখ নেই। এই ঝড় ঝাপটার মাঝে আজিও মাথা উঁচু করে টিকে আছে। কিন্তু যা ব্যাথা যা দুঃখ তা নরেন মাস্টার এবং গগন মিঞা দুজনই অপুত্রক। গাঁয়ের যত দুঃখ—যত গ্লানি এরা বুক পেতে নিয়ে নিজেদের মনের কোনের ঘুমন্ত বেদনার কথা ভুলতে চেষ্টা করে। নরেন মাস্টার স্কুলে যেয়ে ক্লাসে ঢুকেই দেখেন, হরেনের মুখ শুকনো। কেবল হরেন নয়, নিধু, বেচু প্রায় সবাইরই। আদর করে স্নেহের স্বরে জিজ্ঞসা করেন: কীরে মুখ শুষ্ক কেন?" ওরা কোন উত্তর দেয় না। মাস্টার আবাব বলে: কিছু খাওয়া হয়নি বুঝি?" ওরা মাথা নিচুকরে থাকে। কিইবা উত্তর দেবে! নরেন মাষ্টারের চোখ ছল ছল করে উঠে। হরেন গত কাল Verb to be র Conjugation করতে পারেনি সেকথা সম্পূর্ণ ভুলে যেয়ে বলেন: আচ্ছা দে পড়া দে, তারপর আমার সাথে বাড়ী থেকে খেয়ে আসবি।"

টিফিন পিরিয়ডে দেখা যায় নরেন মাষ্টার এইজল কাদা ভেঙ্গে গায়ের রাস্তা ধরে বাড়ী চলছেন আর পিছনে চার পাঁচটী ছেলে। ঠিক এমনি ব্যাপার গগন মিঞা সম্পর্কেও। গায়ের যে লঙ্গর খানা খোলা হয়েছে গগন মিঞার গোলা ঘর থেকে সেখানে বস্তায় বস্তায় চাল যাচ্ছে।

সেদিন ছিল শনিবার। গুঁড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল সারাদিন। খুব কম ছেলেই স্কুলে এসেছে। Rainy-day বলে আর Class বসেনি। লাইব্রেরীতে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে নরেন মাষ্টার বাড়ী ফিরলেন। বেলা তখন প্রায় দু'টা। আকাশে ঘোলাটে মেঘের ফাঁক দিয়ে একটু একটু সূর্যিকে দেখা যাচ্ছে। রাস্তার মোড়ে বিরাট এক অশ্বথ গাছ—তারপর কতগুলি হিজল গাছ সারবন্দে দাড়িয়ে—হিজল ফুল গুলি দুধারের কচুরি পানার উপর ঝরে ঝরে পড়াতে মনে হয় কে যেন রক্ত চন্দনের ফোটায় সবুজ পাতা গুলিকে চর্চিত করে রেখেছে। হিজল গাছগুলি ছাড়িয়ে—ছোট একটা নল ঝাড়। তার চারপাশের সবুজ ঘাস গুলি বর্ষাব পালিমাটিতে সতেজ হয়ে উঠছে! বেশী দিন যদি গায়ের অবস্থা এরকম থাকে ওর এই যৌবনের উচ্ছ্বাস যে নিমিষে শেষ হয়ে আসবে একথা সহজেই অনুমান করা যায়।

নলঝাড়ের কাছে আসতেই কিসের শব্দে নরেন মাস্টার থমকে দাঁড়ালেন। বর্ষার দিনে এমনি শব্দ রাস্তার ধারে—ঘরের কোণে বহু শোনা যায়। সাপে যখন ব্যাঙ ধরে গিলতে পারে না—বিপদাপন্ন ভেকের এই কারতধ্বনি গায়ের লোকেদের কাছে অপরিচিত নয়। নরেন মাষ্টার মনে করলেন হয়ত কাছে ধারেই সাপ তার আহার্য বস্তুটী গলধরণে ব্যস্ত। তাই একটু থমকে দাঁড়ালেন। কিন্তু এ শব্দ অন্য রকম কানে বাজলো তাঁর। কান খাড়া করে দু' এক পা করে এগোতে লাগ-লেন। হ্যাঁ, ঐ ঝোপের ভিতর থেকেই শব্দ আসছে। তবে এত বিপদাপন্ন ভেকের কাকুতি নয়, এ যে মানব শিশুর ক্ষীণ কণ্ঠের ধ্বনি। কাপড় বলা চলে না—জীর্ণ মলিন নেকড়া দিয়ে জড়িত শীর্ণ একটী শিশু পথের ধারে ঝোপের ভিতর। নরেন মাষ্টার

কিছুক্ষণের জন্য হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। খবরের কাগজে পড়েছেন—গুজব শুনেছেন, কিন্তু এর পূর্বে চাক্ষুস কোনদিন দেখেননি—ক্ষুধার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য এমনি ভাবে সন্তনাকে কোন মা-বাপ মরণের হাতে এগিয়ে দিতে পারে। শিশুটীর বয়স হবে ৪।৫ মাস। অর্থাৎ এই দুর্ভিক্ষকে মাথায় করেই ওর জন্ম—ওর বাপ মায়ের কত আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ও জন্মলাভ করেছিল—ওর মা-বাপই হয়ত স্বেচ্ছায় অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কথা কল্পনা করে ওকে এমনি ভাবে রেখে গেছে। নরেন মাষ্টার হাটু গেড়ে বসলেন ছেলেটির কাছে—ও ধুঁকছে। নরেন মাষ্টার কোলে তুলে নিলেন শিশুটিকে—আজ এই পরিত্যাক্ত শিশুটিকে নিজের বাহুর মাঝে আশ্রয় দিতে ওর ভিতরের ঘুমন্ত পিতৃত্ব চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে—আকুল হ'য়ে বলছে: হ্যাঁ—ভগবান আমাকেই ওর রক্ষক রূপে পাঠিয়েছেন, ওকে নিজের কোলে রেখে মানুষ করতে—ওকে ঘিরেই আমার পিতৃত্ব পাবে নূতন রূপ।''—নরেন মাষ্টার শিশুটীকে কোলে করে বাড়ীর দিকে এগোতে লাগলেন। কিন্তু না—যদি ওর মা—বাবা—কী যে রেখে গেছে,—আবার ফিরে আসে ওকে নিতে—! নরেন মাস্টার ফিরে এলেন আবার ঝোপের ধারে। হ্যাঁ ঐত দূরে কে যেন আসছে ছুটতে ছুটতে—নরেন মাস্টার তাড়াতাড়ি শিশুটিকে রেখে দিলেন তার পূর্ব স্থানে।—হাপাতে হাপাতে এসে হাজির হলেন গগন মিঞা।" : মাস্টার সাব—মাস্টার সাব।" গগন মিঞা আর কথা বলতে পারলেন না কিছুক্ষণ। "মাষ্টার সাব—কোন ছাইলা ত্থাখছেন রাস্তার পাড় -? লঙ্গর খানায় ঐ পাশের গায়ের হরিপালের বৌ—আজ রেহাই পাইয়া গেছে। হরি ত কয়েক দিন আগেই চইলা গ্যাছে। বৌটা আজ গলায় দড়ি দিয়া মরলো। ছোট একটা ছাইলা ছিল, ইস্কুল বাড়ীর রাস্তায় নাকি সেটাকে ফেইলা থ্যাছে। মরবার সময় আমার হাত ধইরা বইলা গেল—'গগন চাচা যদি পারো আমার ছাইলাটাকে কুড়াইয়া নিও" গগন মিঞার গলার স্বর রুদ্ধ হ'য়ে এলো। চোখের জলে তার দৃষ্টি হ'য়ে এলো ঝাপসা। নরেন মাষ্টারের চোখ ছল ছল করে উঠল। হাত দিয়ে অদূরে ঝোপের ভিতরে শিশুটীকে দেখিয়ে দিলেন। গগন মিঞা তাড়াতাড়ি ওকে কোলে তুলে নিল। দু'জনেই দু'জনের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে। গগন মিঞা কিছুক্ষণ বাদে মাষ্টারকে লক্ষ করে বলে: না মাষ্টারমশায় আপনিই লইয়া যান। হিন্দুর ছাইলা, শেষে কিছু গুণা হবে।—আর আপনার ঘরেতে ছাইলা পোলাও নাই।" নরেন মাষ্টার নিজে ছেলেটিকে কোলে নিয়ে বুঝেছেন কী আনন্দ! গগন মিঞার অন্তরের গোপন ইচ্ছা তার কাছে অজানা রইল না। তাই—তাকে বুঝিয়ে বল্লেন: আমার ঘরে ছেলে না থাকলেও ছেলের অভাবত নেই—গায়ের ছেলেরাই যে আমার সে অভাব পূরণ করেছে। আর এতে কোন পাপ নেই। তুমি ওকে ভাবীর কোলে দাও—বড় করে তোলো—আমি ওর ভার নেবো—যখন শ্লেট খাতা দিয়ে ওকে পড়তে পাঠাবে।' গগন মিঞার চোখ মুখে কৃতজ্ঞতার ছাপ ফুটে উঠলো। আনন্দের আতিশয্যে ছেলেটাকে দৃঢ়ভাবে বুকের মাঝে আকড়ে ধরে বললো—: আচ্ছা -আচ্ছা আপনি দেবতা, আপনি যখন বল্লেন আমার আর গুনার ভয় নাই"—একই রাস্তা ধরে দু'জনে বাড়ীর দিকে পা বাড়ালো।

× × × × ×

বর্ষার জল সড়ে গেছে। নানান প্রতিষ্ঠানের সেবা কার্যে গায়ের অবস্থা একটু উন্নত হয়েছে। শূন্য বাড়ীগুলি প্রাণহীন দেহের কঙ্কালের মত এই দুর্ভিক্ষের জন্য যারা দায়ী—গ্রামকে মহাশ্মশানে যারা পরিণত করেছে—তাদের দুষ্কর্মের সাক্ষ্যরূপেই দাড়িয়ে আছে।

যারা দুর্ভিক্ষের সংগে লড়াই করে বেঁচে উঠেছে—তারাও ক্লান্ত—তবু ঠিক যেন বন্যায় বিধ্বস্ত বাড়ীগুলির মত যার যার সংসারে কে গুছিয়ে নিচ্ছে। গগন মিঞা আর নরেন মাষ্টারের বিপক্ষে এর পূর্বে যারা ভোট দিত তারা এবার এদের পরিচয় পেয়েছে—তাদের দরদী বন্ধুদের পুরোপুরিই চিনে নিয়েছে। তাই নানান সলা পরামর্শের জন্য গগন মিঞার আঙ্গিনায় গায়ের সব লোক জড় হয়ে সভা করে। ছেলেটার নাম হয়েছে সিরাজ। নামকরণ করেছেন নরেন মাষ্টার। বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন নবাবের পুণ্য স্মৃতি গ্রামবাসীদের কাছে চিরজাগরূক রাখবার জন্যই নরেন মাষ্টার এই নাম রেখেছেন। সিরাজের হাতে গগন মিঞার বিবি রূপোর বালা গড়িয়ে দিয়েছে—পায়ে দিয়েছে মল। সাজের বেলা সিরাজকে নিয়ে এই কৃষক দম্পতির চলে নানা খেলা। নরেন মাষ্টার এসে হাজির হন। গগন বিবি ঘোমটা টানে। নরেন মাষ্টার গগন গিন্নিকে উদ্দেশ্য করে বলেন: দেখো ভাবি—তোমার সিরাজ কত বড় মানুষ হবে—দেশের একটা হোমরা চোমরা হবে—সেদিন যেন এই নরেন মাষ্টারের কথা ভুলো না। ও বড় হয়ে এই দুর্ভিক্ষের প্রতিশোধ নেবে। এই দুর্ভিক্ষ-এই মহামারী ভবিষ্যতে বাংলার বুক থেকে যাতে কাউকে ছিনিয়ে না নিতে পারে—তোমার সিরাজ তারই প্রতিবাদে মাথা উন্নত করে দাড়াবে।" গগন গিন্নি--সিরাজকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে বলেন: কীরে তাই নাকি—ঠাকুর ভাই যা বলে সত্যি ত! ওরে আমার সোণা—ওরে আমার কুড়ানো মাণিক।"

পরিচালক হেমন্ত গুপ্ত

দেবনারায়ণ গুপ্ত

তরুণ চিত্রপরিচালক হেমন্ত গুপ্ত সম্প্রতি পরলোক গমন করেছেন। হেমন্তবাবুর অকাল বিয়োগ, কবির কথাকেই বিশেষ করে স্মরণ করিয়ে দেয়—

"যে ফুল না ফুটীতে
ঝরিল ধরণীতে
যে নদী মরুপথে
হারাল ধারা—"

বাস্তবিকই প্রতিভার উন্মেষকালেই আমরা হেমন্তবাবুকে হারিয়েছি। দীন দরিদ্র সাহিত্যিক, সাংবাদিকের বৃত্তি থেকে তিনি উন্নীত হয়েছিলেন—চিত্র পরিচালকরূপে। তাঁর এই উদ্যম, অধ্যবসায় ও প্রচেষ্টার ফল—সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের কাছে আদর্শনীয়। কেননা যে পথে বিঘ্ন বাধার অন্ত নাই—সেই বাধাবিঘ্নের বেড়াজাল ভেদ করে তিনি নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাই, এদিক থেকে হেমন্তবাবুর সাফল্যকে সাহিত্যিক সাংবাদিকদের সাফল্য বলেই আমি মনে করি।

হেমন্তবাবুর কর্মজীবন আরম্ভ হয় -সাংবাদিকরূপে। প্রথমে তিনি 'ভগ্নদূত' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কর্মারম্ভ করেন। পরে 'সাহানা' নামক একটা সুদৃশ্য সাপ্তাহিক পত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করেন। 'সাহানায়' মঞ্চ ও পর্দা সম্পর্কিত সংবাদ ও প্রবন্ধ বিশেষভাবে প্রকাশিত হ'ত। তাঁর সুষ্ঠু সম্পাদনায় এক সময়ে এই পত্রিকাটী বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিল।

এর পর আমরা হেমন্তবাবুকে পরিচালক মধু বোস পরিচালিত সি, এ, পি সম্প্রদায়ের অভিনয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে দেখেছি। সি, এ, পির প্রচার কার্যের ভার তখন তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল। সি, এ, পি, সম্প্রদায় যখন এম্পায়ার থিয়েটারে মধ্যে মধ্যে অভিনয়ের আয়োজন করতেন তখন হেমন্তবাবু তার প্রচারকার্য অতি নিপুণভাবে করেছেন। সে প্রচার কার্যের মধ্যে আমরা নতুনত্বের সন্ধান পেয়েছি।

পরিচালক মধু বোস যখন চিত্র পরিচালনার কার্যে বিশেষ ভাবে নিয়োজিত হলেন সে সময় তাঁর সহকর্মি হিসাবে হেমন্তবাবু তাঁর সঙ্গে যোগদান করেন। মধু বোস পরিচালিত কয়েকখানি চিত্রে তিনি সহকারী পরিচালকরূপে কার্য করেন। নিজে অভিনয় করেন এবং চিত্র-নাট্য-সংলাপ ও কয়েকখানি সঙ্গীত রচনা করেন। হেমন্তবাবু সঙ্গীত রচনায় যশ-অর্জন করেছিলেন। তাঁর সংলাপ ও সঙ্গীত রচনার মধ্যে আমরা মনোমাধুর্যের পরিচয় পেয়েছি।

এরপর তিনি পরিচালকরূপে নিউটকীজে যোগদান করেন। তাঁর পরিচালিত প্রথম চিত্র 'অভিসার'। অল্প সময়ের মধ্যে এবং অল্প চরিত্র নিয়ে তিনি এই ছবিটী তুলেছিলেন। প্রাচুর্যের দিকে তিনি নজর দেননি। কিন্তু কাহিনীকে কেন্দ্র করে তিনি যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিলেন তা একেবারে ব্যর্থ হয়নি এবং তাঁর রচিত সঙ্গীত ও সংলাপগুলি ছিল—রস মাধুর্যে পরিপূর্ণ।

নিউটকীজের পরবর্তী মুক্তি প্রতীক্ষিত চিত্র 'সমাজে'র কার্য তিনি শেষ করে গেছেন। এর কাহিনী, সঙ্গীত ও সংলাপ সব কিছুই হেমন্তবাবুর রচনা। হেমন্তবাবুর কাছে সাহিত্যিকের মন ও দৃষ্টি ভঙ্গীর যে পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছি, আশা করি 'সমাজে' ও তা যথাযথ দেখতে পাব।

তাঁর পরিচালিত সম্পূর্ণ ছবি 'সমাজ' ও 'অভিসার' এবং নিউ টকীজের পরবর্তী অর্ধসমাপ্ত চিত্র 'বন্দিতা'। এই 'বন্দিতার' কাজ শেষ হওয়ার পূর্বেই তাঁর দেহান্তর ঘটল। আমরা শুনে সুখী হলাম 'সমাজের সঙ্গে হেমন্তবাবুর স্মৃতিরক্ষার আয়োজন করতে নিউ টকীজ বিশেষভাবে মনোনিবেশ করছেন। আমরা আশা করি, 'সমাজ'ই পরিচালকের স্মৃতি-সৌধ রচনা করে চলচ্চিত্র দর্শক সমাজের কাছে তাঁকে স্মরণীয় করে রাখুক—অবেলার যাত্রীর প্রতি এই শ্রদ্ধাঞ্জলীই নিবেদন করি।

সব বিষয়েই দু পাঁচ কথা

শ্রীপঞ্চক

কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ—

ভারত সরকারের নব প্রবর্তিত কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ সাময়িক পত্রিকাগুলিকে এক বিচিত্র অবস্থার সামনে টেনে এনেছে। যুদ্ধে কাগজের খরচ বেড়েছে অথচ প্রয়োজন মিটাবার মত কাগজের সংস্থান নেই—সাধারণ্যে কাগজের ব্যবহার কমিয়ে বৃহত্তর প্রয়োজনে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যেই মনে হয় কাগজ নিয়ন্ত্রণের এই আদেশ। কিন্তু বৃহত্তর প্রয়োজনের মধ্যে কাগজ ব্যবহারকারীদের কোন কোন শ্রেণী অন্তর্ভূক্ত হতে পারে বা হওয়া উচিত তা নিয়ে আইন প্রণয়নকারীরা এতটুকুও বিচার ক'রেছেন ব'লে মনে হয় না। এই নতুন আইনে দেখা যাচ্ছে সরকারী বিভাগের আক্রোশটা সাময়িক পত্রিকা এবং সিনেমার ওপরেই প্রধানতঃ নিবদ্ধ হয়েছে— সাময়িক পত্রিকাগুলি তো অস্তিত্বহীনই হবার উপক্রম। ১৯৪২ সালে কাগজ নিয়ন্ত্রণের

'সন্ধ্যা' চিত্রে মীরা দত্ত

যে আইন প্রণীত হয় তার দ্বারা পত্র-পত্রিকাগুলি আয়তন কমাতে বাধ্য হয়, অনেক পত্রিকা সে সময়ে উঠেই যায়—এখনকার আইন বর্তমান আয়তনেরও একেবারে শতকরা সত্তর ভাগ কমিয়ে দেবার আদেশ দিয়েছে। এ আদেশে কাগজের যা আয়তন হবে তা নিতান্তই হাস্যাস্পদ—হ্যাণ্ড-বিল বলা যায় তাকে--সে কাগজ লোকে কিনবেই বা কি ক'রে ; সেই নিতান্ত স্বল্প জায়গায় গড়বার বস্তুই বা কি থাকতে পারে আর তাই ছাপিয়ে কাগজওয়ালারা পেট্‌শ ...: চালাবে কি ক'রে? আয়তন কমালে কাগজের জন্য নিযু... লোকেরও প্রয়োজন ক'মে যায় তার ফলে বহু লোক বেকা... হতে বাধ্য হবে। ইতিমধ্যেই বহু পত্র-পত্রিকা তাদের কর্মীদের বরখাস্ত ক'রে দিতে বাধ্য হ'য়েছে। এবং এ অবস্থা বহাল হ'লে পত্র পত্রিকার মালিকদেরও অনতি-বিলম্বেই তাঁদের সেই প্রাক্তন কর্মীদের পদানুসরণ করতে হবে। আইনের হাত থেকে রেহাই পেয়ে গিয়েছেন যাঁদের নিউজ প্রিন্টের quota আছে কিন্তু তাঁদের সংখ্যা চার পাঁচের বেশী নয়—বাকীদের মধ্যে অধিকাংশই বহুদিন ধরে news print পাবার চেষ্টা করছেন কিন্তু সাফল্য লাভ করতে পারেননি। তবু তাঁরা চোরাবাজার থেকে এটা সেটা কাগজ জোগাড় করে কোনরকমে চালিয়ে যাচ্ছিলেন নতুন আদেশে কোন রকমের কাগজ ব্যবহারই নিষিদ্ধ হওয়ায় কাগজ তুলে দেওয়া ছাড়া আর এদের গত্যন্তর নেই। রেহাই পাবার যোগ্যতা দেখিয়ে ছাড়পত্র পাবার জন্য সর-কার পক্ষ কাগজ ওয়ালাদের কাছ থেকে আবেদন পত্র চেয়ে পাঠিয়েছে ; সকলে আবেদন পত্র পাঠিয়েছে তো বটেই, তা ছাড়া বহুজনে সটান দিল্লীর দপ্তর পর্যন্ত পৌছেছেন কিন্তু কেউ রেহাই পাবার ছাড়পত্র পেয়েছেন বলে শুনিনি উপরন্তু কর্তাব্যক্তিরা বেশ জোর গলায় বলে বেড়াচ্ছেন এবারের আইন খুব কড়াভাবেই পালন করা হবে এবং আইন যা পাশ করা হয়েছে, তা থেকে কোন নড়চড় বরদাস্ত করা চলবে না। পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশকদের ঘরে ঘরে

হাহাকার উঠেছে তাদের অন্ন ছিনিয়ে নেবার যুক্তিযুক্ত কোন কারণ অ জও তারা পায়নি। সরকারী আদেশ পালন করে পত্র-পত্রিকা যে আকারে প্রকাশিত হ'চ্ছে দেশের অনাহার ক্লিষ্ট কঙ্কালসার জনগণের হাতে তা মানিয়ে যাচ্ছে বেশ।

বর্তমান কাগজ নিয়ন্ত্রণ আইনে আর ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছে সিনেমার মালিকরা। তাঁদের সম্পর্কে যে নির্দেশ রয়েছে তা মানতে গেলে ছবির প্রচার কার্য বলতে কিছু থাকবে না ; এই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পণ্যের খবর জাহির করার পথ এক প্রকার বন্ধই হ'য়ে যাচ্ছে—প্রয়োজন মত পোষ্টার ছাপা যাবে না, হ্যাণ্ডবিলও হবে না ; জনগণকে আকর্ষণ করার মত বিজ্ঞাপন ফলাও ক'রে পত্র পত্রিকায় ছাপা যাবে না—দৈনিকে ছাপা তো যুদ্ধ আরম্ভ হবার অব্যাবহিত পর থেকেই একরকম বন্ধ রয়েছে, সাময়িক পত্রিকাদি নিয়ে চলছিলো কিন্তু তাবাও আর ওভাবে ছাপাতে পারবে না। আর ওভাবে এভাবে কি, কোন কোন পত্রিকা তো সিনেমার বিজ্ঞাপন আদপেই ছাপতে পারবে না ব'লে জানিয়ে দিচ্ছে ; শুধু বিজ্ঞাপনই নয় সিনেমার ছবিও কাগজে কাগজে আর স্থান পাবে না। সিনেমার প্রচার কার্য কমে গেলে অন্যদিকে আরো অনেকের অন্নে হাত পড়ে, যেমন—ছাপাখানা, ব্লকওয়ালা ইত্যাদি ; এদেরও আজ মাথায় হাত পড়েছে। এতোজনের এতো ক্ষতি করিয়ে কাগজ নিয়ন্ত্রণের এই নতুন আদেশের দ্বারা সরকার যুদ্ধকার্যে কি লাভ করবে আমরা বুঝতে অক্ষম। পত্র-পত্রিকা হোক আর সিনেমাই হোক আজ আর তারা বিলাস মাত্র হ'য়ে নেই, অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে, যুদ্ধকালে জনগণের morale কে দৃঢ় রাখতে এদের সহায়তাও তাই অপরিহার্য। কিন্তু আর তা হয় কি করে ?

সিনেমায় 'স্লাইড'—

চিত্রদর্শকরা সিনেমাগৃহগুলিতে "স্লাইড" দেখে থাকবেন এবং এই মাসখানেক যে ইণ্টারভ্যালে আর তা দেখতে পাচ্ছেন

'সন্ধ্যা' চিত্রে জহর

না তাও নিশ্চয়ই নজরে পড়েছে। এটি ঘটেছে বাঙলা সরকারের এক আদেশের ফলে। তাঁদের মতে "স্লাইড" দেখাতে প্রচুর বৈদ্যুতিক শক্তি খরচ হয় এবং সেটা অপব্যয় তাই "স্লাইড" দেখানো বন্ধ করার এই আদেশ। সেই সঙ্গে ইণ্টারভ্যালের সময়ও কমিয়ে মাত্র ৫ মিনিট করা হয়েছে। শুধু স্লাইড দেখানো বন্ধ নয়, বৈদ্যুতিক শক্তি খরচ হতে পারে সিনেমার লবীতে এমন কোন শো কেস বা ছবি সংক্রান্ত সাজসজ্জাও বন্ধ—লবীতে ছবির শো কেসগুলি রাত্রে অন্ধকার থাকে লক্ষ্য নিশ্চয়ই করে থাকবেন। শো কেসে বাতি ব্যাপার না হয় বাদ দিলাম কিন্তু স্লাইড বন্ধ হওয়ার ব্যাপারটা উপেক্ষা করা যায় না কারণ এর সঙ্গে বহুজনের অন্ন সংস্থানের উপায় জড়িত আছে। একথা সত্যি যে ইণ্টারভ্যালে স্লাইডের গাড়ী দর্শকদের অনেক সময়ে বিরক্তির উৎপাদন করেছে—আর ইদানিং তো এমন হয়েছিল যেন শেষই হ'তে চায় না, কিন্তু এ থেকে বহুবিধ পণ্যের খবরও যে সাধারণ্যে প্রচারিত হতো তা তো অস্বীকার করা

যায় না। পত্র-পত্রিকায় জায়গার অভাব ঘটায় আজকাল ব্যবসাদারদের কাছে এইটাই হয়েছিলো সাধারণের মধ্যে প্রচার চালাবার প্রকৃষ্ট উপায়, বন্ধ হয়ে যেতে তাদেরই হলো সব চেয়ে বেশী ক্ষতি। সিনেমাগুলির একটা মোটারকমের মাসিক আয় কমে গেল, স্লাইড তৈরী করে একদল চিত্র-শিল্পী দুপয়সা করে খাচ্ছিল তার পকেটে আবার টান ধরলো, বেকার হলো অগণিত পানওয়ালা চাওয়ালা—ইণ্টারভ্যালে দর্শকদের সওদাতেই যাদের কারবার চলছিলো; এরা ছাড়া আর মাথায় হাত পড়লো বহু পাবলিসিটি প্রতিষ্ঠানের। কয়েকটা এমন পাবলিসিটি প্রতিষ্ঠানের কথা জানি সিনেমায় স্লাইড দেখাবার ব্যবস্থা করিয়ে মাসিক আয় চার পাঁচ হাজারেরও বেশী ছিল; বাধ্য হয়েই এদের কারবার গুটোতে হবে এবারে। বৈদ্যুতিক শক্তি বাঁচিয়ে সরকারের লাভ যা না হবে তার তুলনায় এতজনের সম্মিলিত ক্ষতির পরিমাণ বেশী। আর কারুর কথা বিবেচনায় ধরা না হোক ব্যবসাদারদের পণ্য প্রচারের পথ এইভাবে বন্ধ হওয়াটাই সবচেয়ে আপশোষের কথা। বৈদ্যুতিক শক্তি বাঁচাবার অন্য কোন উপায় খোঁজ করে দেখা উচিত ছিল।

রঙমহলের রামের সুমতি

[রঙমহলে অভিনীত 'রামের সুমতি'র সমালোচনা লিখেছেন বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির সভাপতি ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সমালোচনা প্রসংগে কিছু বলবার ধৃষ্টতা তাই আমি পোষণ করি না। রামের সুমতি মঞ্চস্থ করে কর্তৃপক্ষ আমাদের কাছে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন শুধু এই কথাটুকুই আমি বলতে চাই। শিশুদের উপযোগী আমোদ প্রমোদের উদ্যোগে রূপ-মঞ্চের প্রচেষ্টা সম্পর্কে পাঠক পাঠিকাবা অবগত আছেন। সত্য কথা বলতে কি বাঙ্গলা চিত্র বা নাট্য জগৎ শিশুদের দেখবার উপযোগী চিত্র বা নাটক আজ পর্যন্তও সেরূপ কিছু উপহার দিতে পারেননি। এ বিষয়ে রঙমহলের কর্তৃপক্ষ যে হস্তক্ষেপ করেছেন—সেজন্য তাঁদের আন্তবিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি স্থানীয় নাট্য প্রতিষ্ঠানগুলি রঙমহলের মত শিশুদের দেখবার ও দেখাবার মত এরূপ ধরণের নাটক মঞ্চস্থ করে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রাখবেন। এরূপ নাটক প্রয়োজনায় শুধু আদর্শের দিক দিয়েই নয়, ব্যবসারদিকেও যে তারা লাভবান হবেন—রামেব সুমতি তারই সাক্ষ্য দেবে। আমরা 'রামের সুমতির' নাট্যরূপ-দাতা তরুণ সাহিত্যিক বন্ধুবর দেব নারায়ণ গুপ্ত, প্রযোজক শরৎ চট্টোপাধ্যায়—ও পরিচালক সতু সেন এবং রঙমহলের শিল্পীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি]।

'রামের সুমতি অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প। ইহা 'বিন্দুর ছেলে' নামক গল্প পুস্তকের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'বিন্দুর ছেলে কিছুকাল পূর্ব হইতে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃক প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের অন্যতম পাঠ্য নির্দিষ্ট হওয়ায় ঐ পুস্তকে সন্নিবিষ্ট গল্প তিনটি সর্বজন পঠিত ও সমাদৃত হইয়াছে। 'রামের সুমতি' শরৎচন্দ্রের প্রথম বয়সের রচনা, ঐ গল্পে পল্লীগৃহস্থের একটি জ্বলন্ত

'জুদাই' চিত্রে শ্রীমতী মেহবুব

চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। গল্পটি পড়েন নাই বাঙ্গালা দেশে এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম, কাজেই গল্পাংশ নূতন করিয়া কাহাকেও বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই।

সম্প্রতি ভারতবর্ষের সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় 'রামের সুমতি গল্পটি নাটকাকারে পরিণত করিয়াছেন এবং তাহা 'রঙমহল' রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছে। শ্রীযুত সতু সেনের পরিচালনায় উহা দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। অভিনয় দেখিবার পূর্বে স্বতই মনে হয় যে এতটুকু গল্পকে কেমন করিয়া নাটকে রূপান্তরিত করা যায়? কিন্তু নাটকের অভিনয় দেখার পর নাট্যরূপদাতার অপূর্ব লিপিকৌশল দেখিয়া বাস্তবিক চমৎকৃত না হইয়া থাকা যায় না। নাটকের কোন চরিত্র বাহিরের লোক নহেন। ঘটনাগুলি এমন ভাবে সাজান হইয়াছে এবং চরিত্রগুলির মুখ দিয়া এমন ভাবে শরৎচন্দ্রের ভাষায় কথা বলা হইয়াছে, তাহা দর্শক মাত্রকেই মুগ্ধ করে। অনেকেব বিশ্বাস, প্রেম, বিরহ, মিলন প্রভৃতি

ঘটনার সমাবেশ না করিলে নাটক জমিতে পারে না। সে জন্য বর্তমানে সিনেমার চিত্রগুলিতে প্রায়ই আমরা অনাবশ্যক বিরহ মিলনের ছড়াছড়ি দেখিতে পাই। কিন্তু 'রামের সুমতি' নাটকে প্রমানিত হইয়াছে যে প্রেম, বিরহ, মিলন প্রভৃতিকে বাদ দিয়াও নাটক রচনা করা যায় এবং তাহা দর্শকদিগকে আনন্দ ও শিক্ষা দান করিতে পারে। রামের সুমতি'র মধ্যে ভ্রাতৃপ্রেম, বৌদিদি ও দেবরের ভালবাসা, প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ, গ্রাম্য বালক বালিকার মনোভাব প্রভৃতি এমন সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে তাহা প্রত্যেকেরই নিজের গৃহের ঘটনা বলিয়া মনে করিয়া প্রীতিলাভ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

এই নাটকের অভিনয় সাফল্যও ইহাকে অধিক প্রানবন্ত করিয়াছে। রামের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছেন কাশীনাথ চিত্রের বালক কাশীনাথ বুদ্ধদেব মিশ্র। ইনি রঙ্গমঞ্চে নূতন হইলেও ইহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও সরলতা ইহাকে পরে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতার স্থান দিবে বলিয়াই মনে হয়। প্রসিদ্ধ নট শ্রীযুক্ত জহরলাল গাঙ্গুলী শ্যামলালের ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন। তাঁহার সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। তাঁহার অদ্ভুত কৌশল সিনেমা ও থিয়েটার যাত্রীদের সকলের নিকট সুপরিচিত। শ্যামলালের ভূমিকা সহজ ও সরল হইলেও তাঁহার কৌশল প্রদর্শনের সুযোগের অভাব নাই। এ বিষয়ে তিনি আরও অধিক মনোযোগী হইলে 'রামের সুমতির' দর্শকগণ অধিকতর আনন্দলাভ করিতে পারিবেন। নীলমণি ডাক্তারের ভূমিকায় সন্তোষ সিংহ, যদু মোড়লের ভূমিকায় আশু বোস, ভোলা চাকরের ভূমিকায় তুলসী চক্রবর্তী ও ভূতোর ভূমিকায় বিজয়কার্তিক দাস অভিনয় করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই প্রথিতযশা অভিনেতা—কাজেই তাঁদের অভিনয় যে ভাল হইতেছে, তাহা না বলাই শ্রেয়। দেবনারায়ণবাবু নাটকে শুধু গ্রাম্য চিত্র অঙ্কিত করেন নাই, গ্রাম্য গানেরও সমাবেশ করিয়াছেন। হরিহরের ভূমিকায় হরিধন বাবু ও কৃষকের ভূমিকায় বিশ্বনাথ বাবুর মুখ দিয়া তিনি দুইখানি গ্রাম্য সঙ্গীত শুনাইয়াছেন। যাঁহারা কখনও গ্রামে বাস করেন নাই, বা যাঁহারা গ্রাম্য আবহাওয়ার সহিত পরিচিত নহেন, তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল গানের মাধুর্য উপভোগ করা সম্ভব হইবে না।

বালক গোবিন্দের ভূমিকায় শ্রীমান সনৎ, দিগম্বরীর ভূমিকায় বেলারাণী, নেত্য ঝি-এর ভূমিকায় রাধারাণী ও বালিকা সুরধনীর ভূমিকায় রমা ব্যানার্জী অভিনয় করিতেছেন। সর্বশেষে যাঁহার কথা বলিব, তিনি একাই সমস্ত নাটকখানিকে জমাইয়া রাখিয়াছেন তিনি নারায়ণীর ভূমিকায় অভিনেত্রী সুহাসিনী। অভিনয় দেখিবার পর মনে হয়, বইখানির নাম 'রামের সুমতি' না হইয়া 'বৌদির সুমতি' বা 'নারায়ণী' হইলেই ভাল মানাইত। এই চরিত্রের অভিনয়ের জন্যই যেন সুহাসিনী রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহার দেহের গঠন, কথাবার্তা প্রভৃতি সকলই নরায়ণীর উপযোগী হইয়াছে। এই পুস্তকের মধ্যে অভিনয় হিসাবে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব কেহই অস্বীকার করিবেন না। গোবিন্দের ভূমিকায় সনতের অভিনয় বেশ ভালই হইয়াছে এবং মনে হয় ভবিষ্যতে সে সুঅভিনেতা হইতে পাবিবে। রমা ব্যানার্জী রঙ্গমঞ্চে নবাগতা নহেন, তাঁহার সুরধনীর ভূমিকাও সর্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে বলিতে পারা যায়।

সাজসজ্জা সম্বন্ধে কয়েকটি জিনিষ সত্যই আমাদের দৃষ্টিকটু লাগিয়াছে, কাজেই তাহাদের কথা না বলিয়া পারা যায় না। রামলাল ও শ্যামলাল উভয়েই গ্রাম্য দরিদ্র মধ্যবিত্ত গৃহস্থের লোক তাহাদের 'আণ্ডার ওয়ার' পরিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হওয়া শোভন হয় নাই। নেত্য ঝি ও দিগম্বরী শাশুড়ী যখন একই সংসারে বাস করিতে লাগিলেন তখন তাঁহাদের একই রকম পোষাক লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ

কয়ে। পল্লীগ্রামের ঝি'এর পোষাক অন্যরূপ হওয়া উচিত। শাশুড়ী দিগম্বরী বয়স্কা বিধবা, তাঁহার পোষাকেরও পরিবর্তন প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া যখন তিনি গরদের থান ধুতি পরিয়া পূজার আয়োজন করিতেছেন, তখন ভিতরের জামা ও সায়া অত্যন্ত বিসদৃশ দেখা যায়।

বেড়া ভাঙ্গার দৃশ্য যে নাটককে এমনভাবে জমাইতে পারে এবং মাছধরা ও পেয়ারা ছুঁড়ে মারা যে নাটকে উচ্চাঙ্গের রস সৃষ্টি করিতে পারে তাহা রামের সুমতি অভিনয় না দেখিলে বুঝা যাইবে না। ইহা পিতা পুত্রে পাশাপাশি বসিয়া দেখা যায়—কারণ ইহার মধ্যে কোনরূপ আদি রসের আভাস পর্যন্ত নাই। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকেও বিনা বাধায় এই পুস্তকের অভিনয় দেখিতে পাঠান যাইতে পারে। তাহারা সকলেই পাঠ্য পুস্তকের মধ্য দিয়া রামের সুমতির গল্পের সহিত সুপরিচিত, কাজেই নাটকের অভিনয়ও তাহাদিগকে আনন্দ দান করিবে।

দোটানা

শ্রীযুক্ত উমানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রযোজিত ইউরেকা পিকচার্সের নির্মীয়মান চিত্র 'দোটানা'র কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বিভিন্ন ঘটনা সন্নিবেশে দোটানার কাহিনী যে ভাবে ফেনায়িত হয়ে উঠেছে—পর্দায় যথাযথ রূপ পেলে দোটানা দর্শকদের টানতে পারবে বলেই বিশ্বাস করি।

অলোক শিল্পী। কলকাতাতেই তার ষ্টুডিও। থাকে আইভীদের বাড়ীতে। আইভী অলোকের পিতৃবন্ধুর মেয়ে—অলোকের বাকদত্তা স্ত্রী। অলোকের বাবা থাকেন পাটনায় সেখানকার অবলা আশ্রমের তিনি প্রতিষ্ঠাতা এবং সর্বময় কর্তা। অলোকের বাবার আর এক বন্ধুও পাটনায় থাকেন—তিনি করেন জজিয়তি, তিন বছরের সময় তার মেয়ে স্থলতা হারিয়ে যায়—তারই স্মৃতি নিয়ে তাদের স্বামীস্ত্রীর দিন কাটে। অলোক নিজের সাধনা নিয়েই কাটায় বেশী। আইভী Sophisticated আবহাওয়ার মাঝে বর্ধিত। বন্ধু বান্ধবের তার অভাব নেই। তাদের ভিতর হেলীর সংগেই অন্তরংগতা। বাকদত্তা স্ত্রী হলেও অলোক এতে আপত্তি জানায় না। জানালেই বা আইভী শুনবে কেন?

'বাবুজী, আমাকে রক্ষা করুণ'—বলে হটাৎ একদিন একটী ছেলে এলো অলোকের ষ্টুডিওতে। পুলিশ তাকে তাড়া করেছে। অলক দিল আশ্রয়। ছেলেটী নিজের পোষাক ছেড়ে অলোকের মডেলের পোষাক পরে আত্মগোপন করলে। ছেলেটীর নাম স্যামুয়েল। অলোক তাকে তারই কাছে আশ্রয় দিল। আইভীদের বাড়ীতে হলো তার স্থান। গোবর্ধন বলে একটী ডিটেকটিভ টিকটিকির মত পিছু লেগে আছে স্যামুয়েলের। দিব্বি টুকটুকে চেহারা, আইভীর নজরে পড়লো স্যামুয়েল। আইভী স্যামুয়েলকে নিয়ে বেড়াতে যায়। স্যামুয়েলের মন টলাতে চেষ্টা করে। অলোক স্যামুয়েলকে সতর্ক করে বলে: নেমকহারাম, তুমি মনে রেখো আইভী আমার বাকদত্তা স্ত্রী।' স্যামুয়েল অভয় দিয়ে বলে: আপনি ক্ষেপেছেন বাবুজী—আমাদ্বারা এই বেইমানী কোনোদিনই সম্ভব পর হবে না।" আইভীর বাড়ীতে অভিভাবকরূপে আছেন তার মা কাত্যায়নী, দিনরাত হরিনাম করেন—তাতে আন্তরিকতা কতটুকু আছে খুঁজে পাওয়া দায়! স্যামুয়েলকে বড় সুনজরে দেখেন না তিনি। একদিন অলোক ছিল না বাড়ীতে, আইভী নানান কথা বলে স্যামুয়েলকে নিয়ে ট্যাক্সী করে বের হয়ে পড়ে বেড়াতে। একটী প্রমোদ স্থানে তাদের আলাপ আলোচনা বেশ একটু ঘোরালো হয়ে ওঠে। গোবর্ধন পিছু নিতে ভোলেনি। কিন্তু তাকে যে একটী মেয়ে ধরবার হুকুম দেওয়া হয়েছে। স্যামুয়েল ত ছেলে—নইলে আইভী তার কাছে প্রেম নিবেদন করবে কেন? আইভী বলে: স্যামুয়েল!' স্যামুয়েল উত্তর দেয়: না আইভী, এ হতে পারে না। তুমি বাবুজীর বাকদত্তা স্ত্রী। তোমার ও বাবুজীর মিলনের মাঝে আমি দাড়াতে পারি না।" রাত অনেক হয়ে যায়। অলোক বাড়ীতে এসে শোনে আইভী, স্যামুয়েল তখন অবধিও ফেরেনি। ওদের খোঁজে সে বেরিয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে ওরা দু'জন ফিরে আসে। পথি মধ্যে অলোকের সংগে হেলীর দেখা—সে আইভীর অপেক্ষায়, রাত তখন অনেক। অলোক বলে: আইভী স্যামুয়েলকে নিয়ে বেরিয়েছে।' হেলী ব্যথিত অন্তরে বলে: আইভী আমার engagement

রাখলে না। আমি যে, তার জন্ত taxi engage করে রেখেছিলাম, তুমি নিয়ে যাও তা'হ'লে।" হেলী অন্ত রাস্তা বেয়ে যায়। অলোক উপায়ান্তর না দেখে taxi করে বাড়ী আসে—তার সব ভাড়া মিটিয়ে দেয়। স্যামুয়েল দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে: কোথায় গিয়েছিলেন বাবুজী?' অলোক রাগে উত্তর দেয়: জাহান্নামে।'

সেণ্ট্রাল স্টুডিওর পরথের একটী দৃশ্য

অলোকের সংগে আইভীর বিয়ের পাকাপাকি করতে তার বাবা আসবেন বলে চিঠি লেখেন। অলোক স্যামুয়েলকে বলে। অলোকের বাবার নাম শুনে স্যামুয়েল চমকে উঠে।

স্যামুয়েল অন্তত্র বাড়ী ভাড়া করে থাকে। সুলতা নামে সেখানে সে পরিচিতা। অলোকের ষ্টুডিওতে সে মডেলের কাজ করবার জন্ত যাতায়াত করে। অলোকের সংগে ঘনিষ্ঠতা হয়ে ওঠে।

অলোকের বাবা কলকাতায় আসেন। স্যামুয়েল একদিন আইভীদের বাড়ীতে এসে তাঁকে দেখেই বিস্মিত হয়ে চলে যায়। অলোকের বাবা ছেলেটিকে দেখে চমকে ওঠেন। ওকেই জিজ্ঞাসা করেন: তোমায় কী দেখেছি কোথাও?' অলোক এলে বলেন: তোমার বন্ধুকে যদি পারো একবার নিয়ে এসো আমার কাছে।"

আইভীকে আশীর্বাদ করবেন অলোকের বাবা। তার জজ সাহেব বন্ধুও এসে পড়লেন। অলোককে একটি ফটো দিয়ে তিনি বলেন: আমার মেয়ে সুলতার ছবি, তোমায় বড় করে এঁকে দিতে হবে। এ তোমায় জ্যাঠাইমার অনুরোধ।' গোবর্ধন পুরোহিতরূপে ওখানে আসে, এসে বলে, জানেন অলোক বাবু, আপনার বন্ধু স্যামুয়েল চোর, একটি হার সে বন্ধক দিয়েছে স্যাকরার দোকানে।' অলোকের বাবা আইভীর চালচলনে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না, তবু আশীর্বাদ করে চলে যান।

অন্ত দিনের মতো সুলতা আজও এসেছে ষ্টুডিওতে। অলোক আজ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। সুলতার কাছে যেয়ে বলে: একি হ'তে পারে না সুলতা?' সুলতা অসম্মতি জানায়। অলোক তাকিয়ে থাকে। তার দৃষ্টি যায় হারের লকেটের দিকে। লক্ষ্য করে আশ্চর্য হয়ে যায়। লকেটটি ছিনিয়ে নেয়। সুলতা বলে: না, ওটি কেন, ওটা নেবেন না অলোক বাবু। ওযে আমার ছোট বেলার স্মৃতি।' অলোক শোনে না। ট্যাক্সি করে সুলতাকে নিয়ে তার বাড়ী আসে। ট্যাক্সিতে বসিয়ে রেখে ঘরে যেয়ে তার জ্যাঠা-মশাইর মেয়ের ছবিটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখে। হঁা একই। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এসে দেখে সুলতা নেই। সুলতা

আনন্দ ও বৈচিত্রের
অভূতপূর্ব্ব সমন্বয়......

জীবনের পথে হৃদয়ের গতি সব সময় রুদ্ধ করিয়া রাখা যায় না—তাই কখনও কখনও সংসারে সমস্যার স্রোত ফেনিল হইয়া ওঠে—আর সমস্যার মধ্যেও জাগিয়া ওঠে এমন একটা প্রশ্ন, যাহা মানুষের মনকে দোটানার স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু তার পরিসমাপ্তি কোথায়?..
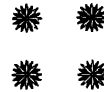
ভূমিকায় :—

জহর গাঙ্গুলী, লতিকা মল্লিক, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য (এম্ পি'র সৌজন্যে) শৈলেন চৌধুরী, রমা ব্যানার্জি, শ্যাম লাহা, প্রভা, ভূনিয়াবালা, কানু বন্দ্যো (এঃ)

* প্রযোজনা : উমানাথ গাঙ্গুলী
* পরিচালনা : অমূল্য বন্দ্যো, প্রতুল ঘোষ
* সুর-শিল্পী : কালী সেন
* চিত্র শিল্পী : সুরেশ দাস
* শব্দ ধর : জে ডি ইরানী

তার ভাড়াটে বাড়ীর দিকে আসে। গোবর্ধন তার পিছু পিছু। গোবর্ধনকে দেখে বলেঃ আমায় থানায় নিয়ে যাবেন—থানায়! অলোক বাবুর কাছে ধরা পড়ার থেকে আমি থানায়ই যাবো। আমার বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট আছে।''

গোবর্ধন এসে অলোকের বাড়ীতে সব বলে। অলোক থানায় গিয়ে খবর পায় সুলতার বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট ছিল—পাটনার অবলা আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল বলে। অলোক পাটনায় রওনা হয়। তার পিতৃবন্ধু জজ সাহেবের বাড়ীতে যেয়ে বলেঃ জ্যেঠিমা দেখুনত এই লকেট আপনার মেয়ের কিনা।' তিনি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলেনঃ হা এত সেই পোড়ামুখির গলাতেই ছিল।' অলোক তাঁকে নিয়ে বিলম্ব না করে হাজতে আসে। দূর থেকে তাকে দেখে জজ সাহেব গিন্নি তার মেয়ে সুলতা বলে চিনতে পারেন না প্রথমে। কাছে এসে তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারেন এ তারই হারানো মেয়ে সুলতা। স্বামীকে যেয়ে তিনি বলেনঃ তুমিই পারো সুলতাকে মুক্তি দিতে। কিন্তু তিনি উত্তর দেনঃ তা হয় না, অপরাধির শাস্তি অনিবার্য—আমার মেয়ে হলেও।'' অলোক তার বাবাকে যেয়ে অনুরোধ করে।

বিচার আরম্ভ হয়। সুলতার পক্ষের উকিল সময় নেয় তদন্তের জন্য। অলোক তাকে যেয়ে বলেঃ টাকার জন্য আপনি ভাববেন না, যা টাকা লাগে আমি দেবো।' পাটনা অবলা আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও ভারপ্রাপ্ত সদস্য অলোকের পিতাকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্রে সুলতার বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট বের করা হয়। সুলতার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আশ্রম বাসিনীদের সংঘবদ্ধ করে আইন লঙ্ঘন করা অথচ অলোকের বাবাই তিন বছর বয়স থেকে তাকে মানুষ করেন ঐ আশ্রমে। ওদিন আশ্রমের অপর মেয়েদের বুঝিঁয়ে সুঝিয়ে বশে আনবার চেষ্টা করছেন অলোকের বাবা—সুলতা তাকে যেয়ে আঘাত করে। আঘাত খুব

'সন্ধ্যায়' কুমারী স্মৃতি বিশ্বাস

গুরুতর লাগে—অবশ্য ডাক্তারের সাহায্যে তিনি মৃত্যুর হাত থেকে বেচে উঠেছেন। প্রথম দিনের জবানবন্দীর পর অলোকের বাবা বাড়ীতে এসে কেবল ভাবছেন। সুলতাকে প্রকৃত ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করে অলোক। সুলতা কোন উত্তর দেয় না।

রাত্রে অলোকের বাবা অসোয়াস্তিতে কাটান। তারপর একটা কাগজে কী লিখে রেখে রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করেন।

অলোক সেখানে এসে উপস্থিত হয়। থানা থেকে পুলিশ ইন্‌সপেক্টর আসেন। এসে আলোকের বাবার লেখা চিঠি নিয়ে পড়তে থাকেন। তাতে লেখা আছে—সুলতা নির্দোষ। প্রকৃত ঘটনা আশ্রমের অপর একটী মেয়ে কল্যাণীই বলতে পারবে।" কল্যাণীকে তলপ করা হয়। কল্যাণী যা বলে তা এই: কল্যাণীর ওপর অলোকের বাবার একটু দুর্বলতা ছিল। বহু চেষ্টা করেও যখন কল্যাণীকে আয়ত্তে আনতে পারেন না তখন কল্যাণীর ওপর বলপ্রয়োগ করতে উদ্যত হন। কল্যাণী সমস্ত ঘটনা সুলতাকে বলতো—ঘটনার দিন সুলতা যেয়ে যেখানে উপস্থিত। দিক বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে আশ্রয়দাতাকে আঘাত করে। কলঙ্কের অপমানের হাত থেকে রক্ষা করে কল্যাণীকে।

* * * *

আইভী এবং হেলী পাটনায় হাজির হয়। তাদের পরস্পরের পরিণয় সূত্রের সংবাদ দিতে এবং অলোকের কাছে ক্ষমা চাইতে। সুলতা মুক্তি পেয়ে অলোককে বলে: বাবুজী, আপনার পিতার এই মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী।" সুলতা তার মা বাপের কাছে আশ্রয় নেয়। অলোকের জ্যাঠাই মা অলোকের হাতে সুলতাকে তুলে দেন।

দোটানার এই গেল মোটামুটী কাহিনী। সংক্ষেপেই এখানে বলা হলো। পর্দায় এই থেকে বহু শাখা প্রশাখা পল্লবিত হয়ে উঠেছে। সেদিন পরিচালক অমূল্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কাহিনীটী শুনতে শুনতে সত্যই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে কাহিনী যে ভাবে এগিয়ে চলেচে, পর্দায় যদি সার্থকরূপ পায় বাঙ্গালী চিত্রামোদীদের অন্তর সহজে যে দোটানার টানে পড়বে এ আর বেশী কথা কী?

দোটানার ভূমিকালিপির জন্য প্রযোজক উমানাথ গাঙ্গুলীর দূরদর্শিতার প্রশংসা করি। অলোক—জহর। স্যামুয়েল,—লতিকা। আইভী রমা ব্যানার্জি। হেলী—রতীন বন্দ্যো। গোবর্ধন—তুলসী। কাত্যায়নী—প্রভা। জজ সাহেব—শৈলেন চৌধুরী। অলোকের বাবা—রবি রায়। বাড়ীয়ালা—কানু বন্দ্যো। এছাড়া বিভিন্নাংশে আরও বহু অভিজ্ঞ অভিনেতৃদেরই দেখতে পাওয়া যাবে।

দোটানার পরিচালনা করছেন অমূল্য বন্দ্যোপাধ্যায়

'জুদাই' চিত্রের একটী দৃশ্য

ও প্রতুল ঘোষ। এদের সহকারীরূপে কাজ করছেন তপন চট্টোপাধ্যায়। দোটানার সুর দিয়েছেন জনপ্রিয় সংগীতজ্ঞ কুমার শচীন দেব বর্মনের ছাত্র শ্রীযুক্ত কালিপদ সেন। কালিপদ বাবু এই চিত্রে সর্বপ্রথম সুরকাররূপে আত্মপ্রকাশ করলেও ইতিপূর্বে বহু চিত্রে শ্রীযুক্ত বর্মনের সহকারীরূপে কাজ করেছেন। আশাকরি তাঁর সুর দর্শক-মন নন্দিত করতে বিফল হবে না।

সন্ধ্যা

শ্রীযুক্ত মনি ঘোষ পরিচালিত অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের প্রযোজনায় গৃহীত 'সন্ধ্যা'র কাজ শেষ হয়ে গেছে। চিত্রখানি মুক্তির অপেক্ষায় আছে। সন্ধ্যার নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন—শ্রীমতী বিজয়া দাস। ভদ্র ঘরের আর একটী মেয়েকে এই চিত্রে দেখা যাবে। 'আর্ট ফিল্মের' দ্বন্দ্বে প্রথম তার সংগে আমাদের পরিচয় হয়—কুমারী স্মৃতিরেখা বিশ্বাস 'সন্ধ্যার' কয়েকটী নৃত্যে দর্শকদের প্রশংসা পাবার দাবী রাখে।

শ্রীযুক্ত মনি ঘোষের সংগে এই আমাদের সর্বপ্রথম পরিচয় হলেও চিত্র জগতে তিনি নবাগত নহেন। ইতিপূর্বে প্রখ্যাতনামা প্রয়োগশিল্পী কুমার প্রমথেশ বড়ুয়ার সহকারীরূপে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন আশাকরি সন্ধ্যার পরিচালন নৈপুণ্যে তিনি তার পরিচয় দিতে সক্ষম হবেন।

সন্ধ্যার সুর দিয়েছেন সুপ্রসিদ্ধ সুরকার হিমাংশু দত্ত (সুর সাগর)। সন্ধ্যার সঙ্গীতাংশও যে দর্শক মন মুগ্ধ করতে সক্ষম হবে সে আশাও আমরা করতে পারি।

নন্দিতা

রূপশ্রী লিমিটেডের নন্দিতার কাজ শেষ হয়ে গিয়ে মুক্তির অপেক্ষায় আছে। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন। 'পাষাণ দেবতা' খ্যাত পরিচালক সুকুমার দাসগুপ্ত।

শেষ-রক্ষা

শ্রীযুক্ত প্রতিভা শাসমল প্রযোজিত চিত্রভারতীর শেষরক্ষা 'সহর থেকে দূরে'র জনপ্রিয়তা ভেদকরে আজ পর্যন্তও দর্শকদের কাছে আত্মপ্রকাশ করতে পেরে

উঠলো না। 'সহর থেকে দূরে' যাবার জন্ত যেরূপ সহরবাসীর ভীড়, মনে হয় পূজার সময় ছাড়া শেষরক্ষা স্থান করে নিতে পারবেনা। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন 'পরিণীতার' সুযোগ্য পরিচালক শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। শ্রীমতী বিজয়া দাসের এই চিত্রেই সর্বপ্রথম চিত্রাবতরণ।

উদয়ের পথে ও দুই পুরুষ

শ্রীযুক্ত বিমল রায় ও সুবোধ মিত্র পরিচালিত নিউথিয়েটার্সের উদয়ের পথে ও দুই পুরুষের কাজ শেষ হয়ে গেছে। দু'খানি চিত্রই মুক্তির অপেক্ষায় আছে। চিত্রশিল্পী বিমল রায়ের 'উদয়ের পথেই' সর্বপ্রথম পরিচালক রূপে উদয়। শুনলুম এই চিত্রের চিত্রগ্রহনে শ্রীযুক্ত পাল অভূতপূর্ব নৈপুন্যের পরিচয় দিয়েছেন।

শৃঙ্খল

শ্রীযুক্ত ধীরেন গাঙ্গুলী শৃঙ্খলের কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। চিত্রখানি ডি, জি, পিকচার্সের প্রযোজনায় গৃহীত হবে।

জুদাই

নবগঠিত প্রশান্ত পিকচার্স বম্বের ইণ্টারন্তাসানেল ফিলমের জুদাই চিত্রের পরিবেশন ভার পেয়েছেন। চিত্র পরিবেশনা কার্যে প্রশান্ত পিক্চার্সের এই সর্বপ্রথম হস্তক্ষেপ। এর স্বত্তাধিকারী শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন কুণ্ডু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতি ছাত্র। চিত্রজগতে সর্ব-প্রথম প্রাইমা ফিল্মস এ যোগদান করেন। প্রাইমা পরিত্যাগ করে ভ্যারাইটি পিক্চার্সে যোগদান করেন। ভ্যারাইটী পিক্চার্সের কর্ম পরিচালনায় তার দক্ষতা প্রকাশ পায়। সম্প্রতি ভ্যারাইটী পিক্চার্স পরিত্যাগ করে স্বাধীনভাবে চিত্র পরিবেশনা কাজে হস্তক্ষেপ করেছেন। এদের পরিবেশনায় জুদাই মুক্তিলাভ করবে। আমরা মোহিনী বাবুর সর্বপ্রকার সাফল্য কামনা করি।

সমাজ

অভিসার খ্যাত পরিচালক হেমন্ত গুপ্ত সম্প্রতি মারা গেছেন। বাংলা চিত্র জগত আর একজন নবীন পরি-

চালককে হারালো। মৃত্যুর পূর্বে স্বর্গতঃ পরিচালক নিউ টকিজের সমাজের কাজ শেষ করে ফেলেছিলেন এবং এদের আর একখানি চিত্র 'বন্দিতা'ও অর্ধসমাপ্তির পথে টেনে এনেছিলেন। আমরা এই নবীন পরিচালকের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি। সমাজের সংগে মৃত পরিচালকের স্মৃতি রক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা করবেন বলেই আমাদের জানিয়েছেন।

প্রথম প্রদর্শনীর বিক্রয় লব্ধ অর্থ থেকে হেমন্ত বাবুর বিধবা পত্নীকে আংশিক কিছু দেওয়া হবে বলে কর্তৃপক্ষ যদি মনোস্থ করে থাকেন —আমরা তাদের আন্তরিক ধন্যবাদই জানাবো তাতে।

সন্ধি

চিত্ররূপার সন্ধির (দ্বোভাষীচিত্র) কাজ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে শ্রীযুক্ত অপূর্ব মিত্রের পরিচালনায় দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। শ্রীমতী সুমিত্রা দেবীর এই চিত্রেই সর্বপ্রথম চিত্রাবতরণ। নবাগতা হয়ে সন্ধি চিত্রে তিনি যে নৈপুন্যের পরিচয় দিয়েছেন—ষ্টুডিও মহলের অনেকেরই ধারণা সুমিত্রা দেবী একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীর সম্মান লাভ করবেন অতি সহজেই।

তাকরার—(হিন্দি)

আর্ট ফিলম্ প্রযোজিত 'তাকরার' এর কাজ হেমেন গুপ্তের পরিচালনায় এগিয়ে চলেছে। শ্রীমতী মলিনাকে তাকরারের একটী বিশিষ্ট অংশে দেখা যাবে। তাছাড়া এই চিত্রে একটী নবাগতা অ-বাঙ্গালী অভিনেত্রী-কেও দেখা যাবে।

অভিনয় নয়

ইষ্টার্ণ টকীজের 'অভিনয় নয়' এর কাজ কালী ফিলমস্ ষ্টুডিওতে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। চিত্রখানির কাহিনী এবং পরিচালনা দুইই শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দের। শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ ইতিমধ্যে মতিমহলের হয়ে আর একখানি চিত্র তুলতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। চিত্রখানির মহরৎ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত ফনীন্দ্র নাথ পাল এই চিত্রে শৈলজানন্দের সহকারীরূপে কাজ করবেন।

কাদম্বরী

বম্বের লক্ষ্মী প্রোডাকসনসের কাদম্বরী সম্প্রতি কলি-কাতায় পাঁচটী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি লাভ করেছে। কাদম্বরী চিত্রের মুক্তিলাভ ধন্য এই পাঁচটী প্রেক্ষাগৃহ হলো—শ্রী, ছায়া পূর্ণ, দীপক ও গণেশ। একযোগে পাঁচটী প্রেক্ষাগৃহ মুক্তিলাভ করবার সৌভাগ্য কোন বাংলা চিত্রেরও হয়নি—সেখানে বম্বেতে গৃহীত চিত্র বাংলায় এসে এতটা সুযোগ আদায় করে নিলো এতে বাঙ্গালী দর্শকদের বিস্মিত হবার কারণ আছে বৈকী? বাংলা ছবিগুলি মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছেনা প্রেক্ষাগৃহের অভাবে, অথচ হিন্দি চিত্র অতি সহজেই সে পথ করে নিলো, এতে দর্শকেরা অতি সহজেই বুঝতে পারবেন বাংলা চিত্র জগতে অবাঙ্গালী রাহুদের প্রতিপত্তি কত? কিছুদিন পূর্বে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র বলেছিলেন, বাংলা চিত্র জগতে যেভাবে অবাঙ্গালী রাহুদের আনাগোনা হচ্ছে তাতে মনে হয় অতি অল্পদিনের ভিতরই বাংলা চিত্র জগত অবাঙ্গালী রাহুগ্রাসে পূর্ণ কবলিত হবে। শিখণ্ডীর মত যেসব বাঙ্গালী পুরভাগে থেকে এই রাহুদের সাহায্য করছে বাঙ্গালী চিত্রামোদীরা কোন দিন যে তাদের ক্ষমা করবে না এ বিশ্বাস আমাদের আছে। বাংলা চিত্রজগতকে এই আসন্ন কবলিত হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারেন একমাত্র চিত্রামোদীরা। তাই বাঙ্গালী চিত্রামোদীদের কাছে আমাদের আবেদন তারা যেন—এই ধরণের হিন্দি চিত্র যা শিখণ্ডীরূপ বাঙ্গালীদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার বুকে বাংলা চিত্র থেকেও বেশী সুযোগ গ্রহণের স্পর্ধা রাখে সে সব চিত্রের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বিরত থাকা। দীপকে এবং গণেশে যদি কাদম্বরী মুক্তি লাভ করতো আমাদের ক্ষোভ ছিল না—কিন্তু সম্পূর্ণ বাঙ্গালীদের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত ছায়া, শ্রী, পূর্ণতে কাদম্বরীর মুক্তিলাভ করবার সৌভাগ্য যদি

দর্শক অভিনন্দন লাভে প্রতীক্ষিত ২খানি চিত্র !

বাঙ্গালী চিত্রামোদীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন তবে তাদের কী বলবার আছে?

কাদম্বরীর কাহিনী বাঙ্গালীদের কাছে অপরিচিত নয়—বিক্রমাদিত্যের সভাকবি বানভট্টের সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস কাদম্বরীর কাহিনী অবলম্বনে কাদম্বরী চিত্র গৃহীত হয়েছে। এরূপ কাহিনীকে পর্দায় রূপ দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষদের আমরা ধন্যবাদই জানাবো—কিন্তু এরূপ চিত্রের রূপ দিতে যে গবেষণা ও কল্পনার প্রয়োজন কর্তৃপক্ষ তা থেকে বঞ্চিত বলেই কাদম্বরীর ব্যর্থ রূপ দেখে আমরা ব্যথিত হয়েছি। ঘটনা সন্নিবেশের অজ্ঞতা ও পরিচালন নৈপুন্যের অভাবের জন্যই মূলত 'কাদম্বরী' চিত্রে ব্যর্থ রূপ পেয়েছে। বর্তমানে ভারতে বহু বিদেশীরা উপস্থিত—বানভট্টের কাহিনীর বিষয়ে তাদেরও অনেকে অবগত আছেন—তারা যদি কাদম্বরী চিত্র দেখেন—কবি বানভট্টের প্রতি হীন ধারনাই পোষণ করবেন। কাদম্বরীর মত একটি উচ্চ শ্রেণীর প্রণয় মধুর কাহিনী চিত্রে যে রূপ পেয়েছে তা যে কোন চিত্রামোদীর কাছে হাস্যাস্পদ বলেই মনে হবে। হিন্দুর প্রাচীন দেব দেবতাদের অলৌকিক শক্তির পরিচয় উপন্যাস যে ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে—যারা এই অলৌকিক শক্তিকে বিশ্বাস করেন না তারাও অনেক সময় অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেবার ধৃষ্টতা রাখেন না—অথচ চিত্রে সে সব জিনিষগুলি ভোজবাজির মতই রূপ পেয়েছে।

অভিনয়ে কাদম্বরীর ভূমিকায় শান্তাআপ্তের মত প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীকেও পরিচালক exploit করতে পারেন নি। প্রিয়তমের মৃতদেহ জড়িয়ে শান্তা আপ্তের সংগীত—কী হাসির খোরাকই যোগায় না? যৌন আবেদনের খোরাক রূপে শাণ্টাআপ্তেকে exploit করতে পরিচালক মোটেই কার্পণ্য করেন নি। অন্য বিষয়ের কথা ছেলেই দিলাম। এক স্থানে—কাদম্বরী যখন হেঁটে চলেছে তার পায়ের আংশিক অনাবৃত অংশটাকে দেখিয়ে পরিচালক কোন রসের পরিচয় দিলেন? মহাশ্বেতার ভূমিকায় বনমালা তবু খানিকটা মান রেখেছেন। কুমার চন্দ্রাপীড়ের ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল ও পুণ্ডরীকের ভূমিকায় হরিশ নেহাৎ ভাড়ামীর পরিচয়ই দিয়েছেন। কপিঞ্জলের ভূমিকায় যিনি আত্মকাশ করেছেন তিনি যে কোন শ্রেণীর অভিনয় করেছেন তা নির্ণয় করা দায়। সব চেয়ে বেশী হাস্যাস্পদ সাটিন পরে কপিঞ্জল ও পুণ্ডরীকের আত্মপ্রকাশ। গেয়ো যাত্রা যে শ্রেণীর সম্মান পাবার যোগ্য অভিনয়ে কাদম্বরী তার চেয়ে উচ্চ সম্মানের দাবী করতে পারে না।

সংগীতাংশ আনন্দদায়ক। আজকালকার হিন্দি সামাজিক চিত্রে যে সব চটুল সুরের মাতাল করে তোলে—বেশীর ভাগ সংগীত সই শ্রেণীর। তবু জন-প্রিয়তার দিক থেকে একে আমরা প্রশংসা করবো। দৃশ্যপটগুলির জন্য খরচা করা হয়েছে প্রচুর—দৃশ্য সজ্জার ভার যার পর ছিল—তার নৈপুণ্যেরই প্রকাশ পেয়েছে। চিত্রগ্রহণ ও শব্দ গ্রহণ প্রশংসনীয়।

অলঙ্কারে বৈচিত্র্য
MBS
অলঙ্কার নির্মাণে — ডিজাইনের সৌষ্ঠব, মনোরম কাজ এবং স্বর্ণের বিশুদ্ধতাই আমাদের বৈশিষ্ট্য। আমাদের দোকানে নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র গিনি স্বর্ণের নানাবিধ হাল ফ্যাসনের অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসনাদি সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে এবং অর্ডার দিলেও অল্প সময়ে পছন্দ মত জিনিষ তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয়। মফঃস্বলের অর্ডার ভি. পি. ডাকে পাঠান হয়। পুরাতন স্বর্ণের পরিবর্ত্তে নূতন অলঙ্কার পাওয়া যায়। কাজের তুলনায় মজুরী সুলভ এবং প্রত্যেকটি অলঙ্কারের জন্য গ্যারান্টি থাকে।

রূপ-মঞ্চ

মঞ্চ, পর্দা ও সাহিত্যকলার সচিত্র মাসিক

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির মুখপত্র

কার্যালয়: ৩০, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা

ষষ্ঠ সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩৫১ : চতুর্থ বর্ষ

আমাদের আজকের কথা

বাংলা চিত্র জগতের বিষয়ে খবরাখবর যাঁরা রাখেন, বাঙ্গালীর চিত্র ব্যবসায়ে দুর্দিনের আশঙ্কাও যে তাঁরা না করেন এমন নয়। যাঁরা গভীরভাবে তলিয়ে কিছু দেখেন না তাঁদেরই অবগতির জন্য বাংলা চিত্র-জগতের ধীরে ধীরে শোচনীয়তার পথে এগিয়ে যাবার কথা প্রকাশ করতে চাই—হয়ত এদের ভিতর অনেকেই থাকতে পারেন যাঁরা বাংলা চিত্রজগতকে এই শোচনীয় পরিণাম থেকে রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে আসবেন।

প্রথম মনে করুন ষ্টুডিও। যেখানে চিত্রপানি গ্রহণ করা হয়। প্রয়োগশালা। এই ষ্টুডিও বা প্রয়োগশালা বাংলায় বাঙ্গালীদের আওতায় বলতে গেলে, নিউ থিয়েটার্সের ষ্টুডিও এবং অরোরা ফিল্ম ষ্টুডিও ছাড়া আর দ্বিতীয়টী নেই। বহু ধনী বাঙ্গালী চিত্র ব্যবসায়ী আছেন অথচ আজ পর্যন্ত তাঁরা ষ্টুডিও গঠনের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন না। যুদ্ধের দরুণ 'paper money' বৃদ্ধির সংগে সংগে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখতে পাই, বিভিন্ন ব্যবসায় লিপ্ত বহু বাঙ্গালীই প্রভূত সম্পদের অধিকারী হয়েছেন। যুদ্ধজনিত অবস্থায় সঞ্চিত অর্থ তারা কোন দিকে নিয়োজিত করেছেন জানি না কিন্তু আজ যদি এদের ভিতর থেকে এগিয়ে এসে সেরূপ কোন সম্পদশালী ব্যক্তি ষ্টুডিও নির্মাণে হস্তক্ষেপ করেন—ষ্টুডিওর অভাবে অনেক সময় ষ্টুডিও-হীন বাঙ্গালী প্রযোজকদের অবাঙ্গালী ষ্টুডিও মালিকদের কাছে ধর্ণা দিতে হবে না। অবশ্য এরা বলতে পারেন বর্তমানের

রূপ-মঞ্চ

ছবি বিশ্বাস পরিচালিত 'প্রতিকারে' রেণুকা ও ছবি।

Post war planning নিয়ে অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা নানান জল্পনা কল্পনা নিয়ে মেতে উঠেছেন আর আমাদের বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের সে সব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কোথায়? অনেকে বলেন, বাংলায় চিত্র প্রযোজনার ক্ষেত্রে বাঙ্গালীদের আধিপত্য বেশী। কিন্তু পরোক্ষ ভাবে দেখতে গেলে দেখা যাবে, এই বাঙ্গালী প্রযোজকরা অনেকেই অবাঙ্গালীদের হাতের মুঠোর ভিতর। আর বাংলায় শতকরা ১জনই বা অবাঙ্গালী প্রযোজক থাকবে কেন? বর্তমানে বাংলার চিত্র প্রযোজনা কার্যে—নিউ থিয়েটার্স, অরোরা ফিল্ম করপোরেশন, এম, পি প্রডাকসন্স, ডি, লুক্স, এম, পি প্রডাকসন্স, ভ্যারাইটী পিকচার্স, মতিমহল, ইষ্টার্ণ টকীজ, আর্ট ফিল্ম, ইউরেকা পিকচার্স শ্রীভারতলক্ষী, নিউ সেঞ্চুরী প্রডাকসন্স, নিউ টকীজ, চিত্ররূপা, ইন্দ্রপুরী, ষ্টুডিও, কে, বি, পিকচার্স, রূপশ্রী লিঃ প্রভৃতি চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলির নামই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এর ভিতর শ্রীভারতলক্ষী, নিউ টকীজ, মতিমহল, আর্ট ফিল্মস্, নিউ সেঞ্চুরী প্রডাকসন্স, ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও, এরাত পুরোপুরী অবাঙ্গালীদের হাতে, বাকী যাঁরা রইলেন তাঁদেরও অনেকে আংশিকভাবে এদেরই আওতার

পরিস্থিতিতে মেসিন পত্রাদির সংঘটনে যেসব বাধাবিঘ্ন আছে—সে অবস্থায় কোন ঝুক্কি নেওয়া মোটেই সমীচীন নয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নামলে দেখা যাবে এসব বাধা বিঘ্ন খুবই তুচ্ছ। বম্বেতে এই অবস্থাতেই একাধিক ষ্টুডিও গড়ে উঠেছে। তারপর অন্ততঃ যুদ্ধোত্তর কালের জন্তও ত এখন থেকে তাঁরা কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন? বাংলা এবং বাংলার বাইরে যেথানে দেখছি

রূপ-মঞ্চ

গঠিত। প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা আছেন তাঁদের ত দেখতেই পাচ্ছি - কিন্তু পরোক্ষভাবে অনেক বাঙ্গালী প্রযোজক অবাঙ্গালী ধনীর মুখপানে চেয়ে আছেন দয়ার ভিখারী হয়ে অর্থাৎ তিনি অর্থ দিয়ে সাহায্য করছেন তবে বাঙ্গালী প্রযোজক ছবি তুলছেন। এতে দাঁড়ালো এই, ছবি যখন মুক্তি পেলো— অবাঙ্গালী ধনী সুদের অংশ শুষে নিয়ে স্ফীত হ'লেন—আর বাঙ্গালী প্রযোজকের মাথায় চাপলো কতগুলি দেনার গুরুভার। দোষ অবশ্য বাঙ্গালী প্রযোজকেরও নয়—বা অবাঙ্গালী ধনীদেরও নয়—কারণ ছবি তুলতে হ'লে টাকার প্রয়োজন, তাই বাঙ্গালী ধনীকদের দ্বারা যখন সাহায্যের কোন প্রকার সুযোগ মেলে না—বাধ্য হয়ে বাঙ্গালী প্রযোজককে অবাঙ্গালী ধনীকের দ্বারস্থ হ'তে হয়—তিনি বাঙ্গালী ধনীকের মত নেহাৎ গোবেট নন—অর্থাৎ টাকা দিয়ে সুদে আসলে যে অনেকগুণ পাবেন এ ধারণা তাঁর আছে—আর তাইত তিনি করেন। এমন বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানও আছে অবাঙ্গালী ধনীকের লোলজিহ্বা যাকে গ্রাস করে বসে আছে, একবার একটু বেঁকে বসলেই হয়, জাল যখন গোটাতে আরম্ভ করবে মূল সমেত চড় চড় করে উঠে আসবে। তাই আমার আবেদন বাঙ্গালী ধনীক এবং ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে। এই ক'বছরে বহু ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে আমাদের দেশে অথচ চিত্র শিল্পের দিকে অর্থ নিয়োগ করলে যে লাভের অংশ অনেক বেশী পরিমাণে ঘরে আসবে—সেদিকে কোন ব্যাঙ্কগুলিরই দৃষ্টি নেই। কারণ ঐ যে একটা ভয় আছে—অনেক অদূরদর্শী ব্যবসায়ী

অরোরার 'সন্ধ্যা' চিত্রে বিজয়া দাস।

যেহেতু ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন চিত্র ব্যবসায় অর্থ নিয়োগ করে—আর কী তাঁরা এদিকে অগ্রসর হবেন জুজুর ভয়ে? আরে একবার পা বাড়িয়েই দেখ না! অনেক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলির খবর রাখি, যুদ্ধজনিত অবস্থায় যারা কেবল চোরাই বাজারের উপর নির্ভর করে স্ফীত হয়েছে। এই বাজারেও ত ভয় কম নেই। ধরা পড়লে যে সুদে আসলে যাবে। তবু তাঁরা চিত্র ব্যবসায়ে অর্থ নিয়োগ করবেন না। দেশের এই নূতন শিল্পকে আশ্রয় দিয়ে আজ যদি বাংলায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণ বাঙ্গালীদের আওতায় রাখতে পারে—ভবিষ্যতের ইতিহাসে একটী শিল্পের উন্নতির সঙ্গে তাদের

কথা যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। পরিবেশনা ক্ষেত্রেত কথাই নেই। সেখানে অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা গিজ গিজ করছেন। প্রদর্শন ব্যাপারেও এই সহরের বেশীরভাগ প্রেক্ষাগৃহগুলি এদেরই কর্তৃত্বাধীনে। এবং যে রকম অবস্থা, দু'চার বছরের ভিতর এরা যে বাঙ্গালীদের ডিঙ্গিয়ে চলবেন তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই! ষ্টুডিওর মালিক, প্রযোজক, পরিবেশক, প্রদর্শক—ব্যবসাজগতের প্রত্যেকটী বিভাগেই যদি তাদের প্রাধান্য বেশী পায়—বাংলা চিত্রের ভবিষ্যৎ তাহলেও কী উজ্বল বলেই মনে করবো? বাংলা চিত্রের একজন শুভাকাঙ্খী হ'য়ে বাংলা চিত্রের এই শোচনীয় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমার বাঙ্গালী ভাইদের অবহিত করবার অধিকারও কী নেই?

গত সংখ্যায় কাদম্বরী চিত্রের সমালোচনায় অনেকেই উষ্মা প্রকাশ করেছেন। বম্বেতে গৃহীত একটী ছবি—পাঁচটী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করবার সৌভাগ্য লাভ করলো—অথচ বাংলা ছবি সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত এই সত্য কথাটী বলাই যেন আমাদের মহা অপরাধ হ'য়েছে। এজন্য দায়ী আমি অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানদের করিনি—আমি বাঙ্গালী চিত্রামোদীদের কাছে এবং বাঙ্গালী চিত্র ব্যবসায়ীদের কাছে আবেদন জানিয়েছি। তারা যেন বাংলায় হিন্দি চিত্রগুলির প্রাধান্য না দেন। আজ এই কলিকাতা মহানগরী হিন্দি চিত্রের একটি প্রধান ব্যবসাক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। সারা ভারতের বাজার থাকতেও কলিকাতায় অনেক সময় বম্বে থেকেও হিন্দি চিত্রের প্রসার দেখা যায় বেশী। অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের পক্ষে কলিকাতাকে হিন্দি ছবিগুলির প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে পরিণত করবার সুযোগ হ'য়েছে বাঙ্গালী চিত্র ব্যবসায়ীদেই সাহায্যে এবং সহযোগিতায়, অথচ বম্বে বা বাংলার বাইরে বাংলা ছবির ব্যবসাকেন্দ্র নেই বললেই চলে। কলিকাতা হিন্দি চিত্রের প্রসারে মেতে উঠুক আপত্তি নেই। কিন্তু বম্বে বা দিল্লীও তাহলে বাংলা চিত্রের ব্যবসাকেন্দ্রে কেন পরিণত হয় না? এমন অনেক অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী আছেন—যারা বাংলা ছবির প্রদর্শন করে বাংলার বাইরে লাভবান হবেন জেনেও হিন্দি ছবির স্বার্থের কথা মনে করে বাংলা ছবির পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বিরত থাকেন।

বন্ধুবর শ্রীপঙ্কজও কাদম্বরীর সমালোচনার ওপর একটু উষ্মা প্রকাশ করেছেন। অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের প্রতি কটু উক্তি করা হয়েছে বলে—কিন্তু যারাই উক্ত সমালোচনা পড়েছেন—নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, অভিযোগ আমার অবাঙ্গালী চিত্র ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে নয়—অভিযোগ বাঙ্গালী চিত্র ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে—যারা ব্যবসায়গত বাধ্যবাধকতায় একাধিক প্রেক্ষাগৃহে, এমন কী বাংলা চিত্রগৃহগুলিতেও হিন্দি ছবির মুক্তিদানে সাহায্য করেন অথচ বাংলা ছবি মুক্তির পথ খুঁজে পায় না।

বাংলা ছবি যে হিন্দি ছবির তুলনায় অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ, সুযোগ পেলে সারা ভারতের দর্শক-মন জয় করতে যে বাংলা ছবি হিন্দি ছবির তুলনায় যোগ্যতর, একথা বন্ধুবর নূতন করে কী বলবেন? আমরা বহুবার বহু ক্ষেত্রে বলেছি। তবু বম্বের একটা নিকৃষ্ট ছবিও যে টাকা পায় সারা ভারত কুড়িয়ে, বাংলার একটী উচ্চ শ্রেণীর চিত্রও অনেক সময় তা থেকে বঞ্চিত। তারপর বান্ধবরের কথা মেনে নিয়েও যদি বলি, বাংলা ছবি এক বাঙ্গলাতেই যা লাভ করে হিন্দি ছবি সারা ভারত কুড়িয়েও তা পায় না—তাহলে বাংলার বাইরে মুক্তি লাভ করলেত বাংলা ছবি আরও বেশী অর্থোপার্জন করতে সমর্থ হবে। বন্ধুবর একটা কথা বলেছেন, বাংলা প্রেক্ষাগৃহে হিন্দি ছবিগুলি মুক্তি লাভে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। নেহাৎ ব্যবসার খাতিরেই অর্থাৎ যেহেতু প্রদর্শকরা বাংলা ছবি পান না তাই হিন্দী ছবির দ্বারস্থ হতে হয়। কিন্তু একথা আমি স্বীকার করি না। কেন, তা বলছি। পূর্বে কোন অবাঙ্গালী চিত্র প্রতিষ্ঠান ছবির মুক্তি দিতে

কোন প্রেক্ষাগৃহ পাননি বলে নানান দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন, চিত্রগৃহগুলি যেহেতু এক একটা প্রতিষ্ঠানের হাতে অমনি তারা চড় চড় করে নিজেদের ছবির মুক্তি দিচ্ছে, আর আমি হা করে বসে আছি।" সেদিন ব্যবসা ক্ষেত্রে এই অবাঙ্গালী পরিবেশকের উপায়হীনতার কথা চিন্তা করে সত্যই ব্যথিত হয়েছিলুম। উদার মনোভাব নিয়ে বিচার করলে, বাস্তবিকইত একজনে তার ছবিগুলি পর পর মুক্তি দিয়ে যাচ্ছে আর, আর একজন হাত গুটিয়ে বসে আছে। এটাই বা কী করে সহ্য করা যায়? কিছু দিন বাদে উক্ত ব্যবসায়ী এলেন আর একজন অবাঙ্গালী চিত্র ব্যবসায়ীর সংস্পর্শে। বাঙ্গালী চিত্র-ব্যবসায়ী মহলে এই ব্যবসায়ীটার প্রতিপত্তি অসম্ভব। অমনি পূর্বোতন অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী চড় চড় করে এবার তার ছবিগুলির মুক্তি দিয়ে যেতে লাগলেন। এবং এমন সুযোগই তিনি পেলেন, আজ পর্যন্ত কোন বাংলা ছবির ভাগ্যেও যা ঘটেনি। এ অবস্থায় বন্ধুবর কী মনে করবেন? আমার বক্তব্য হচ্ছে এই, আজ যদি বাংলা চিত্র ব্যবসায়ীর মূলে অবাঙ্গালী ধনীকের অর্থ নিয়োজিত থাকে অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা চিব দিন এই সুযোগ গ্রহণ করে আসবেন, এতে সকলের পক্ষেই ক্ষতিকর। তাই বাংলা চিত্রের এই শোচনীয় পরিণামের কথা চিন্তা করে—বাঙ্গালী ধনীক শ্রেণী এবং ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান গুলিকে এদিকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করি।

বাংলা ছেড়ে যেসব শিল্পী বম্বের দিকে যাচ্ছেন—এদের পরিণাম সম্পর্কেও আমরা চিন্তান্বিত। বম্বেতে এরা হয়ত এক একটা বিভাগের উপরওয়ালা হয়েছেন কিন্তু তাদের সহকারী সবই অবাঙ্গালী। অর্থাৎ এক একটা বাঙ্গালী বিশেষজ্ঞের পিছনে ৩।৪ জন অবাঙ্গালী শিক্ষানবীশ। বাঙ্গালী বিশেষজ্ঞের বিশেষত্বটুকু যখন করায়ত্ব হবে তখন যে বাঙ্গালীদের কোন প্রয়োজনেই আসবে না—About turn quick march করে আবার বাংলাতেই ফিরে আসতে হবে। বম্বের বাজার চিরতরে বাঙ্গালী বিশেষজ্ঞদের জন্য বন্ধ হবে। কারণ ইতিমধ্যে ঐ শিক্ষা-নবীশদের দল বেশ এক একজন হোমরা চোমরা হয়ে উঠবে। তাই এদের বম্বে যাওয়াটা বন্ধুবর শ্রীপঙ্কজ যে ভাবে দেখেছেন আমি সে দৃষ্টি নিয়ে দেখতে পারি নি।

জানেন কী এঁদের

(৩)

দেবীকারাণী দেবী

ভারতীয় ছায়া জগতে দেবীকারাণীর নাম না জানেন এমন দর্শকের সংখ্যা নেই বললেই চলে। দর্শক-মন-নন্দিতা দেবীকারাণী ছায়া জগতে নিজের প্রতিভায় স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছেন। এ গৌরব মূলতঃ বাংলারই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ দেবীকার দাদামশায় ছিলেন। মাদ্রাজের ভূতপূর্ব সার্জন জেনারেল কর্ণেল এম, এন্ চৌধুরী আই, এম, এস দেবীকার পিতা। ১৯১১ খৃঃ মাদ্রাজের ওয়ালটিয়ার সহরে দেবীকার জন্ম হয়। মাদ্রাজ এবং শান্তিনিকেতনেই দেবীকার শিক্ষারম্ভ। উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত যাত্রা করেন এবং ছ' বৎসর বাদে ফ্রান্স সুইজারল্যাণ্ড ইটালী—পরিভ্রমণ করে বার্লিনে প্রায় দু'বৎসর ধরে চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে ১৯৩১ খৃঃ ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। হিমাংশু রায়ের সংগে পরিনয় সূত্রে আবদ্ধা হন। এবং ৺ হিমাংশু রায় প্রযোজিত Indo International Film এর ইংরেজী সবাক চিত্র 'Karma' এ অভিনয় করেন। 'কর্ম' সর্ব-প্রথম ভারতীয় ইংরেজী সবাক চিত্ররূপে সম্মান পেয়ে আসছে। লণ্ডনে চিত্রখানি মুক্তিলাভ করে অজস্র প্রশংসা লাভ করে। এই চিত্রে অভিনয় করে দেবীকাও আন্তর্জাতিক চিত্র জগতে সুনাম অর্জন করেন। এবং এই চিত্রে অভিনয় করবার পর British Broad Casting (B, B. C.) Companyর দ্বারা আমন্ত্রিত হ'য়ে short waveএ ভারতে বেতার-বার্তা প্রচলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর বম্বে টকীজের প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে স্থায়ীভাবে যোগদান করেন।

বম্বে টকীজ প্রযোজিত 'অচ্ছুত কন্যা'য় অভিনয় করে অসম্ভব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। এরূপ প্রতিভাদীপ্ত অভিনয় দেখে চিত্রামোদীরা বিস্মিত হলেন। পর পর জীবনপ্রভাত, নির্মলা, বচন, দুর্গা, অঞ্জন, এবং হামারীবাৎ চিত্রে অভিনয় করেন।

১৯৪০ খৃঃ এর স্বামী স্বর্গত হিমাংশু রায়ের মৃত্যুর পর বম্বে টকীজের সমস্ত পরিচালনার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। মতানৈক্যের জন্য রায়বাহাদুর চুনিলাল একদল অভিজ্ঞ কর্মী ও শিল্পীসহ বম্বে টকীজ পরিত্যাগ করে 'ফিলিমিস্তান' কম্পানীর প্রতিষ্ঠা করেন। বম্বে টকীজের এই ভাঙ্গনে—বম্বে টকীজ সম্পর্কে অনেকেই সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন—কিন্তু স্বীয় পরিচালনা নৈপুণ্যে দেবীকা সমস্ত আঘাতই সামলে নিতে পেরেছেন।

দেবীকার অভিনয়ে যে আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে অন্য কোন অভিনেত্রীই তার সমকক্ষতার দাবী করতে পারেন না। ভারতের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর সম্মান অতি সহজেই দেবীকা লাভ করেছিলেন। তাই বাংলার বাইরে বাঙ্গালী মেয়েটীর সুনামে প্রত্যেক বাঙ্গালীই গর্ব অনুভব করেন।

শ্রীমতী বিজয়া দাস বি এ—

বাংলা চলচ্চিত্র জগতের নূতন আবিষ্কারদের ভিতর একমাত্র গ্রাজুয়েট মহিলা। ১৯১৮ খৃঃ ২৭শে অক্টোবর ময়মনসিংহে শ্রীমতী দাসের জন্ম হয়। পাটনা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার স্বর্গতঃ সি, সি, দাস মহাশয় বিজয়ার পিতা ছিলেন। সব-কণিষ্ঠা কন্যা বলে শ্রীমতী বিজয়া পরিবারের খুব আদুরে মেয়ে। ১৯৩৮ খৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি, এ পাশ করেন। বেথুন কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষয়িত্রী-

'শেষরক্ষায়' নায়িকা ইন্দুমতীর চরিত্র রূপায়ণে শ্রীমতী বিজয়া দাস বি, এ।

রূপে যোগদান করেন। শিক্ষয়িত্রীর কার্য পরিত্যাগ করে Supply Departmentএর অধীনে কাজ করতে আরম্ভ করেন। শ্রীমতী দাসের বালিকাবয়স থেকেই সংগীত এবং অন্যান্য কলা বিদ্যায় অনুরাগ দেখা যায়। ১৯২৫ খৃঃ জোড়াসাঁকো-তে শেষ বর্ষণের অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন এবং দুখানি গান গেয়ে উপস্থিত শ্রোতাদের অভিভূত করেন। পরবর্তী কালে অভিনয় এবং সংগীতে তিনি যে পারদর্শী হবেন একথা তখন থেকে অনেকেই অনুমান করে নিয়েছিলেন। তারপর রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পুজায়' নটীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। সে অভিনয়ে প্রশংসা না করে কেউ থাকতে পারেন নি। বৃন্দাবন লীলায় শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয়ে শ্রীমতী দাস যে অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন — অনেক পেশাদার প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীদের কা থেকেও অনেক সময় তা আশা করা যায় না। ১৯৩৮ খৃঃ গিরিশচন্দ্রের আবু হোসেনে রোজেনারা, ১৯৩৩ খৃঃ রবীন্দ্রনাথের মায়ার খেলায় অশোকা এবং চিরকুমার সভায় নির্মলার ভূমিকায় অভিনয়

'শেষরক্ষা'র একটী দৃশ্যে বিজয়া দাস, পদ্মা দেবী ও রেবা।

করেন। চিত্রে অভিনয় করবার গোপন ইচ্ছা শ্রীমতী দাসের বহুদিন থেকেই ছিল— সে সুযোগ সর্বপ্রথম এলো চিত্রভারতীর শেষরক্ষা চিত্রে। নায়িকা ইন্দুমতীর ভূমিকায় অভিনয় করবার গৌরব তিনি অর্জন করলেন। শেষ-রক্ষার পরিচালক শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায় সব দিক বিচার করে শ্রীমতী বিজয়া দাসকে নির্বাচন করে দূরদর্শিতারই পরিচয় দিলেন। শেষ-রক্ষার কার্য শেষ হতেই শ্রীমতী বিজয়া অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের সংগে চুক্তিবদ্ধ হলেন এবং অরোরা ফিল্ম করপোরেশন প্রযোজিত সন্ধ্যা চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। সন্ধ্যার পরিচালনা করেছেন প্রমথেশ বড়ুয়ার সুযোগ্য সহকারী শ্রীযুক্ত মণি ঘোষ। শ্রীমতী বিজয়া দাস অভিনীত দু'খানি চিত্রই মুক্তি প্রতীক্ষায় আছে। আমাদের দৃঢ় ধারণা—সংগীতে—অভিনয়ে—বাচন ভংগিতে এই নবাগতা—শিক্ষিতা অভিনেত্রী দর্শক-মন অধিকার করতে সমর্থা হবেন। বাংলা চিত্র জগত শ্রীমতী দাসের মত অভিনেত্রী লাভে যে গৌরবান্বিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। —নিতাইচরণ সেন

কথাকলি নৃত্যের দুর্গতি

প্রহ্লাদ দাস

ভারতীয় নৃত্যকলাকে ধরে নিয়ে ক্যামেরার সাহায্যে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশ হতে আগত লোকদের কাছে দেখাবার ভার পেয়েছিলেন, বিখ্যাত সিনেমা ডিরেক্টর মধু বসু মহাশয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রীযুক্ত বসু একজন অভিজ্ঞ লোক হয়ে কথাকলি নাচ ফিল্মে তুলে নিয়ে—যে ভাবে লোকের সাম্‌নে ধরেছেন—তাতে বিদেশাগত যাঁরা,— তাঁদের ধারণা হবে কথাকলি নাচ পুতুল নাচ, পুতুল নাচ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ অতি অল্প সময়ের মধ্যে মধু বাবু প্রাথমিক শরীর চর্চা হতে আরম্ভ করে অভিনয় পর্যন্ত দেখিয়েছেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে অভিনয় দেখাতে গিয়ে অভিনয় হয়েছে খাপছাড়া। প্রকৃত টেক্‌নিক্ পড়েছে বাদ, নাচ হয়েছে প্রাণহীন পুতুল নাচেরই মত। এই ভাবে যদি শ্রীযুক্ত বসু ভারতীয় নৃত্য-কলাকে বৈদেশিকদের সামনে তুলে ধরেন তবে ভারতবর্ষ এবং তার নৃত্যকলা সম্বন্ধে লোকের যে উচ্চ ধারণা আছে সেটা ক্ষুণ্ণ হবে বৈ কী? শ্রীযুক্ত বসুর উচিত ছিল এই কাজের ভার নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ববিখ্যাত নৃত্য-শিল্পী উদয়শঙ্করের সঙ্গে পরামর্শ করে কোন্ নাচ্ কতটুকু তুললে—তার বৈশিষ্ঠ বজায় থাক্‌বে সে সম্বন্ধে ওঁর মত নেওয়া, তা না করে উনি যা করেছেন তাতে বৈদেশিকদের কাছে কথাকলি যে অত উচু ধরণের নাচ তা বলতে লজ্জা হয়। শ্রীযুক্ত বসু অভিনয় সম্বন্ধে ভাল বুঝতে পারেন কিন্তু নৃত্য সম্বন্ধে নিজে বেশী বুঝি এটা মনে না করে যিনি প্রকৃত নৃত্য-শিল্পী তার সাহায্য নেওয়া উচিত ছিল। উনি হয়ত বলবেন কথাকলি নাচের যাঁরা গুরু তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন, কিন্তু তাঁরা কথাকলি নাচ সম্বন্ধে জান্‌তে পারেন তাই বলে কী ভাবে লোকের চোখের সামনে ধরলে আর্টিষ্টিক হবে সে ধারণা তাঁদের নেই, তাঁর প্রমাণ কলামগুলের পার্টি বিখ্যাত কবি বেলাথল সহ কলকাতা ফার্ষ্ট এম্পায়ারে (বর্তমান রকসি) এক 'সো' দেয় এবং অকৃতকার্য হয়ে ফিরে যায়। তার একমাত্র কারণ, কি ভাবে লোকের সাম্‌নে ধরলে লোকের মনঃপুত হবে সেই জ্ঞানের অভাব। সুতরাং শ্রীযুক্ত বসুর অনেক ভেবে কাজ করা উচিৎ ছিল। কিছুদিন পূর্বে আমি যখন মাদ্রাজে ছিলাম তখন একদিন আমার এক মালাবারী বন্ধু বিখ্যাত কথাকলি নৃত্য শিক্ষকের সঙ্গে 'ডান্সেস অফ ইণ্ডিয়া' দেখতে গিয়ে যা দেখলুম তাতে বন্ধুবরত চটেই অস্থির! শ্রীযুক্ত বসুকে সাম্‌নে পেলে হয়ত দু'কথা শুনিয়েই দিতেন। কারণ তাঁর দেশের শিল্পকে যদি কেউ ঐ ভাবে লোকের চোখে খেলো করে ধরে তাতে তাঁর রাগ হবারই কথা—আমার ও দুঃখ হয়। শ্রীযুক্ত বসুর উচিৎ ছিল শরীর চর্চা হতে আরম্ভ করে অভিনয় পর্যন্ত না দেখিয়ে তোটেয়াম অথবা পরপ্পারের—যে কোন একটা নাচ দেখান, তাতে কথাকলির সব টেকনিকই দেখান হতো। তা না করে অভিনয় দেখাতে গিয়ে কথাকলি নাচকে তিনি পুতুল নাচ করে ফেলেছেন। এজন্য প্রত্যেক নৃত্য—শিল্পীরই প্রতিবাদ জানানো উচিত।

গাঁয়ের নটী

(গল্প)

নির্মলচন্দ্র দত্ত

সতেরো বছর বয়সে ললিতা বিধবা হয়েছিল।

কেষ্ট চাটুজ্যের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না—এ কথা গ্রামের সকলেই জানত। সামান্য পূজারী বামুনের কাজ করে স্ত্রী ও চারটী ছেলে মেয়ে নিয়ে দিন তার অতি কষ্টেই কাটত। বড় মেয়ে ললিতার বয়স তখন পনেরো পার হ'য়ে ষোলয় পড়েছে। কাজেই বিয়ে না দিলে মান-ইজ্জৎ রক্ষা হয় না। বামুনের ঘরে বিনাপণে পাত্র পাওয়া দুঃসাধ্য—তাই ললিতা এত বয়স হওয়া সত্বেও শ্বশুর ঘর করতে যেতে পারে নি। সুপাত্রের খোঁজ অবশ্য একটা পাওয়া গেল—অনেক কষ্টে। ওপাড়ার রাম চক্কোত্তির মাস চারেক হ'ল স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে। তাই তিনি আর একটী বিয়ে করতে চান্—নইলে ছোট ছেলেমেয়েগুলোর বড় কষ্ট হয়।

জোতদারী ও সুদে কারবারিতে রাম চক্কোত্তির অবস্থা বেশ স্বচ্ছল হ'য়ে উঠেছিল। বয়স অবশ্য একটু বেশী হ'য়ে গিয়েছে—প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। গাঁয়ের নারীমহল বলে,—অমন কার্তিকের মত সুপুরুষ! বাংলা দেশে মেয়ের অভাব কি যে, ওঁর বিয়ে হবে না। নইলে সংসারটা যে ভেসে যায়!

কেষ্ট চাটুজ্যে ললিতার জন্যে রাম চক্কোত্তিকে সুপাত্র মনোনীত করলেন। ললিতার রূপ ছিল—তাই সে রূপের হাটে অতি সহজেই বিকিয়ে গেল। ললিতাকে রাম চক্কোত্তির খুবই পছন্দ, কিন্তু ললিতার রাম চক্কোত্তিকে পছন্দ হয়েছিল কিনা সন্দেহের কথা। তার মনের ভাবে তা বোঝা যায় না। কিন্তু ললিতার পছন্দ অপছন্দ বা ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর কি আসে যায়—বিয়ে তার রাম চক্কোত্তির সাথেই হ'য়ে গেল। গাঁয়ের শিক্ষিতেরা দুঃখ করল—মেয়ে-মহল খুসী হ'ল।

এক বছরও পার হয় নি। ললিতা সিঁদুর আর হাতের নোয়া খুইয়ে বাপের বাড়ী ফিরে এল। কিন্তু বাঙালী মেয়েদের স্বামীর ঘরই নাকি একমাত্র পুণ্যতম স্থান—তাই তাকে আবার বাপের বাড়ী থেকে অনিচ্ছাসত্বেও স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে হ'ল।

রাম চক্কোত্তি তাঁর বড় ছেলে রঞ্জনকুমারের বাইশ বছর বয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন দূরান্তরের এক সহরে। সে প্রায় আজ দু'বছর অতীত হয়েছে। গাঁয়ের লোকে বলে—রাম চক্কোত্তি টাকার লোভে ছেলেটার বিয়ে দিল এক কাল কুৎসিৎ মেয়ের সংগে। তাই ছেলেটা অমন মনমরা হ'য়ে থাকে—হয়ত পছন্দ হয়নি বউটাকে মোটেই। লোকে টিটকারীও দেয়—পাঁচ হাজার টাকার অমন মা-কালী বউ—তাইতেই তো বউটাকে রাম চক্কোত্তির অত আদর!

ললিতা ঘর সংসার বেশ করছিল। কিন্তু মাস কয়েক পর হঠাৎ গাঁয়ের লোকের মুখে মুখে শোনা গেল—ওমা, কি ঘেন্নার কথা! রাম চক্কোত্তির বিধবা বউটা ছোঁড়াটার মাথা খেল! আহা অমন দেবদূতীর মত বউ থাকতে ছোঁড়াটারও মরন নেই। মা হয়—মায়ের সংগে এ কি কেলেংকারী! ছুঁড়িটার গলায় দড়ি জোটে না!

কথাটা সত্যি কি মিথ্যা তা কেউ যাচাই ক'রে দেখেনি।

কিন্তু একদিন গাঁয়ের সমাজের টনক নড়ল। এত বড় কেলেংকারীতো পাড়াতে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। তাই ললিতার চরিত্র যাচাই করতে বসল বিচার সভা। রঞ্জনকুমার পুরুষ, তাই সে অপরাধী বলে স্বীকৃত হ'ল না, কিন্তু ললিতা নারী, তাই তার অপরাধ সবচেয়ে গুরুতর ব'লে বিচার্য হ'ল। তাই ললিতার মাথায় ভ্রষ্টা চরিত্রের কলংকের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তাকে সমাজের বাইরে বের করে দেওয়া হল।

মেহতাব : কারদারের 'সংযোগ' ও 'জীবন' এর নায়িকা।

ললিতা দেহ বিক্রীর দোকান সাজিয়ে বসল।

ললিতা গাঁয়ের নটী। উপার্জন সেই অনুপাতে খুবই অল্প। তাই বেশী অর্থের লোভ দেখাল তাকে সঞ্জয়। কলকাতার কোন এক থিয়েটারের নাম করা অভিনেতা সে—যুবরাজের ভূমিকায় অভিনয় করে যশঃ লাভ করেছে। বছর পাঁচেক আগে মেট্রিক ফেল করে সিনেমায় অভিনয় করার ইচ্ছা নিয়ে থিয়েটারে যোগ দিয়েছে।

ললিতার রূপ ও শক্তি আছে—চেষ্টা করলে ভবিষ্যতে যশঃ ও খ্যাতি অর্জন করতে পারবে এ ধারণা বদ্ধমূল হল সঞ্জয়ের মনে। সঞ্জয়ের সুমিষ্ট প্ররোচনায় ললিতা ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে নিজের সত্বা ফেলল হারিয়ে।

সঞ্জয়ের সাথে ললিতা গ্রাম ছেড়ে চলল কলকাতায়।

পরিচারিকার অভিনয় করে করে লতিকার দিন বেশ চলে যাচ্ছিল। সহসা থিয়েটারের ম্যানেজার লতিকার ওপর সুনজর দিলেন কাজেই লতিকার ভাগ্যরথের চাকা ঘুরল। পরিচারিকা থেকে সে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য মনোনীত হ'ল।

ললিতার দেহ সৌষ্টব, বাচনিক ভংগী, আর সুষ্ঠু অংগ পরিচালনার জন্য দর্শকবৃন্দের কাছে অতি সহজেই সে খ্যাতি অর্জন ক'রে বসল।

ললিতার পূর্বনামের মৃত্যু হ'য়ে নতুন নামের হ'ল জন্ম।

ললিতা এখন বিনীতা দেবী।

কলকাতার পথে পথে টাঙানো বিনীতা দেবীর ছবি সম্বলিত বিজ্ঞাপন। আধুনিকতম মেয়ে পুরুষের চোখে ললিতা দেখাল প্রলোভন।

সঞ্জয় কিন্তু যেমন ছিল তেমনি র'য়ে গেল। ললিতার এখন আর সময়ই হয় না সঞ্জয়ের ওপর একটু দৃষ্টি দিতে। ম্যানেজারের আদর আপ্যায়নে ও সাহচর্যে তার নূতন ললিতার রূপের মোহ ছিল—সেই নেশায় তার আশ্রয় দাতার অভাব হল না। অনেক সুহৃদজন এসে তার আসে-পাশে জুটতে লাগল।

জীবন হ'য়ে উঠল মুখরিত। ললিতার স্থান এখন আর সঞ্জয়ের পাশে নয়—বড় বড় মজলিসে, টি পার্টিতে, অভিনয়ের অধিবেশনে—আর নারীর মুখে মুখে, পুরুষের হৃদয়ে হৃদয়ে।

সঞ্জয় এসে একদিন বলল—লতা, তুমি এখন পাহাড়ের শিখরে দাঁড়িয়ে, তাই তোমার সাহচর্য পেতে সাধ্য সাধনা করতে হয়।

ললিতা হেসে বলল—জানই তো সঞ্জয়, একদিন সকলে মিলে আমায় সমাজ ছাড়া ক'রে দিয়েছিল, অথচ অপরাধ আমার কিছুই ছিল না। একটা মিথ্যা দুর্ণামের বোঝা মাথায় চাপিয়ে আমার ছেলে রঞ্জনকেও পর্যন্ত লাঞ্ছনা ভোগ করান। এই অমূল্য ব্যাপারটার কেউ একবার অনুসন্ধান ক'রে পর্যন্ত দেখল না। তাই তার প্রতিশোধ নেবার জন্যে আজ আমার অট্টহাসি হাসতে ইচ্ছে করছে সঞ্জয়!

সঞ্জয় কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে—যে তোমায় আলোর পথ দেখিয়ে আনল, সে কি তোমার এখন মনের বাইরে?

ললিতা বাধা দিয়ে বলল—না সঞ্জয়, তুমি আমায় আলোর পথ দেখিয়েছ ব'লেই আজ তোমায় এত সম্মান করি। দেখো সময় যেদিন আসবে, সেদিন যথোচিত পুরস্কার দেব।

—তোমায় আমি তো কাছে পেতে চাইনি—শুধু চেয়েছিলাম সাহচর্য। কিন্তু তা হ'ল না, লতা। তাই আমার দুঃখ হয় বড়, কিন্তু হিংসে হয় না।

—দুঃখ বা হিংসে কিছুই করো না, সঞ্জয়। মনে রেখো, নিজের স্বার্থের জন্যে আমি আর সকলকে ঠকাতে পারি, কিন্তু তোমায় পারিনে। তুমি আমার পথের অগ্রদূত। কেবল অপেক্ষা ক'রে আছি, যেদিন আমি জয়লাভ ক'রে ফিরে আসব, সেদিন তোমার কাছ থেকে আমি জয়মাল্য উপহার নেব তাইত—
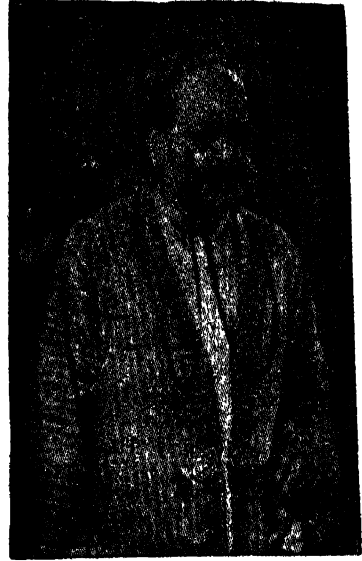
'সন্ধ্যা' চিত্রে অহীন্দ্র চৌধুরী।

বাইরে থেকে ম্যানেজারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—বিনু, আসতে পারি ঘরে?

সঞ্জয়কে অন্য পথ দিয়ে বের ক'রে দিয়ে ললিতা ম্যানেজারকে ঘরে আহ্বান ক'রে বলল—আসুন, আসুন, আপনার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছি।

ম্যানেজার বিনীত কণ্ঠে বললেন—এত বড় সৌভাগ্য আমার, বিনীতা দেবী!

—হ্যাঁ, দেখছেন না, আপনার জন্যে আমি কম উদ্বিগ্ন হ'য়ে থাকি!

বিছানার ওপর ব'সে প'ড়ে ম্যানেজার বললেন—আর তোমার স্বপ্নে আমি কি কম বিভোর হ'য়ে থাকি বিনু!

অলঙ্কারে বৈচিত্র্য
MBS
অলঙ্কার নির্মাণে — ডিজাইনের
সৌষ্ঠব, মনোরম কাজ এবং
স্বর্ণের বিশুদ্ধতাই আমাদের
বৈশিষ্ট্য। আমাদের দোকানে
নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র
গিনি স্বর্ণের নানাবিধ হাল
ফ্যাসনের অলঙ্কার ও রৌপ্যের
বাসনাদি সর্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত
থাকে এবং অর্ডার দিলেও অল্প
সময়ে পছন্দ মত জিনিষ তৈয়ারী
করিয়া দেওয়া হয়। মফঃস্বলের
অর্ডার ভি. পি. ডাকে পাঠান
হয়। পুরাতন স্বর্ণের পরিবর্তে
নূতন অলঙ্কার পাওয়া যায়।
কাজের তুলনায় মজুরী সুলভ
এবং প্রত্যেকটি অলঙ্কারের
জন্য গ্যারান্টি থাকে।

তোমার জন্যে আমি দুনিয়ায় সব কিছু ত্যাগ করতে পারি। কিন্তু 'আপনি' ডাক যে বড় পর পর মনে হয়। এবার থেকে তুমি আমায় 'তুমি' বলবে।

—কিন্তু এতই যদি তুমি আমায় ভালবাস, তাহ'লে আমায় একটা ছবির পরিচালকের সংগে আলাপ করিয়ে দাও না গো!—যাতে আমি সিনেমায় নামতে পারি। নইলে এমন ক'রে দারিদ্রের মধ্যে দিন কাটলে তো আর চলে না। তুমিই বা আর কত দেবে একলা।

—কোন ভাবনা নেই বিনু, সব ব্যবস্থাই আমি ক'রে দেব।

× × ললিতা একটা নূতন বইয়ে নায়িকার ভূমিকায় ছবি তোলবার জন্যে মনোনীত হ'য়ে ম্যানেজারের সংগে বাসায় ফিরে আসছিল, নজরে পড়ল তার সঞ্জয়কে। সঞ্জয় যেন ললিতার বিজয়ে গৌরবান্বিত হ'য়ে তার জয়-রথের নিশান ধ'রে এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

ছবির শুটিংএ ম্যানেজার প্রত্যেকদিনই উপস্থিত থাকেন—বিনীতা দেবী অভিনয় করে, ম্যানেজার তারিফ করেন। ম্যানেজর একদিন গদগদ কণ্ঠে বললেন—তোমার acting যা হচ্ছে, বিনু! এরই মধ্যে ষ্টুডিওতে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে! আর দু'দিন পরে সব পরিচালকরাই তোমায় নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে, দেখে নিও!

ললিতা শুধু বিজয় গৌরবের হাসি হাসে।

প্রেক্ষাগারে নূতন ছবি দেখবার পরই সত্যি সত্যিই সকল ষ্টুডিওর ছবি পরিচালকদের মধ্যে বিনীতাকে নিয়ে প'ড়ে গেল কাড়াকাড়ি। বিনীতাকে যে ছবিতে নামানো যাবে, সেই ছবিই নাকি চলবে সব চাইতে ভাল।

কিছুদিন হ'ল ললিতার একজন বড় জমিদার প্রণয়ী জুটেছেন—তাঁর নাম প্রমোদরঞ্জন রায় চৌধুরী। কলকাতায় তিন চারখানা বাড়ী আছে তাঁর—অগাধ ঐশ্বর্যের মালিক সে।

প্রমোদরঞ্জন একদিন বললেন—তোমার জন্যে আমি সব কিছু ত্যাগ করতে পারি, বিনীতা দেবী!

ললিতা মৃদু হেসে বলল—তাইতো দেখছি, রায় চৌধুরী, আমার জন্যে সবাই সব কিছু ত্যাগ করতে পারে।

—তুমি হাসলে বিনু? কিন্তু দেখো একদিন, সত্যিই পারি কি না! কিন্তু তোমায় বিয়ে করতে হবে আমাকে।—প্রমোদরঞ্জন জোর গলায় বললেন।

কথাটা প্রমোদরঞ্জনের অত্যুক্তি ছিল না। সত্যসত্যই বিনীতার নামে কলকাতা সহরের ওপর একটা বাড়ী উঠল। বাড়ীর নাম হ'ল, 'বিনীতা ভিলা।' ঘরে আধুনিকতম আসবাবপত্র ও সাজসজ্জায় পরিপূর্ণ ও সুসজ্জিত। দরজায় সশস্ত্র দারোয়ান। মটর গ্যারেজে নূতন দামী মটর। কথায় কথায় পরিচারিকা ছুটে আসে বিনীতার সেবার জন্যে। ললিতা এখন ঐশ্বর্য ও খ্যাতির প্রাসাদ শিখরে।

সেদিনের ললিতা এ দিনে বিনীতা হয়েছে।

সঞ্জয়ের আর দেখা নাই অনেক দিন। সঞ্জয়ের কাছে ললিতা এখন আকাশের মত বহু দূরে।

ম্যানেজার বাবু আসেন মাঝে মাঝে। কিন্তু দরজা সকল সময় তার জন্যে উদ্‌ঘাটিত হয় না। ব্যাপারটার জন্যে ম্যানেজার বেশ একটু মনঃক্ষুণ্ণ হন। তাঁর অভিমান হয় বিনীতার ওপর, রাগ ও হিংসা হয় প্রমোদরঞ্জনের ওপর।

"মেঘদূত" পত্রিকায় বিনীতা দেবীর প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ল—"প্রাচ্য নৃত্যে নারী।" চিত্র-তারকা বিনীতা দেবীর প্রবন্ধের জন্যে নাম করা পত্রিকার সম্পাদকগুলো পর্যন্ত ধন্না দিতে লাগল স্বনামধন্যা অভিনেত্রীর বাড়ীর দরজায়।

বিনীতার নতুন ছবির উদ্বোধন হ'চ্ছে "রেখা বাণী" চিত্রগৃহে। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের তাদের অভিনীত ছবি দেখানো হবে আজ। ললিতার

মটর এসে প্রেক্ষাগৃহের ফুটপাতের ধারে থামতেই ললিতা চমকে উঠল সঞ্জয়কে দেখে। সঞ্জয় সেই পথ দিয়ে কোথায় যেন চলেছিল। তার পরণে ময়লা একটা কাপড়, গায়ে ছেঁড়া একটা জামা, পিঠের উপর কিসের একটা বোঁচকা।

ললিতা আশ্চর্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল—একি সঞ্জয়? এমন বেশে কোথায় চলেছ?

সঞ্জয় উত্তর দিল—ফেরী করতে।

—ফেরী করতে?

—হ্যাঁ, থিয়েটারের কাজ আমি ছেড়ে দিয়েছি। ও আর ভাল লাগে না। এই কাটা কাপড়ের ফেরী ক'রে বেড়াই। এতেই বেশ আছি। ব'লেই সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। তারপর নিজের পথে চ'লে গেল সে।

সঞ্জয় সম্বন্ধে ললিতা ভাববার সময় আর পেল না। প্রেক্ষাগৃহের কর্তারা ও দর্শকবৃন্দের দল তাকে ঘিরে ফেলেছিল।

ম্যানেজার ভাবেন—মেয়ে জাতটাই এম্‌নিধারা। নারীকে আলোর পথ দেখালেই পুরুষের এমনি ক'রেই তার কাছ থেকে অবমাননা পেতে হয়। প্রমোদরঞ্জনের ওপর প্রতিহিংসায় ম্যানেজারের সর্বশরীর জ্বলে ওঠে। তিনি ভাবেন—একজনকে আসন থেকে জোর ক'রে সরিয়ে দিয়ে আর একজন এসে আধিপত্য করবে সেখানো, আর তার অতীত মালিককে ধিক্কার দেবে—এ কখনও সহ্য হয় না। এম্‌নি ক'রে চোখের সামনে বিনীতার দেহকে নিয়ে আর একজন মনের আনন্দে ছিনিমিনি খেলবে—এ সহ্য সীমার অতীত। ম্যানেজার তাঁর গুলিভরা পিস্তলটা নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যান বাইরে।

ললিতার বাড়ীর দরজায় এসে তিনি চুপ ক'রে দাঁড়ান। ভেতর থেকে ভেসে আসছিল প্রমোদরঞ্জন ও বিনীতার হাসি কলরোলের উচ্ছ্বাস। প্রমোদরঞ্জন বলছেন —জান বিনু, তোমার জন্যে হয়ত আমি গত জন্মে তপস্যা করেছিলাম, নইলে এ জন্মে পেলাম কি ক'রে?

ললিতা উত্তর দেয়—আর তোমার জন্যে আমি বুঝি তপস্যা করি নি, রায় চৌধুরী?

—হ্যাঁ, তা করেছই তো। কিন্তু প্রাণেশ্বরী, আর একটু দাও অমৃত।

—না, না, অত মদ খেয়ো না, লক্ষ্মীটি! ওতে শরীর থাকে না।

—ওতে কিচ্ছু হবে না। শরীর পাথর দিয়ে গড়া—আত্মা আমার ভগবান।

'উদয়ের পথে' চিত্রে বিশ্বনাথ, বিনতা ও দেবী মুখার্জি।

হাওয়ায় দরজার পর্দা উড়ে গিয়েছিল, তারই ফাঁকে ম্যানেজারের নজরে পড়ল—একহাত দিয়ে প্রমোদরঞ্জন মদের গ্লাসশুদ্ধ বিনীতার হাত চেপে ধরেছেন ও অন্য হাত দিয়ে ধরেছেন তার দেহটা জড়িয়ে। ম্যানেজারের চোখে এ দৃশ্য সহ্য হ'ল না।

ম্যানেজার ঘরে ঢুকে প'ড়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন—শয়তান! ললিতা মদের গ্লাস ছেড়ে দিয়ে স'রে গেল আচম্বিতে দূরে। পিস্তল থেকে গুলি বেরিয়ে এসে প্রমোদরঞ্জনের কপালে গিয়ে বিদ্ধ হ'ল।

প্রমোদরঞ্জন সোফা থেকে মেঝেয় পড়লেন লুটিয়ে।

ব্যাপারটা যেন কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে গেল। ললিতা তার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে 'পুলিশ, পুলিশ' ব'লে ডাকতে যাচ্ছিল—কিন্তু তার গলা একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল। স্বর বেরুল না।

নীচের রাস্তা দিয়ে তখন সঞ্জয় যাচ্ছিল ফেরী ক'রে—চাই জামা ছিট কাপড়?

ললিতা সঞ্জয়কে দেখে ছুটে নেমে গেল নীচে।

দুষ্কর্মের জন্যে ম্যানেজারের তখন হয়ত অনুতাপ হচ্ছিল—তাই তিনি মৃত প্রমোদরঞ্জনের দিকে চেয়ে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন।

নীচে নেমে এসে সঞ্জয়ের হাত ধ'রে হাঁফাতে

রূপ-মঞ্চ

হাঁফাতে ললিতা বলল—চল সঞ্জয়, আমরা চ'লে যাই। এ খেলা আর ভাল লাগে না। এ অভিনয় শুধু অভিনয়ই—শুধু মিছে। চল, চল আমরা চ'লে যাই—অনেক দূরে, বহুদূরে—যেখানে ম্যানেজার নেই, প্রমোদরঞ্জন নেই, ছবির পরিচালক নেই, কাগজের সম্পাদক নেই, নগরের কৌতূহল দৃষ্টি নেই, সেইখানে। এ জীবন আর চাই নে, সঞ্জয়। এখানে আছে শুধু লোক দেখানো আভিজাত্য, দর্শকেরে স্তুতি বাক্য। বাইরের সুখ, যশঃ, খ্যাতি—এ সব কিছুই আর চাইনে, ভালও লাগে না। এখানে এক মুহূর্ত আর থাকলে আমি পাগল হ'য়ে যাব সঞ্জয়! লোকে দেখে আমাদের জীবন কি সুখের, কি শান্তির—কিন্তু ঠিক তা নয়, তা নয়, সঞ্জয়। এ শুধু অভিনয়—এর মত লাঞ্ছনা, এর মত দুঃখ, এর মত অশান্তি, এর মত অভিশাপ আর কিছুতে নেই।

সঞ্জয় কোন কথা বলে না। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সে।

ললিতা সঞ্জয়ের হাত ধ'রে বলল—কথা বলছ না যে, সঞ্জয়? চল এখান থেকে এখনই পালাই। এখনই পুলিশ এসে পড়বে—তা হ'লেই সর্বনাশ—মানস সৌধ আমার ধুলিসাৎ হ'য়ে যাবে। চল সঞ্জয়, আমি খ্যাতি চাইনে, যশঃ চাইনে, ঐশ্বর্য চাইনে। আমি শুধু চাই একটীমাত্র শান্তিময় আশ্রয়। তোমার বাপ নেই, মা নেই, স্ত্রী নেই, কেউ নেই—আমারও কেউ নেই—আমরা দু'জনেই সমান হতভাগ্য। চল, আমরা দু'জনে মিলে একটা ঘর বাধিগে। জান, এ ঘরে কোন দিন অশান্তির আগুন লাগবে না! আজ আমার প্রতিশোধ নেওয়া শেষ হ'য়েছে সঞ্জয়! আজ তুমি আমার গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দেবে, চল। আজ সময় হয়েছে সঞ্জয়, আজ তোমার পুরস্কারের দিন—আজ থেকে আমি তোমার সাথী। এমনি ভাবে আমরা দু'জনে হাত ধ'রে পথ বেয়ে—চলব। ভগবান নিশ্চয় সহায় হবেন আমাদের। তুমিও গাঁয়ের মানুষ, আমিও গাঁয়ের মেয়ে—চল, সেই কোলেই আবার ফিরে যাই। বিনীতা দেবীর মৃত্যু হয়েছে, সঞ্জয়—সেদিনের ললিতা আবার বেঁচে উঠেছে।

সঞ্জয়ের চোখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

তার পর—

ললিতার হাত ধ'রে সঞ্জয় তার পথ চলতে লাগল।

মতিলাল সাহা (ঢাকা)

(১) নবাগতা উদীয়মানা-অভিনেত্রী বিজয়া দাশের সামাজিক মর্যাদা কী, (২) রেণুকা রায়, রবীন মজুমদার, অসিতবরণ, ভারতী, প্রমথেশ বড়ুয়া ও যমুনা দেবী বিবাহিতা কিনা।

(৩) বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠা গায়িকা (চিত্র জগতে) কে? তার ঠিকানা কি?

: (১) আপনার আমার যে সামাজিক মর্যাদা। তা'ছাড়া তিনি শিল্পী—আমাদের চেয়েও বেশী মর্যাদাসম্পন্না।

(২) আমি চিত্র জগতের Matrimonial agent নই যে খোঁজ করে বেড়াবো কার বিয়ে হ'য়েছে না হয়েছে। আর তা জেনে আপনারই বা কী লাভ? অভিনয়ের রসগ্রহণে কী ব্যহত হবে? (২) কানন দেবী। ৮৭ ধর্মতলা ষ্ট্রীটে, রীতেন এণ্ড কোম্পানীর প্রচার সচিব শ্রীযুক্ত হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের কাছে পত্র লিখলেই জানতে পারবেন।

প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (বহরমপুর)

আমি বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির সভ্য হইতে ইচ্ছা করি, আমায় কি কি করিতে হইবে? P. W. D. নামক যে বইখানি তোলা হচ্ছে তাহা কোন Studioতে এবং কোন Producer দ্বারা?

: বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির সভ্য হতে হলে চার আনার ডাক টিকিটসহ, নাম ঠিকানা, সম্পাদক সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৪।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে পাঠিয়ে দেবেন। P. W. D. নাটক ভ্যারাইটী পিকচার্সের প্রযোজনায় গৃহীত হবে। তবে বর্তমানে P. W. D.র চিত্ররূপ দিতে কর্তৃপক্ষ ইচ্ছুক নন। তারা মৌমাছির একটী গল্পকে চিত্ররূপ দিতে ব্যস্ত আছেন। গল্পটী মূলতঃ রূপমঞ্চের মারফতেই নির্বাচিত হ'য়েছে। ওরূপ একটী প্রথম শ্রেণীর গল্প যদি চিত্রে সার্থক রূপ পায় রূপ-মঞ্চের পরিশ্রম সার্থক হবে বলেই মনে করি।

শ্রীশক্তি কুমার সেন (নবাবগঞ্জ, ২৪ পরগণা)

আপনার চিঠি নিউ থিয়েটার্সের কার্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্রের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। সময় মত তাঁর সংগে রূপ-মঞ্চের কথা উল্লেখ করে দেখা করবেন।

বলাইচাঁদ দাস (বেলেঘাটা)

১। কৃষ্ণকান্তের উইল কি পূর্বে গৃহীত হয়েছে? তাতে কে কে অভিনয় করেছেন (২) আপনার পত্রিকায় আমি আমার লেখা প্রবন্ধ দিতে ইচ্ছুক তাতে আপনার কি মত? (৩) দুর্গাদাস সংখ্যা কবে বের হবে!

: (১) নির্বাক যুগে গৃহীত হ'য়েছিল। দুর্গাদাস, সীতা দেবী প্রভৃতি অভিনয় করেছিলেন। বর্তমানে নিউ থিয়েটার্স কৃষ্ণকান্তের উইলের হিন্দি রূপ দিতে হস্তক্ষেপ করেছেন। ছিত্রখানি পরিচালনা করবেন প্রিয় বান্ধবী খ্যাত নবীন পরিচালক সৌম্যেন মুখোপাধ্যায় এবং বিভিন্নাংশে অভিনয় করবেন—অসিতবরণ, ভারতী, সুমিত্রা দেবী প্রভৃতি।

(২) কোন অমত নেই তবে পত্রিকার উপযোগী হওয়া চাই। (৩) 'দুর্গাদাস' ইতিমধ্যে প্রায় শেষ হ'য়ে এলো।

রমেশ চন্দ্র দে (লতাফৎ হোসেন লেন)

(১) উমাশশী আর অভিনয় করেন না কেন? তিনি কি

'উদয়ের পথে' রেখা দেবী।

আর অভিনয় করবেন না? (২) কলিকাতার শ্রেষ্ঠ চিত্র গৃহ কোনটি (৩) আপনার মতে সমস্ত বাংলা ছবির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনটি?

: না। চিত্র জগৎ থেকে তিনি যে আরও এক প্রিয়তর জগতে প্রবেশ করেছেন। (২) বৈদেশিক চিত্র-গৃহগুলির ভিতর মেট্রো এবং দেশীয় প্রেক্ষাগৃহের [illegible] চিত্রা। (৩) সবাক চিত্রের বাল্যবয়সে—দেবদাস। সবাক চিত্রের কৈশোরে অর্থাৎ আজ অবধি প্রিয়বান্ধবী।

গীতা দেবী (কলিকাতা)

কানন দেবী, ভারতী, সুনন্দা, সন্ধ্যারাণী, যমুনা দেবী ও মলিনা দেবীকে পর পর সাজিয়ে দিন। এঁদের পরবর্তী চিত্র [illegible]? (২) সুরশিল্পী কমল দাশ গুপ্তের পরবর্তী চিত্র কী?

: শ্রীমতী চন্দ্রাবতী—দুই পুরুষ, বিরাজ বৌ। মলিনা— ইষ্টার্ণ টকীজের অভিনয় নয়, এম পি প্রডাকসন্সের নির্মীয়মান চিত্র, আট দিনের তকরার। সুনন্দা—নিউ-থিয়েটার্সের দুই পুরুষ---বিরাজ বৌ। কানন দেবী—এম, পি প্রোডাকসন্সের টু সিসটার, ডি, লুক্স পিকচার্সের আর একখানি চিত্র—তাছাড়া কানন এবং রায় প্রডাকসন্সের একখানি চিত্রেও দেখা যেতে পারে। ভারতী—নিউ থিয়েটার্সের কৃষ্ণকান্তের উইল। ছায়া-দেবী—রামানুজ। যমুনা--সুভেশ্যাম ও বড়ুয়ার অপরাধী। সন্ধ্যারাণী আপাততঃ কোনটিতেই নয়। (৩) কমল দাশগুপ্ত নীরেন লাহিড়ী পরিচালিত কে, বি পিকচার্সের একখানি চিত্রে সুর দেবেন বলে চুক্তি বদ্ধ হ'য়েছেন।

গণেশ প্রসাদ সিংহ রায় (আরামবাগ)

প্রমথেশ বড়ুয়া এবং ছবি বিশ্বাসের ভিতর শ্রেষ্ঠ অভিনেতা কে? ছবি বিশ্বাস, অমর মল্লিক, ফণী রায়, রেণুকা এদের অভিনীত শ্রেষ্ঠ চিত্র কি কি? সিনোমাটো-গ্রাফ কী এবং এর আবিষ্কারক কে?

: ছবি বিশ্বাসের অভিনয় প্রতিভার সংগে প্রমথেশ বড়ুয়ার তুলনা করা চলে না। অমর মল্লিক—কাশীনাথ। ছবি বিশ্বাস—ছদ্মবেশী। ফণী রায়—নন্দিনী। রেণুকা—পোষ্যপুত্র। Cinamatografe যে যন্ত্রের সাহায্যে চলচ্চিত্র দেখানো হয়। Thomas Armat এবং C. Francis Jekins এর Armat যন্ত্রের পূর্বে Louis Auguste Lunieree Cinematographs যন্ত্রই ছিল প্রসিদ্ধ। [illegible] খৃঃ [illegible] Armat Cinematograph যন্ত্রের দ্বারা নিউ ইয়র্কে [illegible] একখানি চিত্র প্রদর্শন করা হয় [illegible] চলচ্চিত্রের প্রচার বৃদ্ধি পায়।

বিজয় কুমার পাল (চন্দননগর)

পৃথিবীর; প্রথম নির্বাক এবং সবাক ছায়া ছবি কি কি?

: পৃথিবীর—চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রথম ছবি হচ্ছে একজন লোক হাঁচছে। সে লোকটার নাম ফ্রেড অট। তিনি এডিসনের বিজ্ঞান শালার একজন কর্মী। প্রথম চলচ্চিত্র বলতে তার হাঁচি এবং প্রথম অভিনেতা বলতে তিনিই চিরস্মরণীয় হ'য়ে আছেন। ১৯২৯ খৃঃ প্রথম সবাক চিত্র 'সিংগিংফুল' প্রদর্শিত হয়।

সব বিষয়েই দু পাঁচ কথা

- শ্রীপঞ্চক

দোষ কার ?

গত সংখ্যায় 'রূপমঞ্চে' কাদম্বরী চিত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে অবাঙ্গালী চিত্র-ব্যবসায়ীরা বাঙ্গলা চিত্রজগতকে গ্রাস ক'রে নিচ্ছে ব'লে ইঙ্গিত করা হয়েছে—ইঙ্গিত শুধু নয়, মন্তব্যটা একটু কটুও হ'য়েছে। সত্যিই বাঙ্গলা চিত্র-জগত একেবারেই যেন হিন্দী চিত্রময় হ'য়ে উঠেছে—অধিকাংশ বাঙ্গলা ছবিঘরেই আজ চলছে হিন্দী ছবি; শুধু কল্‌কাতাতেই নয় মফস্বলের চিত্রগৃহগুলিতেও। কিন্তু এর জন্য দায়ী বাঙ্গলার চিত্র প্রযোজকেরাই। কারণ তারা ছবিঘরগুলিতে চলবার মত ঠিক সংখ্যক ছবি তুলতে পারছেন না, আর এখন ছবির চাহিদাও বেড়ে গিয়েছে অনেকগুণ বেশী—সুতরাং চিত্রগৃহগুলিকে হিন্দী বা ইংরাজী ছবির স্মরণাপন্ন না হ'য়ে উপায় নেই; আর ইংরাজী ছবির চেয়ে হিন্দী ছবি সহজবোধ্য ও সহজপাচ্য বলে হিন্দী ছবি দিয়েই প্রদর্শকরা তাদের প্রোগ্রাম তৈরী ক'রতে বাধ্য হন। এর জন্যে অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের প্রতি কটাক্ষপাত গায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করা নয় কি ?

অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য পরিবেশন ক্ষেত্রে—চিত্র প্রযোজনা ও প্রদর্শন ব্যাপারে বাঙ্গালীদেরই তো দেখ্‌ছি বেশী হাত তা সত্বেও যখন হিন্দী ছবি বেশী সংখ্যায় দেখানো হচ্ছে তখন দোষ কার বের করা শক্ত নয়। বাঙ্গলার গর্ব ভারতের বৃহত্তম স্টুডিও নিউ থিয়েটার্সের কথাই ধরুণ না—৪৪ সালের আটমাস পার হ'য়ে গেল, কি বাঙ্গলা কি হিন্দী একখানা ছবিও মুক্তি দিতে সক্ষম হয় নি—ছোট প্রযোজকদের কথা আর কি ধরবো। সরকারী ফিল্ম-নিয়ন্ত্রণের চাপে তো তারা উচ্ছেদই হ'তে বসেছে। তবুও আজ বাঙ্গলার চিত্রশিল্প বলতে যা তা এই ছোট ছোট স্বাধীন প্রযোজকরাই বাঁচিয়ে রেখেছে; নিউ থিয়েটার্সের এর জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত—জন ছয়েক পরিচালক, চার পাঁচটি সম্পূর্ণ ইউনিট, দুটো ষ্টুডিও নিয়েও আটমাসের মধ্যে একখানাও ছবি সাধারণ্যে উপহার দিতে পারলে না! এদিকে লাইসেন্সের বেলা সিংহীর ভাগটা তারাই খেয়ে বসে আছে। এ হিসেবে বম্বের প্রযোজকরা অনেক বেশী তৎপর এবং তাদের তৎপরতাই আজ বাঙ্গলার গ্রামগুলিকেও হিন্দী ছবি নিয়ে ভরিয়ে রাখতে পারছে। বাঙ্গলা ছবি যখন বেশী সংখ্যক তৈরী হ'য়েছে তখন যত নিকৃষ্টই হোক সে সব ছবি ফেলে বাঙ্গালী প্রদর্শকরা হিন্দী ছবির পৃষ্ঠপোষকতা করেনি, এখন বাঙ্গলা ছবিই নেই, সুতরাং হিন্দী ছবি না হ'লে চলবে কেন? তাই বলছিলাম কাদম্বরীর সমালোচক হিন্দী চিত্রব্যবসায়ীদের প্রতি যে কটুক্তি করেছেন তা অহেতুক হ'য়েছে। সত্যি কথা বলতে অবাঙালী চিত্র-ব্যবসায়ীরা জোর ক'রে বা কোন রকম চাপ দিয়ে ক্ষেত্র তৈরী ক'রে নিচ্ছে না, বাঙলার চিত্রব্যবসায়ীদের অকর্মণ্যতাই তাদের অধিষ্ঠিত হবার পথ করে দিচ্ছে। বাঙলার এইসব চিত্রপ্রযোজকদের দোষেই আজ বাঙ্গালীগুণীদের আমরা আর ঘরে আটকে রাখতে পারছি না—বম্বে হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে তাদের মক্কা। অথচ বম্বেতে তারা যে অর্থ লাভ করেন সে পরিমাণ অর্থ এখানেও যদি তাদের প্রযোজককেরা দেন কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু তা তারা দেবেন না। বাঙ্গলা ছবি নিতান্ত প্রাদেশিক হ'লেও ব্যবসার দিক মোটেই অলাভজনক নয়, এমন বহু বাঙ্গলা ছবি আছে যার মত ব্যবসা-সাফল্য ভারতব্যাপী প্রদর্শনক্ষেত্র থাকা সত্বেও খুব কম হিন্দী ছবির ভাগ্যে ঘটেছে—হালফিল 'শহর থেকে দূরে' ও 'মাটির ঘরের' কথাই ধরুণ না। রজত জয়ন্তী সমগ্র ভারতের মধ্যে প্রথম বাঙ্গলা ছবিরই হয়েছে (চণ্ডীদাস) তারপরও দীর্ঘকাল ছবি দেখাবার রেকর্ড বাঙ্গলা ছবিরই ছিল এত দিন ('সোণার সংসার', 'চাঁদসদাগর', 'দক্ষযজ্ঞ' প্রভৃতি)।

গড়পড়তা হিসেব ধরলে এই দু'বছরে দুর্দান্ত ব্যবসা ক'রতে সমর্থ হ'য়েছে হিন্দী ছবি 'বসন্ত', 'কিসমৎ', 'নাজমা', 'শকুন্তলা', 'তকদীর', রামরাজ্য', 'তানসেন' আর সেই জায়গায় বাঙলা ছবি হ'চ্ছে 'বন্দী', 'কাশীনাথ', 'প্রিয়বান্ধবী', 'শেষ উত্তর' 'শহর থেকে দূরে', 'মাটির ঘর', ও 'নন্দিনী'—দেখা যাচ্ছে বাঙলা ছবির ব্যবসাক্ষেত্র অপরিসর মনে করবার যুক্তি খাটে না। বাঙলা ছবির এই সুফলা ক্ষেত্রকে আজ আমরা হারাতে বসেছি। স্পষ্টই হিসেব ক'রে দেখা গিয়েছে যে বাঙলা ছবির জন্য বম্বের মত বেশী পয়সা দিয়ে গুণীব্যক্তিদের নিযুক্ত ক'রলে বা ছবির জন্যে ওরকম খরচ ক'রলেও কোন ক্ষতি হতে পারে না। বাঙলা ছবির চাহিদা মেটাবার দিকে যদি প্রযোজকরা দৃকপাত না করেন তা হ'লে হিন্দী ছবিতে বাজার ছেয়ে যাবে না তো কি!

চিন্তার কথা

একটা বিজ্ঞপ্তি হাতে এলো—৺ সত্য মুখোপাধ্যায়ের পরিবারবর্গকে সাহায্য করার জন্য একটি বিচিত্র অনুষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি। এই হ'লো আমাদের অবস্থা—জনগণের মনোরঞ্জনে একজন তার জীবন উৎসর্গ করে গেল আর তারই পরিবারবর্গ দারিদ্রের কবলিত। তার কারণ সত্য মুখোপাধ্যায় বিন্দু বিন্দু রক্ত খুইয়ে যাদের সমৃদ্ধি বাড়িয়ে দিয়ে গেলো তারা তার উদর পূরতীর জন্য সংস্থান ক'রে দিত না—প্রায় শতখানেক ছবিতে অভিনয় করেও সত্য মুখোপাধ্যায় এমন পারিশ্রমিক পায়নি যার দ্বারা সে তার পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা ক'রে যেতে পারতো! এর জন্য দায়ী কাকে ক'রবো?—যে ব্যক্তি, জনগণের মনোরঞ্জনকে জীবনের ব্রত মেনে নিয়ে একনিষ্ঠ কাজ ক'রে গেল; না, যারা তাকে খাটিয়ে নিজেদের সম্পদ বাড়িয়ে গেল অথচ তার কদর মত মজুরী দেবার সময় হাতের মুঠো আর খুললে না!

বে-আদপী প্রশ্ন

১। সাতখানি ছবির লাইসেন্স পেয়েও এবং দুটো ষ্টুডিও থাকা সত্বেও নিউ থিয়েটার্স আট মাসের মধ্যে একখানি ছবিও মুক্তিদানে সমর্থ না হওয়ার পিছনে কি রহস্য থাকতে পারে?

২। ছবির সমালোচনা অনুকূল না হ'লে সেই কাগজে বিজ্ঞাপন বন্ধ ক'রে ছবির মালিকরা নিজেদের কোন উদ্দেশ্য সফল ক'রে তুলতে সক্ষম হন?

৩। বাঙলা ছবি লাভজনক হওয়া সত্বেও কেন ছবিঘর গুলির প্রয়োজন মেটাবার মত সংখ্যায় তোলা হয় না?

৪। যে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও গত বছর ভারতের মধ্যে সব চেয়ে কর্মমুখর ষ্টুডিও-ছিল এবং সবচেয়ে বেশী সংখ্যক ছবি নির্মাণ করার কৃতিত্ব লাভ করেছিল এ বছর তার সে রূপ নেই কেন আর তার নিজস্ব কোন ছবির কথাও শোনা যাচ্ছে না?

৫। বাঙলাদেশ থেকে দলে দলে গুণীব্যক্তিরা বম্বেতে চলে যাচ্ছে সে কি বাঙলাদেশে তাদের কদর হচ্ছে না বলে, না বাঙলা চিত্রশিল্প উঠে যাবার সূচনা তাদের চোখে পড়েছে?

এ দৃষ্টান্ত একটাই নয়—ভারতীয় চিত্রজগতে শত শত সত্য মুখোপাধ্যায় জঠরের জ্বালাকে চেপে কোটি জনের মনোরঞ্জনের পর বিতাড়িত অবজ্ঞাত হ'য়ে দারিদ্র্যের সুপ্রসারিত বাহুর মধ্যে আত্মসমর্পণ করেছে। এদের এবং এদের পরিবারবর্গের জীবন ধারণের সংস্থান করিয়ে দেবার কোন উপায় নেই। কিন্তু সংস্থান থাকবেই বা না কেন? যাদের দিয়ে ব্যবসা তারাই যদি না পেলো খেতে তো অমন ব্যবসায় দরকার নেই আমাদের। চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট
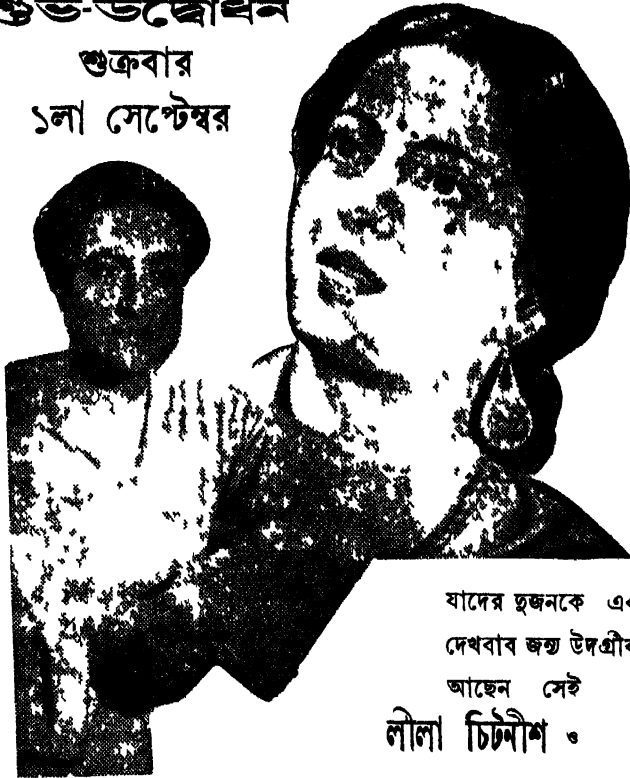
অশোককুমার

অভিনীত রামনীক প্রোডাক্‌সন্সের

কিরণ

পরিচালক : জাগীরদার

সহভূমিকায় : রামা শুক্ল, জাগীরদার, কানাইয়ালাল কুসুম দেশপাণ্ডে ও নন্দকিশোর।

একযোগে

জ্যোতি : শ্রী

২॥০ ৫॥০ ৮॥০ — ৩, ৬, ও ৯

পূর্ণ : ছায়া

প্রত্যহ ৩, ৬ ও ৯ টায়

পরিবেশক : মান্‌সাটা ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স

সকলেরই এবিষয়ে চিন্তা ক'রে দেখবার সময় এসেছে। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এর একটা প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করা দরকার। সিনেমা কি থিয়েটার যখন ব্যবসা হিসেবে সাফল্যলাভে অসমর্থ্য ছিল তখন মানাতো কোন শিল্পী বা কলাকুশলীর জন্য 'সাহায্য রজনীর' অনুষ্ঠান। আজ এটা দেশের একটা বৃহত্তম শিল্পে পরিণত হ'য়েছে, কোটি কোটি টাকা খাটছে এর পিছনে এ শিল্পে নিয়োজিত সহস্র সহস্র ব্যক্তির মধ্যে যে কোন কারণেই হোক কোন সময়ে দুঃস্থ অবস্থার কোপে পড়তে পারবে কি তার জন্যে কোন সংস্থানই কি থাকবে না? আশ্চর্য, এ-ব্যাপার নিয়ে বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সংঘ বা ভারতীয় চলচ্চিত্র সংঘ অথবা অন্য কেউই আজো মুখ খোলেনি। এখন চলচ্চিত্র শিল্পের সর্ব বিভাগই ফেঁপে উঠেছে তাই এখনই দুঃস্থ শিল্পী ও কলাকুশলীদের স্থায়ীভাবে সাহায্যের জন্য একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করা সহজ সাধ্য হবে মনে হয়। কিন্তু উদ্যোগী হবে কে?

বাণীচিত্রাকারে রবীন্দ্রনাথের "শেষ রক্ষা"

বাংলার প্রথম মহিলা প্রযোজক শ্রীযুক্তা প্রতিভা শাসমলের প্রযোজনায়, এবং পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় গৃহিত হয়েছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের রসমধুর প্রহসন শেষরক্ষার চিত্ররূপ।

বিশিষ্ট শিল্পী সমন্বয়ে ও গীত প্রাচুর্যে ছবিখানির আত্মন্ত সমৃদ্ধ হয়েছে বলে প্রকাশ। আধুনিক সমাজের উচ্চশিক্ষিতা ও সংগীত-নিপুণা কুমারী বিজয়া দাস বি, এ, রবীন্দ্রনাথের অমর সৃষ্টি ইন্দুমতীর ভূমিকায় রূপদান করেছেন। তা ছাড়া অদ্বিতীয় চরিত্রাভিনেতা অমর মল্লিক এই চিত্রে নিউ-থিয়েটার্সের বাইরে এসে প্রথম অবতীর্ণ হ'য়েছেন।

সকল দিক দিয়ে রবীন্দ্র-নাট্য-সাহিত্যের আভিজাত্যকে অক্ষুণ্ন রাখতে পশুপতিবাবু চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। আমরা চিত্র-ভারতীর এই নবীন উদ্দমের সার্থকতা কামনা করি।

মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে "রাষ্ট্রবিপ্লব"—

নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বিরচিত নূতন ঐতিহাসিক নাটক 'রাষ্ট্রবিপ্লব' মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হচ্ছে। সাজাহানের শেষ জীবনের শোচনীয় পরিণতি—মোগল সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ঔরঙ্গজেবের প্রাধান্য থেকে দারা শিকোহর শোচনীয় মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনাই নাটকে স্থান পেয়েছে। বাইরে থেকে এই গেল নাটকের স্থূল বিষয় বস্তু। এই ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে নাট্যকার যে সব অন্তর্নিহিত ঘটনা সন্নিবেশ করেছেন এজন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রথমে দেখতে পাই রাজা জয়সিংহের মারফতে নাট্যকার মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ নির্ণয় করেছেন—শুধু মোগল সাম্রাজ্যই নয়—ভারতে হিন্দু রাজত্বের পরে পাঠান—মোগল এবং পরবর্তী কোন সাম্রাজ্যই কেন স্থায়ী হয়নি বা হবে না—এর যে প্রকৃত কারণ ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে তাঁর প্রগতিশীল মনেরই পরিচয় পাই। জয়সিংহের উক্তিতে নাট্যকার ফুটিয়ে তুলেছেন: এই যে সাম্রাজ্য এ তাসের দেশের মত ফুৎকারে উড়ে যাবে। জনগণের সংগে যে সাম্রাজ্যের যোগ নেই সে সাম্রাজ্য কোনদিন টিকতে পারেনি—পারবেও না—। শুধু মোগল সাম্রাজ্যকেই নয়—নাট্যকার সাম্রাজ্য লিপ্সু প্রত্যেক জাতিকেই লক্ষ্য করে এই কথা বলেছেন। বর্তমানের সাম্রাজ্য লিপ্সু দেশগুলি যদি এই সত্য উপলব্ধি করতে পারতো তবে যুদ্ধের এই বিভতৎসতার মধ্যে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে কাউকেই জড়িয়ে পড়তে হ'তো না। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ নির্ণয় করতে যেয়ে নাট্যকার যে সত্য কথা বলেছেন তাতে তাঁর সৎসাহসেরই পরিচয় পেয়েছি। এই জন্য তিনি দারা শিকোহ এবং ঔরংজেবের চরিত্রের বিশেষত্ব ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াস পেয়েছেন। ঔরংজেব ইসলামের সর্বভারত বিজয়ের স্বপ্নে ছিলেন বিভোর—ইসলাম ধর্মের বিস্তার করে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি ভারতে সুদৃঢ় করতে তিনি চেয়েছিলেন। অপর দিকে দারা চেয়েছিলেন সর্ব-ধর্ম মহামিলনে

মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে দৃঢ় করতে। সু-সাহিত্যিক উদার মনোভাব সম্পন্ন শ্রদ্ধেয় রেজাউল করীম সাহেব সম্প্রতি সাহাজাদা সাজাহানের জেষ্ঠ পুত্র দারা শিকোহর জীবনীতে দারার এই সর্ব-ধর্ম-মিলনের আদর্শকে অতি সুষ্ঠুভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন। "পৃথিবীর কোনও শক্তি এ সমন্বয়ের গতিরোধ করিতে পারিবে না, সমন্বয়ের কাজ অনন্তকাল ব্যাপী চলিতে থাকিবে—ইহাতে কাহারও কোন বাধা টিকিবে না।" রেজাউল করীম সাহেবের এই আশার বাণীর কথাই রাষ্ট্রবিপ্লব দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল। নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—এই আশার বাণীই জয়সিংহের মারফতে—দারার নিজের উক্তিতে আমাদের শুনিয়েছেন। যে নাটকের ভিতব দিয়ে আজকের বিবাদমান জাতির শিক্ষার জন্য মহা-মিলনের বাণী ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে—জাতীয় নাট্যশালার ইতিহাসে সে নাটকের কথা যে চির উজ্জ্বল হ'য়ে থাকবে একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। নাটকের মূল উদ্দেশ্যের কথা চিন্তা করে 'রাষ্ট্রবিপ্লব' যে কোন জাতীয়তাবাদী উদার মনোভাব সম্পন্ন নাট্যামোদীদের কাছ থেকে প্রশংসা পাবে বিন্দুমাত্রও তাতে সন্দেহ নেই।

নাটকের অভিনয় এবং আনুসঙ্গিক সম্পর্কে আমাদের কিছু এবার বলবার আছে। এই প্রসংগে আর একটী কথা বলে রাখি, নাটকখানি দেখবার পূর্বে নাটক সম্পর্কে বিরুদ্ধ মনোভাবই আমাদের মনে গড়ে উঠেছিল—কয়েক-জন প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, কিন্তু নাটকখানি দেখবার পর সে মনোভাব নিয়ে যদিও আমরা ফিরিনি তবু সমালোচনা প্রসংগে কয়েকটী কথা বলার দরকার। অনেকেই অভিযোগ করেছেন—সেই একই জিনিষের শচীনবাবু পুনরাবৃত্তি করেছেন—অর্থাৎ ঐ সেই সাজাহানের বিষয় বস্তুই স্থান পেয়েছে নাটকে। বিষয়-বস্তু একই সন্দেহ নেই—প্রথম দিকে সাজাহানের চরিত্র ও অভিনয় ডি, এল, রায়ের সাজাহানের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় কিন্তু সমস্ত বিষয়টী শচীনবাবু যে দৃষ্টি ভংগী নিয়ে দেখেছেন—ইতিপূর্বে কোন নাট্যকারই তা দেখেননি তাই নাট্যামোদীরা যদি সেই দৃষ্টিভংগী নিয়েই রাষ্ট্র বিপ্লবকে বিচার করেন নাটকের বিষয় বস্তু সম্পর্কে কোন অভিযোগই থাকবে না। বরং ঐ পুরাতনের মাঝথেকে যে আলোর জ্যোতি দেখিয়েছেন নাট্যকার, সেজন্য তাঁকে প্রশংসাই করবেন। তবে ঔরংজেবের আদর্শ সম্পর্কে নাটকে ঔরংজেবের সংগে দর্শক সাধারণকে পরিচয় করিয়ে দেবার সংগে সংগে যতখানি অবহিত করে তুলতে পেরেছেন—দারার আদর্শ সম্পর্কে তা মোটেই পারেন নি। দারা তাঁর আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য না সাম্রাজ্য লিপ্সার জন্য দিল্লীর মসনদে বসবার জন্য যুদ্ধ করছেন একথা দর্শকেরা প্রথমে মোটেই উপলব্ধি করতে পারেননি, যতক্ষণ না দারা নিজে নাটকের শেষের দিকে ব্যক্ত করলেন। নাটকে দারাকে প্রধান নায়ক করলেও দারাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি মোটেই। দারা, ঔরংজেব, সাজাহান জয়সিংহ—জাহানারা, রোসেনারা এই চরিত্র কয়টী যেন নাট্যকার তৌলদণ্ডে ওজন করে রূপ দিয়েছেন—এটা কী নাটকে এক সংগে ছবি বিশ্বাস, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রাণীবালা, সরযূবালা প্রভৃতি এতগুলি প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা, অভিনেত্রীদের চুলচেরা বাটোয়ারার জন্যই না মূল চরিত্রগুলির প্রত্যেক-টীকে একই পর্যায় রাখবার জন্য তা বোঝা দায়। অভিনয়ে দারার ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস—সাজাহান—শৈলেন চৌধুরী জাহানারা—রাণীবালা, রোসেনারা—সরযূবালা, ঔরংজেব—রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়সিংহ—নির্মলেন্দু প্রভৃতি প্রায় সকলেই একই শ্রেণীর অভিনয় করেছেন অর্থাৎ team-workটী ভাল হয়েছে। তবে রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঔরংজেব এবং নির্মলেন্দুর জয়সিংহ প্রশংসাই করবো বেশী।

নাটকের উদ্বোধন সংগীতটীর সুর ও রচনার যেমনি প্রশংসা করবো তেমনি রাণীবালা যে ভংগিমায় গেয়েছেন তারও প্রশংসা না করে পারি না। নাটকের নাচ এবং গান বর্জন করা হ'য়েছে, তাছাড়া কোন অংঙ্কিত দৃশ্যাদির সাহায্যও গ্রহণ করা হয়নি—এবিষয়ে দর্শক সাধারণের মন এবং রুচি নিয়ে পরীক্ষা করে নাট্যকার যে সংসাহসের পরিচয় দিয়েছেন—এজন্যও তাঁকে ধন্যবাদ। 'তাজমহল' খিলান এবং স্তম্ভের পরিকল্পনার জন্য কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রশংসাভাজন হয়েছেন। মাঝে মাঝে নাটক একটু মন্থর-গতিতে চলেছে—শেষের দিকেই এই মন্থর গতি বেশী, বিশেষ করে নাদিরা—দারা প্রভৃতিকে নিয়ে দৃশ্যগুলি। শেষ দৃশ্যের জন্য নাট্যকারকে প্রশংসা করতে পারবো না, শেষ দৃশ্যে নাটকীয় চরমগতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নি ব'লে। দারার মৃত্যু দর্শক মনে কোন রেখাপাত করতেই পারে না।—শ্রীকাঃ।

আলোক তীর্থের "মনে রাখার রাত"

শ্রীরঙ্গমে 'আলোক তীর্থ' সম্প্রদায়ের 'মনে রাখার রাত' দেখে এলাম। আমি নিজে নাটক, সঙ্গীত ও নৃত্যকলা প্রভৃতিতে নিতান্তই অনভিজ্ঞ, তবে গত ১৫।২০ বৎসর ধরে নানা যায়গায় সৌখীন জলসায় ও অভিনয়ের মধ্য দিয়েই দিনগুলি কাটিয়ে এসেছি। সেই ক্ষুদ্র জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিয়েই 'আলোক তীর্থ' সম্প্রদায়ের অভিনয় সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলবার প্রয়াসী হয়েছি। প্রথমতঃ মনে হয় অভিনয়ের আগে ব্যবস্থাপনার দিকে উক্ত সম্প্রদায়ের বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। নাটকখানি মনে কোন দাগ রাখতে পারে না। তবে কুমারী অমিতা বসুর নৃত্য প্রশংসনীয়। সঙ্গীতাংশ মোটেই উল্লেখযোগ্য নহে। আবহ সঙ্গীত ভাল। গৌতম বাবু শ্রোতৃবৃন্দকে কিছুটা হাসির রস পরিবেশন করেছেন। দিলীপ বাবু ও শ্রীযুক্ত সুললিত গোস্বামীর ভূমিকা দুটী মন্দ হয়নি। এতদিন অভিনয়ে শুধু, পদক, কাপ, পুস্তকাদি প্রভৃতি দিয়ে শিল্পীকে সম্মানিত করা দেখে এসেছি কিন্তু এবারে 'রাণীর' ভূমিকায় কুমারী পারুল করকে জনৈক ভদ্রলোক তাঁর ভূমিকায় মুগ্ধ হয়ে স্বর্ণাঙ্গুরী প্রদান করায় কিঞ্চিৎ আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। ইহা নিতান্তই অশোভন হয়েছে। যাহা হউক সবদিক দিয়ে বিচার করে দেখতে গেলে এই এমেচার ক্লাবকে উৎসাহিত করবার জন্যেই এই সকল ত্রুটী-বিচ্যুতির উল্লেখ করতে বাধ্য হলাম।

শ্রীমুর্দ্ধেন্দু নাথ ঘোষ।

৮৫ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

রঙ মহলে বিধায়ক ভট্টাচার্যের ১৩৫০

গত ১লা সেপ্টেম্বর শুক্রবার বিধায়ক ভট্টাচার্যের '১৩৫০'

রঙ্গমঞ্চে

নাটকখানি একটি সৌখিন সম্প্রদায় কর্তৃক রঙমহল রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ হয়েছিল। নাটকখানি আমরা দেখে এসেছি। ১৩৫০ সাল বাংলার ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মত চিরদিন বাঙ্গালীর মনে বিভীষিকার মত রেখাপাত করে থাকবে। শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'তেরশো পঞ্চাশের মন্বন্তরে' যে সব তথ্য সংগ্রহ করে সন্নিবেশ করেছেন তাতে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অপেক্ষাও পঞ্চাশের মন্বন্তর যে আরও বিভৎস' এই কথাই প্রমাণিত হয়েছে। বৈদেশিক বা সরকারের কথা ছেড়েই দিলাম—কোন বাঙ্গালীই যে ১৩৫০ শের কথা ভুলতে পারবেন না বা অস্বীকার করতে পারবেন না এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এই ১৩৫০ শের দুর্ভিক্ষের কথাই বিধায়ক বাবুর নূতন নাটকে স্থান পেয়েছে। নাট্যকার হিসাবে বিধায়ক বাবু নূতন নন। তাঁর নামও নাট্যামোদীদের কাছে অপরিচিত নয়। ১৩৫০শের নাটকখানিতেও তাঁর দক্ষতারই কথা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। নাটক খানি পরিচালনা করেছেন জনপ্রিয় চিত্রনট ধীরাজ ভট্টাচার্য। নাট্য পরিচালনায় ধীরাজ বাবুর যে দক্ষতা রয়েছে ১৩৫০ নাটক খানিতে তার আমরা পরিচয় পেয়েছি। দৃশ্য সংযোজনায়—অভিনয় প্রতিভায়—নিখুঁত রূপ-সজ্জায় ১৩৫০ নাটক খানি যাঁরাই দেখেছেন তাদেরই মনে রেখাপাত করে আছে। অভিনয়ে ধীরাজ ভট্টাচার্য, ফণীরায়, রেণুকা রায়—সুশীল রায়, বন্দনা এরা প্রত্যেকেই নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। কোন সৌখীন সাম্প্রদায় যে এতটা নৈপুণ্যের পরিচয় দেবেন এ আমাদের কল্পনার বাইরে ছিল। আমরা স্থানীয় রঙ্গমঞ্চে নাটক খানি পুনরায় মঞ্চস্থ করবার জন্য কর্তৃপক্ষদের অনুরোধ করছি।

নাটকের প্রারম্ভে শান্তিপুর নিববাসী শ্রীযুত অজিত চক্রবর্তী একটি কৃষকের রূপদানে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাও এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য।

—নিতাই চরণ সেন

"নূতন নাটক নবান্ন"

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (বাংলা শাখা) কর্তৃক অভিনীত "জবানবন্দী" নাটকের সাফল্যের সংবাদ আমরা ইতিপূর্বে এই পত্রিকায় দিয়েছি। নাট্যকলায় এক সম্পূর্ণ অভিনব সমাজ-সচেতন এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন করে সম্প্রতি এই নাট্যসম্প্রদায় কলিকাতার বিশিষ্ট সমালোচক ও নাট্যকলারসিক সাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহের সঞ্চার করেছেন। গণনাট্য সংঘের কর্মীরা সৌখীন বা পেশাদারী থিয়েটারী ঢংএর গতানুগতিকতার স্রোতে গা ভাসান নাই; দেশের গণজীবনকে অভিনয়, সংগীত, নৃত্য প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নূতন ও বলিষ্ঠ রূপ দেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই গননাট্যসংঘ রীতিমত এক আন্দোলনের ভূমিকা রচনা করেছেন, "জবানবন্দী"র অভিনয় ছাড়া ইহারা বাংলা দেশের মৃতপ্রায় নাট্য সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের সূচনা করেছেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

সম্প্রতি জানা গেল, "জবানবন্দী"র নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য লিখিত নূতন নাটক "নবান্ন" মঞ্চায়িত করবার জন্য এঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী বিধ্বস্ত গত দুই বৎসরের বাংলার ক্ষয়িষ্ণু কৃষকশ্রেণীর গ্রাম্যজীবন, এই পূর্ণাঙ্গ "নবান্ন" নাটকের পটভূমি। আমরা গণনাট্য সংঘের এই নূতন নাটকের অভিনয় দেখবার জন্য বিশেষ আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করছি